কলিকাতার কথা

আদিকাণ্ড

বাযবাহাদুব

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, এম, আর, এ, এস,

ভাবত-বাণীভূষণ কর্তৃক প্রণীত

সম্পাদনা

ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এম এ (ট্রিপল), এম ফিল, পি এইচ ডি , ডি লিট

প্রাপ্তিস্থান

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিযাটোলা লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক
শ্রী অরিজিৎ মল্লিক
১২৯, বিধান সরণী
শ্যামবাজার
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ : অতনু মিত্র

মুদ্রক
গুপ্ত প্রেস
৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

নতুন সংস্করণ ঃ পরিচায়িকা

রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক, ভারত বাণীভূষণ (১৮৭৮-১৯৪৩) বিংশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গীয় সমাজের এক উল্লেখযোগ্য মনীষী ছিলেন। দানে-ধ্যানে সমাজসংস্কার কার্যে এবং সাহিত্য সাধনায় তিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। আজ তাঁর নাম এবং গ্রন্থাদি অনেকখানি অপরিচিত হয়ে পড়েছে, তা আমাদের জাতিগত ত্রুটি। আমরা অতীতকে অতি সহজে ভুলে যাই। তাঁর জীবনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে তাঁর স্মৃতিকে জাগ্রত রাখা জাতির স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে যে কয়েকটি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ জনসমক্ষে প্রচার করার প্রয়োজন আছে। প্রমথনাথের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত অরিজিৎ মল্লিক মহাশয় তাঁর 'কলিকাতার কথা' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণে উদযোগী হয়েছেন দেখে আমরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। বাংলার সারস্বত সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রমথনাথের পিতা যদুলাল মল্লিক প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮৭৮ সালে প্রমথনাথের জন্ম হয়। প্রথমে হিন্দু স্কুলে, পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তিনি পড়াশুনা করেন। নানা কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বেশি অগ্রসর না হলেও অত্যন্ত অধ্যায়নশীল রূপে সমাজে পরিচিত হন। সংস্কৃত এবং ইংরাজী দুই ভাষায় তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল, তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৩ সালে তিনি 'সুবর্ণবণিক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু ঐ সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। সুবর্ণবণিক সমাজে আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে এই সমাজে একটা জাগরণ ঘটেছিল। সুবর্ণবণিক সমাজের অনাথ, বিধবা, কন্যাদায়গ্রস্থ, দরিদ্র ছাত্র প্রমুখ এই সমিতির সাহায্যে যাতে আর্থিক সমস্যার কতকটা সমাধান করতে পারে এই ব্যবস্থা করা হয়।

সরকার কর্তৃক তিনি কলকাতা করপোরেশনের কমিশনার নিযুক্ত হন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্যও ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯২৩ সালে তিনি সুবর্ণবণিক সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচিত হন। মহাভারতের উপর তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁকে 'ভারতবাণীভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা নিচে দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থ রচনার অনেক দিন পরে প্রকাশিত।

১। কলিকাতার কথা, আদিখণ্ড (১৯৩১)

২। ঐ মধ্যখণ্ড (১৯৩৫)

৩। মহাভারত (১৯৩৫)। (মূল মহাভারত অনুযায়ী)।

৪। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (১৯৩৭)।

৫। দুটি কথা।

৬। দয়া।

৭। অবকাশ-লহরী (১৯০১)। (কবিতা পুস্তিকা)।

৮। 1894 or India's Recovery—(১৮৯৮)
(১৮৯৮ অথবা ভারতের উত্থান), পুস্তিকা।

৯। Origin of Caste (১৮৯৯) (জাতের উৎপত্তি), পুস্তিকা।

১০। The Mahabharata as it was, is and ever shall be (মহাভারত যা ছিল, যা হইয়াছে এবং যা হইবে) ১৯৩৪, প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা।

১১। The Mahabharata as a History and a Drama (ইতিহাস ও নাটকরূপে মহাভারত) স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের মুখবন্ধসহ (১৯৪৯), ৪০০ পৃষ্ঠা।

১২। The History of the Vaisyas of Bengal (বঙ্গদেশের বৈশ্যগণের ইতিহাস)

প্রমথনাথ মল্লিকের প্রধান ঝোঁক ছিল ইতিহাস-চর্চায়। সামাজিক ইতিহাসের চর্চা ছাড়া জাতীয় ইতিহাস পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। শুধু রাজকীয় শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিক কাহিনী কোন দেশকে ও জাতিকে পরিপূর্ণভাবে ধরতে পারে না। কোন জাতির আসল ইতিহাস তাঁর জনসাধারণের ইতিহাস একথা বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় বঙ্গদর্শনের কয়েকজন লেখক সেইরূপ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সামাজিক ইতিহাস রচনার গুরুত্ব প্রথা মাফিক রচনায় সিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা বিশেষ অবলম্বন করেননি। ইংরেজ আমলের সিলেবাসেও তার বিশেষ স্থান জোটেনি। ফলে দেশের তরুণেরা যা পড়েছে তা বংশানুক্রমিক রাজাদের কথা, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা এবং কিছু যুদ্ধ বিদ্রোহের বিবরণ। দেশ স্বাধীন হবার পরে, আধুনাতনকালে সামাজিক সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের দিকে অর্থাৎ জনগণের জীবন ও মানসিকতার ক্রমিকাশের দিকে ঐতিহাসিকদের পূর্ণ দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু জাতি যখন পরাধীন, যখন রাজনৈতিক ইতিহাসেরই একচেটিয়া কারবার তখন স্কুল কলেজের শিক্ষা পরিধির বাইরে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি লেখক সামাজিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন এবং নানাভাবে তার উপাদান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ করে রেখেছেন। বর্তমান গ্রন্থটিকেও আমরা সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি প্রাচীন গ্রন্থ বলে গণ্য করতে চাই।

কলকাতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক ভারতে ইংরেজ শাসন এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সূচনা এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। দুই, কলকাতা মহানগরকে আশ্রয় করেই নবযুগের বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার জাগরণ। কাজেই কলকাতার ইতিহাস বাঙালি জাতির আধুনিক কালে প্রবেশের এবং ঔপনিবেশিকতার মুখোমুখি হবার ইতিহাস।

প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয় 'কলিকাতার কথা' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন ৬৫ বছর আগে এবং পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হয় ৬১ বছর আগে। অনেকগুলি জাতীয় আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত সুদৃঢ় ব্রিটিশ অধিকারে কোথাও দুর্বলতা দেখা দেয়নি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটি রচিত একথা মনে রাখা প্রয়োজন।

লেখক ঐতিহাসিক উপাদান সঙ্কলনে যেমন পরিশ্রম করেছেন, প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন, তেমনি স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয়ও দিয়েছেন। মুদ্রিত ইংরেজী গ্রন্থ যেগুলি আকর হিসেবে গ্রহণযোগ্য তার সাহায্য যেমন নিয়েছেন, বিবিধ সরকারি নথি যেমন মেময়রস, ডায়েরি, চিঠিপত্র, দলিল প্রভৃতিকেও প্রয়োজন মত ব্যবহার করেছেন। পুরনো স্মৃতিস্তম্ভকে কাজে লাগিয়েছেন,

ভৌগোলিক বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক অংশগুলিতেও পরিক্রমা করেছেন। এইরূপে গ্রন্থটি কলকাতার ইতিহাস চর্চায় এবং নবযুগের বাঙালি সংস্কৃতির চর্চায় একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। পবিশেষে আবার উল্লেখ কবি, প্রমথ নাথের সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত অবিজিৎ মল্লিক মহাশয় গ্রন্থটিব নতুন মুদ্রণ প্রকাশ করে ইতিহাসবিদদের যেমন উপকার কবলেন তেমনই কৌতূহলী সাধারণ পাঠকদেবও আমন্ত্রণ জানালেন এমন একটি গ্রন্থপাঠে যার সরস বিবরণ ধর্মী রচনা কাহিনী পাঠের সমান আনন্দ দেবে।

বিঃ দ্রষ্টব্য / (১) আমরা গ্রন্থটির অবিকৃত পুনর্মুদ্রণ করেছি। শুধু বানানের ক্ষেত্রে আধুনিক স্বীকৃত বানানবিধি অনুসরণ কবেছি।

(২) প্রথম সংস্কবণেব আখ্যাপপত্র ঃ

কলিকাতাব কথা / (আদিকাণ্ড) / রায়বাহাদুর / শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, এম আর. এ এস/ ভাবত বাণীভূষণ কর্তৃক প্রণীত / শ্রী প্রবোধকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল/ ৪নং মদনগোপাল লেন, কলিকাতা/ কর্তৃক প্রকাশিত / ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ / সন ১৩৩৮ সাল/ ১২নং বামচন্দ্র মৈত্রেব লেন, কলিকাতা/ জুনো প্রিন্টিং ওয়ার্কস/ হইতে মুদ্রিত/ গ্রন্থকাব কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংবক্ষিত মূল্য তিন টাকা।

রথযাত্রা

১লা শ্রাবণ ১৪০৩ — **ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়**

বুধবার — এম এ. (ট্রিপল), এম. ফিল, পি এইচ. ডি. ডি.লিট।

ভূমিকা

কিছু দিন হইল একখানি মাসিক পত্রিকায় কলিকাতার কথা বাহিব হইযাছিল। পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনুবোধ করেন। তাঁহাদেব সহানুভূতি ও উৎসাহ দান কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকার করিয়া উহা গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ নূতন আকাবে পবিবর্তিত কবা হইল।

গ্রন্থের পরিচয় উহার নামেই হইয়া থাকে, তবে পাঠকবর্গ গ্রন্থকর্তার মুখে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া উহা পাঠ কবেন। বর্তমান সময়ে নাটক নভেলের পাঠক সর্বাপেক্ষা অধিক, কিন্তু অনেক সময় বিষয়ান্তর আনন্দদায়ক হয়, তজ্জন্য বর্তমানের সহিত প্রাচীন ঘটনা সকলের যে কিছু সম্বন্ধ আছে, উহা অতি পবিশ্রম ও যত্ন সহকারে দেখান হইযাছে; যাহাতে দেশের ও দশেব দুরবস্থা ও দুঃখ দাবিদ্র দূব হয়, উহাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কলিকাতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব লাভেব বঙ্গালয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, মার্হাটা পিঞ্জাবি শিখ প্রভৃতি সকলেই পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া ইউরোপের বিদেশী বণিকগণেব ব্যবসা বাণিজ্য হইতে বাজত্ব ও দেশাধিকাব করিবার পথ সরল ও সুগম করিযাছিল। সৃষ্টিব প্রথম অঙ্কে আদ্যাশক্তি যেরূপ অসুর নাশ কবিযা দেবতাগণের হৃতবাজ্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, পুবাণাদিতে উহাব বিবরণ আছে, সেইরূপ ঘোর কলিযুগের প্রারম্ভে হিন্দু রাজাগণের মধ্যে ঘোরতর প্রলয়ঙ্কবী যুদ্ধ ও বিবাদেব কথা মহাভারতে উক্ত রহিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানিব কর্মচারিগণেব দোষগুণ বিচার বিলাতের পার্লামেন্টেই হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব দোষগুণ বিচার কবিযা উহাদের উচ্ছেদ ও তৎস্থলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত কেমন করিয়া হইয়াছিল, উহার বৃত্তান্ত ইতিহাস, কোম্পানির মূল কাগজপত্রে ও সাময়িক ঘটনা পর্য্যালোচনা পূর্বক উল্লেখ করা হইল। আদিকাণ্ডে ইউরোপের ব্যবসায়িগণ কি কৌশলে এদেশের সম্রাট মন্ত্রী ও কর্মচারিগণকে বশীভূত করিযা ব্যবসা করিবার শর্তলাভ করে, কেমন কারয়া দেশের ব্যবসায়িগণের সহায়তায় এদেশে ব্যবসা করিবার শর্ত লাভ করে, কেমন করিয়া দেশের ব্যবসায়িগণের সহায়তায় এদেশে ব্যবসা আরম্ভ করে ক্রমে একাধিকার ব্যবসাদি দ্বারা তাহাদিগকে দুগ্ধের মক্ষিকার ন্যায় দূরে ফেলিয়া দেশের ব্যবসাধিকার করে ও শেষে বাজত্ব পর্য্যন্ত লাভ করে; এই কথা দেওয়ানি লাভেই সূত্রপাত হয়। সেই দেওয়ানি লাভের কথা পর্য্যন্ত আদিকাণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। কোম্পানির শেষ গভর্নবের কথায় শেষ হইয়াছে ও পরবর্তী কাণ্ড, ১ম গভর্নর জেনারেলেব কথায আরম্ভ হইবে। তিমিবাচ্ছন্ন কলিকাতা কেমন কবিয়া প্রকাণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় সমৃদ্ধিশালী নগরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকাব করিল উহার রহস্যভেদ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কলির সহিত যে কলিকাতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, উহার সূত্র নির্দ্ধারণ করা নূতনত্ব না হইলেও, উহার গায়িত্রী উল্লেখ করা আবশ্যক "**তোর কড়ি বুদ্ধি ফলার করি আয়।**" উহা প্রবাদবাক্যে পবিণত হইলেও উহা উদাহরণ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। কলিকাতার নাম ও প্রতিপত্তি প্রাচীন হিন্দু বাজত্বে ছিল না, উহার সূত্রপাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শুভাগমনে ও ব্যবসায় হইয়াছিল। সেই অপূর্ব ব্যবসার ইতিহাস ত্রিকালদর্শী

আর্যমুনি ঋষিগণের অজ্ঞাত ছিল, কারণ তাঁহারা সেকথা কোন পুবাণাদিতে উল্লেখ কবেন নাই। মহাত্মা ব্যাস মহাভারতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত কবিয়া অমর হইযাছেন, সে সকল উদাহরণকে যেন ক্লাইব, ওয়ারেন হেস্টিংস সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর, উমিচাঁদ, নন্দকুমার প্রভৃতি কালের মহিমা অতিক্রম করিয়াছে। আধুনিক বা সেকালেব কবি বা ঐতিহাসিকগণের উক্তির সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রকাশিত কাগজপত্র ও তাহাদের উচ্চ কর্মচারিগণের বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় বিচাবাদিতে প্রকাশিত সত্য প্রচার কবা এই গ্রন্থের গৌণ লক্ষ্য।

মহাত্মা ব্যাসের মহাভারতে যাহা নাই, উহা কোথাও নাই, এই কথাই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু কলিকাতায় যে সকল ঘটনা ও ভবিষ্যৎ রাজত্ব ভিত্তি স্থাপনের কথা নূতন। কোন শাস্ত্রের বা জ্যোতিষে কোথাও কেহ কলিকাতা ও উহার ভবিষ্যত উন্নতির কথা বলিয়া যান নাই। ইহাতে যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় উচ্চাদর্শ নাই, তবে ইহাতে অতীতের পঙ্কেব সার দিযা বর্তমান ও ভবিষ্যত মানব চরিত্র ও জাতীয় জীবন উজ্জ্বল কবা উচিত। কবিরা তাঁহার কাব্যে বাঙালি জাতিব প্রতি যে অন্যায়াচরণ বা ইতিহাস ও নীতিবিরুদ্ধ যে চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, উহাব যথাসাধ্য সমালোচনা ও যতটুকু সেখানে যাহা বাদ পড়িয়াছে তাহা দশের ও দেশের মঙ্গলের জন্য কর্তব্যানুরোধে উহার সংস্করণ করা হইয়াছে। বিলাতে সাধাবণ রাজকীয় পবিষদে সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সর্বেসর্বা কর্তৃপক্ষগণের ও তাঁহাদের উচ্চ কর্মচারী বা তদনুচরগণের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া কর্তব্যপবাযণ ইংরাজ জাতির বার্ক প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মনীষিগণ তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেকালেব বাঙালী জাতির কথায় সমালোচনা করায় কাহারও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। ইশপের গল্পে পনীর ভাগপ্রাথী বিড়ালের ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইয়া যেরূপ কেবল ন্যায় সুবিচারই লাভ হইযাছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষে অর্ন্তবিবাদে দেশের লোকের সহায়তায় ও আহ্বানে বিদেশী মুসলমান রাজত্ব স্থাপন ও উহার পরিবর্তন হইয়াছিল। দেশেব ধনরত্ন বিদেশীর হইয়াছিল, দেশের লোক ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছিল। লাভের ও হিংসার বশবর্তী হইয়া যাহারা সেই সকল বিদেশীর সহায়তা করিয়া রাজ্য জমিদারী লাভ করিতেছিল, তাহারা স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের ও দশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না কবিয়া দেশে দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ স্বরূপ হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সংস্কার ও সুবন্দোবস্থার জন্য বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকর্তারা স্বহস্তে রাজ্যলাভ গ্রহণ করিয়াছেন ও অতি ধীরে ধীরে গ্রসর হইতেছেন; উহার সমালোচনার যোগ্য সময় এখনও হয় নাই ও উহা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়।

যাহাই হউক সকল যুগ অপেক্ষা কলিকালে উদ্ধারের পথ সুগম, উহাতে জগাই মাধাই যেমন পাপিষ্ঠ ছিল, তেমনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সংস্পর্শে প্রেম ভক্ত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গলের বেশ্যার প্রেমাসক্তিতেই ভগবদ্ প্রেম লাভ হইয়াছিল, তুলসী দাসের স্ত্রীর গঞ্জনায় শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ হইয়াছিল; ঐকান্তিক আসক্তি ও উহার নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি হয়। নরকের ভীষণ চিত্রেব মধ্যে শিক্ষা করিবার অনেক আছে। মহাত্মা ব্যাস অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইবার পূর্বে নরক দর্শন করাইয়াছিলেন। নরক দর্শন না করিলে স্বর্গের সুষমা ও সুখানুভব করা যায় না। আশা বৈতরণী নদী ভোগের আকাঙক্ষার লোক মায়ার আবর্তে মগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু যখন প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, তখনই স্বর্গের কূলে উপনীত হয়। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে সন্তানই মানুষকে নবক হইতে উদ্ধার করে। ইহার অর্থ এই যে, সন্তান না হইলে স্বর্গীয় ভগবৎ নিঃস্বার্থ ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ও প্রেম যে কি বস্তু, উহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার পরিণামেই সন্তান লাভ হয় বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন নিঃস্বার্থ বাৎসল্য আদি উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কলিকাতার কথায় ঘোর নরকের চিত্র

সকল বর্তমান উহাতে বাঙালী জাতিব উপর কলির অত্যাচারে বা বিধিবিড়ম্বনায় তাহাদেব যে গৌরব নষ্ট হইয়াছে উহা দূর করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থের নূতনত্ব নয়। উন্নতিশীল বাঙালী জাতির উহার প্রতি লক্ষ্য পড়িলেই শ্রম সার্থক হইবে। দ্যুতক্রীড়ার ব্যসন যেরূপ দুর্যোধন ও শকুনির কার্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেরূপ নলদময়ন্তীর কথায় হয় নাই। কালের করালচক্রে বাঙালী জাতি ভাবতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা কোনাংশে হীন না হইলেও সেকালে শিক্ষা ও গুণগ্রাহী ঐতিহাসিক কবির আবির্ভাবাভাবে পরাধীন ভীরু হইয়াছিল। সেই কলঙ্ক দূর করা গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলেও গৌম বটে। এইজন্য ঘটনাদির সহিত মানব চরিত্রেব সমালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে ও করা হইয়াছে, উহা কোথাও ব্যক্তিগত ভাবে কবা উদ্দেশ্য নয়। দুর্যোধন বা শকুনির চিত্র লইয়া আর্যাকুলের বিচার করা যায় না; তবে মহাত্মা ব্যাস ঐ সকল চরিত্রেব সমাবেশ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির চিত্র উজ্জ্বল করিবার হীন চবিত্রেব সহিত সাজাইয়া ছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র, অতি দুখেব বিযয যে সকল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি আদিবসের শিরোমণি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে বীরত্বের পক্ষপাতী ছিলেন না এ কথা বলিতে হইবে। তাঁহার অন্নদাতার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তিনি অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর সর্বনাশ করিয়াছিলেন। কোন স্বদেশভক্ত বাঙালী দেশদ্রোহী ভবানন্দকে মঙ্গলময়ী অন্নদার বরপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। কবি ঐ চিত্র আঁকিয়া বাঙালীর আদর্শ করিয়া সেকালে অনেক বাঙালীকে উহার অনুসরণ করাইযা দেশেব ও দশের সর্বনাশ করিয়াছেন। হায় নবীন চন্দ্র! তুমি তোমার পলাশির যুদ্ধে বাঙালীর চবিত্রে যে কলঙ্ক কালিমা দান করিয়াছ, উহা সেকালের ইতিহাসের সত্য চিত্রেব বিরুদ্ধ। তুমি বাঙালীকে কাপুরুষ সাজাইয়া বক্তিয়ার খিলিজীকে দিয়া বাংলা অধিকার করাইয়াছ, অথচ মীরমদনের অমিত বিক্রমের কথাও উল্লেখ করিয়াছ। নিশ্চয়ই প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রমুখ বাঙালী বীরগণের কথা অবগত ছিলে, কেন উল্লেখ কর নাই বা কবিতায় তাহাদের কীর্তি ব্যক্ত কর নাই? মানবের রুচি ও মতি গতির পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করা স্বদেশ ভক্ত কবির প্রধান কর্তব্য কর্ম। সেকালে শিক্ষাভাবে, বোধ হয়, লোকের স্বদেশ ভক্তির অভাব ছিল উহাতেই আজ বাঙালীর এত দুর্দশা।

শেষ কথা, আজকালের মত অধীত গ্রন্থের তালিকা দিয়া পরিশ্রমাদির আড়ম্বর করা যুক্তি সঙ্গত নয়, কারণ না পড়িয়া, ত আর কেহ গ্রন্থকর্তা হয না। চিত্রগুলি কলিকাতার ঐতিহাসিক সভার ব্লক হইতে মুদ্রিত, তজ্জন্য উক্ত সভার কর্তৃপক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ দান করা যাইতেছে। যে যাহা লেখে সে সে সম্বন্ধে সমস্ত কথা অনুসন্ধান ও তথ্য অবগত হইয়াই লেখে, উহার সমালোচনা কবিবার সময়ই ঐ সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের মত উল্লেখ করা ব্যবস্থা। যাহা কোন গ্রন্থকর্তার মত বা কথা উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর্য মুনি ঋষিদেরও ভ্রম আর্য প্রয়োগ আছে; সুতরাং যেই লেখে সেই ভোলে। যাহাই হউক দেশের ও দশের হিতকামনায় সংকল্প করিয়া কার্য করাই কর্তব্য। লেখকের গুণ অপেক্ষা দোষই অধিক, সহৃদয় পাঠকগণ, আশা করি, মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুই গ্রহণ করিবেন। মুদ্রাঙ্কন বিভ্রাট নতুন নয়, তবে অবসর ও উপযুক্ত সহায়তা অভাবে অনেক ভুল হইয়াছে। ভ্রম সংশোধন তালিকা দেওযা অপেক্ষা কৃতবিদ্য পাঠকমণ্ডলীর উপর সেই ভারার্পণ করা হইল। ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী থাকাই সম্ভব তজ্জন্য মার্জনা করা উচিত। দ্বিতীয় সংস্করণে উহার চেষ্টা করা হইবে।

১২৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
শ্যামবাজাব, কলিকাতা

বিনীত
শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক

সূচী

বিষয়

চিত্র সূচী

[সমকালীন মতামত]

প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত

H E Lord Lytton said at the Government House Durbar .-

"It gives me great pleasure to hand to you the sanad of your title. You have taken much interest in public affairs and your connection with various educational institutions and your unostentations charity show that you appreciate your responsibility as a citizen of Calcutta and as representative of an ancient family"

"Am desired by His Excellency to congratulate you on title conferred on you"

"Hearty congratulation". Private Secretary, Governor, bengal

Darjeeling 2 June, 22 (Maharajadhiraj) Burdwan.

Darjeeling, 5 June 22.

"রায়বাহাদুর ভায়া, সম্মান ও উপাধি বর্ষণে আপনার শ্লাঘা বাড়িবে না জানি, বরং সম্মানই সম্মানিত হইবে। সাহিত্যসেবায় দেশসেবায় প্রাণপাত করিয়া ধন্য হইয়াছি রাজা তাহা জানিলেন ও বলিলেন ইহাই পরম সুখ। দীর্ঘজীবি হইয়া অকুতোভয়ে দেশ জননী ও ভাষা জননীর সেবা করুন, ইহা অপেক্ষা শুভ ইচ্ছা জানি। (সার) শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (3-6-22)

My dear Rai Bahadur,

so shall I address you and later on I am sure higher honorific titles will be bestowed on you When I read in the papers I could not make out if it was you, for indeed you deserved to start with higher honours My hearty congratulations to you

With kind regards, yours Sincerely, (Raja) kisory Lal Goswami, 7-6-1922

"Your name in the honours' list is a very agreeable and welcome surprise in force of expression and independence of thought. You have distinguished yourself in public life regardless of frowns and favours of powers that be you are and ornament of our Country and a chif of the old block You do not care for any distinction but it has come unasked and unsought You deserve it and much higher honours I admire you, love you and esteem you as a valued friend and coadjutor and consider it a pride to be associated with you."

(Rai Bahadur) Radha Charan Pal 3-6-22

My Congratulations for the Bharatbani Bhuusan title conferred on you by Pandits Maharajah Benares.

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিকস্য স্বর্ণবণিজঃ মহাভারতে সশ্রদ্ধং মহাপরিশ্রমং বহুকাল প্রবৃত্তং তৎপ্রযুক্তং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে পরমাত্মনি সানুরাগং পক্ষপাতং চাবলোক্য করালকলিকালসময়েহপি যৌবনং ধনসম্পত্তিরিত্যাদ্যনর্থকারিণাং লব্ধাবসরত্বেহপি শ্রীমৎকুমার হৃদয়োদ্ভাসিত তাদৃশ সৎপ্রবৃত্তি দর্শন সঞ্জাত হৃদয়সন্তোষোহস্মৈ সচ্চরিত্রায় "ভারতবাণীভূষণ" ইত্যুপধিং বিতরামি অনেন চোপধিনা যুক্তোহয়ং চিরং জীব্যাদিতি শিবং। সঃ ১৯৬৭

(মহামহোপাধ্যায়) শিবকুমার শর্ম্মমিশ্রঃ, চন্দ্রভূষণ শর্ম্মা প্রিংস্পপল হিন্দুকলেজ, অনন্তরাম শর্ম্মা, প্রভুদত্ত শর্ম্মাগ্নিহোত্রী, শ্রীরামভর্তা চৌহদী।

Maharaja Bahadur Sir Joteendro Mohan Tagore, K C S I wrote - " I offer you my best congratulations and good wishes for your success in the literary world " 24 3 1899

Raja Peary Mohan Mookerji C S I. wrote -

"Allow me to contratulate you on the excellence of the collection of poems the simple and easy flow of verse and the choice of words made the reading of the little pieces delightful " 5 5 1901

Saroda Charan Mitra, late Judge, Calcutta High Court wrote -"I Seldom relish Bengali poetry as my misfortune has been to come generally across doggerrels and translations But I am glad to say that some of your pieces evinced real poetry (রসাত্মকং বাক্যং) 26 6 1902

Mr R C Dutt C I.E wrote -

"I have no doubt, your book will have value in the eyes of all real students of history" 2 3 1903

Sir Jmes Mackay (Now, Lord Incheape) wrote -

"The History of the vaisyas of Bengal, dedicated to your late father my old friend for whom I had high regard and esteem I am very grateful to you for thinking of me." 7 3 1903

Dr Sir Goonidas Benerji Kt. (Late Judge Calcutta High Court) wrote :-

"The spirit of historical research which History of the Vaisyas of Bengal evinces is admirable By writing this book, you have not only done valuable service to your community, but you have made a useful contribution to our historical literature. You have already given fair earnest of good works in literary fields 23 3 03

Sir Chander Madhab Ghosh Kt Late offg Chief Justice Calcutta High court, wrote :-

"I have perused your book entitled "Historyy of the Vaisyas of Bengal". Which you have been so good as to present to me, with great interest and much pleasure. It seems to me that there are good grounds to believe that the Subarnabaniks of Bengal were at one time Vaisyas, but degenerated into the status of Sudras. You have deserved well of your caste people in bringing to light their true origin " 10 4.03

Viscount Dillon, President, Society of Antequarians of London wrote :-

"I am always interested in the history of our loyal fellow subjects in those parts, as I spent 3 years in India long ago. I am reading your work with great pleasure" 16 4.03

Maharajah Durga Charan Law C. I E. Wrote :-

"I must say that instead of spending your time thoughtlessly like many other men you have taken to literary pursuits in very commendable I only wish your good father was living I am sure he and I would have passed a pleasant time in talking of your valued propensities."

"জয়েতি দেবা শ্চ মূদা তা মূচুঃ সিংহবাহিনীং, তুষ্টুবু মুর্নয় শ্চৈনাং ভক্তি-নম্রাত্ম-মূর্ত্তয়ঃ।" ২য় অধ্যায়। ১০৯।

"যা চ স্মৃতা তৎক্ষণ মেব হন্তি নস্ সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে যে দেবশক্তির আবির্ভাব অসুর বিনাশ করিবার জন্য দেবীশ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনীতে স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল, যাঁহার পূজায় পুষ্পভূতির বংশধরগণ স্থানীশ্বর কনৌজ ও ভারতের সংম্রাজ্য লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে যিনি সেই বংশধর মল্লিকবংশে বিরাজমানা ও সম্পূজিতা, যাঁহার কৃপায় দুঃখ দারিদ্র্য দূর হয় তাঁহারই শ্রীচরণকমলে আন্তরিক ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ এই পরিশ্রমের ধন ৺শারদীয় পূজার সময় উৎসর্গীকৃত হইল।

সাষ্টাঙ্গাবনত সেবক মল্লিক শ্রীপ্রমথনাথ।

প্রথম পরিচ্ছেদ
নাম ও ইতিহাস

ভগবতী কালীর নাম হইতেই কলিকাতার নাম হইয়াছে ইহা সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল জনকয়েক অজ্ঞ লেখক ঐ নামের উৎপত্তি "খালকাটা" বা অজ্ঞ ঘেসেড়ার প্রত্যুত্তরে "কালকাটা" হইতে হইয়াছে উল্লেখ করিয়া উপহাসিত হইয়াছেন। ওয়ার্ড সাহেবের মতে কালিকাদেবী কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে ঐ নামের উৎপত্তি হয়। এই মত তাহার গ্রন্থের * পরিভাষায় দিয়াছেন। হিন্দুস্থানি কথায় কালিকা-'থা' (ছিলেন) এই হইতেই কলিকাতার নামোৎপত্তি হইয়াছে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। মুসলমান রাজত্বকালে হিজলীতে লবনের কারখানা ছিল ও সুন্দরবনের কাষ্ঠ, মোম, মধু লইয়া পশ্চিমের. লোকেরা কলিকাতায় ব্যবসা করিত। তাহাদের অনেক কথা ও ছড়া সেকালের অনেক পুরাতন তথ্য নির্ণয় করে। কলিকাতা আধুনিক নয়, ইহার উল্লেখ আইনি আকবরীতে রহিয়াছে, সুতরাং উহার নামের উৎপত্তি "খালকাটা" বা কালকাটা হইতে হয় নাই। কালীঘাটের নাম আইনি আকবরীতে নাই, গোবিন্দপুর বা সুতানটিরও কোন উল্লেখ নাই। বিপ্রদাসের "মনসার ভাসানে" কালীঘাটে দেবীর পূজাদির কথা আছে। উহার পূর্বেই ঐখানে দেবী গিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে কলিকাতার উল্লেখ এইরূপ আছে।

"ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুই কুলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট, দুকূলে যাত্রীর নাট, কিঙ্করে বসায় নানান হাট।"

কালীদেবী কবে কলিকাতা হইতে কালীঘাট যান, তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরূহ, তবে এই পর্যন্ত শোনা যায় ও প্রবাদ এই যে, বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল। সেই পুরাতন পাথরের বাঁধান ঘাট হইতে বর্তমান পাথুরিয়াঘাটার নাম হইয়াছে। সেকালে বর্তমান স্ট্রাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল। কবি-কঙ্কণের চণ্ডীতে ঐ ঘাটের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাত্রীর ও হাটের কথা আছে। বর্তমান ২০৩ নং দরমাহাটা স্ট্রীটে ঠিক পানপোস্তার উত্তর, দেবীর পুরাতন মন্দির পূর্বে সেইখানেই বর্তমান ছিল। + কাপালিকেরা দেবীকে কালীঘাটে লইয়া যায়। সেকালে তাহাদিগকে সকলেই বড় ভয় করিত, কারণ তাহারা দেবীর নিকট নরবলি দান করিত। তাহাতে তখন কেহই তাহাদের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। শোনা যায় যে, ঐ স্থানের অধিকারীগণের পূর্বপুরুষ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দেবীর স্বপ্নাদেশে ঐখানে তাঁহাব মন্দির ছিল জানিতে পারে ও তাঁহার পূজাদি করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি ঐ বংশের সকলেই পৃথক হইয়া গেলে সকলেই পৃথক পৃথক

* Kalika--"ut" = to move.

+ ২৩৫ নং দরমাহাটায় শিবের মন্দির আছে।

কালীপূজা করিয়া থাকে। তাহারা দুর্গাপূজা সেরূপ করে না। বর্তমান বসত বাড়ি হইবার পূর্বে ঐখানে সাগর দত্তের পাটের কল ছিল, উহাতে তিনবার আগুণ লাগিয়াছিল ও বর্তমান বসত বাড়িতে কিছুদিন হইল বজ্রাঘাত হয়।

মুসলমান রাজত্বকালে কলিকাতার নাম দিল্লী, আগ্রার মত বিখ্যাত না হইলেও সে সময়ে বিদ্যমান ছিল ও উহা সরকার সাতগাঁর অধীন বলিয়া আইনি আকবরীতে দেখা যায়। প্রাচীন বসবাসের চিহ্ন, পোড়ামাটির ধাতুর ঘটি, বাটি, খোলা, খাপড়া ফলের বিচি, গাছের পাতা ও গুঁড়ি আদি বর্তমান কলিকাতার দুর্গের গভীরতম কূপে, লাল দিঘি, মনোহরতলা প্রভৃতি পুষ্করিণীর গভীর ঘাতে পূর্বে পাওয়া গিয়াছে।

কালীক্ষেত্র— বেহালা হইতে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে লোকে তখন কালীক্ষেত্র বলিত, উহা যে কাশীর ন্যায় মহাপুণ্যক্ষেত্র তাহা দেবী ভাগবত উল্লেখ করিয়াছে। আরও সতীর ছিন্নদেহ ভূমিতে পতিত হইয়া পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল উক্ত হইয়াছে। তন্ত্র বিশেষের মতে একান্ন পীঠের মধ্যে কালীক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ। পীঠমালায়েও দক্ষিণেশ্বর হইতে বেহালা পর্যন্ত স্থানকে কালীক্ষেত্র বলে। ঐখানে সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে কালীঘাটের নামোল্লেখ আছে কিন্তু কালীক্ষেত্র বা কালিকা দেবীর কোন উল্লেখ নাই। কালীক্ষেত্রদীপিকা বলিয়া একটি গ্রন্থ আছে, উহা দিল্লির পাঠান রাজাদের সময়ের বলিয়াই বোধ হয়। তখন কালীঘাটের অনতিদূরে দুই এক স্থানে মানবের বাস ছিল, তদ্ভিন্ন সমস্তই ভীষণ জঙ্গল, কচু, বেত ও গুল্মাদিপূর্ণ ছিল। তখন সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি পথ ছিল উহা কপিলাশ্রমে গিয়া পৌছিত। বর্তমান চিৎপুরের রাস্তাকে সেকালে তীর্থযাত্রীর পথ বলিত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব দক্ষিণেশ্বরকে সেকালের বাংলার রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *বিখ্যাত গুপ্ত রাজাদেব পুরাতন মুদ্রা সকল কলিকাতা ও কালিঘাট হইতে পাওয়া গিয়াছে; ঐ সকল এখন বিলাতের British Museum-এর মুদ্রা প্রদর্শনীতে রক্ষিত হইতেছে। গুপ্ত বংশের অধিকার কালে প্রাচ্য ভারতে তান্ত্রিকগণ প্রবল হইয়া উঠেন। উদীয়মান তান্ত্রিকতায় বৌদ্ধ মন্ত্রযান শৈব শাক্ত সম্প্রদায় গা ঢালিয়া দেন। সেই সময়েই বোধহয় যে, কালী কলিকাতা হইতে কালীঘাটে স্থানান্তরিত হন। + সেইজন্যই বোধহয় গুপ্তবংশের মুদ্রা সকল কালীঘাটের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তখন কাপালিকগণের নরবলি আদি অত্যাচারে কালিঘাট ও কলিকাতা বনজঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। উহার সঙ্গে সঙ্গে কালীক্ষেত্র নামেরও লোপ হইয়াছিল। সেই হইতেই কলিকাতার নাম আরম্ভ হয়, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। প্রত্যক্ষমূলক সমস্ত জ্ঞানই আমাদের নিজ প্রত্যক্ষজাত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ জাত ঘটনা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত প্রবাদ হইতেই পাওয়া যায়।

পৌরাণিক সমস্যা ও তত্ত্ব নির্ণয়

বর্তমান ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বহু শতাব্দী পূর্বে কলিকাতা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানগুলি সমুদ্রগর্ভে ছিল। কালধর্মে গভীর সমুদ্রতল হইতে যুগান্তর ধরিয়া চর ও বালুকাস্তর দ্বারা

* Martin's Eastern India Vol 3. P 48

Catalogue of Asiatic Indian coins Society Journal P 142-44 (1884.)

+ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাটে আবিষ্কৃত দ্বাদশাদিত্য উপাধিধারী তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রাদিত্য উপাধিধারী বিষ্ণুগুপ্তের যথাক্রমে তিনটি ও পনেরটি সুবর্ণ মুদ্রা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাংলার 'ব' দ্বীপের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রাদি উহার পোষকতা করে ও বাংলার তীর্থাদির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। পণ্ডিত ফারগুসন সাহেবের মতে, ''দহ'' শব্দ দীপ শব্দের অপভ্রংশ ও কলিকাতার চতুর্দিকে শিয়ালদহ, এড়িয়াদহ, খড়দহ, প্রভৃতি দহ শব্দমূলক স্থান সকল বর্তমান, তাহাতে উহার উৎপত্তি গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের মত হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজারা উহার চারিধারে 'আল' দিয়াছিল বলিয়া উহার নাম বাংলা, উহা আইনি আকবরীতে উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে যে, চন্দ্রবংশের বলিরাজার পাঁচ পুত্রের নাম হইতে তাহাদের রাজ্যের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও শুহ্ম হইয়াছিল। ঐতরের ব্রাহ্মণ (২।১।১) বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকে পুণ্ড্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন বেদাদির সময় বঙ্গ বা গঙ্গার নামোল্লেখ নাই। উহার আর্য সূর্যবংশের রাজাদের কীর্তি। বনবাস কালে রাজা রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের মুখে গঙ্গার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য শুনিয়াছিলেন। তিনি গৌতমাত্মজ শতানন্দের মুখে বশিষ্ঠ কর্তৃক শক ও যবনাদি দ্বারা বিশ্বামিত্রের নিগ্রহবার্তা অবগত হইয়াছিলেন। সগর রাজা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম সাগর হইয়াছিল। কপিল মুনির আশ্রমে অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব আহরণ করিতে গিয়া কপিল মুনির শাপে সাগর সন্তানেরা ভস্ম হইয়া যায়। শেষে ঐ বংশের ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। গঙ্গার ভাগীরথী নাম সাগর সঙ্গমের মুখেই হইয়াছিল। উহা সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ। রামচন্দ্র পাণ্ডবেরা প্রমুখ সমস্ত হিন্দু রাজারা তীর্থযাত্রায় ঐখানে গিয়াছিলেন। আজ ও প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারী সাধুমোহান্ত গৃহীগণ বহুকষ্ট স্বীকার, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া সেই সাগরসঙ্গমে স্নান ও কপিলদেবের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতের পোষকতাই করে। আরও দেখা যায় যে, মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামে দৌহিত্র ছিল। তিনি যে স্থানে রাজত্ব করেন সেই দেশ তাঁহার নামে গৌড় বলিয়া বিখ্যাত হয়। এই গৌড়ই বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী, মালদহ জেলায় অবস্থিত। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গৌড়ব্রাহ্মণেরাই ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রাচীন বাংলার অধিবাসিদের মধ্যে শক-যবনাদির আধিক্য থাকিলেও আর্য হিন্দু জাতির অভাব ছিল না, কারণ সেকালের বাংলার রাজারা সকলেই আর্য হিন্দু ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব বাঙালীর বেশভূষার ধাঁজধরন দেখিয়া উহারা যে আর্য্য হিন্দুজাতি তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি দেশের রাজাদের সহিত প্রাচীন আর্যাবর্তের রাজাদের সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব ছিল বলিয়াছে। অঙ্গাধিপতি লোমপাদ রাজা দশরথের ঔরসজাত কন্যা শান্তাকে পালন ও কন্যা বলিয়া গ্রহণ করেন। দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার পিতার অনভিমতে কতকগুলি পরমা সুন্দরী বেশ্যা দ্বারা আনাইয়া যজ্ঞাদি করেন ও ঋষির কোপানল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই পালিত কন্যা শান্তাকে দান করিয়া জামাতা করেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গই রাজা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করেন ও তাহাতে রামচন্দ্রাদির জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। রাজা দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজা দুর্যোধনের পক্ষে অঙ্গ বঙ্গাধিপতি রাজারা যুদ্ধ করিয়া স্ব স্ব বলবীর্যের সবিশেষ পরিচয় দান করিয়াছিলেন। ইহাতেই বেশ বোঝা যায় যে, কেন মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশে বাস করা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তখন ঐ সকল দেশে বৈদিক ধর্মাপেক্ষা তান্ত্রিকধর্মের প্রতি লোকের আস্থা অধিক ছিল। যাহাই হউক, বাংলার

আদিম অধিবাসীরা আর্য হিন্দুজাতি। অনার্য-শক-যবনাদি কর্মোপলক্ষ্যে আসিয়া সেইখানে বাস করিত। বাংলার বর্ণমালা ভারতীয় শ্রেণীভুক্ত। বাংলার ইতিহাস আজ পর্যন্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র বাংলাদেশে সেকালে যে কোন একজন রাজা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বণিকেরা নিজ নিজ এলাকায় রাজার মত কার্য করিত। গৌড় বঙ্গমাগধের এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য প্রজারা গোপালদেব নামক একজনকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ ইতিহাসে পরিস্কার আছে।

গৌড়ীয় প্রজারা ক্রমাগত কান্যকুব্জ, গুজরাট ও কামরূপের রাজাগণের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেশের অরাজকতা দূর করিবার জন্য এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই গোপালদেব পাল বংশের প্রথম রাজা। তিনি কেমন করিয়া রাজ্ঞীর চক্রান্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার সবিশেষ উল্লেখ এইরূপ আছে যে, একজন রাজা প্রতিদিন নির্বাচিত হইত কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাহাদিগকে একে একে সংহার করিত। কেবল গোপালদেব তাহার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী কাল রাজত্ব করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বৌদ্ধ লামা তারানাথের গ্রন্থে উহার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলার ইতিহাসে" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, * মুসলমান বিজয়ের পূর্বে গৌড়বঙ্গে বর্তমান সময়ের মত জাতিভেদ ছিল না। পালোপধারী ব্যক্তিগণের বংশধরগণ কায়স্থ, তৈলিক কাংস্যবণিক প্রভৃতি বহু নিম্নজাতিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। * যাহাই হউক তখন দেশে ঘোর অরাজকতা বর্তমান; সেইজন্যই উহার কোন ইতিহাসই নাই যে যাহা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কলিকাতাদি পরগণা কাহার অধীন ছিল, তবে এ পর্যন্ত বলা যায় যে উহা পাল রাজার অধীন হইয়াছিল। পূর্বে উহা গুপ্তবংশের অধীনে ছিল। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে জনসাধারণ সেই গুপ্তবংশের রাজ্যচ্যুতি করে। উহার পরে পালবংশের অভ্যুদয় হয়। বাংলার স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ও প্রাচীন হিন্দু কীর্তির ধ্বংস বর্তমান আছে।

সপ্তগ্রাম

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করিবার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ষড়যন্ত্রের ফলে রাজা হর্ষবর্ধনের পরেই অরুণাশ্ব সিংহাসন অধিকার করেন। সেই হইতেই বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্র কান্যকুব্জ হইয়া পড়ে। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার জাতীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "কনোজপতি যশোবর্মা ও গৌড়পতি অদিশূরের উদ্যমে বৈদিক সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্মার্ত ও মীমাংসকগণ আবার নিবন্ধ প্রণয়নে অগ্রসর হইলেন। গুপ্ত ও হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে আর্যাবর্ত হইতে বৈশ্য প্রভাবাদি লোপের আয়োজন চলিয়াছিল। নিবন্ধকারগণ এই সময় হইতে বৈশ্য সমাজের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি তাহাদের ধর্ম নৈতিক সনাতন অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত কবিবার জন্য অনেকেই বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন।" সেই হর্ষবর্ধনের বংশ ও কুটুম্ব আত্মীয়গণ তাহাদের বহুদিন সঞ্চিত ধনরত্ন ও কুলদেবী সিংহবাহিনীকে লইয়া বাংলার যে কয়খানি গ্রামে বাসারম্ভ করেন কালে তাহাই সপ্তগ্রাম নামে বিখ্যাত হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ উইলফোর্ড

* বাংলার ইতিহাস (১ম ভাগ) পৃষ্ঠা ১৪৯।

সাহেব সপ্তগ্রামের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও সেখানে কাহারা থাকিত তাহা উল্লেখযোগ্য—"হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্তমান সপ্তগ্রামকে সেকালে 'গাঞ্জেস রিজিয়া' বলিত। পুরাকালে উহা রাজন্যবর্গের বাসভূমি ছিল ও ক্রমে ক্রমে বহুজনাকীর্ণ বহুগ্রাম সম্মিলিত হইয়া সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। সাতটি সাধুর নামে সাতখানি গ্রাম উৎসর্গীকৃত হওয়ায় উহার নাম সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম হইয়াছিল। পুরাণেও ঐ কথারই পোষকতা করে যে, কান্যকুব্জের + এক নরপতির সাত পুত্র সাত গ্রামে বাস করিত, তাহাতেই উহার নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল।"

ঐ সকল রাজপুত্রেরা তাহাদের পৈত্রিক ধনরত্ন দ্বারা ব্যবসা করিত। তাহারা ইউরোপে সেইখান হইতে মুক্তাদি রপ্তানি করিত। প্রসিদ্ধ টলেমি ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ হইতে তখন সোনা রূপাদি আসিত। সুবর্ণের বিনিময়ে বঙ্গের যাবতীয় বিখ্যাত পণ্যদ্রব্য ও মুক্তাদি লইয়া যাইত। ইহাতেই সেই দেশীয় বণিকেরা, সুবর্ণবণিক আখ্যা লাভ করে। ভারতের আর কোথাও বণিকগণের ঐ নাম নাই। পাঠান রাজত্বকালে সেই রাজ্যবর্ধনের বংশধরেরা সুবর্ণরেখায় স্বর্ণের আবিষ্কার করিয়া মল্লিক উপাধি ও মল্লিক খালের উভয় পার্শ্বের জমি জায়গীর পাইয়াছিলেন। তাহাতেই ঐখানে মুসলমানদিগের টাঁকশাল হইয়াছিল। প্লিনির সময় হইতে পর্তুগীজদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সপ্তগ্রামই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। ঐতিহাসিক হন্টার সাহেবও উহার সমর্থন করিয়াছেন। উহা হইতেই বাংলার নাম "সোনার বাংলা" হইয়াছিল। সপ্তগ্রাম রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাধিকার লোপের পর শতাধিক বৎসর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ স্থান সমূহও বোধহয় ঐরূপ স্বাধীন ছিল। আইনি আকবরীতে বাংলার দুইটি বন্দর সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইউরোপীয় জাতির অধিকারে ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। মোগলেরা উহাকে বিদ্রোহীর আড্ডা বলিত ও সেইজন্য উহার নাম "বুলঘক খানা" দিয়াছিল। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিজার ফ্রেডরিক ভ্রমণ করিতে আসেন। তিনি সপ্তগ্রামে প্রতি বৎসর ত্রিশ পয়ত্রিশ খানি বিদেশী অর্ণবপোত আসিত বলিয়াছেন। পেগুর সহিত সপ্তগ্রামের রজতাদির ব্যবসা বিশেষরূপে চলিত; ঐস্থানেব কার্পাস নির্মিত উত্তম বস্ত্র, সুমাত্রা, মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে ও ভারতেব নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। ঐ দুই বন্দরে বাণিজ্যের মাশুল বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা আদায় হইত। সাতগাঁর অন্তর্গত কলিকাতা মহকুমা ও ব্যারাকপুরের খাজনা ৯৩৬২১ দাম ছিল। সেকালে টাকার চল্লিশ ভাগের একাংশ তামার পয়সাকে দাম বলিত। আইনি আকবরীর রাজস্ব হিসাবে এই পর্য্যন্তই পাওয়া যায়। উহাতে ব্যারাকপুর দুইটি আছে। রুকনউদ্দিন বারবকশাহ সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সুবিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আমলে কেহ প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতে পারিত না। তখন জলাভূমির চারিদিকে আল দেওয়া হইত।

ব্যারাকপুর তাঁহারই স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। বোধহয় যে, বর্তমান ব্যারাকপুর বারবকপুরের অপভ্রংশ মাত্র * ও মকুমা মাকান্দা হইবে। ঘটককারিকা বলে যে, রাজা আদিশূর ভট্ট নারায়ণকে তীর্থবাস করিবার জন্য কালীঘাট দিয়াছিলেন। আর উহার বংশধরকে বল্লাল কালীক্ষেত্র একদানপত্রে দান করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধহয় যে কলিকাতা বা কালীক্ষেত্র সরকার সাতগাঁর অধীনে আসিবার পূর্বে আদিশূরের অধীন ছিল। সপ্তগ্রামের আদিম অধিবাসিরা কলিকাতায় আসিয়াছিল ও সপ্তগ্রামের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার

+ কান্যকুব্জ রাজা হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল।

* Robertson সম্রাট ফরাকশিয়ারের ফারমন।

উন্নতি আরম্ভ হয়। কলিকাতার সহিত সপ্তগ্রামের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্যবসার সূত্রেই উন্মুক্ত হইয়া যায়।

কালীর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা

শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, পৃথিবীর মঙ্গলের নিমিত্ত সত্যযুগে দেবতারা স্ব স্ব শক্তির সমষ্টিতে আদ্যাশক্তির সৃষ্টি করেন। সংযম শিক্ষা দ্বারা বলসঞ্চয় সমষ্টিতেই হয়। স্ত্রীজাতিই তাহার মূলে বর্তমান। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা প্রথমে সমাজশক্তির প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি যেন জগৎকে পাতিব্রত্য ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য পিতার যজ্ঞে স্বামীর অযথা নিন্দা শ্রবণ করিয়া আপনার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাযোগী শিব পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই মৃত সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। তখন বিষ্ণু সেই পবিত্র মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই সিদ্ধপীঠের সৃষ্টি হয়। তাহাতেই কোথাও অন্নপূর্ণা, কোথাও বগলামুখী, কোথাও চামুণ্ডাদি বিরাজমান। পৃথিবীর যত প্রকার যাগযজ্ঞ আছে তাহার মধ্যে দাম্পত্য-প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন কালীমূর্তির আবির্ভাব। সাক্ষাৎ ভীষণ কালরূপী ভগবতী হৃদয়ে ভক্ত মুণ্ডমালা ধারণপূর্ব্বক তাণ্ডবনৃত্যের সহিত ভবানীপতির গুণকীর্তন করিতেছিলেন। তাহাতে পৃথিবী রসাতল যায় দেখিয়া মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয় নামের স্বার্থকতা করিবার জন্য যেন কৌশলে ধরাশায়ী হইয়া সেই নৃত্য ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহাতেই যেন গঙ্গা * শিববেণী ভ্রষ্ট হইয়া প্রবাহিতা। সত্যই ক্রোধে সকলকে স্বর্গ হইতে মর্তে নামাইয়া আনে। তাহাতেই গঙ্গার এইখানেই নাম পরিবর্তন হইয়াছিল। যাহাই হউক, কালীমূর্তি ভীষণ হইলেও যথার্থ ভক্তের চক্ষে উহা অপূর্ব দাম্পত্যপ্রেমের সমুজ্জ্বল আত্মোৎসর্গের চিত্র। কালীদেবীর প্রথম আবিষ্কারাদির কথা প্রবাদ ও কিম্বদন্দীতে বর্তমান, সুতরাং নানা মুনির নানা মত, কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার উপায় নাই। মূর্তিপূজা বেদাদির সত্যযুগের সময়ের নয় উহা আধুনিক। বর্তমান কালীদেবীর মূর্তি দেখিয়া বোধহয় যে, যেন উহা যশোহরেশ্বরীর সম-সাময়িক। বেহালায় রাজা বসন্তরায় কৃত অনেক দিঘি ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। তিনিই বর্তমান কালীর মূর্তি ও তাঁহার পুরাতন + মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। বর্তমান কালীর সেবায়েতগণের পূর্ব পুরুষ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী রাজা বসন্তরায়ের মঙ্গলকামনায় দেবীর পূজা করিতেন। দেবীর পূজা ও মন্দিরাদির নির্মাণ দ্বারা রাজা বসন্তরায়ের অধিকারই প্রমাণ হয়। আরও বেহালাদি স্থানে তাঁহার নির্মিত অন্যান্য মন্দিরাদি উহাই স্থির করে। পরবর্তীকালের ঘটনাদিও তাহারই পোষকতা করে। রাজা বসন্তরায়ের পিতামহ রামচন্দ্র সপ্তগ্রামের কাননগুহের সেরেস্তায় এক মোহরের কার্য করিতেন। রামচন্দ্র ঐ কার্য পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে কার্য করিতে যান। সেইখানেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় ও দেহান্ত হয়। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বঙ্গের সিংহাসনে মুসলমানের মধ্যে সুলেমানের মত ন্যায়বান বিচক্ষণ পণ্ডিত শাসনকর্তা বসে নাই বলিলেই চলে। তিনি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য করিতেন, ও বড়ই গুণগ্রাহী ছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্রেরা সকলেই তাহাদের পিতার পদ ও মর্যাদা নবাবসরকারে

* শাস্ত্রীব প্রতাপাদিত্য পৃ ৮৬।

+ "শিবজটা মুক্ত হয়ে ভাগীরথী নাম লয়ে এথা আসি ত্রিবেণী হইল।
সরস্বতী যমুনাবে মিলাইয়া দুই ধারে মধ্যভাগে আপনি বহিল।।"

অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভবানন্দ প্রতিভাবলে নবারের মন্ত্রী হইয়া পড়েন। রামচন্দ্রের তিন পুত্র, ভবানন্দ, শিবানন্দ ও গুণানন্দ। ভবানন্দের শ্রীহরি ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নবাব সুলেমানের পুত্র দায়ুদের সমবয়স্ক ছিল। তাহারা একসঙ্গে লেখাপড়া ও খেলা করিত। সেই দায়ুদ যখন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন তখন শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায় উপাধিতে সম্মানিত হইয়া অমাত্যপদ লাভ করেন। সুলেমানের সময় বঙ্গদেশে সম্রাট আকবরের নামে খুতবা (নামাজ) পঠিত হইত। দায়ুদ উহা রহিত করিয়া নিজ নামে তাহা প্রচলিত করিলেন। বিদ্বান ব্যক্তিগণের সহবাসে ও শিক্ষায় তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনতাকাঙ্খা প্রবল হইয়া পড়ে। তিনি মন্ত্রিগণকে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। উহাতে দূরদর্শী ভবানন্দ চাঁদ খাঁ মছন্দরীর পরিত্যক্ত যশোর আবাদ করিবার জন্য জায়গীর লইলেন ও সেইখানে পরিজনসহ চলিয়া গেলেন। গৌড়ে কেবল শ্রীহরিই রহিলেন। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সুলেমানের রাজত্বকালে বাংলাদেশে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়। একজন ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান রমণীর রূপৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম ও স্বদেশদ্রোহী হইয়া পড়েন। যে গঙ্গাবংশাবতংস রাজা মুকুন্দদেব অদ্ভুত বিক্রমে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন ও ত্রিবেণীতটে সুপ্রশস্ত ঘাট বিজয়ধ্বজা স্বরূপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি কালাপাহাড় কর্তৃক পরিচালিত পাঠান সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হন। এই সকল যুদ্ধাদিতে বাংলায় অশান্তি আরম্ভ হইয়াছিল। উড়িষ্যার পুরাতন দেবদেবীর ধ্বংস সেই কালাপাহাড়ই করিয়াছিল। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দায়ুদ নিহত ও গৌড় মহামারীতে জনশূন্য হয়। সম্রাট আকবর বিদ্রোহদমন ও বাংলা জয় করিবার জন্য রাজা তোডরমল্ল ও মুনেম খাঁকে পাঠান। সেই রাষ্ট্র বিপ্লবেব সময় রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ছদ্মবেশে নানাস্থানে অবস্থান করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছিলেন। প্রবাদ যে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর প্রসাদে ও উৎসাহে রাজা তোডরমল্লের অনুগ্রহ লাভ করিয়া দায়ুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যশোরাদির শ্রীবৃদ্ধি করেন। গৌড় নগরের মহামারীর পূর্বে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। গৌড়েই তাঁহার জন্ম হয় ও তাহার জন্মকালের ঘটনা ও কোষ্ঠীবিচার করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে গেলে রাজা বসন্তরায় বিধির নির্বন্ধে উহা করিতে দেন নাই। প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে গিয়া সম্রাট আকবরের দরবারে রাজনীতি শিক্ষা করেন ও মিবারের মহারাণা প্রতাপসিংহ কেমন করিয়া দিল্লীর অধীনতা শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য সুখ ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতার মৃত্যুর পূর্বে জমিদারীর দশ আনা ভাগ পান। রাজা বসন্তরায় ছয় আনা মাত্র পান। তিনি মোগল বাদশার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই পিতৃব্য বসন্তরায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেন না। তাহাতেই তিনি তাঁহাকে ও তাহার কর্মক্ষম পুত্রগণকে হত্যা করেন। তিনি ভবিষ্যতে মোগল আক্রমণ রক্ষা করিবার জন্য সেকালের পাঠান সামন্তগণ ও হিন্দু জমিদারগণকে একমতাবলম্বী করেন। নদীর উপকূলে মাটির দুর্গাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ দুর্গ জগদল রায়গড়, মাতলা, বেহালা, মুচিখোলা, শিবপুর, সালকিয়া, চিৎপুর, মুলাজোড় প্রভৃতি স্থানে ছিল।

মেটিয়াবুরুজ ঐ মাটির বরুজ হইতে মুচিখোলাকে **মেটিয়াবরুজ** আজও লোকে বলিয়া থাকে। প্রতাপাদিত্য কালীঘাটে আসিতেন। এইরূপে দেখা যায় যে কলিকাতা ও তৎ সন্নিবেষ্ট স্থান সমূহ প্রতাপাদিত্যের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। নৈহাটিতে সেই যশোর রাজবংশের

যে গঙ্গাবাস বাটী ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের সহিত কলিকাতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গোবিন্দপুর

প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়ের চিরাভিলষিত উৎকলেশ্বর মহাদেব ও গোবিন্দজী বিগ্রহ আনয়ন করিতে গিয়া সুবর্ণরেখাতটে উৎকল বাসীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। উহাতে গোবিন্দজীর শ্রীমতি সুবর্ণরেখায় পড়িয়া যায় ও তাহা তিনি উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সেই গোবিন্দজীকে শ্রীমতির সহিত যশোরে লইয়া যাইবেন বলিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহার একজন কর্মচারী গোবিন্দ দত্ত, দেবীর প্রত্যাদেশে কালিঘাটের নিকটবর্তী কোন স্থানেব মাটির ভিতর হইতে প্রভূত অর্থলাভ করেন ও দেবীর পূজাহোমাদি করিয়া গোবিন্দপুর গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। ঐ দেবতার নামে ঐ গ্রাম পত্তন করা হয় ও অমনোনীত শ্রীমতির মূর্তিগুলি বেহালা প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, দিগ্বিজয় গ্রন্থে ইহার আভাস পাওয়া যায়। সতীশবাবু বঙ্গীয় সমাজ গ্রন্থে ১৪৩।১৪৪ পৃষ্ঠায় বলেন যে কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত ভাগীবথীর পূর্বতট বাসী বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজা বসন্ত রায়ের প্রভাবে তথায় আসিয়া বাস করেন। বর্তমান পিরালী ঠাকুর গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ পঞ্চানন যশোর হইতে ঐখানে বাস আরম্ভ করেন। ঐখানের নাম পত্তন লইয়া অনেক অযথা দাবীর কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। সাহেবেরা তাহা লইয়া উপহাসই করিয়া থাকিবেন। উইলসন ও ষ্টার্ণডেল সাহেব তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য! উহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। শেঠেরা ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর তাহাদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীউ হইতে ও হাটখোলার দত্তরা ও কুমারটুলির মিত্রেরা তাহাদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দবাবুর নাম হইতে গোবিন্দপুর হইয়াছে বলিয়া দাবী করেন। ঐ সকল দাবীর সন্তোষজনক কোন প্রমাণ নাই ও তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই। যাহাই হউক, টাকীর জমিদার রায় চৌধুরীদের পূর্ব পুরুষ ভবানিদাস প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিলেন। খুলনা বাগের হাট প্রভৃতির যাবতীয় সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ * প্রতাপাদিত্যের প্রদত্ত জমিদারী ভোগ করিতেছেন। ইহাতেই প্রতাপাদিত্যের কোন না কোন কর্মচারী কর্তৃক গোবিন্দপুরের নাম প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে সঙ্গত বলিয়াই বোধহয়।

যুদ্ধ— সেকালে প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। তিনি হিন্দু মুসলমান, ফিরিঙ্গি মগেদের নেতা হইয়াছিলেন। তিনি ধূমঘাটের দুর্গ মধ্যে প্রাসাদাদি করিয়া + রাজ অভিষেকাদি করিয়াছিলেন। রাজা বসন্ত রায়ের হত্যার পর তাহার শিশু সন্তান রাঘবকে তাঁহার মাতা কচুবনে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য তাহার নাম কচুরায় হয়। প্রতাপাদিত্য ঐ রাঘবকে সেখান হইতে আনাইয়া আপনার পত্নীকে লালন পালন করিতে দেন। সেই পুত্র রাজা বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসুর সাহায্যে পলায়ন করিয়া দিল্লীর দরবারে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে পিতৃ হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করেন। সেকালে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং হিজলিকাঁথির ইশা খাঁর চক্রান্তে ও কৌশলে প্রতাপাদিত্যেব হস্ত হইতে কচুরায় উদ্ধার লাভ করে। ইহাতেই প্রতাপাদিত্য হিজলী জয়

* বঙ্গীয় সমাজ পৃ. ১৪৩।

+ শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্য পৃ. ৭০। বারভূঞা পৃ. ১৭৫। রাম রাম বসুর জীবন চরিত।

করিয়া ইশা খাঁকে নিহত করেন। রাজমহল হইতে শের খাঁ প্রতাপাদিত্যকে বশীভূত করিতে গিয়া পরাস্ত হইলেন। এই সকল সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি এব্রাহিম খাঁকে প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সহিত প্রতাপাদিত্যের বেহালা বড়িশার সন্নিকট কলিকাতার দক্ষিণ রায়গড় দুর্গের নিকট যুদ্ধ হয় ও শেষে প্রতাপের জয়লাভ হয়। মোগলগৌরব আকবর প্রতাপাদিত্যের বিজয় কাহিনীতে মর্মাহত হইয়া কুমার খসরুল শ্বশুর ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রী আজিম খাঁকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাংলায় পাঠাইয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্যের নিকট কোনরূপ বাধা না পাইয়া তাঁহারা বর্তমান কলিকাতার নিকট শিবির স্থাপন করিয়া উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ রাত্রির ঘোর অন্ধকারে প্রতাপের সৈন্যগণের হাতে সেই প্রসুপ্ত মোগল সৈন্যগণ তাহাদের সেনাপতির সহিত মহানিদ্রায় অভিভূত হইল। প্রাচীন ঘটক কারিকা ঐ যুদ্ধে কুড়ি হাজার মোগল সৈন্যের রক্তপাতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অতিরঞ্জিত হইলেও সত্য জয় ঘোষণা করিতেছে। কলিকাতায় সেই মোগল ও বাঙালীর রক্তপাত ও প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়েই কলিকাতার জঙ্গলের হিংস্র জীবজন্তু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়াছিল বা তাহারা সেই সকল মৃতদেহ ও উষ্ণশোনিত পান করিয়া বহু দিনের জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করিযাছিল। এই যুদ্ধে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে যোদ্ধৃবর্গ উত্তেজিত হইয়া কোন বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন নাই, তবে যদি বাঙলার মধ্যে কোথাও তীর্থস্থান থাকে যথায় মোগল সম্রাটের অধীনতা শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য বাঙালী দশ সহস্র আততায়ীকে হত্যা করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়া ধন্য হইয়াছিল, তবে সেই এই কলিকাতায়। সেই বিজয়বার্তাই, হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে পার্থক্য শেষ করিয়া একপ্রাণে একযোগে বারভূঞাগণকে একত্রিত করিয়াছিল ও মোগল সম্রাটের প্রবল প্রতাপে ভীত না হইয়া বরং তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ বা কায়মনোবাক্যে বিরুদ্ধাচরণ করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হয় নাই। তখন সকলেই জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য ধন, মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। সেই দুঃসহ প্রতাপাদিত্যের বিজয়বার্তা সম্রাটকে শেল সম বিদ্ধ করিল ও সেই মোগল শোণিতপাতের ও পরাজয়ের প্রতিহিংসা কামনায় দ্বাবিংশতি আমিরগণ স্বর্ণপ্রসু বঙ্গভূমিতে মোগল বিজয় বৈজয়ন্তী স্থাপন করিবার জন্য আগমন করে। তাঁহাদের সেই দর্প বশীরহাটের অপরপারে ইচ্ছামতীর তীরে চূর্ণ হইয়াছিল। আজও সেই চিরস্মরণীয় সংগ্রামের বিজয় দুন্দুভি সংগ্রামপুরের নামে নিনাদিত হইতেছে। মোগল কুলগৌরব আকবর আগরায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সময় তাঁহার প্রেরিত দ্বাবিংশ আমিরের পরাজয় ও নিধন সংবাদে ব্যথিত, যে নারকীয় পন্থায় তিনি বিদ্বেষী আমীর ও রাজাগণের জীবননাশ করিতেন, ভুল ক্রমে বিধির বিধানে নিজে সেই বিষাক্ত পান সেবন করিয়া ইহলীলা শেষ করেন। আম্বেরের রাসা গ্রন্থে, টেরী তাহারা ভ্রমণ বৃত্তান্তে ও আরংজেবের ইউরোপীয় চিকিৎসক মেনুসী ঐ শোচনীয় মৃত্যুর কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাই হউক কলিকাতার যুদ্ধে মোগলের পরাজয় ও প্রতাপাদিত্যের বিজয় কলিকাতার নামকে যেন চিরস্মরণীয় করিয়া সর্বত্র প্রথম পরিচিত করে।

তুলনা ও সমালোচনা— যতদিন ভূমণ্ডলে স্বাধীনতা রক্ষার আদর ও বীরের সম্মান বর্তমান থাকিবে, ততদিন ভারতে দুই প্রতাপের নাম অক্ষুণ্ণ অমর ও উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে দুই জনেই সম্রাট আকবরের শত্রু—একজন রাজস্থানের মেবার মুকুটমণি বীর কেশরী, মহারাণা প্রতাপ সিংহ, আর একজন বাংলার নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পুত্র, বঙ্গগৌরব

প্রতাপাদিত্য। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্তমান। প্রতাপসিংহ রাজার সন্তান, শিক্ষিত রণবীর ও বীর প্রভুভক্ত রাজপুত অনুচরগণ পরিবেষ্টিত। আর বাঙালী প্রতাপের সেইরূপ কিছুই ছিল না। বাঙালী প্রতাপাদিত্য নিজ চেষ্টায় সমস্তই করিয়াছিল। হিন্দু খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণকে একত্রিত করিয়া শিক্ষিত মোগল সৈন্য ও তাহাদের সেনাপতিগণকে উপর্য্যুপরি পরাজিত করিয়াছিল। তাহাতেই বাঙালী জাতির রণনৈপুণ্য, সাহস ও বল বীর্যের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং দিল্লীতে সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার বিষয় দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালার মুসলমান অধিপতিরা সম্রাটকে কর দান না করিয়া কেমন করিয়া রাজ্য হারাইয়াছিলেন তাহাও দেখিয়াছিলেন। মনে করিলে, তিনিও অনায়াসে রাজা তোডরমল বা মানসিংহের মত দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক বাংলার শাসনকর্তারূপে সম্মানিত হইতে পারিতেন। কিন্তু সেইখানেই প্রতাপাদিত্যের বিশেষত্ব ও বীরত্ব। রাজপুত বীর প্রতাপ যদি স্বদেশভক্ত বীর কবি বিকানীয়ারাধিপতির ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের সৎপরামর্শ ও উৎসাহ না পাইতেন, তাহা হইলে তিনিও আকবরের সহিত প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে বদ্ধ হইতেন। সেই পৃথ্বীরাজের পত্র পাঠ করিলে উহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তন্নিমিত্ত ঐ পত্রের সারমর্ম সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করা হইল। ইহাতে স্বদেশপ্রেম ও ভক্তি যে কি বস্তু, তাহা সম্যক অবগত হইয়া প্রতাপাদিত্যের পাপ পুণ্যের বিচার ও গৌরব যে, কোথায় উহা স্পষ্ট জানা যায়। রাণাপ্রতাপ কষ্টে ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া সম্রাট আকবরের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। সম্রাট তাহা পাইয়া বড়ই আনন্দিত ও তাহাতে রাজধানী উৎসবে জাগরিত। বন্দি কবি উক্ত পৃথ্বীরাজ প্রতাপের সন্ধিপত্র প্রার্থনা দেখিয়া উহা জাল বলিয়া উড়াইয়া দেন ও তাহার নির্ণয়ার্থ প্রতাপকে পত্র লিখিবার অনুমতি লাভ করেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"**আকবর** কর্তৃক সকলেই ক্রীত, একমাত্র অবশিষ্ট **উদয়ের** পুত্র **প্রতাপ**। **প্রতাপ**— অমূল্য, সেই ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিনিময় করিয়াছে। যে মহারাণা বিষয় বিভব রাজ্য সকলই ত্যাগ করিয়া জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া সেই অমূল্য রত্ন রক্ষা করিয়াছেন, শেষে সেই চিতোরও কি সেই হাটে বিকাইবে? যিনি আপনাকে প্রকৃত রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন, তিনি কি আপন মর্যাদা নৌরোজায় জলাঞ্জলি দিতে পারিবেন? যদিও তাহা অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু সেই কলঙ্ক এখনও হামিরের বংশধরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই অমূল্য রত্ন রক্ষা করিবার জন্য যে অসি নিষ্কাসিত হইয়াছে, উহা কি সমগ্র রাজপুত জাতির কলঙ্কমোচন ও মান সম্ভ্রম বজায় না করিয়াই, কেবল ক্ষণস্থায়ী জীবন ও সুখ দুঃখের জন্য ত্যক্ত হইবে? সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে সেইজন্য প্রতাপের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে।"

উহার গূঢ় মর্ম অবগত হইয়া মহারাণা প্রতাপ নৌরোজার সময় দিল্লী আক্রমণ করিয়া পূর্ব সন্ধিপত্র জাল প্রতিপন্ন করেন। স্বদেশ উদ্ধারের জন্য স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুত অমাত্য অকাতরে অর্থদান করিয়া রাণা প্রতাপের উদ্যোগের সহায়তা করিয়াছিলেন। এইরূপ কোনও সুযোগ বাঙালী প্রতাপের ছিল না, তবুও তিনি বারবার মোগল বাহিনী পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক জননী ও জন্মভূমি উদ্ধার করিবার চেষ্টায় প্রতাপের পিতৃব্যহত্তাদি শত অপরাধ নষ্ট হইয়াছিল! শাস্ত্রে কর্তব্যপরারণ ব্যক্তি যে পথাবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রতাপ তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। প্রহ্লাদ হরি কর্তৃক পিতৃবধের কারণ হইয়াও হরিনাম ত্যাগ করেন নাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির পরমগুরু আত্মীয়গণের

ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন, ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সম্মান রক্ষার জন্য মাতার আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতাপাদিত্যের কার্যসমূহ দেশরক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত, সেইজন্য উহা পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সত্য, বাংলার প্রতাপকে রাণা প্রতাপের মত দুঃখ দারিদ্র্যের অনশনাদি ভীষণ কষ্টভোগ করিতে হয় নাই, কিন্তু তাঁহার অনুগত ও ভৃত্যগণের স্বদেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। প্রতাপের রায়গড়, কলিকাতা ও সংগ্রামপুরের জয়লাভ, রানা প্রতাপের হলদিঘাট, দেবীর ক্ষেত্রাদি যুদ্ধের সমতুল্য, বা গ্রীকজাতীর মারাথান ও থার্মপলির সমান। হায়! আজ পর্যন্ত বাংলায় কোন কবিই প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্য ও জয় ঘোষণা করিয়া কিছুই লিখিলেন না। নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ বাঙালীকে ভীরু আদি ভীষণ অন্যায় চিত্রে অঙ্কিত করিয়া বাঙালী জাতির সর্বনাশ করিয়াছেন। আর সেকালের কবি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের বীরত্বের কোন কথা না বলিয়া, দেশদ্রোহি মানসিংহের দাস ভবানন্দেরই প্রশংসা করিয়া অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ভবানন্দের উন্নতি অন্নদার বরপুত্র হিসাবে হইয়াছিল বলিয়া, দেশে দুর্নীতি প্রচার ও কুলাঙ্গারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হায়! সে সময়ের লোকের প্রকৃতি ও রুচি, তখনকার কবির কথায় ও কাব্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। যে নিজের নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশ ও দশকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারে, বীরের ও জমিদারগণের সর্বনাশ করে, তাহাকে কবি অন্নদার বরপুত্র সাজাইয়া গুণাকর উপাধি ও অর্থ লাভের লোভে কর্তব্য ও বিদ্যাবুদ্ধির অপলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

"ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত, ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি কত, ক্ষমা রূপা ক্ষীণের ক্ষমতা।"

* * * *

'কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি, সেইমত রচিয়া বিধানে।'

হায়! গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ হিন্দুরা সামাজিক বিষয় লইয়া বিবাদেই দেশের সর্বনাশ করিয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র রায়ের মনোমালিন্য হয়। কেদার রায়ের সহিত শ্রীমন্ত খাঁর মনান্তর হওয়ায় চাঁদ রায়ের পরমা রূপবতী যোড়শী কন্যা সোনামণি ইশা খাঁর হস্তগত হয়। ইশা খাঁকে কেদার রায় ত্রিবেণীর দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। সেই ইশা খাঁ মানসিংহকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর ত্রিপুর ও শ্রীপুরের রাজাগণ সোনার গাঁ আক্রমণ করিলে তাঁহার সেই পত্নী সোনামণি স্বয়ং বীরবিক্রমে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইশা খাঁর পিতা বৈশ্য রাজপুত, অযোধ্যা হইতে বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া মুসলমান হন। তাঁহার দুই পুত্র— ইশা খাঁর ও ইসমাইল খাঁ বণিকদিগের নিকট বিক্রীত হন। তাঁহাদের পিতৃব্য কুতব খাঁ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন ও শেষে তাহারা সোনার গাঁর মালিক হইয়া পড়েন। যাহাই হউক, ইহাতে দেখা যায় যে, সেকালে স্বদেশবৎসল বাঙালী স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বীরত্বের উদাহরণের অভাব ছিল না। ঐজন্য বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার

* 'যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্তরায়, রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল।
ক্রোধ হইল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়, রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে বঙ্গে, মানসিংহ বাংলায় আইলা'।

রায়, মুকুন্দরাম, সীতারাম প্রভৃতি নাম উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। শেরশাহের ন্যায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা উদয়নারায়ণ একাকী নবারের প্রস্তাবমত প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়া নিজ সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছিলেন। রঘুবংশের দিগ্বিজয় বর্ণনায় কবি কালিদাস বাংলায় জয়স্তম্ভ গঙ্গার মধ্যে স্থাপন করা রঘু রাজারও পক্ষে শ্লাঘার কথা মনে করিয়াছিলেন। সেই বাংলায় গৌরব বারভূঞার আমল পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ইতিহাসে কলিকাতার নিকট প্রতাপাদিত্যের বিজয় ও শত্রুসংহার আজম খাঁর শিবির আক্রমণ হয়। উহা সেকালের বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনাতেই ঐযুগের ইতিহাসের প্রথম স্থান অধিকার করে।

মানব ভোগতৃষ্ণায় অভাব সৃষ্টি করে। সেই কল্পিত অভাবের জন্য দুঃখ ভোগ করে। উহা দূর করিবার জন্য সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। উহার জন্য সে কোনরূপ দুষ্কার্যকে পাপ বা ঘৃণার কার্য মনে করে না। মহাকবিরা তাঁহাদের কাব্যে উহার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়াছেন। আর কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কি ঠিক তাহারই বিপরীত। ভবানন্দকে দেবীর বরপুত্র সাজাইয়া দেশে কৃতঘ্নতারই প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাতে এদেশে লোকে নীচ শ্বাপদের ন্যায় স্ব স্ব উদরপূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অনেক **ঘরের ঢেঁকি কুমীরেরই** সৃষ্টি করিয়াছিল। দেবীর সমক্ষে যেমন কাপালিক ও দস্যুরা স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবলীলাক্রমে পশু ও নরবলি দান করিত, তেমনি সেকালের সম্রাট হইতে সামান্য জমিদারেরা আপনদের মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদা ভুলিয়া গিয়া, কেবল স্বার্থসিদ্ধির লোভে দেশের ও দশের সর্বনাশ করিয়া নররক্তের অপব্যবহারে নরকেব ভীষণ বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেন। তাহাতেই বোধহয়, শাস্ত্রে মনোভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যজ্ঞে বলিদানাদিব ব্যবস্থা ও যজ্ঞের জন্যই পশুগণের সৃষ্টি উক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যকে যুদ্ধে পশুশ্রেণীতে পরিণত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত করা সেকালের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের খর্বতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! সেই সকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ যদি কবি কর্তৃক অন্নদার ববপুত্র সাজান হয়, তাহা হইলেই বলিতে হয় যে, সে সময় বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানাদি দ্বাবা স্বার্থত্যাগে স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি করা বাংলায় বাঙালীর ধ্যান ও ধারণার অতীত বিষয় হইয়াছিল। তখন ভারতবাসী বা বাঙালীরা অসভ্য ছিল না। তাহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার ভুরি ভুরি উদাহরণ শাস্ত্রাদিতে বর্তমান ছিল; তবে যে তাহাদের ঐরূপ দুর্দশা কেন হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা এক যুগমাহাত্ম্য ও কালধর্ম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। লোকে তখন "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মন্ত্রের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। তাই তখন কর্মচারীরা প্রভুর উন্নতি বা দেশের মঙ্গলের দিকে না তাকাইয়া কোনরূপে আপনাকে রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী করিতে পারিলে যথেষ্ট মনে করিত। হায়! পরাধীন বাঙালী জাতির মধ্যে রাজপুত ভাট বা মার্হাট্টা কবিগণের মত স্বাধীনতার যশঃ কীর্তন না থাকিলেও যে, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, চাঁদ রায়াদির জন্ম হইয়াছিল, ইহা বড়ই বিচিত্র। দীপ নিভিবার পূর্বে একবার যেমন দপ্ করিয়া জ্বালিয়া উঠে, তেমনিই বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছিল। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে কলির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নল যুধিষ্ঠিরাদি রাজারা রাজ্য দেশ ও স্ত্রী পর্যন্ত হারাইত, তেমনি সেকালের সম্রাট হইতে মূর্খ প্রজারা সামান্য গৃহবিবাদে বা সামাজিক মনান্তরে প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিয়া খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিয়া দেশ

মজাইয়া দিত। **ষড়যন্ত্রই কলিকালের ব্রহ্মাস্ত্র।** বিদেশীগণ তাহাতেই দেশের বিপ্লবের সময় দুর্দমনীয় পার্বতীয় বারির ন্যায় ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল। তাহাতেই বোধহয়, শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া মথুরা ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন ও দ্বারকায় গমন করেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ কৌশল করিয়া যে পর্বত গুহায় রাজা মান্ধাতার পুত্র মুচকন্দ দেবতার বরে নিদ্রিত ছিলেন, সেইখানে কালযবনকে লইয়া গিয়া মুচকন্দের মস্তকে পদাঘাত দ্বারা তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করান ও তাহাতেই দেবতার বরানুযায়ী কালযবন ভস্মীভূত হইয়া যায়। কলিকালে যুদ্ধাপেক্ষা মন্ত্রণাবলই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। দেবী ভগবতী ও ব্রহ্মা বিষ্ণু সেই পথ অবলম্বন করিয়া অসুর নাশ করিয়াছিলেন। তিলোত্তমাই সুন্দ উপসুন্দের নাশের কারণ হয় ও ব্রহ্মার অমর বর বিফল করে। মহাদেবের বরে গার্গ্য অপ্সরা গোপালির গর্ভে কালযবনকে লাভ করেন। তিনি যাদবগণের কুলগুরু ছিলেন। ও যাদবগণের কন্যা বিবাহ করেন। তিনি শ্যালকগণ কর্ত্তৃক নপুংসক বলিয়া উপহাসিত হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য তাহাদের অবধ্য কাল-যবনকে যবনরাজের পোষ্যপুত্র করান। এইরূপে দেখা যায় যে, কলিযুগের সূত্রপাত হইতেই হিন্দুর তপস্যায় ও দেবতার বরে যবন জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল; সেইজন্যই কবি ভারতচন্দ্র ভবানন্দের উন্নতি অন্নদার বরে হইয়াছিল বলিয়াছেন। যুগমুখী ব্রাহ্মণ যুগধর্মানুসারে কার্য করিয়া দেবীর বর লাভ করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন বা ক্রমওয়েল মহাবীর হইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা শার্লমান, ফ্রেডেরিক বা পিটারের মত ইতিহাসে উচ্চাসন পান নাই। ভারতে একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া উহা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সকল বীরত্ব ও যত্ন সেইজন্যই বিফল হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্থায়ী হয় নাই। তিনি চন্দ্রগুপ্তের মত আলেকজাণ্ডারের বিজিত ভারতাংশ পুনরুদ্ধার করিয়া স্থায়ী রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেই সময়েও ভারতে জাতীয়তার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার পরে ও উহা হইবার কোন সুযোগই হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বংশ, ধর্ম ও ভাষা এক সমাজভুক্ত হইয়া সমুদ্রে সম্মিলিত নদী সমূহের ন্যায় তাহাদের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতিজ্ঞানাদি লোপ করে নাই। এইরূপ দেশে এক স্বজাতিপ্রতিষ্ঠা যে জাতির বলবতী হয়, সেই জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবল ও বলশালী হইয়া পড়ে। উহারই প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভারতের সে সৌভাগ্যোদয় হয় নাই।

বাণিজ্য স্বাধীনবৃত্তি। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া উহার উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। ব্যবসায়ী বণিকগণ সপ্তগ্রামকে বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র করিয়া বিদেশী বণিকগণের সহিত সেইখানে ভারতের যাবতীয় সামগ্রীর ব্যবসা করিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইত। তাহাদের সহানুভূতি লাভ করিয়া শাসন-কর্তার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। তাহাতেই পরাধীন বাঙালী জাতির মধ্যে স্বাধীনতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সকল স্বদেশী ও বিদেশী বণিকগণের সাহায্যে প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে সৈন্য সামন্ত সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সেই সৎসাহসের ও বীরত্বের তুলনা নাই। তাহার প্রশংসা না করিয়া কবি ভারতচন্দ্র কেমন করিয়া প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু আদি বর্ণনা করিলেন ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার

অনুমোদন করিলেন বোঝা যায় না, উহা যে ভবানন্দের মানসিংহকে সাহায্য করার অপেক্ষা শতাংশে অধিক গর্হিত কার্য, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হায়! যে রসদাভাবে মহাবীর নেপোলিয়নকে রুশিয়া জয় করার আশা ত্যাগ করিতে হয় সেই দেশবৈরী— সৈন্যগণকে রসদ যোগাইয়া, বাঙালীর কালাপাহাড় বল, আর কালযবনই বল, হায়! ভবানন্দ * অন্নদার বরপুত্র সাজিয়া রাজা জমিদার ও ধনবান হইয়াছিলেন। কেমন করিয়া সেই ভবানন্দের উপযুক্ত বংশধর কবিকে দিয়া সেই দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা উজ্জ্বল করিয়া লেখাইয়া রাখিলেন ইহা বিবেক ও বুদ্ধির অগম্য। দুর্যোধনাদির চরিত্র যেমন পাণ্ডবগণের চিত্র সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, তেমনি ভবানন্দ কচুরায় প্রমুখ রাজা মহারাজা যশোহরজিৎগণ প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, মকুন্দ রায় প্রভৃতির চিত্রে বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধিই করিয়াছিল। তখন যে সকল মগ বোম্বেটিয়া ফিরিঙ্গি দস্যুদের ভয়ে দেশের লোক কাঁপিত, তাহাদিগকে যাঁহারা সৈন্য ও সেনাপতি করিয়া তাহাদের দ্বারা দেশের দুঃখ দূর করিয়াছিল তাঁহারাইত দেশের যথার্থ হিতৈষী ও রাজা। কি আশ্চর্য্য! বলিতে ও লিখিতে কাহারও লজ্জা হয় যে সেই সকল মুর্খ বিদেশীদেশবৈরীগণের মধ্যে কেহই প্রতাপাদিত্য প্রমুখ কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। যদি চক্রান্ত বা রসদ দানের পরিবর্তে ভবানন্দ ও কচুরায় প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহাতে কাহারও কোন দুঃখ ছিল না, তাহাতে শুধু দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় হইত মাত্র। ইহাতেই মনে হয় সেকালে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এই কথার মূল্য ছিল না। সেই কাপুরুষ কচুরায় যশোহর লাভ করিয়া যশোরেশ্বরীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের রসদ যোগাইয়া যে কেবল ভবানন্দের ভাগ্য ফিরিয়াছিল তাহা নহে। নলডাঙা, বাঁশবেড়িয়ার জমিদারদেরও সেই দশা। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট সাহেব স্বদেশদ্রোহী রাজপুতকুলকলঙ্ক রাজা মানসিংহের বীরত্ব অপেক্ষা পতিত্বেরই প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার পঞ্চদশ শত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা প্রায় সকলেই বাংলায় ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিল। বাংলায় তিনি দুইটি পত্নী লাভ করিয়াছিলেন ও তাহাতেই তাঁহার বংশরক্ষা হইয়াছিল। কোচবিহারাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার ভগ্নী পদ্মেশ্বরীকে মানসিংহকে দেন। + তাহাতেই বোধহয়, জয়পুরের রাজারা 'কাছোওয়া' বংশ বলিয়া থাকে।

* গিয়াছিনু বাংলায়, ঠেকেছিনু বড় দায়,
সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল, অবশেষে যাহা রৈল,
উপবাসী সহ দশবলে।
ভবানন্দ মজুমদার, নাম খুব হুসিয়ার,
বাঙালী বামুণ এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল. সকলেরে বাঁচাইল,
ফতে হৈল ইহারি কারণ।
সে দেবীর পূজা দিয়া, ঝাড়বৃ নিবারিয়া,
যোগাইল সকলে আহার।
বাজ্য দিব কহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি,
গোলামে কবুলে পার পায়।
বাংলার সামাজিক ইতিহাস।—পৃ. ১৩৮।৯

লবকুশের বংশ বলিয়া সে কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা যতই কেন করা হউক না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহাই হউক, বাংলা বিজয়ে রাজা মানসিংহের পত্নীলাভ ও মানে মানে বংশরক্ষা হইয়াছিল। রাজা মানসিংহের পঞ্চদশ শত পত্নীর সকলেরই দুই তিনটি করিয়া পুত্র ছিল, শেষে তাঁহার মৃত্যুকালে কেবল একমাত্র পুত্র বর্তমান ছিল। মানসিংহের অনেক পত্নী তাঁহার সহমৃতা হন। ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার গৌরবের কথা। মানসিংহ বাংলার যাবতীয় সমাচার ভবানন্দ মজুমদারের নিকট অবগত হন। একথা কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনুমোদন করিয়াছেন। তখন তিনি যে বিভীষণের কার্য করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"মানসিংহ বাংলার, যত যত সমাচার, মজুমদারে জিজ্ঞাসিয়া জানে।"

ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য করিতেন কিনা, তাহাতে আর কি আসে যায়, আজ পর্যন্ত রাজারা সকল দেশে গুপ্তচরের কার্যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালধর্ম ও পূর্বস্মৃতি

কলি— কলিই কলিকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ক্রোধের ঔরসে তাহার ভগ্নী হিংসার গর্ভে কলির জন্ম। কলি স্বীয় ভগ্নী দুরুক্তির পাণিগ্রহণ করেন। ভয় উহার পুত্র—মৃত্যু কন্যা। হিন্দু জাতির মধ্যে কলিকে দেবতা শ্রেণীর মধ্যে দেওয়া হয় নাই ও তাঁহার পূজাদি করা হয় না। কলির অবতার কল্কী—-নাদির শাহ প্রমুখ সকলেই কল্কীর ন্যায় ভারত শোষণ করিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছিল। দাবানলে কুরুঙ্গদল যেমন ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া শেষে তাহাতেই দগ্ধ হইয়া যায়— সেইরূপ ভয়ানক দৃশ্য নাদির শাহের আমলে দিল্লীতে হইয়াছিল। নাদির শাহ একটি মসজিদ উপরে থাকিয়া ঐ বীভৎস ব্যাপার দর্শন ও সৈন্যগণ দিয়া নিরীহ নাগরিকগণকে পশুবৎ বধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। তখন নিরুপায় নিরীহ নাগরিকগণ সেই সকল সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া প্রতিহিংসা করিতে গিয়া নষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে সকলের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া হত ও আহত ব্যক্তিগণকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল ও পথে রক্তস্রোত উষ্ণতায় প্রবাহিত হইয়াছিল। ঐ সময় দিল্লী, শ্মশান অপেক্ষা শত সহস্র গুণে বিভীষিকাময় দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। রমণীগণ পশুগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবাব জন্য আত্মহত্যা কবিয়াছিল। নাদির শাহের এই ভীষণ অত্যাচারের মূল কারণ অর্থলিপ্সা। বাংলার স্বাধীনতা লোপ করিয়া মোগল সম্রাটের কর অর্থাদি আদায় করিবার জন্য রাজপুতগ্লানি মানসিংহ দুইবার বাংলায় আসিয়াছিল। সেই সকল দানবগণের কৃপায় সোনার বাংলা ছারখার হইয়াছিল। প্রাসাদাদি পরিপূর্ণ নগর গ্রাম হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছিল। বাংলার বীরগণ যাঁহাবা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহারা সর্বস্বান্ত ও নিহত হইয়াছিল। কলির প্রভাবে হিন্দুর সর্বনাশ ও যবনের অভ্যুদয় হিন্দু কুলাঙ্গারগণের দ্বারাই হইয়াছিল। ইহাতে বাঙালী জাতির কলঙ্কের বিষয় কিছুই নাই। এই লীলাখেলা কলির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের আমল হইতেই হইয়া আসিতেছে৷ যাদবগণকে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। বাঙালীর শ্রীকৃষ্ণের মত মন্ত্রী ছিল না, তাই মানসিংহের পতন হয় নাই। সেই কলির প্রভাব যখন ষোলকলা, তখনই কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হয়। সেই কলিকাতার যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য যবন রক্তে পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ ও তর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তাঁহার ভোগে আসিল না। সেই কালিকাতা তাঁহার পরাজয়কেতন স্বরূপ তাঁহার অনুগত ভক্ত লক্ষ্মীকান্তের হইল। কি আশ্চর্য্য! ইনিই প্রতাপাদিত্যের বিজয়ের পর সকলের অগ্রণী হইয়া তাঁহার সর্ম্বদ্ধনা করিয়াছিলেন। ইনিই বড়িষার সাবর্ণচৌধুরীদের পূর্বপুরুষ। কেমন করিয়া ইহার সৌভাগ্যোদয় হইল, উহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। উহাতেই কলির প্রভাব কলিকাতার প্রাপ্তিতে কতদূব বর্তমান, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। কলিকাতায় মোগলবীর্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, শেষে আবাব সেই কলিকাতা তাহাদের বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ লক্ষ্মীকান্ত বিনা রক্তপাতে লাভ করিল। হায়!

উহাতেই দেশ চিরদিনের জন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। তাহাতেই মনে হয়, কলিকাতার নাম সন্ধিবিচ্ছেদ ব্যুৎপন্ন করিলে মন্দ হয় না। কলির + কাতা (রজ্জু) এই সন্ধিবিচ্ছেদে কলিকাতার উৎপত্তি নিষ্পন্ন করা হইল। লক্ষ্মীকান্তের জন্মের সময় জননী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতাও তাহাই করিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে কামদেব সদ্যোজাত সন্তান লক্ষ্মীকান্তের প্রতি তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার ভগবদত্ত আশ্চর্য উপায়ে ভূপতিত অসহায় জ্যেষ্ঠী শাবকের জীবনরক্ষা ও আহার লাভের ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার মায়ারজ্জু ছিন্ন হইয়া যায় ও তিনি ব্রহ্মচারী হন। সেই অবধি তিনি পরিত্যক্ত পুত্রের কোনরূপ সংবাদাদি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু কলির প্রভাবে পরম পবিত্র তীর্থ কাশীতেও কলির অবতার মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার পুত্রের প্রতি মমতা হঠাৎ তীব্র হইয়া পড়ে। তাহাতেই বলিতে হয়, প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস তাঁহার কর্মচারিগণের অভ্যুদয় বিধাতার লিপি। তখন কলির প্রভাবে ধর্মলোপ হইয়াছে। "ঘটক কারিকায়" কামদেবের নাম জীয়ো গাঙ্গুলী। তাঁহার নিকট মানসিংহ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন।

"মানসিংহ মহারাজ কাশীতে আছিল
জীহোর নিকটে তিঁহ উপদিষ্ট হ'ল।"

* * * *

"মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ
কালীঘাটে পায় নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।"

* * * *

"আজি হ'তে তব ইচ্ছা যত লও তুমি
কুলীনে ধরুক্ ছাতা অন্নদাতা তুমি।"

* * * *

"লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত রায় চৌধুরী খ্যাতি
কন্যাদানে কুলনাশে কুলের দুর্গতি।"

* * * *

"কালীঘাট কালী হ'ল চৌধুরী সম্পত্তি
হালদার পুজক তাঁর এই ত বৃত্তি।"

সেই শত সহস্র মোগল বাঙালীর রক্তপাতের লভ্য কলিকাতাদি পরগণা সকল কামদেব ব্রহ্মচারীর সন্তান লক্ষ্মীকান্তের হইল। উহার সহিত পিতাপুত্রের সম্মিলন পরস্পর কুলশীলাদির পরিচয় হইল। স্বজাতি বৎসল মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কেহই প্রতাপাদিত্যের কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলেই কলিকাতা সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতেন। যাহাই হউক, মোগল দরবারে কলিকাতাদি পরগণায় নাম মোগল সম্রাটগণের শ্রেষ্ঠ আকবরের সময়ের প্রতাপের বিজয়ে উল্লেখ ও উহাকে জাহাঙ্গীরের সময় সেই কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান করা হয়। সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্ববাস হুগলী জেলার অন্তর্গত গোহট্ট গোপালপুরে ছিল। তাঁহারা জমিদারী লাভ করিয়া কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন নাই। হুগলী ত্যাগ করিয়া নিমতা ও শেষে বড়িশায় বাস করেন। কলির ব্রহ্মাস্ত্র মায়া— তাহার রজ্জু ছিন্ন করিয়া লক্ষ্মীকান্তের জন্মের সময় কামদেব ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন, আবার তাহার অনেক পরে বহু সাধনার পর সেই মায়ার রজ্জু ব্রহ্মচারীকে কাশী হইতে কলিকাতায় আনাইয়া পিতা পুত্রের পরিচয় ও সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে কালী ও কলিকাতা পরগণা লাভ করাইয়া দিল। ইহা কলির অনুগ্রহেই হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। লক্ষ্মীকান্তের জন্ম ফকিরডাঙায় হয়।

মানব অহঃরহ দেবীর নিকট কামনা করিয়া পূজা করিতেছে। প্রার্থনায় আপনার মনের উচ্চভিলাষের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। বাসনার পরিতৃপ্তিতে উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে

থাকে। সেই বাসনাই মানুষকে দাঁড়ের মত বাঁধিয়া কলির পদতলে লুণ্ঠিত করে। সেই কৃতকার্যতার চিন্তাই মানুষের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট করে। তাই কামদেব বহুকাল কাশী বাস ও সাধনা করিয়াও মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল। তোডরমল্লের আমলের রাজস্ব বন্দোবস্তে বাঙালীর সাতপুরুষের বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া হিন্দু মুসলমান এক হইয়া মোগল সম্রাটের কর বন্ধ করিয়াছিল ও যাহাতে তাহা আর দিতে না হয়, তাহারই জন্য বারবার মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়াও শেষে কৃতকার্য হইতে পারিল না। সেকালে কলিকাতার এমন কিছুই ছিল না যে, যাহা দ্বারা তাহার এই অলৌকিক উন্নতি সূচনা করিতে পারে। তাহাতেই মনে হয় কলির প্রভাবে উহা সম্পন্ন হইয়াছিল ও সন্ধি বিচ্ছেদের অর্থের সহিত উহার নামের সার্থকতা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে।

সুতানটি— মার্কোপোলোর আমল হইতে বাংলায় ক্রীতদাস-দাসীর ব্যবসা চলিত। সেকালের মুসলমান দরবারে বিদ্যাবুদ্ধি অপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রীর মূল্য অধিক ছিল। আরমানি পর্তুগীজেরা সম্রাটের দরবারে সুন্দরী স্ত্রী সরবরাহ করিয়া তাঁহাদের অর্থলাভ ও সম্মানাদি যথেষ্ট হইত। সেকালে দেশে সুন্দরী স্ত্রী রক্ষা করা দায় ছিল। বীর শের আফগানের রূপসী মেহেরুন্নিসার হরণ ও তাঁহাকে "নূরজাহান" অর্থাৎ জগজ্যোতিঃ নামে প্রখ্যাতা করিয়া সম্রাট তাঁহাকে প্রাধানা সাম্রাজ্ঞী করেন। তিনিই জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য রক্ষা ও চালনা করিতেন। তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে জাহাঙ্গীর নূরজাহান সহ বন্দি হইয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই ষড়যন্ত্রে তাঁহার ভ্রাতৃ-কন্যা-পতি শাহজাঁহা সম্রাটের তৃতীয় পুত্র হইয়া সাম্রাজ্য লাভ করেন। ঐ সকল কারণে বাংলাদেশে কেন সমস্ত ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও শিক্ষা লোপ হইয়াছিল। অবরোধ ও সহমরণ প্রথার প্রশ্রয়ে বাঙালী জাতি দুর্বল হইয়া পড়ে। আরমানিরা স্ত্রীজাতির ব্যবসায় সম্রাটের মনস্তুষ্টি করিয়া "ফকর অলতোজার" অর্থাৎ বণিকগৌরব উপাধি লাভ করে। কলিকাতায় মোগল সম্রাটের আমল হইতেই সূতা ও নটীর ব্যবসা আরমানি পর্তুগীজেরা করিত। উহাতেই উহার ঐ নাম হয়।

বরানগর— ওলন্দাজেরা নটীর ব্যবসা বারনগরে করিত। পুরাতন ওলন্দাজী দলিলে বারনগরই লেখা আছে ও তাহা হইতে বরানগর হইয়াছে। ইংরাজেরা সূতা ও নটির ব্যবসা করিয়াছিলেন উহা সেকালের সেরেস্তার কাগজে প্রকাশ পায়। তদনুরূপ সূতা ও নটির ব্যবসা হইতে সূতানটি নাম পত্তন হইয়াছিল।

সেকালে এদেশে স্ত্রীলোকেরা চরকা কাটিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। সেকালের চরকা কাটার ছড়া এইরূপ ছিল : —

"চরকা মোর ভাতার পুত, চরকা মোর নাতি।
চরকার কল্যাণে মোর, দ্বারে বাঁধা হাতি।।"

সেকালে এইদেশে চরকার সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারী হইত, সেজন্য ম্যাঞ্চেস্টার বা লাঙ্কেশায়রের উদর পূরণ বা এক্সচেঞ্জের খেলায় ব্যবসায়ীর সর্বনাশ হইত না। মহাত্মা গান্ধী এখন তাই সেই চরকার বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। সেকালে দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উপার্জনক্ষম ছিল। এদেশে তখন স্ত্রীলোকেরা দিবানিদ্রাদি সুখভোগ করিত না, চরকায় সূতা কাটিত। দেশের অভাব দেশের লোকেই দূর করিত, তাহার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। তাহাতেই পৃথিবীতে এদেশের শিল্প ও নৈপুণ্য বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, দিল্লিতে সম্রাটেরা ঢাকার মসলিন বড়ই আদরে গ্রহণ ও ব্যবহার করিতেন। শেষে তাঁতিরা পর্তুগীজ, আরমানি বণিকগণের কুপরামর্শে দাদনি প্রথায় দেশের সেই সূতা কাটা ক্ষতিকর করিয়া ফেলে ও ক্রমে উহা বন্ধ হইয়া যায়। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে

উহার উল্লেখ আছে তাহা দেওয়া গেল।

"প্রভুর দোসর নাই উপায় কে করে, কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে।
দাদনি দেয় এবে মহাজন সবে, টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে?
দু'পণ কড়ির সূতা, একপণ বলে, এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে।"

সেকালে বিদেশী ইউরোপীয় জাতিগণকে ফিরিঙ্গি বলিত ও তাহারা সেখানে থাকিত ও ক্রীতদাস-দাসীর ব্যবসা করিত; লোকে সেখান দিয়া যাইবার সময় ভয়ে জড়সড় হইত। এদেশের স্ত্রী পুরুষ হরণের জন্য তাহাদিগকে হারাম বলিত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উহার আভাস পাওয়া যায়।

" ফিরিঙ্গি দেশ খান বহে কর্ণধার, রাত্রিদিন বহে যায় হারামদের ডরে।"

সেকালের পর্তুগীজেরা ব্যাণ্ডেলে গির্জা করিয়া এদেশের লোকজনকে জোর করিয়া খ্রীষ্টান ও সপ্তগ্রামের বাণিজ্য পোতাদি লুটপাঠ করিত। ধৃত স্ত্রীপুরুষ কলিকাতার জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিত ও তাহাতে তাহারা ক্রীতদাস-দাসীর ব্যবসা করিত। সেকালে ইউরোপের বণিকগণ স্বদেশ হইতে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিত না। তাহাদের সেবা শুশ্রুষা ঐ সকল নটীরা করিত ও তাহারা তাহাদের যত্নে মুগ্ধ হইত। তাহাতে সেই সকল ইউরোপীয় বণিকগণের যে সন্তানসন্ততি হইত তাহাদিগকে ফিরিঙ্গি বলিত। সেকালের নবাব বাদশাহরা ইউরোপের সুন্দরী স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার করে, সেই ভয়েই বা স্বাস্থ্যের জন্যই হউক, তাহাদিগকে এদেশে আনিত না। সেইজন্য তাহারা যেখানে থাকিত, সেখানে নটির ব্যবসা বেশ চলিত ও দালাল থাকিত। সেই সকল ইউরোপীয়গণের সহিত নটিগণের আলাপাদি করাইয়া ধোপা রতন সরকার নূতন ইউরোপবাসিদের ঘনিষ্ঠতায় দোভাষীর কাজ করিবার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সেকালের তাঁতিরা তাহাদের সহিত তাহার আলাপ করাইয়া দিত। ইহাতেই সে বেশ রোজগার করিত ও সে যেখানে থাকিত, তাহার বাগান বলিয়া এখনও রাস্তায় তাহার নাম রহিয়াছে। অনেক ক্রীতদাসী আপনাদের স্বাধীনতা ইউরোপীয় বণিকগণের নিকট লাভ করিত ও মদের ব্যবসা করিত। সেকালে ইউরোপবাসিগণের জন্য জাভা ও বাটোভিয়া হইতে এক রকম মদ আসিত; আর আরমেনিয়ানগণ এক আরক মদ বিক্রী করিত। বর্তমান আরমানি গির্জায় ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের এক আরমানির সমাধি বর্তমান রহিয়াছে। সেকালে আরমানি পর্তুগীজ ও ওলন্দাজেরা তাঁতিদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস ও ব্যবসা করিত। কয়লাঘাটায় বর্তমান মেটকাফ্হলের নিকট তাঁতিরা থাকিত, বাঙ্কশাল স্ট্রীটের নিকট ওলন্দাজেরা, ক্যানিং ও আরমানিয়ান স্ট্রীটের নিকট পর্তুগীজ ও আরমানিরা থাকিত। ওলন্দাজেরা খিদিরপুর হইতে শাঁকরালের খাল পর্যন্ত ভাগীরথীকে গভীর করিয়া বাণিজ্যোপযোগী করে ও উহাকে কাটি গঙ্গা বলিত। ঐখানে ওলন্দাজেরা কুতঘাটা মাশুল আদায় করিত, তাহাতেই তাহাদের ভাষানুযায়ী ব্যাঙ্কশাল রাস্তার নাম হইয়াছে। পর্তুগীজদের যেখানে তুলার গুদামাদি ছিল, আজও তাহা আলুগুদাম বলিয়া পরিচিত। পর্তুগীজ ভাষায় তুলাকে 'অল' বলে সেই অল গুদাম হইতে আলুগুদাম, বর্তমান ক্যানিং স্ট্রীটের নিকটবর্তীস্থান। অনেক পর্যটকগণ পর্তুগীজদিগকে বনে পশুর মত বাস করিতে দেখিয়া গিয়াছে ও তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, কাহাকেও কোন দৃকপাত করিত না বলিয়াছেন।

ভবানীপুর— ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর জামাতা ভবানীদাসের নাম হইতে ভবানীপুরের নাম হইয়াছে। ইনি কালীর সেবায়েত বর্তমান হালদারদের পূর্বপুরুষ। সেকালের কলিকাতা খাল বিল ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, স্থানে স্থানে লোকালয় ছিল। ঐ সকল খাল বিলাদিতে. কলিকাতাদি মহালের সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। কলিকাতার স্থান সমূহের অবস্থা বিশেষের সঙ্গে

ঐ সকল স্থানের নাম হইয়াছিল। যেমন মেছুয়াবাজার, পটুয়াটোলা, কসাইটোলা, ময়রাহাটা, নাপতেহাটা, কলুটোলা, বেনেটোলা, শাঁখারিটোলা, কাঁসারিপটী, হোগলকুড়িয়া, পার্শিবাগান, উল্টাডিঙ্গি, নারিকেলডাঙ্গা ইত্যাদি।

চৌরঙ্গী— চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়া একটি খাল কালীঘাটে ও একটি হেষ্টিংস স্ট্রীটের মধ্য দিয়া ক্রীক রো ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইয়া বেলিয়াঘাটা ধাপায় যায়। সেই খালে নামিবার সিঁড়ি ২৬নং ক্রীক রোর বাড়িতে বর্তমান রহিয়াছে। সেকালে দিনের বেলায় একা কেহই চৌরঙ্গী জঙ্গলে ঢুকিতে সাহস করিত না। উহা হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ ছিল। ঐখানে চোর ডাকাতেরা কালীঘাটের যাত্রীদের দ্রব্যাদি লুটপাট করিত। এরূপ চোরবাগানে চোরেরা লুকাইয়া থাকিত ও সুবিধা পাইলে দিনেরাতে চুরি করিত। ঐজন্য উহার নাম চোরবাগান হয়। ইউরোপের নাবিকগণ ও এ দেশের নটী সন্তান, ফিরিঙ্গিরা চৌরঙ্গীর জঙ্গলে তখন দস্যুর কার্য করিত। কোম্পানির সেরেস্তার কাগজে দৃষ্ট হয় যে, ঐরূপ চারজন দস্যুকে অতিকষ্টে ধরিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত যাহা সর্ব প্রথমে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ইংরাজগনকে **ইঙ্গরাজ** বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চোর ইঙ্গরাজগণের আড্ডা হইতে চৌরঙ্গীর নমোৎপত্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধহয়। চৌরঙ্গী গৌরি সন্ন্যাসীর নাম হইতে উহার উৎপত্তি কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ ঐ ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে কোন সন্ন্যাসীর আশ্রম থাকা অসম্ভব, বিশেষতঃ তাহার কোন প্রমাণ বর্তমান নাই। বর্তমান মিডলটন রোর নিকট হরিণেরা খেলা করিত বলিয়া উহাকে "ডিয়ার পার্ক" বলিত। তাহাতেই পার্ক স্ট্রীটের নামোৎপত্তি হইয়াছিল।

সেকালের সীমানা—ডিহি কলিকাতার পশ্চিমে ভাগীরথি, উত্তরে সূতানটি, —পূর্বে তখনকার নোনা জলাভূমি বর্তমান শিয়ালদহাদি ও দক্ষিণে গোবিন্দপুর ছিল। বর্তমান টাঁকশাল হইতে বর্তমান কাষ্টম হাউস পর্যন্ত সমস্তই কলিকাতা, আর উহার উত্তরে বর্তমান বাগবাজারের খাল পর্যন্ত সুতানটি, কলিকাতার দক্ষিণ খিদিরপুর ভবানীপুর পর্যন্ত গোবিন্দপুর ছিল। পুরাকালের স্মৃতি বর্তমানের মধ্যে ডুবিয়া আছে, তাহা সেকালের কলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দপুরের সীমা উল্লেখ করার সঙ্গে চিত্রিত করা আবশ্যক। সেকালের কলিকাতার চারিদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া ছিল। গঙ্গাতীরেও ঐরূপ বেড়া ছিল ও মধ্যে মধ্যে আসিবার পথ ও ফটক ছিল। আজকালের ফান্সি লেন ও ওয়েলেসলী প্লেসের মোড় হইতে ঐ বেড়া আরম্ভ হইয়া লারকিন্স লেনের নিকট দিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে পৌছিয়াছিল। সেখান হইতে উহা বারেটো লেন, মাঙ্গো লেন, মিশন রো-য়ে গিয়াছিল এবং সেখান হইতে বরাবর লালবাজার, রাধাবাজার, এজরা স্ট্রীট, আমড়াতলা স্ট্রীট, আর্মিনিয়ান স্ট্রীট, হামাম গলি, মুরগীহাটা, দরমাহাটা, খোংরাপটী, বন্‌ফিল্ডস লেন, রাজা উডমণ্ড স্ট্রীট দিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়াছিল। সেকালের পুরাতন কেল্লা বর্তমানে কয়লাঘাট স্ট্রীট ও ফেয়ার্লি প্লেসের মধ্যে ছিল। উহার পশ্চাৎ পথের পর মালগুদাম ক্ষুদ্র ডক ও বাগান ছিল। বর্তমান চার্চ লেন ও হেস্টিংস স্ট্রীটের মোড়ে চৌকা মাটির বরুজের উপর কামান সাজান থাকিত। গঙ্গার ধার হইতে ফান্সি লেনের মধ্যে তিনটি পুল ছিল। বর্তমান সেন্টজন গির্জার নিকট একটি পুলের ধারে বারুদ ঘর ছিল।

ইংরাজী কোয়াটার — কাপ্তেন পেরিনের তখন দুই তিন খানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল ও তাঁহার বাগবাজরের নিকট একটি মনোরম বাগান ছিল। সেখানে সেকালের ইউরোপীয় বাসিন্দারা বেড়াইতে যাইত ও সেইজন্য সেইখানেও দুদশ ঘর ইউরোপের লোকেরাও থাকিত। লোকে মিশন রো-কেও তখন রোপ ওয়াক বলিত। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার যে নকসা

হয়, তাহাতে ঐ সকল স্থান চিহ্নিত হইয়াছে। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পেরিনের বাগান পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয় ও উহা গভর্ণর জেলারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রথম পক্ষের শ্বশুর কর্ণেল স্কটের হইয়াছিল। শেষে উহা কোম্পানীর বারুদ খানা হইয়াছিল। আপর্জানের ম্যাপে ঐ স্থানের বিবরণ পুরাতন বারুদখানা, বাজার ও রাস্তা বলিয়া উল্লেখ আছে।

এইরূপে দেখা যায় যে, কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্ণর জেনারেল হেস্টিংস প্রভৃতির শ্বশুরবাড়ি বাগবাজার আদিস্থানে ছিল।

সেকালের সাহেবপল্লীর মধ্যে প্রায় আড়াই শত পাকা বাড়ি ছিল। সেকালের বাড়ির হাতার মধ্যে পুকুর ও বাগান থাকিত। ঐ সকল ইউরোপবাসিদের জন্য নিকটে মুরগীর হাট, তেলি, মুদি, মুচি কসাইদের বাস হাড়িটোলা ডোমটোলা জানবাজারের কাছে ছিল। তাহাতেই ঐ সকল জায়গার নাম ঐরূপ হইয়াছিল। কুমারের বাসন তাহাদেব কাজে আসিত না বলিয়া কুমারটুলি দূরে পড়িয়াছিল। সেকালের ইংরাজী টোলায় উমিচাঁদ ও কোম্পানীর দালাল রামকৃষ্ণ শেঠ বাস করিতেন। বর্তমান মেটকাফ হলের স্থান কাপ্তেন উইলসের ম্যাপে উক্ত শেঠের বাড়ি বলিয়া উল্লিখিত হয। শেষে ঐখানে থাকিতে না পারায়, ঐ বাড়ি আমিয়ট সাহেবকে ভাড়া দেওয়া হয়। আর তখন বর্তমান লিয়নস রেঞ্জে তিন খানি বাড়ি ছিল, উহার মধ্যে একখানিতে উমিচাঁদ থাকিত। আজকাল যেখানে ফিনলে মিউরেব অফিস, পূর্বে সেইখানে থিয়েটার হইত। যেখানে হলওয়েলের বাড়ি ছিল, এখন সেইখানে ছোট আদালত, ও পুরাতন কোম্পানীর টাঁকশাল যেখানে ছিল, সেইখানে স্ট্যাম্প স্টেশনাবি অফিস হইয়াছে। যেখানে কোম্পানীব সোরাব গুদাম ছিল, এখন সেইখানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হইয়াছে। এখন যেখানে রয়েল একস্চেঞ্জ হইয়াছে সেইখানে লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাসস্থান ছিল। কোম্পানির গভর্ণর ক্রটেনডেন সাহেবের বাড়িই বর্তমান ফেয়ারলি প্লেসের প্রায় অধিকাংশ স্থল। তাঁহার গঙ্গার ধারে পাকা ঘাট বাঁধান ছিল। উহা পূর্বোক্ত ম্যাপে দেখা যায়। গ্রিফিথস সাহেবের বাড়িতে গ্রেহাম কোম্পানীব আফিস ছিল। পাদরী বেলামির বাড়িতে পূর্বে কোম্পানীর কালিকোপ্রিন্টারেরা থাকিত, শেষে ঐখানে বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী থাকিতেন। উহার সীমানা ও হাতা বর্তমান ওয়েলেসলি প্লেস ও ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাউন্সিল হাউসে কোম্পানীর পুরাতন সভাগৃহ ও ওল্ডকোর্ট হাউস রাস্তায় কোম্পানীর আদালতাদি ছিল। হেয়ার স্ট্রীটের মুখের সেকালের কোম্পানীর হাসপাতাল ও সরকারী আস্তাবল ছিল।

বর্তমান চিৎপুর রোড ও কলুটোলার মোড়ের বাড়িতে হুগলীর ফৌজদারগণ মামলা মোকর্দমা নিষ্পত্তি করিত, সেইজন্য ঐস্থানের নাম "ফৌজদারী-বালাখানা" হইয়াছিল। বড়বাজার খোংরাপটীতে আর্মানি গীর্জা ও গোরস্থান তাহাদের সেকালের ঐ সকল ব্যবসায়ীদের বসবাসের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। কলিকাতায় সেকালে ব্যবসা ও গাছের নামে স্থানের নাম হইয়াছিল। যেমন সোনাপটি, তুলাপটি, দারমাহাটা, মরয়াহাটা, দরমাহাটা, মলঙ্গা, বটতলা, সিমূলিয়া ও ইটালী। * ইটালিতে হিন্তাল গাছ ও বনজঙ্গল ছিল ঐ হইতে ইটালির নাম হইয়াছে।

যতদূর দেখা যায় সেকালের কলিকাতার উন্নতি চার শ্রেণীর লোকের দ্বারা হইয়াছিল : যথা—

* কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজে ইটালির নাম হিন্তালী আছে, যথা — সম্রাট ফরক্শিয়ারের ফারমণের ৩৮ খানি গ্রামের তালিকা।

প্রথম। ইউরোপীয় বণিকগণ, তাহাদের কর্মচারী, তাহাদের বংশধর আত্মীয়স্বজন ও দালালগণ।

দ্বিতীয়। স্বদেশী ও আরমেনি ব্যবসাদার মহাজন ও অন্যান্য সওদাগারগণ।

তৃতীয়। কোম্পানির সেকালের কর্তৃপক্ষগণের প্রিয়পাত্র উমেদারগণ।

চতুর্থ। ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজা মহারাজাদের গুপ্তচর ও বাংলার জমিদারগণ।

পূর্বেই সেকালের ইউরোপীয় বণিকগণ ও তাহাদের কর্মচারী দালালদের কথা বলা হইয়াছে। এখন দ্বিতার ব্যবসাদারদের বাসস্থানের উল্লেখ করা যাইতেছে। তাহারা প্রায় সকলেই নিজ কলিকাতার মধ্যে বড়বাজারে থাকিত। সেকালের পুরাতন দুর্গের পাশ দিয়া একটি রাস্তা বড়বাজারে আসিয়াছিল। এখন যেখানে নঙ্গরেশ্বর মহাদেব আছেন, ঐখানে পূর্বে মাল নামাইবার ঘাট ছিল। নঙ্গরের নীচে ঐ শিব ছিলেন, নঙ্গর তুলিতে গিয়া উহা পাওয়া যায় ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাহাতে উঁহার ঐ নাম হয়। ব্যবসায়ীরা নঙ্গর ফেলিবার ও উঠাইবার সময় শিবের পূজা করিতেন। সেকালে ভাল ঘাটের অভাবে ব্যবসাদাররা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইত, সেইজন্য তাহারা পাকা ঘাট গঙ্গার উপর করিয়াছিল; উহা সেকালের সেই সকল খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। উহা তখনকার ম্যাপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে সেইজন্য সাহেবদেরও ঘাট ছিল যেমন রস, বরেটো, জ্যাকশন, ব্লাইথার ইত্যাদি। বড়বাজারের ঘাটের পর যথাক্রমে কাশীনাথ, হুজরীমল, নয়ান মল্লিক ও বলরামচন্দ্রের ঘাট গোকুল মিত্র, গোবিন্দরাম মিত্র, মদন দত্ত, বনমালি সরকার , বৈষ্ণব দাস শেঠের ঘাট ছিল। ইহারা সকলেই নামজাদা ব্যবসাদার ও পুরাতন কলিকাতার বাসিন্দা। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় গঙ্গার ধারে বাগবাজার হইতে চাঁদপাল ঘাট কম বেশি পঞ্চাশটি ঘাট হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নগরের ও কোম্পানীর ঘাট ও স্থান বিশেষেব নামের ঘাট ছিল। হাটখোলার ঘাট হাটতলায় বলিয়া আছে। তাহাতেই মনে হয় যে কলিকাতার বাজারাদি হইবার পূর্বে নির্দিষ্ট দিনে হাট বসিত, বা তখন যেখানে খোলা হাট থাকিত, অর্থাৎ যাহাব, যে কিছু বিক্রয় করিতে হইত, সে ঐখানে তাহা করিত। কালে তাহাই বোধহয় হাটখোলা নামে খ্যাত ও তাঁহার ঘাট হাটতলার ঘাট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বলরাম চন্দ্র বোধহয় মাড়েদের পুরুষ তাহার নামে ঐ ঘাট ছিল। দেওয়ান কাশীনাথ বাবুর শ্যামলিয়াজী, গোবিন্দরাম মিত্রের সিদ্ধেশ্বরী আদি দেবদেবীগণ সকল লোকের ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিযা থাকে ও ঐ সকল দেবতা যেন একরকম সাধারণের হইয়াছে। আনন্দময়ীজীউ ও দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যো র পূর্ব পুরুষগণের হয়, উহাও সেইরূপ। কলিকাতার আদিম অধিবাসিগণের দেবদেবী স্থাপনের অভাব নাই। দেওয়ান কাশীনাথ বাবুর পূর্বপুরুষ লাহোরের মুলুক চাঁদ টণ্ডন সুন্দরবনের কাষ্ঠাদিব ব্যবসা করিতেন, তিনি উক্ত নঙ্গরেশ্বর শিবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐখানের সমস্ত জায়গা বর্তমান তাঁহার বংশধরগণের মূল্যবান দেবতার সম্পত্তি। ঐ সকল মূল্যবান সম্পত্তি তখন অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে ছিল। হুজরীমল ও মল্লিকেরা পাশাপাশি থাকিত ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ছিল। উক্ত হুজরীমল ইতিহাস প্রসিদ্ধ উমিচাঁদের পরম আত্মীয় শ্যালক ছিলেন। নয়ান চাঁদ মল্লিক ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মল্লিক বংশের মধ্যে কলিকাতায় প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহ রাজারাম মল্লিক ত্রিবেণী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাসারম্ভ করেন ও তাঁহারই পরামর্শে জব চার্ণক কলিকাতায় আসিয়া নবাবের কর্মচারীগণের অত্যাচার হইতে কোম্পানীকে বাঁচাইয়াছিলেন। রাজারাম ইউরোপীয় বণিকগণ ও দেশীয় বণিকগণের সহিত ব্যবসা করিতেন ও পুরুষানুক্রমে ধনী ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ বনমালী, কৃষ্ণদাস প্রমুখ সকলেই ব্যবসায় প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতেন ও সপ্তগ্রামে থাকিতেন। ইঁহারা সকলেই

নবদ্বীপ, কাঁচড়াপাড়া, কাশী প্রভৃতি স্থানে সদাব্রত দেবমন্দিরাদি দ্বারা আপনাদেব বৈশ্য রাজবংশের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। নয়ান চাঁদের পিতা দর্পনাবায়ণ ধর্ম কর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ সন্তোষ কুমার মল্লিক, যেমন ব্যবসা বাণির্জ্য করিতেন, তেমনি তাঁহারও কোম্পানীর সেবেস্তায় বিশেষ সম্মান ছিল। তিনি কলিকাতায় **সন্তোষ বাজার** নিজ নামে স্থাপন করিয়া সেকালের কলিকাতাবাসীদের অভাব মোচন করিয়াছিলেন। তাঁহারই কথায় কোম্পানী বাজারাদির পরিদর্শক কর্মচারি বহাল করিত। নন্দরাম সেন কোম্পানীর টাকা কড়ি ভাঙিয়া পলায়ন করিলে, জনৈক রামভদ্র নামক ব্যক্তি সন্তোষ মল্লিকের কথায় ঐ চাকরি পাইয়াছিল। ইহা কোম্পানীর সেরেস্তায় দেখা যায়। এখনও নটীরা বাম ভদ্র খুড়োর নামে জ্বলিয়া যায়। ইহার মধ্যে কি রহস্য আছে, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। সেকালের কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাবে বড় বাজার ও সন্তোষ বাজারের নামোল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত বাজার পরিদর্শকের স্মৃতি নন্দবাম সেনের বাস্তায় ও শিবমন্দিরে রক্ষা করিতেছে। সেকালের মল্লিকেরা কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও তাহার উন্নতি কর্তা। সেকালের নামজাদা বাঙালীরা সকলেই তাঁহাদিগকে সম্মান করিত। সকলেই মল্লিকদের পূর্বপুরুষের কুলদেবী ˆ সিংহবাহিনীর পূজা সেকালে ও এখন করিয়া থাকে। এই দেবীমূর্তি বাংলার মূর্তির ন্যায় উলঙ্গ নয়। অতি প্রাচীন জাতির বস্ত্র পরণের ধাঁচে ইঁহাব নিম্নাঙ্গ মাত্র আবৃত, ঐ মূর্তির মস্তক ধাতুময় মুকুট রাজগৃহলক্ষ্মীর চিহ্ন ধাবণ করিযা আছে। ভ্রমক্রমেই, উহাকে রাজা রাজ্যবর্ধনের পরিবর্তে মানসিংহের গৃহদেবী বলিযা থাকেন। রাজা মানসিংহ উহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিযা অকৃতকার্য হইয়া ছিলেন বলিয়া লোকে ঐরূপ ভ্রমে পতিত হন। ঐরূপ কলিকাতায় বিষ্ণুপুরের রাজার কুলদেবতা ˇ মদনমোহন জিউও গোকুল মিত্রের বাসস্থান বাগবাজারে বিদ্যমান আছেন। সেকালে দেবতার মন্দিব সাধারণেব পূজাদি ও ভক্তি উৎকর্ষের জন্য উন্নতিশীল হিন্দুমাত্রেই নির্মাণ ও ক্রিয়াকর্ম করিত। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের গির্জায় ও মসজিদে প্রার্থনাদি করা ও হিন্দুব মন্দিরে বিখ্যাত দেবদেবীর শ্রীচরণে ভক্তি স্তোত্রপাঠ ও পূজা করার উদ্দেশ্য একই। উহাতে পৌত্তলিকতা কিছু মাত্র নাই। উহা জীবন্ত বা মৃত মানবের আদর্শ পূজা করা অপেক্ষা শতাংশে শ্রেযস্কর। স্মরণাতীত কাল হইতে জাতিজীর্ণ হিন্দুর ধর্ম প্রচার ও রক্ষা দেবদেবী ও দেবালয় হইতেই হইয়া আসিতেছে। আত্মবিস্তৃতেই সাধারণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা যায়, আর আত্মসংকোচই দাসত্বের মূল কারণ। গ্রামেব লোকের সর্বস্ব কাড়িয়া লইযা আপনাব পরিবারবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়াইলেই আত্ম সংকোচেবই উদাহরণ হইয়া পড়ে। আর তাহা না কবিয়া নিজের উপার্জিত ধন পুত্র কলত্রের ভরণপোষণের সঙ্গে দেবদেবীর পূজা উৎসব, আহার, বিহার, যাত্রা ও মহোৎসব করা প্রাচীন আর্যজাতির উন্নতির আদর্শ। সর্ব সাধারণের সমক্ষে সেই প্রীতির ছবি ধরিয়া নিজের শক্তি দশের সহিত সঞ্চার করিলেই আত্মবিস্তৃতি। অতি প্রাচীন ব্রহ্মধারণা— সেই আত্মশক্তির বিস্তারের উপরই তখন সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল; তাহাতেই ব্রাহ্মণ, মুকুটমণি, আর শুদ্র দাস ও অনার্য্য। পরোপকার লক্ষ্য হইলেই বুদ্ধের জন্ম হয়, আর আত্মসেবায় চিত্তপ্রবৃত্তি পর্যাপ্ত করিতে গেলে, নাদির শাহ, নীরোর আর্বিভাব। মানুষ যতক্ষণ স্বার্থের আকুঞ্চন ক্রিয়ার বশীভূত, ততক্ষণ তাহাব সমাজ বন্ধন জাতিভেদ বিদ্যমান থাকে, আর যাই ধর্মের প্রসারণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়, অমনি তখন তিনি আপামর সকলকেই আলিঙ্গন করিতে চান, প্রতিহিংসা আসে না, ক্ষমা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। তাহাতেই যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের সুসন্তান— উন্নতিশীল জাতির আরাধ্য, আর গৌর নিতাই মহাপ্রভু প্রেমের অবতার। তাহাতেই জগাই মাধাই মুক্ত ও ব্রাহ্মণ, ডোম, মুসলমান বৈষ্ণব হইয়াছিল। এই আত্মবিস্তৃতি লাভের জন্যই

আকবর প্রতাপাদিত্য কেহও কোন ধর্মকে ঘৃণা করিতেন না, সকলের উপাসনা গৃহ ও মন্দিরাদি করিবার অনুমতি দিতেন। হিন্দুর উপাসনা ও ধর্ম যে কি, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক, তাহা না করিলে তদ্বিপরীত **কাল ধর্ম** যে কি, তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না। দুঃখমোচনই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। সুখ দুঃখ দেহীর অভাবে দেহ ভোগ করিতে পারে না অর্থাৎ মৃতদেহ সুখ দুঃখ যে কি, তাহা সে জানে না। মৃতদেহ মানুষ হয় পোড়াইয়া, নয় পুঁতিয়া ফেলে। দেহীর অভাবে উহা থাকে না ও উহা কোন কাজেই আসে না, বরং দুঃখ দায়ক হইয়া পড়ে। ইহাতে দেখা যায় যে, সংসারের সুখ দুঃখ দেহীই ভোগ করে, দেহ করে না। সুখ দুঃখ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহা হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল ইন্দ্রিয় বা দেহ তাহা ভোগ করে না। সেই সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা ভোগকে কর্মের অনুসঙ্গ করিয়া কর্মে পরিচিত করাকেই **ধর্ম** বলিয়াছেন। উহা ভোগ মোহময় লালসাতৃপ্তির জন্য নয়, ধর্মের নিমিত্ত প্রশস্ত। ইহার জন্য ধর্মলাভের মূলে পানাহার স্নানাচমণ, কীর্তনাদি শারীরিক, শ্রবণ স্মরণাদি মানসিক ও ধ্যান-ধারণাদি আধ্যাত্মিক উপাসনাদি ও বিবাহাদি দ্বাবা ধর্ম লাভের ব্যবস্থা। মানুষ যখন আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার দেবত্ব, তখন হয় সে রাজা রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, নয় সে ব্যাস, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য। আর যখন সে নিজের উদর পূর্ণ করিতে চায়, তখন সে পশুরাজ নাদির শাহ, নয় সেকেন্দর। এই পরার্থ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বেই স্বর্গ নরক ও ঘোব কলির সৃষ্টি। এই উভয়ের পরস্পর সামঞ্জস্যেই সমাজ ও জাতির সৃষ্টি। মানব চরিত্র সংগঠন ও সঞ্চালন ধর্মের আদর্শেই হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত ব্যাস বাল্মিকীর আদর্শ দেবত্ব লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টান, মুসলমান মহম্মদ যীশুর জন্ম ও মৃত্যু ধর্মের অঙ্গ করিয়া সর্বদাই উৎসবাদি করিয়া থাকে। পশুরা ধর্মাধর্মের কোন ধারই ধারে না, মানুষ যখন সেইরূপ হইয়া পড়ে, তখনই ধর্মবীর মহম্মদের আবির্ভাব। শিক্ষার অভাবে বলের দ্বারা মানুষকে সমাজভুক্ত ও বশীভূত ও একত্রিত করা, এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি ব্যতিরেকে করিতে পারা যায় না। সেইখানে অভ্যাস ও আচারই ধর্মপ্রাপ্তির সোপান, উহাতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি। তাহাতেই হিন্দুর সন্ধ্যা গায়ত্রী মুসলমানেব নমাজ, খ্রীষ্টানের উপাসনা—বেদ, কোরাণ, বাইবেল অভ্রান্ত ভগবদ্বাক্য। যাহা তাহার অনুমত, যাহা পূর্বপুরুষগণ মানিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এই সহজ জ্ঞানের পূজায় পাদরী ক্রানমার অবলীলাক্রমে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল। পূর্বে অবলীলাক্রমে হিংস্র ক্ষুধার্ত সিংহব্যাঘ্রের উদরে খ্রীষ্টানগণের স্ত্রীপুত্র পরিবারকে, ঐ ধর্ম যাহাতে সকলে গ্রহণ না করে, সেইজন্য রোমের রাজারা সাধারণের চত্বরে প্রকাশ্যভাবে দান করা, পুণ্য ও ধর্ম মনে কবিত। ধর্মের প্রাণ ও ভিত্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভয় ও ভক্তিতে। তাহাতেই লোকের আত্মপ্রসাদ, তাহাতেই কঠোর কর্তব্যসাধনই ধর্ম। কিন্তু কর্মে দাসত্ব ও জ্ঞানে মুক্তি। যতক্ষণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ মানবকে কর্ম করিতে হইবে। কলিকাতায় প্রাচীন দেবদেবীর আর্বিভাব, আগমন ও পূজার উৎসবাদিতে বাংলাব ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নরনারী সেখানে আসিত ও ক্রমে ক্রমে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

লাল দিঘি — জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা কলিকাতা বা তন্নিকটবর্তী স্থানে থাকিতেন না, কেবল তাহাদেব কাছারি বাড়ি লালাবাজারে ছিল। কালীঘাটের শ্যামরায় উক্ত সাবর্ণ চৌধুরীদের কুলদেবতা। উহাকে ঐ কাছারী বাড়ির নিকট রাখা হইত ও ঐখানে দোলের উৎসব মহাসমাবোহে করা হইত। ঐ সময় সেইখানে হাট-বাজার বসিত, তাহাতেই লালবাজার রাধাবাজারাদির ও দিঘির জল আবিরে লাল হইত বলিয়া ঐ সকল নাম হইয়াছিল। আদম সুমারির কর্মচারী মিঃ এ. কে রায় অনুসন্ধানের দ্বারা উহা জানিয়াছেন প্রকাশ করেন। ঐ

সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারীর কর্মকর্তা শোভাবাজার রাজাদের পূর্বপুরুষ রুক্মিণিকান্ত তিনি রাজা নবকৃষ্ণের প্রাপিতামহ। কেশব রায়ের নাবালক অবস্থায় ঐ কার্য করিয়া নবাবের মনস্তুষ্টি করিয়া "ব্যবহর্তা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী ও সর্বমঙ্গলা রাজা টোডরমলের রাজস্বের মুহুরী মনোহর ঘোষের স্থাপিত। তিনি ডাকাতের উৎপাতে ঐ সকল দেবী ত্যাগ করিয়া বারাকপুরে চন্দন পুকুরে থাকিতেন। * শেষে চিতে ডাকাত ঐ দেবীর সমক্ষে অনেক নরবলি দান করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। উক্ত মনোহর ঘোষ— দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ ও বারাণসী ঘোষের পূর্বপুরুষ। ইহাদের সহিত রাজা নবকৃষ্ণের কুটুম্বিতা হইয়াছিল। কলিকাতায় **হরিঘোষের গোয়াল** প্রবাদ বাক্য ও বারাণসী ঘোষের নামে রাস্তা আছে। ঐরূপ হাটখোলায় দত্তেরা বালিতে থাকিতেন ও মদন দত্তের বৃহৎ শিব মন্দির এখনও নিমতলায় আছে। উহারা বড়ই অভিমানি ছিলেন ও তাহাতে এখনও লোক কথায় কথায় বলে **অভিমানে 'বালির দত্ত যান গড়াগড়ি'**। আর একজন দত্তের নামে কলিকাতার রাস্তা আছে। কালি প্রসাদ দত্ত, রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বি চূড়ামণি দত্তের বংশধর। চূড়ামণি দত্ত সেকালের খাঁটি হিন্দুয়ানির বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য তিনি রাজা নবকৃষ্ণকে নানারূপ উপহাস করিতেন। রাজা নবকৃষ্ণের ছেলেবা সেই শোধ তাহার শ্রাদ্ধের সময় তুলিবার বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরাদি — তখন কালীপ্রসাদ দত্তকে সাবর্ণ চৌধুরীদের কেশব রায়ের পুত্র সন্তোষ রাম পঁচিশ হাজার টাকায় কালীঘাটের বর্তমান মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব করেন, তাহাতে সুচতুর কালীপ্রসাদ সম্মত হইয়া তাহাই করেন। সন্তোষ রায় তাঁহার অনুগত কালীঘাটের যাবতীয় ব্রাহ্মণদিগকে চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধে আনিয়া দত্তদের মান রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমান কালীর মন্দির সন্তোষ রায় আরম্ভ করিয়া যান ও তাঁহার পুত্র ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা শেষ করেন। ঐ সময়েই রাজা বসন্ত রায়ের পুরাতন মন্দির ভাঙিয়া ফেলা হয়। সাবর্ণ চৌধুরীরা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর কেশব রাম নিমতা বিরাটী হইতে বড়িশায় আসেন। বর্তমান শ্যাম রায়ের মন্দির বাওয়ালীর জমিদারদিগের পূর্বপুরুষ উদয় নারায়ণ মণ্ডল ও সাহা নগরের মদন কলে উহার সমুখের দোল মঞ্চটি প্রস্তুত করাইয়া দেয়। আর তারা সিংহ নামে একজন ধনী শিখ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তর দিয়া নকুলেশ্বরের মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। + পূর্বোক্ত মল্লিক বংশের কালী চরণ মল্লিক কালীদেবীর ভূকৈলাশের রাজাদের দেওয়া রূপার চার হাত সোনার করিয়া দেন, পাইকপাড়ার রাজাদের ইন্দ্র নারান সিং সোনার জিহ্বা, বেলিয়া ঘাটার চালের মহাজন রাম নারায়ণ সরকার স্বর্ণ মুকুট, চড়ক ডাঙ্গার রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় চারিটি স্বর্ণ কঙ্কন, এবং নেপাল রাজ্যের প্রধান সেনাপতি স্যার জঙ্গ বাহাদুর মস্তকের স্বর্ণ ছত্রটি দিয়াছিলেন। ইহাতেই দেখা যায় যে, সাবর্ণ চৌধুরীরা দেবীর সেবা, অলঙ্কার বা মন্দিরাদি জমিদারী লাভ করিয়া কিছুই করেন নাই, বা সেইখানে সেই সময় হইতে বাস আরম্ভ করেন নাই। তাহাতেই বোধহয়, তাঁহারা দেবীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। পূজক হালদারেরাই দেবীকে পূজাদি করিয়া ঐ স্বত্ত্ব পাইয়াছিল। লাট মন্দির আন্দুলের জমিদার রাজা কাশীনাথ রায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে করিয়া দেন। নহবত খানা ভোগ ঘরাদি সমস্তই ভক্তেরা করিয়া দেয়।

* Calcutta Reveaw 1854 Vol 3

+ দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীদেবীর চারিটি রূপার হাত করিয়া দিয়াছিলেন।

আধুল, কাশিমবাজার, নশীপুর, বর্ধমান, ভুকৈলাস, পাইকপাড়া প্রভৃতি সেকালের বিদেশী বণিকগণের সোনার কাঠি রূপার কাঠিগণকে কলিকাতায় থাকিতে হইত ও তাহাদের যথেষ্ট মূল্যবান সম্পত্তি এখনও বর্তমান আছে। বহুদিন হইতে বাংলায় পলাতক রাজা, নবাব, রাজপুত্র ও সাহাজাদাগণের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে, কলিকাতাও সেইরূপ হইয়াছিল। সেইজন্য ঐখানে যে সকল ষড়যন্ত্রাদি হইত, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য প্রায়ই কলিকাতায় গুপ্তচর থাকিত ও তাহারা কলিকাতাব জন-রবাদি পর্যন্ত ও ভারতের সর্বত্র রাজা মহারাজা নবাব ও সম্রাটকে পাঠাইয়া দিত। এ কথা সেকালের কোম্পানির সেরেস্তায় পরিস্কাব লেখা আছে। তাহাতেই কলিকাতার নামও জাহির হইয়াছিল। ঐ সকল সংগ্রহের জন্য কতকগুলি লোক ও কর্মচারী বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইত। তাহারা কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মচারী বা অনুগত প্রিয়পাত্র ছিলেন। পৃথিবীতে যত রকম ব্যবসা আছে, তাহাব মধ্যে ইহাতে যেমন অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক লাভ হইত, তেমন আর কিছুতেই হইত না। যাহারা একবার ঐ রোজগার করিয়াছে, তাহারা উহা করিবাব জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকিত ও সুযোগ অনুসন্ধান করিত। সেইজন্য উমিচাঁদ প্রমুখের বাড়ি বাগান কলিকাতায ছিল ও সর্বদাই ইউরোপবাসী বণিকগণের সন্নিকটে থাকিতে হইত। তাহাদেব অধীন অনেক গুপ্তচর থাকিত, যাহাদের মারফত কোম্পানির কর্মচারিগণ অর্থ সাহায্য লাভ করিত ও তাহাদের অন্তরের কথা মত্ততাবস্থায় নটীদিগের দ্বারা বাহির করাইয়া লইত। আরও ইউরোপীয় বণিকগণও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুবিধা করিবার জন্য ঐরূপ করিত। সেইজন্য কলিকাতায় ঐরূপ আড্ডা ও বাগানবাড়ির অভাব ছিল না। বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটেব ধারে ঐরূপ বহু বাগান ছিল ও স্থানে স্থানে সর্বত্রই ঐরূপ মদ ও খাবার আড্ডায় সেকালের ফিবিঙ্গী রূপসীরা থাকিত। ইহাতেই সাবর্ণ চৌধুরীদের আমোক্তার আন্টুনি সাহেবের সঙ্গে জব চার্ণক প্রমুখেব রসিকতা হইত। তাহার সহিত চাবুক লইয়াও রঙ্গরস হইত—কোম্পানীর কর্মচারিগণকে লালবাজারে সাবর্ণ চৌধুরীদের দোলের উৎসবে যোগদান করিতে না দিয়া, জব চার্ণকেব প্রাণের আন্তরিকতায উপহাস কথা 'চাবুক মারিয়া লাল করা' কার্যে পবিণত হইয়াছিল। তাঁহার পিঠে চাবুক পড়িয়াছিল ও সেই লজ্জায় তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া কাঁচড়াপাড়ায় চলিয়া যান। আন্টুনিব বাগানের স্মৃতি ঐ নামেব বাস্তায় বর্তমান রহিয়াছে। উহার নামে হাটও ছিল। উহার পৌত্র একজন কবি ও একজন কেলি সাহেব সেকালের অর্থশালী ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। কবি আন্টুনি কলিকাতার বিখ্যাত কবিওয়ালা। সে এক কুলটা ব্রাহ্মণীর প্রেমে হিন্দু হইয়াছিল। সে যে কালীভক্ত ছিল, তাহা তাঁহার গানে প্রকাশ পায়। সেকালের ফিরিঙ্গিদের আভিজাত্য গৌরব ছিল। ঠাকুর গোষ্ঠির দ্বারকানাথ প্রমুখ শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে পড়িয়াছিলেন। ঐ সকল ছাত্রদিগের নিকট শেরবোর্ণ আপনাকে ব্রাহ্মণের দৌহিত্র বলিয়া পূজার বার্ষিক আদায় করিতেন। বৌবাজারে ফিরিঙ্গিরা যে কালীর পূজা করিত, তাহাকে লোকে **ফিরিঙ্গী কালী** বলে। তাহাদের ব্রাহ্মণী উপপত্নীর নিকট হিন্দু ধর্মের উপদেশ ও ভক্তি শিক্ষাদি করিত। উহাতেই কবি আন্টুনির কবিত্বে হিন্দু সমাজ তখন বড়ই আনন্দিত হইত। উহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে হিন্দু ও ফিরিঙ্গি কবিব প্রশ্ন উত্তর দেওয়া গেল। উহাতে সেকালের ফিরিঙ্গিদের হিন্দু ধর্মের প্রতি কিরূপ ভাব ও ভক্তি ছিল প্রকাশ পায়। সেকালে কবিরা পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তবে বেশ আসর জমকাইত। যথা —

প্রশ্ন— "বল হে এন্টুনি, একটি কথা জানতে চাই
এসে, এ দেশে, এ বেশে, তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।"—রাম বসু

উত্তর— "এই বাংলায়, বাঙালীর দেশে আনন্দে আছি

হয়ে ঠাকুর সিং-এর বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি।''—আন্টুনি

প্রশ্ন— "সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণে ভজে মাথা মুড়োলি
পেলে শুনতে পাদরী, দেবে মুখে চুনকালি।"—রাম বসু

উত্তর— "খ্রীষ্টে আর কৃষ্ণে নাই রে কিছু ভিন্ন ভাই
নামের ফেরে ভোলে মানুষ, তা বই আর নয় কিছুই।"—আন্টুনি

দেবীর উপর ভক্তির উক্তিতে আপনাকে ফিরিঙ্গি জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছে—

"ভজন সাধন জানি নে মা, জেতেও ফিরিঙ্গি
পায়ে রাখ করে কৃপা, ওমা শিবে মাতঙ্গি।"—আন্টুনি

ফিরিঙ্গি —পারস্য ভাষায় সাধারণত ইউরোপীয়গণকে ফিরিঙ্গি বলে। এ দেশে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষকে ফিরিঙ্গি বলে। * সেকালে এই ফিরিঙ্গি কথা লইয়া মামলাও হইয়াছিল। সাবর্ণ চৌধুরীদের আমোক্তার আন্টুনি পর্তুগীজ ছিল। সেকালে ফিবিঙ্গিরা হিন্দুদ্বেষী ছিল না, তাহারা সকলের সহিত মেলামেশা করিত। শেষে তাহারা যখন হিন্দুদের উপব অত্যাচার আবম্ভ করে ও ব্রাহ্মণের বিধবাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে থাকে, তখনই তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। কবি ভারতচন্দ্রের কবিতায় বিদ্যাসুন্দরের পুরবর্ণন আছে, তাহাতে তাহাদের নাম গন্ধ কিছুই নাই। যথা : —

"ইরাকী, তুরকী তাজী আরবী জাহাজী
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী।"

জাতি-- ভারতচন্দ্রের সময় সেকালের হিন্দু সমাজের জাতি বিশেষের পরস্পর কিরূপ মর্য্যাদাব স্থান ছিল, যাহা লইযা এখন আদম সুমারির সময় বড়ই পরস্পব মনান্তর ও গ্রন্থাদির দ্বারা জাতির উচ্চ নীচতার বিচার হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। উহাতে কোন জাতির কি ব্যবসা ছিল, তাহাও নির্ণয় করা যায়। কারণ বলা বাহুল্য যে সমাজপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজের অনুমোদিত কথাই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন, ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘন্টা রব, শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরে কহে ব্যাধি ভেদ, চিকিৎসা কর পড়ে কাব্যে আয়ুর্বেদ।
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি, বেণে মণি, গন্ধ, সোনা, কাঁসারি, শাঁখারি।
গোয়ালা, তামুলী, তিলি, তাঁতী, মালাকার, নাপিত, বারুই, কুরী, কামার, কুমার।
আগরি প্রভৃতি আর নাগরি যতেক, যুগি, চাষা, ধোবা, চাষা, কৈবর্ত অনেক।
সেকরা, ছুতার, নড়ী, ধোপা, জেলে, গুঁড়ি, চাঁড়াল, বাগ্দী, হাড়ি, ডোম, মুচী, শুঁড়ি।
কুরমী, কোরঙ্গা, পোদ, কপালি, তিয়র, কোল, কলু, ব্যাধ, বেদে, মালিক, বাজিকর।
বাইতি, পটুয়া, কান, কসবি যতেক, ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্তক অনেক।"

কলিকাতায় সেকালে যেখানে যে জাত থাকিত, সেইখানে তাহদের নাম উল্লেখ আছে; যেমন বেনে টোলা, শাঁখারি টোলা, কাঁসারি পাড়া, জেলে টোলা, তিলি পাড়া, কুমারটুলি, চাষাধোপা পাড়া, সেকরা পাড়া, হাড়ী টোলা, ডোম টোলা, মুচি পাড়া, শুড়ী পাড়া, কপালি টোলা, কলু টোলা, পটুয়া টোলা ইত্যাদি। তখন কলিকাতায় এই সকল জাত ছাড়া অন্য জাত

---

* অভিধান

ছিল না বলিয়া বোধহয়। পিরালি জাতির কোন উল্লেখ নাই—অথচ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে দেখা যায় যে, পিরল্যা গ্রামের পিরালিরা যবন বিশেষ ও ব্রাহ্মণের উপর বড়ই অত্যাচার করিত : —

"পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন, উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞ সূত্র কাঁধে, ঘর দ্বার লোটে আর লৌহ পাশে বাধে।"

পিরালী ধর্ম প্রতাপাদিত্যের জন্মের প্রায় একশত বৎসব পূর্বে খানজা আলি নামে একজন ঈশ্বর পরায়ণ মুসলমান বাগের হাট মহকুমার প্রচার করিয়াছেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির সম্মিলন করিবার নিমিত্ত ঐ ধর্ম প্রচার করেন। এই ধর্মের নাম পিরালি হইবার কারণ গভর্নমেন্টের স্মৃতি স্তম্ভের খোদিত লিপির পুস্তক হইতে জানা যায় যে খানজা আলির মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য মহম্মদ তাহীর পিরালী নামগ্রহণ করিয়া গুরুর মন্তব্য কার্যে পরিণত করেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিতে যশোর জেলায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত পিরালী দেখিয়াছেন। তিনি ২৮শে এপ্রিল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর রেগুলেসন ছাপাইয়া দেখাইয়াছেন, যে যেখানে জাতি বিচার নাই সেই শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দিরেও তাহাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কলিকাতার পিরালীরা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যকালে বা তাহার পরে কলিকাতার গোবিন্দপুরে আসেন। তাহাদের বংশের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের একরূপ প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদ্বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ, রাজনৈতিক দ্বারিকানাথ, রাজবল্লভ যতীন্দ্রমোহন বংশ পরস্পরা মহারাজা উপাধি সৃষ্টি করিয়া কলিকাতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রবাদ যে, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের উদ্বোগে রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহাতে শাস্ত্রীর কথা বা দ্বারিকানাথের জীবন চরিত লেখকের কথা বা বিশপ হিবারেব কথার কোন মীমাংসা করা হয় নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহারা ভট্ট নারায়ণের বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। উক্ত বংশ হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রামমোহন বায়, ও নলডাঙাব রাজারা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের সহিত পিরালীদের সম্বন্ধাদিও প্রকাশ হয নাই ও পরস্পর পর্যায় মিলে না। পিয়ালীদের ঠাকুর উপাধির কারণ লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও সহিত বসু মহাশয়ের সামঞ্জস্য হয় না। উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় বর্ধমানাধীশের সভাসদ তারানাথ তর্করত্নের প্রদত্ত কুলাচার্য সংগ্রহীত ও মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পিরালী ব্রাহ্মণ রায়রেঁয়ে অতি কৃপণ বলিয়া হীন ঠাকুর উপাধি লাভ করে বলেন, যথা : —

"পঞ্চানন নুলো বলে, জ্ঞানী কবে, ধনে ভুলে, পাপক্ষয় বিদ্যা অন্নদানে
রায় রেঁয়ে সুকৃপণে, পারালী দ্বিজ নন্দনে, অপকৃষ্টে ঠাকুরত্ব ভণে।"

কলিকাতায় কোম্পানীর আমিন ও প্রধান কর্মচারীর কাজ পঞ্চাননের দুই সন্তান জয়রাম ও রামসন্তোষ করিতেন। কালকাতা কোম্পানীর হইলে জয়রামই উহার জরিপ করে ও কোম্পানীর কর্মচারীদের মাহিনা বাম সন্তোষ দিত। পঞ্চানন, বোধহয়, প্রতাপাদিত্যের দখলের সময় গোবিন্দপুরে আসিয়া রায় রেঁয়ের কাজ করিত ও যৎকিঞ্চিৎ সংগহ করিযাছিল। সেই সময়েই বোধহয় তাঁহার ঠাকুর উপাধি লাভ হইয়াছিল। কোম্পানী ঐজন্যই বোধহয় জয়রামকে ঐ কার্য দিয়াছিল। কলিকাতার জরিপেই পিরালী ঠাকুর গোষ্ঠীর সৌভাগ্যোদয় ও গোবিন্দপুরে বাস। সাধারণের কৌতূহল তৃপ্তিব জন্য ও সত্যের অনুরোধে কলিকাতার উন্নতিশীল পিবালী

জাতির সম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেবের হিন্দু মাইথলজি গ্রন্থে ও অনেক কথা আদালতের দাখিল উইলে লেখা আছে। উহাতে দেখা যায় যে, সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর জয়রামের সর্বস্ব, তের হাজার টাকা মাত্র ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জীউ ঠাকুর থাকে। সেকালের কলিকাতার উন্নতি ও আবাদ করার প্রচীন ছড়াটি নিম্নে দেওয়া গেল।

" পিরালি কায়েত তাঁতি, আর সোনার বেণে
করলে আবাদ তারা দেশ, বয়ে ধন এনে।"

প্রাচীন কলিকাতার সম্বন্ধে প্রাচীন আর যে ছড়া আছে তাহা কালক্রমে পবিবর্তিত হইত। তাহার আভাস মিঃ এ, কে, রায় আদমসুমারির বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা : — "গোবিন্দ রামের ছড়ি, উমি চাঁদে দাড়ি, নকু ধরের কড়ি, মধুর সেনের বাড়ি। নন্দরামের ছড়ি, উমিচাঁদের দাড়ি, হুজরীমলের কড়ি, বনমালী সরকারের বাড়ি।" গোবিন্দ রাম মিত্র ও নন্দ রাম সেন কোম্পানীর কর্মচারি ছিলেন। তাঁহারা সেকালের বড়ই জবরদস্ত লোক ছিলেন—একরূপ সেকালের ধর্মাবতার হাকিম ছিলেন। উমিচাঁদের দাড়িতেই যাদু ছিল, তাহাতে নবাব কোম্পানী সকলেই ভুলিত ও তিনি কলিকালের ব্যবসায় সিদ্ধ হস্ত। ভগবান দত্ত দাড়িই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ও বিশেষত্ব হইয়াছিল। সদগোপ বনমালি সরকার কোম্পানীর নিকট পাটনায় দেওয়ানি ও কলিকাতার ডেপুটি ট্রেডার বা কোম্পানীর অধীন ব্যবসায়ী ছিলেন। কুমারটুলিতে সেকালে তিনি এক প্রশস্ত বাড়ি করলেন। তাহতেই লোক বলিত— "সর্বস্ব খোয়াইয়া পাকা সেথখানা"। মথুর সেন লাট সাহেবের বাড়ির অনুকরণে নিমতলায় বাড়ি করেন। তিনিও ব্যবসাদার ছিলেন; তাঁহারও ঐ দশা। উর্মিচাঁদের শালা হুজরীমল তেজারতি করিত। নকুধর ও মথুর সেন, উভয়ে সুবর্ণ বণিক, এক সময়ের লোক নহেন। নকু ধর পোস্তার রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি লর্ড ক্লাইবের টাকাকড়ি সরবরাহ করিতেন ও তাহার জন্য কোম্পানীর নিকট খেলাৎ লাভ করেন। নকুধরের ভাল নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। তাঁহার নিকট রাজা নবকৃষ্ণ সামান্য মহুরীর কাজ করিতেন। লর্ড ক্লাইব লক্ষ্মীকান্তের নিকট হইতে নব কৃষ্ণকে পান। নব কৃষ্ণ সেইজন্য পোস্তার রাজার বাড়িতে জুতা পরিয়া যাইতেন না। মহারাজা সুখময় লক্ষ্মীকান্তের দৌহিত্র ও তিনিই পোস্তার রাজবাটির সৃষ্টিকর্তা। লক্ষ্মীকান্ত ধর ও তাহার দৌহিত্রেরা কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা। মহারাজা সুখময় কলিকাতা হইতে পুরীর রাস্তা পাকা ও দুই ধারে আম্র বৃক্ষ স্থাপন করিয়া তীর্থ যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হয় ও তখন হইতে ঐ তীর্থে যাইবার এক রকম কেন্দ্র কলিকাতা হইয়া পড়ে। ইহাদেরও গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। কোম্পানীর কর্ম করিয়া রাজবল্লভ, নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ মিত্র, কাশীনাথ, আঁধুল, কাশিমবাজার, নসীপুর, পাইকপাড়া, ভূকৈলাসের জমিদারেরা রাজা উপাধি ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের প্রায় সকলেই কলিকাতায় ভাগ্যোন্নতি হইয়াছিল ও তাঁহারা সেখানে থাকিতেন। তাহারা ঐ হিসাবে কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে পাইকপাড়ার রাজাদের ঠাকুর বাড়ি ও খিদিরপুরের ভূকৈলাসে রাজাদের ঠাকুর বাড়ি আছে। বৎসর বৎসর ভূকৈলাসে শিবরাত্রির দিন এখনও মেলা হয় ও বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

চিত্র কলার নৈপুণ্য যেমন তাহার মূল চিত্রের পশ্চাতের রঙে ও অস্পষ্টাংশের বৈচিত্রের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ পশ্চাতের রঙই ঐ মূল চিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনি কলির ধর্মাবনতি ও কলিকাতার পুরাতন স্থান সমূহের ও অধিবাসিগণের সম্বন্ধে অতি

সংক্ষেপে একটি চিত্র অঙ্কিত করা গেল। নাটকেও অভিনয়ের প্রধান প্রধান অভিনেতা অভিনেতৃগণের সংক্ষেপ বিবরণ পূর্বে দেওয়ারই ব্যবস্থা।

পাঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিমের ব্যবসায়ী হুজরী মলাদি সেকালের কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা ও ব্যবসাদার ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জমিদার ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের কলিকাতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় কোম্পানীর কর্মচারীরা ঘরবাড়ি, বিবাহ ও নিকা করিত ও ধর্ম বিস্তার করিত, তাহাতে ফিরিঙ্গি জাতির উৎপত্তি। তাহারাও কলিকাতার পুরাতন অধিবাসী। তাহাদের দুরবস্থা ইসপের ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড় কাকের মত হইয়াছিল। তাহাতেই তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য ঘোচে নাই। তাহারা যদি পূর্বের মত থাকিত, ইংরাজ না সাজিত, তাহা হইলে তাহাদের ওজন বুঝিয়া চলা হইত। আরও যখন ইউরোপবাসিরা স্বদেশে হইতে আপনাদের স্ত্রী জাতিগণকে আনিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা ফিরিঙ্গিদিগকে এক ঘরে করিয়া ফেলে। ইংরাজ জাতি দেশ করতলস্থ করিয়া এ দেশের পোষাক ও আচার ব্যবহারাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিল। কলিকাতায় যে, শুধু কেবল ওয়ারেন হেস্টিংসের শ্বশুরবাড়ি ছিল তাহা নয়, কোম্পানীর কুঠির গভর্নর স্যার চার্লস আয়ার জব চার্ণকের ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত কন্যার সহিত পরিণয় হইয়াছিল। চার্ণকের অন্যান্য কন্যাগণকেও কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীরা বিবাহ করিয়াছিল। সেকালে ঐ সকল ফিরিঙ্গি কন্যার অদৃষ্টে ইংরাজ কর্মচারী স্বামী লাভ হইত, কিন্তু শেষে উহা কবি কল্পনা হইয়াছিল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ এ দেশীয় বিপন্ন লোকের আশা-ভরসাও সহায় ছিল। তাহারা কোন অন্যায় কার্য করিলে তখন লোকে বিশেষ কোন দ্বিরুক্তি করিত না। গৃহস্থের সুন্দরী বিধবা বা সধবা হরণ কবা সেকালের মুসলমান নবাব, সম্রাট ও তাহাদের কর্মচারিদের অভ্যস্ত বিদ্যা যদি কেহ সেইজন্য এক ঘরে হইত ও তাহা নবারের কর্মচারীদের কানে যাইত, তাহা হইলে সে যথেষ্ট অর্থলাভ করিত ও তাহাতে তাহার গোষ্ঠী পতিত্ব লাভ হইত। জব চার্ণকের ঐ ব্রাহ্মণপত্নী লাভের বিবরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিন্দুর সতীদাহ ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ। পাটনায় চার্ণক অবস্থানকালে এক সতীদাহে এক যুবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সিপাহি দিয়া বলপূর্বক তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আবার হেজেস সাহেবের ডায়েরীতে একজন হিন্দু নারী স্বামীর অর্থ ও অলঙ্কারাদি লইয়া চার্ণকের আশ্রয় গ্রহণ করে, উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সে সময়ে দেশের ও দশেব কিরূপ দুর্দশা হইয়াছিল তাহা বেশ অবগত হওয়া যায়। সাধারণ লোক দারিদ্র্যে, শিক্ষাভাবে ও দেশের স্বদেশী ন্যায়বান রাজা বা সমাজপতির অভাবে পশুরও অধম হইয়াছিল। কেহ কোন অত্যাচার করিলে ঘাড় নীচু করিয়া চলিয়া যাইত। তাহাদের তাহার প্রতিকার করিবার কোন উপায় বা ব্যবস্থা ছিল না, আর যখন উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা হইত তখন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি তাহা নষ্ট করিয়া দিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গ বিজয়ের কারণ ও ফল

আর্য অতীত গৌরব ভারতে চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, অশোকাদির আবির্ভাবেই হইয়াছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের বিজয়বাহিনী আর্যাবর্তের ধনরত্নৈশ্বর্য অপহরণ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা বঙ্গাধিকার করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিল। বাংলার বিজয় সিংহ প্রমুখ শূরবীরগণ সিংহল, জাভা, * বালি দ্বীপ জয় ও রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য অর্থগৃধ্নুমোগলদিগের কর দান হইতে জননী জন্মভূমি ও স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিতে গিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ ও অনাহারে প্রাণ হারাইল, পত্নী যমুনায় প্রাণত্যাগ করিল। হায়! যাঁহারা হিন্দুজাতির বিজয় বৈজয়ন্তী সমগ্র বাঙালীর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বার বার মোগল সেনা ও সেনাপতিগণকে পশুর ন্যায় বধ ও তাড়াইয়া দিয়াছিল তাঁহারা অতীতের অতল গর্ভে লুক্কায়িত। হা ভারতচন্দ্র! † সেই বাঙালী বীরগণের নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষীতার কথা ও গৌরব, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নদাস বলিয়া কি এক ফোঁটা চক্ষের

---

* Numerous Sanskrit inscriptions in Champa, Kamboja (Tonking and America) in Java and Sumatra tell us that Hindus conquered these countries and held them from Second century of the Christian era downwards untill the 12th century. Dr. Buhler Bombay Gazette 1890.

† "যুঝে প্রতাপ আদিত্য, যুদে প্রতাপ আদিত্য
ভাবিয়া অসার, ডাকে আর বার, সংসার সব অনিত্য।
শিলাময়ী নামে, ছিল তার ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী
পাপেতে ফিরিয়া, বসিল রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি।
বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত, মিলে মানসিংহ রাজে
লস্কর লইয়া, সত্বর হইয়া, প্রতাপ আদিত্য সাজে।"

* * * *

"পাতশাহি ঠাটে, কবে কেবা আঁটে, বিস্তর লস্কর মারে,
বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপ আদিত্য হারে।
শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা, মানসিংহে জয় হৈল
পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জর ভরিয়া প্রতাপ আদিত্যে লৈল।"

* * * *

"প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে মৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে।
কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত, সাক্ষাৎ করিল পাতশাহের সহিত।
ঘৃত ভাজা প্রতাপ আদিত্যেরে ভেট দিলা, কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা।
পাতশাধ আজ্ঞামত মানসিংহ রায়, প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়।"

জলেও তর্পণ করিলে না, ও সেকালের বাঙালীকে লিখিয়া তাহা শিখাইলে না? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখনও লোকে বলে যে, যেখানে প্রতাপাদিত্যের পত্নী জলমগ্না হইয়াছিলেন, সেই যমুনাগর্ভ অজ্ঞ নাবিকগণ নরনারী পথিকগণকে দেখাইয়া চক্ষের জল ফেলে! মানবের শিক্ষা-দীক্ষার উপর যে তখন স্বদেশ হিতৈষীতা নির্ভর করিত তাহা নয়। এদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তখনও এখন স্বভাবতই স্বদেশভক্ত ও তাহারই হিতৈষীর জন্য কাতর। সেকালের লেখাপড়া জ্ঞানন্মুখী না হওয়ায় লোকজনকে এইরূপ করিয়াছিল। দেশের লোক মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া পার্সী পড়িত ও বিধর্মীর আচার ব্যবহার বেশভূষা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। অর্থই তখন সকলের লক্ষ্য হইয়াছিল। উহা উপার্জ্জন করিতে গেলে নবাব সরকারি চাকরি বা তাহাদের মনোমত কার্য না করিলে, হইবাব উপায় ছিল না। দেশে অরাজকতায় ও উচ্চশিক্ষা ও আদর্শের অভাবে এই দুর্দশা হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। সাধারণ লোক সেরূপ অর্থপিশাচ তখনও ছিল না ও এখনও হয় নাই। সেইজন্য তাহাদিগকে সে পাপ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কবি ভারতচন্দ্রের কথায় বেশ জানা যায় যে, গুরু পুরোহিতগণ প্রতাপাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা মানসিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল ও সৈন্য সামন্ত ও দেশবাসিকে যশোরেশ্বরী বিবক্ত হইবার কথা নানা কৌশলে সঙ্গত করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়াছিল। রাজা মানসিংহের বিজয় তাঁহার বলবীর্যে হয় নাই—তাঁহার কলাকৌশল ও অর্থে হইয়াছিল। সেই সকল দেশদ্রোহী গুরু পুরোহিতেরা দেবতাকে লইয়া মানসিংহের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। সেকালের যুদ্ধ ঐরূপই হইত। সেই দুর্দৈব হইতেই বাংলা মোগলের রাজত্বের "জিন্নেৎউল বেলাৎ" অর্থাৎ স্বর্গ হইয়াছিল। বিদেশী পর্যটকেরা ইহাকে মিশর অপেক্ষা ভাল বলিয়া গিয়াছেন। একটি চলিত কথা আছে যে বাংলায় ভগবান গাছের উপর ঐ দেশের রাজা বিশ্বামিত্রের প্রার্থনায় নারিকেলে একখানি রুটি ও জলের ব্যবস্থা ও মাটিতে তরমুজ করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাইবার সময় পশ্চিমের গগনে যে চিত্রকলা অঙ্কিত করিয়াছিল তাহাতেই মারাঠা ও শিখজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল।

জাতীয়তাই স্বাধীনতার সোপান। কবি ভূষণের কবিত্বে ও শিবাজীর ফলোন্মুখী বীরত্বে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগরিত হইয়াছিল। মোগল অত্যাচারে তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্যই ধর্ম জাতীয়তার সঙ্গে এক হইয়া ইন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহের খালসা হইয়াছিল। হায়! বাঙালীর মধ্যে সেরূপ কিছুই হইল না।

ভারতবর্ষের মধ্যে পৃথিবীর দেশ সমূহের ছায়া যেন প্রতিফলিত রহিয়াছে। শীত উষ্ণ ঋতু ভারতবর্ষেব সকল স্থানে এক নয়, উহার তারতম্য আছে। কোথাও মরুভূমি, কোথাও পর্বতরাজি সুশোভিত গিরি কন্দর, কোথাও নদনদী পরিশোভিত হরিৎক্ষেত্র, আবার কোথাও কুমুদ কহ্লার বেষ্টিত হ্রদ। উহার প্রায় চতুর্দিকে সমুদ্রে উদ্বেলিত তটভূমি। ভগবান যেন প্রাকৃতিক নিয়মে ইহার রক্ষা বিধান করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তবুও ভারত পরাধীন। বাংলারও সেই দুর্দশা। বঙ্গদেশ হইতে মোগল দরবারে কত টাকা রাজস্ব যাইত ও তাহার সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কিরূপ বাড়িয়াছিল তাহাতেই বেশ বোঝা যাইবে যে, বঙ্গ বিজয়ে দেশবাসীর কি দুর্দশা হইয়াছিল। আইনী আকবরীতে বাংলা চব্বিশ সরকারে বিভক্ত ছিল ও ৫২৪৫৯৩১৯ দাম রাজস্ব আদায় হইত। হকৎ ইকলি মতে জাহাঙ্গীরের সময় বাইশ সরকার বিভক্ত বঙ্গদেশের রাজস্ব ২৩৯০২৮০০ দাম ও খুলাসাৎ-উল-তয়ারিখে আরঙ্গজেবের সময় সাতাশ শ সরকাব বিভক্ত বাংলায় ৪৬২৯০০০০০ দাম খাজনা আদায় হইত। আবুল ফজল

আইনী আকবরীতে আকবর যে সকল স্থান দখল করিতে পারেন নাই, তাহাও তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। দেশ হইতে কোটি কোটি টাকা ও দেশের লোকের উদর পূরণ না করিয়া দিল্লিতে চলিয়া যাইত, তাহা দূর করিবার যুদ্ধ যশোরেশ্বরীর অনভিমত নয় বলিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়াছিলেন তাহাতেই মানসিংহের জয়লাভ—এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হায়! রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যনাশও শাস্ত্রকারগণের ভবিষ্যৎ বাণীর দ্বারা হইয়াছিল। অনেক দিন হইতে নানা কারণে ভারতবর্ষে স্বজাতি প্রতিষ্ঠা লোপ পাইয়াছে। তাহারই জন্য রাবণের বংশ ধ্বংস ও সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল। হায়! কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ণাহুতির ফল বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষ এক দেশ হইলেও তাহার মধ্যে এক ধর্ম, এক ভাষা ও এক জাতি হয় নাই। আবার এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ নাই, মেশামেশি নাই, একজন একজনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিলে যে সুযোগ ত্যাগ করে নাই। হিন্দু রাজ্যে বিবাদে সকল জাতীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। আসুরীয়, মিশরীয়, রোমক সাম্রাজ্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী কেন যে বিধর্মীর বন্যায় ভাসিয়া যায় নাই তাহার কারণ পাশ্চাত্য লেখকগণ * যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা না বলিয়া থাকা যায় না। "ভারতবাসীর মধ্যে যদি শাস্ত্রকারদের জাতিভেদরূপ সামাজিক দৃঢ় বাঁধ বর্তমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সভ্যতার পদবী হইতে পিছাইয়া পড়িত, অর্ধ মানুষ অর্ধ জন্তুর ন্যায় বিষম দুর্গতিগ্রস্ত হইত। সেই বাঁধ ছিল বলিয়াই মুসলমানগণের দৌরাত্ম্য ও খ্রীষ্টানগণের প্রবল প্রতাপের স্রোতে তাহারা ভাসিয়া যায় নাই।"

যে জাতিভেদ পাশ্চাত্য মতে মনুষ্যবুদ্ধির কার্যকরী শক্তির স্বাভাবিক প্রসরক্ষুণ্ণ করে। ভারতে জন্মভেদে কর্মভেদে হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম গণ্ডীর ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যে যে গণ্ডী নির্মাণ করিয়াছে তাহাতে তাহার বাহিরে যাওয়া অধর্ম। প্রতাপাদিত্য দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য বিদেশের ফিরিঙ্গী মুসলমানদিগকে প্রিয়পাত্র করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত ঐরূপ সৌহার্দ্য করায় ব্রাহ্মণেতর জাতি হইয়াও তিনি দেশের রাজা হইয়াছিলেন। সেকালের ব্রাহ্মণেরা ষড়যন্ত্র করিয়া যেমন বৌদ্ধরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, তেমনি তাহারা প্রতাপের সর্বনাশ করিয়াছিল। উহার সহিত প্রতাপের স্বজাতি আত্মীয় ভৃত্যগণেরও ষড়যন্ত্র ছিল। প্রতাপাদিত্য যুধিষ্ঠির ছিলেন না, বা আর্য্য রাজাগণের আদর্শ অনুসরণ করিয়া কার্য করিতেন না। তাঁহার সাধনা ও দোষ সম্বন্ধে মহানির্বাণ তন্ত্রের হরগৌরীর কথোপকথন উল্লেখ করিলেই হইব। **গৌরী** মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কেমন করিয়া অসৎ প্রবৃত্তি সম্পন্ন লোকের উদ্ধার হইবে, তাহাদের কি কোন নিস্তারের পন্থা নাই? **মহাদেব** তদুত্তরে এই কথা বলিয়াছিলেন;— "যে জীব যদি ধর্মের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির চরিতার্থ করে, তবে তাহার তাহাতে

* জনৈক বৈদেশিক লেখক ভারতে অশান্তি ও উপদ্রব লিখিয়াছেন : —"If the inhabitant of that law flooded land had not erected his social dams, dim the shape of caste customs whereby he has been able to stem the inroads of Christian vigour as well as of Mahomedan violence, it is difficult to see how he could have prevented himself from retrograding into a semi-animal existence A perpetual flow in the whole structure of human relations is not the best social medium for the realisation of higher possibilities, and yet this would have been the inevitable result, without the powers of resistence residing in caste prejudice"

সদ্‌গতি হইবে অর্থাৎ ভোগেচ্ছা না করিয়া সাধনার উপায়স্বরূপ বিশ্বাসে কর্মেচ্ছু হইয়া মদ্য পান বা মাংস ভক্ষণ করে বা অন্য কিছু করে, তবে তাহার প্রবৃত্তির ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি হইবে, উহাতেই তাহার সদ্‌গতি হইবে। সমাজের ভয়ে বা ধর্মের ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হইয়া পরকালে স্বর্গলাভ ইচ্ছায় প্রবৃত্তি দমন করায় বা অন্য সৎকর্মে সদ্‌পতি লাভ হয় না।" ইহাই ধর্মের সূক্ষ্ম মর্ম। সত্যযুগে প্রহ্লাদ ধ্রুবের জন্ম হইয়াছিল, মায়ের পেট হইতেই সে ভগবানের নাম আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু কলিকালে কালধর্মে অধিকাংশ লোককেই লম্পট মাতাল হইতেই হইবে, তাহাদের ব্যভিচার দমন গৌর নিতাই-এর ক্ষমা নীতিতে করিতে হইবে। মদের দোকান বন্ধ বা বেশ্য নগর হইতে স্থানান্তরিত করিলে, তাহা হইতে পারে না। সেকালের হিন্দুসমাজ বা ব্রাহ্মণগণ প্রতাপাদিত্যের কার্যসমূহ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখেন নাই। তাহাতেই দেশের সর্বনাশ হইয়াছিল। দেশের লোক দেশের লোকের সঙ্গে দেশের রত্ন ভোগ করে, ইহা জাতিজীর্ণ দেশবাসীর প্রাণে সহ্য হয় নাই। তাহাতেই হিন্দুর ক্ষত্রিয় বৈশ্যের রাজ্যনাশ ও কায়স্থ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী হইতে হইয়াছিল। তাহাতেই পারসীক, বাহ্লিক, শক, যবন সিন্ধু নদী পার হইয়া আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিল। আর্য হিন্দুজাতির ধর্মবলই চতুবর্ণকে আশ্রয় করিয়া বহুকাল পর্যন্ত স্বতন্ত্রতা রক্ষা ও স্বদেশকে কামধেনু করিয়াছিল। তাঁহাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষাই দেশের ও দশের মূল উন্নতির সোপান। ব্রাহ্মণ শিক্ষা দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা ও ক্ষত্রিয় বাহুবল দ্বারা রাজ্য রক্ষা করিত, বৈশ্য বাণিজ্য কৃষিশিল্প দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি ও শূদ্র সমাজ পালন করিত। তাহাদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ ছিল না যে, যাহা করিত ও উহা ক্রমে ক্রমে বংশ পরম্পরাগত হইয়া, এমনই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে তাহা অলৌকিক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই সকলেই গৌরবান্বিত হইত। সেই স্বজাতি প্রতিষ্ঠা যতদিন বর্তমান ছিল, ততদিন হিন্দুজাতিকে কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে হয় নাই। তাহাতেই তাহাদের বাণিজ্য শিল্প পৃথিবী ব্যাপী হইয়া পড়ে; তাই পুরুষ পরম্পরাগত অভ্যাসের ফলে সূক্ষ্ম শিল্পাদির কারুকর্ম ও বৈচিত্রে ভারতবর্ষ বিখ্যাত হইয়া পড়ে। ভারতবাসীর সেই হস্তজাত দ্রব্যসকল ইউরোপবাসিগণের উচ্চতর বিজ্ঞানের কল নির্মিত বস্তুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ও সুলভ হওয়ায় বিদেশীয় বণিকগণ উহা লইয়া বাণিজ্য করিত। ভারতবর্ষের উর্বরতা পরিশ্রমের তারতম্য, জাতিভেদে ব্যবসা ও দক্ষতায় প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্য সামগ্রী আপনাদের অভাব দূর করিয়াও অবশিষ্ট থাকিত। উহাতেই বিদেশ হইতে স্বর্ণরৌপ্যাদি বিবিধ রত্ন বিনিময়ে বণিকগণ এদেশে ধন আহরণ করিত। তাহাতেই ঐ সকল বণিকগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছিল। সেকালে বাংলাদেশে জাহাজ তৈয়ারি হইত ও ঐ সকল তুরস্ক দেশাদিতে যাইত। ঐ সকল জাহাজে চড়িয়া এদেশের বণিকগণ বাণিজ্য করিত ও দ্বীপপুঞ্জ হইতে মণিমুক্ত প্রবাল ও নানা প্রকার দ্রব্য আনয়ন করিত। সেকালে লোকের অন্নকষ্ট ছিল না। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশবাসীর অভাব দূর করিয়া উৎবৃত্ত থাকিত। অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া বড়ই সুলভ ছিল। তাহাতেই প্রতাপাদিত্যের জন্মের পূর্বে ইবনবতুতা প্রমুখ ভ্রমণকারীরা যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধহয় না। আট দরহাম বা দামে অর্থাৎ সেকালের চার আনায় এক বৎসরের এক পরিবারের আহার সংগ্রহ হইত। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় হইত ও প্রচুর ধানের গোলা দুর্ভিক্ষের দায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাখা হইত। বিদেশী মুসলমানের আমলেও যদি ঐরূপ দ্রব্য সুলভ ছিল, তখন স্বাধীনতার সময় উহা অপেক্ষা শতাধিক গুণে সুলভ হওয়ার কথায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভ্রমণকারী টাভারনিয়ার বাংলায় হীরার খনি ছিল বলিয়া গিয়াছেন ও ইকনমিক জিয়লজি অফ্ ইণ্ডিয়া

গ্রন্থের ২৫ হইতে ৩০ পৃষ্ঠার বিবরণ উহার সম্পূর্ণ পোষকতা করে। কিন্তু হায়! এখন তাহার কোন উদ্দেশ্যই নাই, সে স্থলে কেবল কয়লার খনিরই আবিষ্কার হইতেছে। ইহাতে কি অধিকারিগণের ভাগ্যের তারতম্যের কথা সূচনা করে না? পূর্বে সুবর্ণরেখা, দামোদর প্রভৃতির বালুকা হইতে স্বর্ণ আহরণ করা হইত। বঙ্গের লৌহ ও সোরা যুদ্ধের অসি ও বারুদে ব্যবহৃত হইত। শ্রীহট্টের উৎকৃষ্ট চর্ম হইতে ঢাল, ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহা যেমন লঘু ও তেমনি দুর্ভেদ্য ছিল, সেইজন্য উহা সকলেই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিত। বার্ণিয়ার প্রমুখ ভ্রমণকারীরা বলেন যে, সেকালে মেক্সিকোর যাবতীয় রৌপ্য ও পেরুর স্বর্ণ পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের মোগল সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিত, কিন্তু উহা আর সেখান হইতে বাহির হইত না। মোগল বিজয়ে সোনার বাংলার দুরবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল।

ধর্মবল — পৃথিবীতে জাতির উত্থান ও পতন তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মনিষ্ঠা ও জাতীয়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বধর্মরক্ষা ও বিস্তার আদি চেষ্টা করা, স্বজাতি ও স্বদেশ রক্ষার আন্তরিক আস্থাই—ঐ প্রেমের মূলমন্ত্র। বৌদ্ধযুগে অশোকাদি প্রস্তর স্তম্ভে ভারতবর্ষের নানা স্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মের অসারতা শঙ্করাচার্য, কুমরিলাভট্ট প্রমুখ সকলে প্রচার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। সেকালে খ্রীষ্টধর্মের ধর্মযাজকগণ ভারতে শুভাগমন করিয়া আপনাদিগকে শ্বেতদ্বীপি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া অশিক্ষিত হিন্দুগণকে ঐ ধর্মে দীক্ষিত করেন; শেষে যখন তাহাদের সেই চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন তাহাদের হাতে জীবনোৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। তাহাদের সেই মৃতুকালের ভবিষ্যদ্বাণী শেষে সত্য হইয়াছিল। একজন বলিয়াছেন যে, **যখন তাঁহার সমাধি স্তম্ভে সমুদ্রের জল স্পর্শ করিবে, তখন ইউরোপবাসিরা সেইখানে আসিয়া তাঁহাদের মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিবে**। ভাস্কোদাগামা যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন সমুদ্রের জল সেই সমাধি স্তম্ভ সত্যই ধৌত করিয়াছিল। সেই সেন্ট থমাসের বর্ষাবিদ্ধ অস্থিপঞ্জর পর্তুগালের জর্জের আজ্ঞায় রাজা তৃতীয় ময়লাপুর হইতে পর্তুগীজেরা তাহাদের স্থাপিত ভারতের প্রথম গির্জায় মহাসমারোহে সমাহিত করিয়াছিল।

সেই সেন্ট থমাসের সমাধিতে সিঘেলমাস নামক একজন ইংরাজ উপাসনা করিয়া যাইবার সময় এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মণিমুক্তাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ১৫৭৯ ও ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে টমাস ষ্টীফেন্স ও রালফ ফীচ ভারত ভ্রমণ করিবার জন্য অসিয়াছিল। সেই স্টীফেন্সের ভ্রমণ বৃত্তান্তেই ইংলণ্ড বাসিগণের ভারতবর্ষের উপর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাতেই ফীচের সঙ্গে লণ্ডনের বণিক জননিউবেরী, জহুরী উইলিয়ম লিডস ও চিত্রকর লেমসষ্টোরিও **টাইগর অফ লণ্ডন** জাহাজে আসিয়াছিল।

স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতী আপনার এই জ্ঞানে তাহাদের বিস্তৃতি করা উন্নতিশীল জাতির ধর্ম। নীচ স্বার্থপরতা বা সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যদি গৌরবে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির অধীন হইয়া থাকা অপেক্ষা, বিদেশী যবনের দাসত্ব করা বা সেই যবনের অধীনে দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা হওয়া ভাল, এই জ্ঞানেই বাংলার সর্বনাশ হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ সেই মন্ত্রের উপাসক ও তাঁহার শিষ্য সেবকেরা সেই সময় সেই মতের পক্ষপাতী হইয়া বাংলাদেশে অনেকই রাজা, জমিদার ও সমাজকর্তা হইয়াছিলেন। হায়! সেই আত্মঘাতী হিন্দুসমাজ আকবরের "দীন ইলাহি" ধর্মের পক্ষপাতী হইয়া "দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বলিয়া গৌরব করিত। মানবের ধর্মবল সর্বাপেক্ষা বলবান, কিন্তু উহা যখন অন্যায় আগ্রহে অন্ধ গোড়ামিতে পরিণত হয়, তখন তাহা রোগ হইয়া দাঁড়ায়। ধর্মের মধ্যে দুরভিসন্ধি আত্মম্ভরীতা থাকিলে মহাপাপ ও পতনের মূল হইয়া পড়ে। আকবরের সেই দশা হইয়াছিল। তাই তিনি

ভারতবর্ষের হিন্দু রাজাগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিতে গিয়াছিলেন। কতিপয় বিলাস-বিভবলোলুপ-মুর্খ-ধর্মজ্ঞানহীন রাজপুতেরা রাজ্য রক্ষা ও রাজ্যলাভাকাঙক্ষায় সেই ঘৃণিত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিয়া কাবুল, বাংলাদি দেশ নানা কৌশলে জয় করিয়া শেষে ধর্মের ভাণ করিয়া সেই সকল স্থান হইতে বহু দেবদেবী নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে সে সকল মহাত্মার বংশরক্ষা পোষ্যপুত্র দ্বারাই হইয়া আসিতেছে। হায়! তাহাদের কাহারও হৃদয়ে আর্য হিন্দুজাতীর মত বা মুসলমান খ্রীষ্টানদের যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থাপেক্ষা জাতিগত উন্নতি লক্ষ্য ছিল না। মানব ধর্ম বলেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া কর্তব্য পালন করিয়া থাকে ও তাহাতেই তাহার ও স্বজাতীর মঙ্গল হয়। তখন তাহারা স্ব স্ব স্ত্রীপুত্র পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত দেশের ও দশের সর্বনাশ করিতে পারে না। তখন তাহারা নিজের বা আত্মীয় কুটুম্বের মঙ্গল দিকে না তাকাইয়া শতকষ্ট, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত পণে দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ ও যাহা কিছু মূল্যবান সমস্তই অবলীলাক্রমে বলিদান করে। ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ উন্নতিশীল জাতির মধ্যে ভুরি ভুরি দৃষ্টিগোচর হয়।

রাজনীতি— কিন্তু হায়! কেমন করিয়া গৌরব ও রাজ্য লাভ লালসায় সেই মিথ্যা জাত্যাভিমানী ও বলবীর্যহীন রাজপুত বাজারা বিদেশী মুসলমানকে আনিয়া সকল রকম সাহায্য করিয়া পৃথ্বীরাজ প্রমুখের রাজ্য হরণ ও মোগল পাঠানের রাজত্ব স্থাপনের পথ পরিস্কার করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেই হইতেই বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রভু, পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা বা তাহাদের সর্বনাশ করিয়া রাজ্যলাভ বা মন্ত্রী হওয়া সেকালের রাজধর্ম হইয়াছিল। দেশে বিজ্ঞান নীতি ও শিক্ষার অভাবে সকলেই ধর্মাধর্ম বিচার করিয়া কার্য করিত না। বিদ্যাবুদ্ধি বলবীর্য অপেক্ষা নীচ ষড়যন্ত্রের প্রভাবই তখন অধিক হইয়াছিল। ইহাতেই দেশের ও দশের সর্বনাশ হইয়াছিল।

সেই মহেন্দ্রক্ষণে ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ ভারতে ব্যবসা করিতে আসে।

আকবরের দরবারে তখন জেসুইট পাদরীগণের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহাতেই এদেশে পর্তুগীজেরা অত্যাচারী হইয়া পড়ে। মগ বোম্বেটিয়াদের অত্যাচারে জলপথে বাণিজ্য করা বন্ধ হইয়াছিল।

কালিকট — রোমবাসিরা সিরিয়া বিজয়ের পর হইতে এদেশের সহিত বাণিজ্যারম্ভ করে। তাহারা মিশর দিয়া আরবদের সহিত মালাবার উপকূলে কালিকটে বাণিজ্য করিত। মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা পারস্যাধিকার করিয়া ইসলাম রাজ্যের **খলিপা** প্রতিষ্ঠা করেন! সেই হইতেই ভারতীয় বাণিজ্য মুসলমানদের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাহাদের সম্মতি ব্যতীত সেখানে কেহই বাণিজ্য করিতে পারিত না। সেই সময় তাহারা কালিকটের হিন্দু রাজাকে মক্কায় লইয়া গিয়া মুসলমান করে। * ঐ কালিকটের নামের উৎপত্তি উহার দানের সময় হয়। এই কালিকটেই রোমবাসিরা ব্যবসা করিতেন ও সেইখানে পর্তুগীজেরা প্রথম বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পণ্য দ্রব্যাদি লইয়া সর্বপ্রথমে কালিকটে বাণিজ্যারম্ভ করে। কালিকট ও কলিকাতার ইংরাজি বানানে সৌসাদৃশ্য আছে ও ব্যবসার সম্বন্ধ ছিল। রোম ও অন্যান্য ইউরোপবাসি বণিকগণ স্ব স্ব পোতে

* মক্কায় যাত্রাকালে চেরামন পেরুমল হিন্দুরাজা কালী মন্দির হইতে কুক্কুটধ্বনি যতদূর শ্রুত হইয়াছিল সেই স্থান মানবিক্রম জামরিণকে দান করিয়াছিলেন। কলিকট্টা এই দেশজ শব্দ হইতে কালিকট নামের উৎপত্তি। ঐ দেশজ শব্দের অর্থ কুক্কুট ধ্বনি বা দুর্গ।

সপ্তগ্রামে আসিয়া সেইরূপ বাংলার সহিত বাণিজ্য করিত। সপ্তগ্রামে সেকালের যে সকল স্তম্ভে সেই সকল বাণিজ্য পোত সংলগ্ন থাকিত, তাহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় যে, উহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই এদেশের বণিকগণের বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করা এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

উদ্যোগ— ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন ড্রেক পর্তুগীজদের গোয়া প্রত্যাগত এক জাহাজ পণ্যদ্রব্য স্বদেশে লইয়া যান। দেখা যায় যে, তাহাতেই ইংরাজ জাতির ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম অঙ্কুরিত হয়। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক উত্তমাসা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতেই ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীতার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত স্পেন, পর্তুগাল কতকগুলি রণতরী লইয়া ইংলণ্ড জয় করিতে যায়। উহাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অজেয় রণতরী বা স্প্যানিশ আরমেডা বলিয়া উক্ত হয়। তখন ইংরাজ জাতির দ্বাদশ বৃহস্পতি— শেক্সপীয়র, বেকন, র্যালে প্রমুখ মনিষীগণ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাসাদি চর্চা করিয়া ইংলণ্ডে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বিধির বিধানে ও ইংলণ্ডের সৌভাগ্য বলে ঝড় উঠিয়া সেই সকল সুবৃহৎ রণতরীগুলি আয়ত্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণতরীগুলি তাহা অবলীলাক্রমে ধ্বংস কবিয়া ফেলে। উহাতেই ইংরাজ জাতির নাম প্রতিপত্তি জগদ্ব্যাপী হইযা পড়ে। " ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং।"

যুগান্তর— ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, সে সময যুগান্তর পরিবর্তনের সময়, পৃথিবীর মধ্যে অনেক স্থলেই ঐ যুগান্তরের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। এক সময়েই পশ্চিম গগনে ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান ও পূর্বগগনে প্রতাপাদিত্যের যশঃ ও গৌরব দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল। ঐ সময়েই ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের সময়, তাঁহারই সাহায্যে বাংলায় খ্রীষ্টানদের প্রথম গির্জা নির্মাণ ও বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গদেশেও রঘুনন্দন বাচস্পতি মিশ্র প্রমুখ ব্যবস্থাকারগণ পুরাতন স্মার্তগণেব অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; জগদীশ, গঙ্গাধরাদি তাঁহাদের নব ন্যায়ে বঙ্গদেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস, নরোত্তম প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ ও উদ্ধারণ শ্রীনিবাসাদি পরম বৈষ্ণবগণ ভক্তির বন্যায় দেশ তোলপাড় করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে বাঙালী ঐন্দ্রজালিকগণ ঘোর অন্ধকারময় নিশিকে এরূপ আলোকিত করিয়াছিল যে, তাহাতে দশ দিনের দূরবর্তী স্থানের লোকেরাও ঐ আলোক দেখিয়াছিল। এইরূপ বহুবিধ ক্রীড়ায় সাতজন বাঙালী সম্রাট প্রমুখ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। সেকালে বাংলায় বণিকেরা প্রভূত ধনশালী ছিল এবং বৈদেশিকগণও তাহাদের প্রশংসা * করিয়াছিল। সপ্তগ্রাম সেকালের ব্যবসায়ীগণের কেন্দ্র ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে তাহাদের কথা বিবৃত আছে। তাহারা ঘরে বসিয়া দেশবাসী ও বিদেশী বণিকগণের সহিত ব্যবসা করিত। তাহাতেই তাহারা স্বাধীনচেতার লোক ছিল। তাহাদের আপদ বিপদে কি দেশবাসি, কি বিদেশী সকলেই সাহায্য করিত। সেইজন্য সম্রাট হইতে তাঁহার মুসলমান কর্মচারীগণের সপ্তগ্রামবাসীর উপর শুভদৃষ্টিপাত ছিল না। তাহারা সপ্তগ্রামকে বিদ্রোহীর আড্ডা বা তাহাদের ভাষায় "বুলঘক

*In Bengal there are the richest merchants I ever met with --Ludovico di Verthema's travels-- P. 212

খানা" নাম দিয়াছিল। আর বোধহয় যে, সেইজন্য "সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী" কথাটি প্রচলিত হইয়াছে। বণিকগণ বৈষ্ণবগণের প্রিয় হইয়া শাক্তপ্রধান দেশে তাঁহাদেরও বিষ নয়নে পড়িয়াছিলেন। বিশ্বকোষ প্রণেতা এইরূপ লিখিয়াছেন : —"মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্য কুলকে শুদ্র জাতিতে পতিত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তৎকালে বৈশ্য বৃত্তিক বহু সম্ভ্রান্ত জাতি পাল রাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সুবর্ণ বণিক জাতিই প্রধান।" ট্রাভারনিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয় বণিকগণ সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে বহুমূল্য রত্নাদি ঠকাইয়া লইয়াছিলও সেই অবধি তাহাদের মাল জোর করিয়া দিল্লিতে পাঠান হইত। বেণিয়ান নেহাল চাঁদ ঐ সকলের দাম ও আসল নকল ঠিক করিয়া দিলে তাহার উপর মাশুল আদায় করা হইত। বণিকগণের মধ্যে সত্যবাদী ও সততার কথা শুনিয়া ঔরঙ্গজেব একজন বণিককে তাঁহার দরবারে আনিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও উপহারাদি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পাথেয় দশ হাজার টাকা ও হাতীআদি পুরস্কার দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। শোনা যায় যে, ইনিই মল্লিক বংশের ঁ কৃষ্ণদাস মল্লিক। নেহাল চাঁদ তাঁহারই নির্বাচিত লোক ছিলেন। ইনিই রাজরামের পিতা ও দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ মল্লিকের পিতামহ।

উক্ত ট্রাভারনিয়ার **"বেনিয়ান"** শব্দের উৎপত্তি গুজরাটি "বেণিয়া" ও সংস্কৃত "বণিজ" শব্দ হইতে হইয়াছে বলিয়াছেন। তাহারা মণি-মুক্তা, হীরা-পান্না, সোনা-রূপার পরীক্ষা করিত ও দর দাম করিয়া দিত। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে গুজরাটের সহিত বাংলার যে বেশ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রকাশ পায়। উহাতে বণিকগণের আগমনের মধ্যে সুবর্ণ বণিকদিগের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে নেহালচাঁদের নাম বর্তমান ছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা ঁ সাগর দত্তের পূর্বপুরুষের ঐ নাম ছিল। আইনী আকবরীতে সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে একমাত্র "আঢ্য" পদবী সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে দেখিতে পাওয়া যায় : —"যাহারা সামরিক হিসাবে মনসবদার ছিলেন না, অথচ সাহসী কর্মঠ কর্মচারী, সম্রাটের খাস পার্শ্বচর ছিলেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ তাহাদের উপর হুকুমজারি করিতে পারিত না, সেইরূপ স্বাধীন ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদিগকে 'আঢ্য' বলা হইত বা তাহাদিগকে ঐ পদবীতে ভূষিত করা হইত।" সুতরাং সুবর্ণ বণিকগণ তখন বেশ সর্বত্রই সম্মানিত হইত।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী— দেশের সম্রাট রাজাদের অজ্ঞতায় যখন বিদেশী বণিকগণের বহির্বাণিজ্য দ্বারা বিদেশ হইতে ধনাগম বন্ধ হইয়া যায় ও ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এদেশের বণিকগণ পূর্বসঞ্চিত অর্থ লইয়া তাহা খাটাইতে আরম্ভ করে; তখনই তাহাদের উপর অধমর্ণগণ বিরক্ত হয়। একটি চলিত কথা আছে : — "লাভ লোকসান গণে চাষ করে না যে বেণে" রাজা বল্লাল সেনের সময় হইতেই রাজাকে দিয়া শাসন দণ্ডের দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণ উহাকে রাহুগ্রস্ত করাইয়াছিল। সেকালের সুবর্ণ ধেনু ব্রত আদি করিয়া বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণ বণিকগণকে নির্যাতিত করে; আর রাজা গণেশের পুত্র যদুও সেইরূপ ব্রাহ্মণগণকে নির্যাতিত করিয়াছিল। এই সকল কারণে সমাজ একেবারে হীনবল হইয়াছিল। দেশের ধনরত্ন দেশবাসীরা লইবার জন্য নানা কৌশল করিত। একজনের ধনরত্ন জমিদারী একজন কাড়িয়া লইয়া আপনি রাজা ও জমিদার হইত। সেকালের স্বার্থপর লোকেরা নিজের বল বুদ্ধি ভরসায় না কুলাইলে নানা চক্রান্ত করিয়া বলবানের সাহায্য গ্রহণ করিত। বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্মচারীগণের ভয়ে কিরূপ অস্থির থাকিত, তাহা ভাড়ু দত্তের প্রসঙ্গে দেখা যায়। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ধর্মকর্মের বৃত্তিতে লাভ নাই দেখিয়া দরিদ্র সমাজনেতা

ব্রাহ্মণগণ চটিয়া আগুন হইত। বাপান্ত তাহাদের মুখের অলঙ্কাব ও লোকজনকে অযথা সমাজচ্যুতি করিয়া দণ্ড আদায় করা তাহাদের নিত্য ধর্ম-কর্মের মধ্যে একটি প্রধান কার্য ছিল। সেই ব্রাহ্মণ জাতিকে সেকালে কেহ ঋণদান করিত না। যাহারা অর্থশালী, তাহারা উহা না করিলে ক্রোধের সীমা কতদূর অতিক্রম করিত, তাহা লেখা অপেক্ষা অনুমানে অধিক অনুভব করা যাইতে পারে। বণিকগণের উপর ব্রাহ্মণগণের সেইজন্যই বড় আক্রোশ ছিল। এমনকি, প্রতাপাদিত্য আপনাদের স্বজাতির মধ্যে সংস্কার বা মর্যাদা লাভ করিতে গিয়া তাঁহার আপনার জামাতার সহিত মনান্তর হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর তাহার কন্যা স্বামীর সহিত সম্মিলিত হয়। দেশের এত দুরাবস্থায় শত প্রতাপাদিত্যও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। এ কথা বলা বাহুল্য যে, জাতীয়তায় সমাজ শক্তি সংগঠিত হইলে তবেই স্বজাতী ও স্বদেশপ্রীতি সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইংরাজের কর্মচারী হইয়া বা হইবার লালসায় দেশের সর্বনাশ করা স্বদেশহিতৈষীতার কর্ম নয়। ইউরোপের ব্যবসায়ীবা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিল। কিন্তু এ দেশের রাজা, নবাব, সম্রাট, মন্ত্রীগণ একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে তাহাতে দেশের কি সর্বনাশ হইল বা হইবে। তাহারা অর্থ উৎকোচ ও উপহাবের বহরে কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবসা করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। তাহাতেই দেশের ব্যবসায়ী দল নীরব ও নষ্ট হইল। তাহাতেই প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিরোধ। যেখানে এমন সুন্দর দৃশ্য—সেখানে সে জাতীর উন্নতি বা স্বাধীনতা কেমন করিয়া হয়? বর্তমান লেখকগণ প্রতাপপ্রমুখ বারভুঞাগণের বিরুদ্ধাচারীগণের উপব খড়্গহস্ত, কিন্তু সেকালের স্মার্ত ও ন্যায়বাগীশেরা বা দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা সেরূপ তখন কিছুই করেন নাই; বরং তাহাদের সেবা ও গুণকীর্তনাদি করিতেন বলিয়া বোধহয়। এখনও সমাজ সংস্কৃত বা উন্নত নয়, তখন অতীতের ঘটনা লইয়া বর্তমানে তীব্র কটাক্ষপাত করিলে কোন ফলোদয়ই হইতে পারে না; তবে যেটুকু না করিলে বর্তমান যুগের পাঠকগণের প্রবৃত্তি ও রুচি মার্জিত করা যায় না। সেকালেব দোষের প্রতি লোকের লক্ষ্য হয় না, তাহাই করা কর্তব্য বলিয়া বোধহয়।

সমাজ বিপ্লব — দেশের সমাজবিপ্লব তখন তাঁহারা কেহই করেন নাই— বল্লালের কৌলিন্য প্রথাতেই তাহার সূত্রপাত। বাংলার ব্রাহ্মণ "বার রাজপুতের তের হাঁড়ির" মত কৌলিন্য জাতরক্ষার জ্বালায় জর্জরিত, আবার তাহার উপর ঘটক ও মুসলমানদেব অত্যাচার। তাহাতেই এদেশে রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ি, বঙ্গ ও মিথিলা ভিন্ন হইয়া তখন পৃথক পৃথক সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিল। বল্লালের যেমন ডোম কন্যাপবাদ ছিল, তেমনি রাজা গণেশের চরিত্রেও কলঙ্ক কালিমা ছিল। তাহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্মাবলম্বন করিলে, তিনি যদুকে সুবর্ণ নির্মিত গাভীর মুখ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাদেশ দিয়া বাহির করাইয়া সেই সুবর্ণ গাভী বিতরণ করিয়া তাহাকে হিন্দু করাইয়াছিলেন. ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট যদুকে গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার উহারই পোষকতায় উহার নাম ফুলজানি বলিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ সেই সুবর্ণ ধেনুর দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে হিন্দু করিয়াছিল, সেই কুলাঙ্গার যদু তাহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল। ইহা রিয়াজ-সালাতিনের ইংরাজী অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় (পৃ. ১১৮)। শোনা যায় যে, সম্রাট সাজাহান হিন্দু রমণীর গর্ভজাত বলিযা তাতার জাতি তাহার অধীনতা স্বীকাব করে নাই। কিন্তু হিন্দুর মধ্যে সে ভাব ছিল না। সেইজন্যই যদু রাজ্য রক্ষার জন্য হিন্দু হইয়া পুনরায় মুসলমান হইয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামস্থ বজ্রযোগিণী গ্রামের একটি পরমা সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা বলপূর্বক গৃহীত হইলে, সামসুদ্দীনের ফৌজদারগণ উহা রাজধর্মের বিরুদ্ধ বলিয়া সেই কন্যার

মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের সৃষ্ট এমন সুন্দর ফুলটা বৃথা নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তিনি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু কেহই তাহা করিল না। শেষে তাহার নাম ফুলমতী বেগম হয় ও তিনি নবাব সমসুদ্দীনের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। বাঙালীর ঘরে সোনামুখি ফুলজানি প্রমুখ ক্লিওপেট্রার জন্ম না হইলেই ভাল হইত। কি আশ্চর্য্য! কুলাচার্যগণ ঘটকমহাত্মগণ পতিত হইয়াও ব্রাহ্মণদিগের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা হইয়াছিল। দেবীবর ঘটকাদির ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোন ব্রাহ্মণই দণ্ডায়মান হইতে তখন সাহস করেন নাই। নিশ্চয়ই তাঁহারা সময়োপযোগী বংশোৎপত্তি ও কৌলিন্য ব্যবস্থা করিতে জানিতেন ও উহার সহায়তা করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত, বৃহদ্ধর্ম্মাদি কতিপয় পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেকালে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুর জাত, ধর্ম বা কুল কিছুই ছিল না, তাই ঘটক মহাপ্রভুরা বলিতেন যে, "দোষ নাই যার, কুল নাই তার" অমনি তাহাতে সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিত "যথার্থ কুলীনই অগ্নির ন্যায় সকল দোষকে হরণ করিতে সক্ষম।" হিন্দু সমাজ যখন এইরূপ আত্মঘাতী হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভগবান গৌর নিতাইকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেম ভক্তি দিয়া বাংলায় বৈষ্ণবজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙালীর মধ্যে তখন জাতীয়তার সৃষ্টি চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু হায়! তাহাও ভণ্ড ও অষ্টসিদ্ধি দলের কৃপায় সমাজে স্থান পাইল না। শরীর রক্ষা না হইলে কি উপাসনা করা যায়, এই মতই প্রবল হইয়া বৈষ্ণবদের মুখে "মাগুর মাছের ঝোল, ভর যুবতীর কোল, হরি হরি বোল," উচ্চারিত হইয়া দেশকে নষ্ট করিয়াছে। তখন এই সকল ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় হিন্দুসমাজ ও ধর্ম লুপ্ত হইয়াছিল। লোকের জাত ধর্ম তখন দেশের রাজা জমিদার ও ঘটক মহাশয়দের হাতে ছিল। তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে দু-একটি সেকালের ঘটক মহাশয়দের ছড়া ও তাহার আনুসঙ্গিক ঘটনা প্রকাশ না করিলে সম্যক বুঝিতে পারা যায় না। হায়! এই সমাজ ও জাত লইয়া এখন লোকে মারামারি করে।

বল্লালের ডোম কন্যার প্রসঙ্গে পুরোহিত ও পুত্র লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে সেই পুরোহিত সিন্দুর ও শাখিনী নামে দুই পরগণা জায়গীর পান। কালে তাঁহার বংশধরগণ পাঠান রাজত্বকালে "রায়" উপাধি লাভ করিয়া দেশে জমিদার ও রাজার মত হইয়াছিলেন। ঐ বংশের রাজীব রায় রাঢ় দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আনিয়া মৈত্র উপাধি দিয়া তাঁহার দুই ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেশে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বারেন্দ্র সমাজ জ্বলিয়া আগুণ হইল ও সেই প্রসঙ্গে দেশময় ছড়া বাহির হইল। ছড়া তখন খবরের কাগজের কাজ করিত।

"গঙ্গাপারের মৈত্র ঠাকুর গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিচয়ের মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।"

"খাট খুটু ঠাকুরটি গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, গাই গোত্র কিছুই নাই রাজীব রায়ের শালা"

জমিদার রাজীব রায়কে তাহার কায়স্থ কর্মচারী ফটিক দত্ত রাঢ়ী বারেন্দ্রের সমাজের সম্মিলন করাইয়া যে সকল ক্রটি করিয়াছেন দেশে তো আর বাহির হইবার যো নাই, তাহা তিনি কেমন করিয়া সংশোধন করিবেন, এইরূপ কথা বলিলে, তিনি তাঁহার উপর রাগ করিয়া বলিলেন, "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই আমাকে ধোবা বলিলি: ধোবাতেই ময়লা সাফ করে, আমি সেই কাজ করিব, নিশ্চয়ই ফটিক ধোবা না হইলে, কখনই অবলীলাক্রমে ঐ কথা বলিয়া আমায় অপমান করিতে তাহার সাহস হইত না।" তৎক্ষণাৎ রাজীব রায় ফটিককে ধোবা করিয়া দিল। আর ঘটকেরা তাহাদের পুঁথিতে ছড়া লিখিয়া রাখিলেন, যথা : —

'জাতির কর্তা রাজীব রায়, মুলুকের শুবা.
তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে, দত্ত হলেন ধোবা।'

দেশ ও সমাজ নীরব; ভয়ে ভয়ে আর কেহ কেহ দ্বিরুক্তি করিল না। শেষে সব থামিয়া গেল। কার্য্যত মহাপ্রভু গৌর নিতাই রাঢ়ী, বারেন্দ্র সমাজ সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সামাজিক ইতিহাসকার সেকালে ঘটক মহাশয়দিগকে দক্ষিণা দিয়া লোকে কেমন করিয়া নিম্নশ্রেণীর জাত হইতে উন্নত হইত, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নজীর সেকালের কুলজী ছড়াতে আছে, যথা : —

'হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস,
তার বেটা কায়েত হলো বিশ্বাস খাস।'

তখন হিন্দুদের মধ্যে একতা বা জাতীয়তা জ্ঞান কিছুই ছিল না দেশে যেমন অরাজকতা, সমাজও তেমনি বিশৃঙ্খল। মহামারীতে গৌড়ের ধ্বংস, সপ্তগ্রামের অধঃপতন ও যশোরের ধ্বংসই কলিকাতার উন্নতির কারণ। উহা না হইলে কলিকাতা বোধহয় যে, অতীতের অতল অন্ধকারে তখনও যেমন লুক্কায়িত ছিল, এখনও তেমনি থাকিত। সেকালের নদীয়া, বাঁশবেড়িয়া, বড়িষার জমিদারগণের দোষ অপেক্ষা হিন্দুসমাজের অধঃপতনই বাংলায় স্বাধীনতা লোপের জন্য অধিকতর দোষী ও তাহার মূল কারণ। তাহাতেই বিদেশী বণিকেরা কলিকাতার উন্নতির সোপান কেন্দ্রীভূত ব্যবসায় করিয়াছিল। স্বদেশী বণিকগণের হতাদর হওয়ায় সেই সকল বিদেশী বণিকগণ এদেশে ব্যবসা করিতে পারিয়াছিল। বিদেশী বণিকেরা এদেশী বণিকগণকে বেণিয়ান করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। উহাতেই বোধহয়, " তোর কড়ি মোর বুদ্ধি ফলার করি আয়" এই কথা, চলিত হয়।

যতদিন লোকে স্বজাতি বলিয়া স্বজাতিকে কোল দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা না করিবে, আপনার দেশের লোকের মুখের অন্ন পরের মুখে তুলিয়া দেওয়াকে পাপ জ্ঞান না করিবে, আপনার জাত্যাভিমান ভুলিয়া সকলের মঙ্গলের জন্য কাতর না হইবে, ততদিন দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, আকাশ কুসুম ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে জ্ঞান, সে তপস্যা বাঙালী জাতীর তখনও ছিল না ও তাহা কখনও যে হইবে বলিয়া বোধহয় না। মিথ্যা মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কোন ফল নাই। তাঁহাদের বর্তমান বংশধরগণ পোষ্যপুত্রের বংশ মাত্র। আর্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বেদ্ধ, গুপ্ত, মুসলমান, খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য ঐ জাতীয়তা ও ধর্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য হিন্দু জাতীর অধঃপতন ও বিদেশীর উন্নতিতে কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি বিশেষের মহাপাপে বা জাতি বিশেষের চেষ্টায় কলিকাতায় ইংরাজ জাতির সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত হয় নাই। উহা তাহাদের ভাগ্য, অধ্যবসায় ও জাতীয়তায় হইয়াছিল। সেই কথা পরিস্কার করিয়া বলিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করা হইল।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার অভাবে দেশের লোক মূর্খ হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপীয় জাতিগণ তাহারই জন্য এদেশের লোকের উপর সহজেই প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল ও দেশের কর্তা হইয়াছিল। মুসলমান আধিপত্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, ততই সেই আত্মঘাতী হিন্দুসমাজ টোলের অধ্যাপকগণের হস্তে গিয়া পড়িয়াছিল। তখন দেশের লোক সেকালের কাজির বিচার অপেক্ষা সেই সকল শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকে বড়ই বিশ্বাস ও মান্য করিত। তাহাতেই মুসলমানকে স্পর্শ করা, সমুদ্র যাত্রাদি পাপ হইয়া পড়ে। সেই ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে যে কেহ কোন কথা বলিত, সেই পতিত হইত। তাহারা তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া নিঃগৃহীত করিত। ইহাতেই তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কেহই কোন কথা বলিত না। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ শাসন অধিকরতর প্রবল হইয়া পড়ে। যে সমুদ্রযাত্রী বণিক ভারতের সমৃদ্ধির কারণ ছিল, তখন ব্রাহ্মণ শাসনে তাহারা

* সমুদ্রযাত্রী বৈদেশিক বণিকের কর্মকর্তা বেণিয়ান হইয়া দেশের ধন তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া কেবলমাত্র শতকরা কমিশনে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছিল। তাহাতে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হুগলী, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গার নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল স্থানেই ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যারম্ভ ও উহাদের ব্যবসার কেন্দ্র করিয়া উহা দখল করিয়াছিল। হায়! কালের করাল গতিতে যে চিকিৎসাশাস্ত্র রোম, মিশরবাসীগণ ভারতবর্ষের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল ও উহা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই চিকিৎসা দ্বারা ভাগ্যবান ইংরাজ জাতি ভারতে বাণিজ্য করিবার ছাড় সনদ ও কলিকাতাদি কয়েকখানি গ্রাম খরিদ করিবার স্বত্ব লাভ করিয়াছিল। মুসলমান সম্রাট নবাবেরা সেইজন্য ইউরোপীয় চিকিৎসকগণকে বড়ই সমাদর ও তাঁহাদিগকে নিকটে রাখিতে চাহিতেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিপক্রেটিস তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, চিরতা, দারুচিনি প্রভৃতি দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন রোগের ঔষধ বলিয়া এদেশী বৈদ্যশাস্ত্রানুযায়ীই চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুবর্ণ বণিকগণ বিলাত হইতে আমদানির সোনারূপা দিয়া বাংলাদেশে গহনার চাল করিয়া দেশের লোকের অর্থসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া শেষে সকলের চক্ষুশূল হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থা করায় উহাদিগকে লোকে সোনার বেণে বলিত। সুবর্ণরেখা বাংলার সীমা ছিল, সেখানে সুবর্ণ আহরণ ঐ প্রদেশী বণিকেরাই করিত। সেই সোনা ও বিদেশী সোনা দেশে ব্যবহৃত না হইলে ঐ ব্যবসা চলে না বলিয়া, তাহারা সেঁকরা রাখিয়া উৎকৃষ্ট গহনা গড়াইত ও বিক্রি করিত। সেই হইতেই সুবর্ণ বণিক ও সোনার বাংলা নাম আরম্ভ হয়। সেইজন্য সুবর্ণ বণিক জাতি ভারতবর্ষেব আর কোথাও নাই। সেঁকবারা ঐ সকল গহনা তৈয়ারি করিবার সময় মেল দিয়া সোনা চুরি কবিত। সুবর্ণ বণিকগণের উপর সেই অপরাধ ন্যাস্ত হইত। তাহাতেই তাহাদের ছায়া মাড়াইলে চান করিতে হয়, এই ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। নবশায়কগণ ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষা ও অর্থ সাহায্য কবিয়া হিন্দু সমাজে সম্মানিত, আর সুবর্ণ বণিকগণ তাহা না করিয়া অপদস্থিত। ইহাতেই তাহাবা তখন ঐ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বিদেশী বণিকগণের বেণিয়ান হইয়াছিল। যদি তাহারা ঐ রূপ কার্য করিতে অযথা বাধ্য না হইত, তাহা হইলে এদেশে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের বাণিজ্য করা বা তাহাদের রাজ্য লাভ করা অসম্ভব হইত। ঐ সকল বেণিয়ানগণের নামের ও প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশের লোক ইউরোপের ব্যবসায়ীগণকে মাল দিত ও তাহাদের সহিত কারবার করিত। দেশের স্বাধীনতা লোপের জন্য সেকালের ক্ষমতাপ্রিয় অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণ সমাজ সম্পূর্ণ দায়ী ও দোষী। তাহারাই দেশের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশকে দরিদ্র করিয়াছিল। সেকালের সুবর্ণ বণিক তাহাতে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া নবশায়ক উন্নতকারী হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া গৌর নিতাই-এর প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। তাহাতেই ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হন। সুবর্ণ বণিকগণের মধ্যে মাহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত, বৈষ্ণব চূড়ামণি, তাঁহাকে বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলার সুবাহুর অবতার বলিয়া থাকেন। তিনি নবাব হুসেন শার সময় জমিদারী খরিদ করিয়া উদ্ধারণপুর নামে নগর সৃষ্টি করেন। তাঁহার পাট বৈষ্ণবগণের তীর্থও ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে। বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার পরিচয় ও মহাপ্রভু গৌর নিতাইয়ের দয়া ও ভক্তির কথা

* সমুদ্র যাত্রা স্বীকার কমণ্ডলু বিধারণং ইমান ধর্মাণ কলিযুগে বর্জ্যানা ইমানীষিণঃ
রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্ব।

প্রকাশিত রহিয়াছে। সেকালের ব্রাহ্মণ সমাজের সুবর্ণ বণিকগণের উপর অযথা হিংসা, দ্বেষ ও পীড়নের বিরুদ্ধে পরমদয়াল গৌর নিতাই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন উক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাংলার ইতিহাসে সেই পুণ্য শ্লোক বৈষ্ণবের কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। উহাতে রাঢ় ও বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধাদিতে কিরূপ ব্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটকগণ নিত্যানন্দের সময় কিছুই করিতে পারিলেন না, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগে তাঁহার সন্তানের বংশে বীরভদ্রী দোষ স্পৃষ্ঠ করাইতে ছাড়িলেন না। সে দোষের সঙ্গে উদ্ধারণের হাতে নিত্যানন্দের অন্নগ্রহণের কথা কিন্তু উক্ত হয় নাই; যদি তখন উহা দোষ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে ঘটকেরা তাহা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বাংলাদেশে হিন্দুজাতির মধ্যে জাতিগত ছুঁই ছুঁই ও অন্যান্য কুসংস্কারের সৃষ্টি সেকালের টুলো গোড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই করিয়াছিলেন। ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্তের জন্ম হইয়াছিল। উদ্ধারণ দত্ত, দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া নিত্যানন্দের বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর পুরুযোত্তমে ও ছয় বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সূর্য দাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। সুবর্ণ বণিকগণ মনে করিলে সে সময়ে হিন্দুসমাজে তাহাদের যথাস্থান অনায়াসে লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা হিন্দু সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হওয়াই ভাল বিবেচনা করিয়া ছিলেন। তাহাতেই হিন্দু সমাজের আক্রোশ তাঁহাদের উপর দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কবিগণের লেখাতে তাহার সবিশেষ আভাস লক্ষ্য হয়। সেকালে বাণিজ্য জলপথেই অধিক হইত। দেশে যাতায়াতের রাস্তায় গাড়ী যাইবার সুবিধাও ছিল না ও সেদিকে দেশের শাসনকর্তাদের লক্ষ্য পড়িবার সময় বা সুবিধা ছিল না। তখন এখনকার মত গাড়ি ঘোড়ার চাল ছিল না। গরুর গাড়িতেই মালাদি ও লোক যাইত। তাহাও দস্যু ও হিংস্র জন্তুর ভয়ে বেশি দূর যাইতে পারিত না। একদিনে যতদূর পথ যায়, ততদূরই চলিত। তাহাতে তখন একদিনের অধিক দূরের লোকের সহিত পরস্পর মেশামিশি ছিল না; এমন কি, পরস্পর পরস্পরকে জানিত না ও চিনিত না। ঐ সকল স্থানের গণ্ডি মধ্যে তাহারা পৃথক হইয়া থাকিত। তাহাতেই রাঢ় বারেন্দ্র আদি ভিন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে ও পরস্পর পরস্পরকে পর ভাবিত। ইহাতেই ইউরোপবাসীগণ এদেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া এদেশে লোকের সহিত মেশামিশি করিয়া স্বজাতী ও স্বদেশবাসি অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। হায়! তখন দেশের অভাব দূর করা লোকের চিন্তার অতীত হইয়াছিল।

তখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশেই ইচ্ছাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল। অসংযত ক্ষমতাশীল সম্রাট মূর্খ নবাবেরা প্রজার উপর যথেচ্ছাচার দুর্ব্যবহার করিত। তাহাতেই প্রজারা সর্বদাই দুঃখ ভোগ করিত ও শাসনকর্তার ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত। তখন কেহ কোন কথার প্রতিবাদ করিতে পারিত না। সর্বদাই ঘরে বসিয়া আপদ বিপদ হইতে স্ত্রী পুত্র পরিবারকে বাঁচাইবার চিন্তায় ব্যস্ত থাকিত। আরও সেকালে গৃহস্থেরা শিক্ষিত ছিল না, যাহার যে কার্য বা ব্যবসা, তাহা চালাইবার জন্য যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক, তাহাই শিক্ষা করিত। সেকালের গুরু মহাশয় শিক্ষার আচার্য ছিল। তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড় অক্ষর পরিচয় লেখা ও পড়া, অঙ্ক ও শুভঙ্করী। টোলের পণ্ডিতের কাছে ব্রাহ্মণেতর জাতি শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না। লোকে তখন কথকতায় শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিত। বাংলায় কাশীদাস

কীর্তিবাস রামায়ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিল। সেকালে রাজনীতি চর্চা করিবার বিদ্যা ও বুদ্ধি সেকালের জমিদার ও টোলের পণ্ডিতদের কিছুই ছিল না। প্রতাপাদিত্য প্রমুখের যাহা কিছু হইয়াছিল তাহা দিল্লি দরবারে গিয়া ও পূর্ব পুরুষগণ নবাব সরকারে কার্য করিত সেই নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

রাস্তা— কলিকাতা হইতে যশোরের রাস্তা বর্তমান আছে ও ব্যারাকপুর আদি স্থানের সহিত যাতায়াতের ব্যবস্থা স্থল পথে আছে, কিন্তু উহা কে কবে করিয়াছিল, তাহার সবিশেষ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনেকেই বলেন যে ঐ সব রাস্তা প্রতাপাদিত্য বা মুসলমান নবাব বাদশারা করিয়াছিলেন। ঐ সকল রাস্তা তৈয়ারির বিবরণ সেকালের মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বা ঘটকেরা প্রশংসার কর্ম মনে করিত না, তাহাতেই কোন উল্লেখ নাই। কেবল ঐ জন্য শেরশাহ নাম প্রসিদ্ধ, তিনি সুদর সুন্দর পথ ও বিশ্রামাগার করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা তাঁহারই কীর্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়। তিনি সোনার গাঁ হইতে সিন্ধু পর্যন্ত ১৫০০ ক্রোশ রাস্তা করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে রাস্তা করিয়াছিলেন। শেরশার আমলে ঐ সকল রাজপথ নিরাপদ হইয়াছিল ও রাস্তায় পণ্যদ্রব্যের উপর কর আদায় হইত। তাহার আমলে বাংলায় বিদেশী দ্রব্য বিনা মাশুলে আসিত। উহার কর গ্রহণের সুবিধা ছিল না। সেকালে কলিকাতায় এমন কোন বানিজ্য দ্রব্য ছিল না যে, যাহার জন্য উহা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানের ন্যায় বিখ্যাত হইয়াছিল। বিদেশী বণিকগণের সঙ্গে যাহারা বাণিজ্য করিত, তাহার বেণিয়ানের কার্য করিত বা দালালি করিত। তাহাদের দাদন লইয়া তাঁতিরা প্রথম কলিকাতায় সূতা কাটিত ও উহার ব্যবসা করিত। এই পর্যন্ত কবিকঙ্কণাদিতে আভাস পাওয়া যায় মাত্র। কলিকাতার নিকট প্রতাপাদিত্যের দুর্গাদি ছিল ও সেইখানে মোগল সেনাপতি আজিম খাঁ প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাজিত হয়। তাহাতেই বোধহয় যে, কলিকাতার কতকাংশ উন্নতি প্রতাপাদিত্যের সময় হইয়াছিল ও ঐখানে আজিম খাঁ শিবির স্থাপন করিয়া থাকিবার সময়, তাহারাই বন জঙ্গল পরিস্কার করিয়াছিল। তখন সেখানে ঐ সকল মোগল সেনার আহারোপযোগী দ্রব্যাদি ছিল ও লোকজন তখন তাহা সরবরাহ করিত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তখন লোক সংখ্যা বড়ই অল্প ছিল।

ইউরোপীয় বণিকগণের শুভাগমনের পূর্বে বনজঙ্গল ও যুদ্ধোপযোগী স্থান ভিন্ন অন্য কোনরূপ বসবাসের উপযুক্ত স্থান বলিযা কলিকাতার সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না, তাহাতেই উহা বড়ই অস্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাহাদের উদ্যোগ

দৈব— উচ্চাভিলাষ, ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য ও শিক্ষাই উন্নতি ও কৃতকার্যতার সোপান। উপযুক্ত সময়ে ও সুযোগে কার্য না করিলে উন্নতি হয় না; কৃতকার্যতা মনুষ্যের বিদ্যা, বুদ্ধি, ভাগ্য ও অভিজ্ঞতাতেই লাভ হয়। ঘটনাচক্রের সমাবেশেই মনুষ্যের ভাগ্য পরিবর্তন ও উন্নতি হয়, লোকে উহাকেই দৈব বলে। আর তাহা না হইলে লোকে আকাশে উঠিতে গিয়া পাতালে পড়িয়া যায়। সে দুর্দশা স্পেন পর্তুগালের অজেয় রণতরীর মত বাংলার বারভুঁঞাদের হইয়াছিল। তাহারা যদি মন্তব্য স্থির করিয়া সকলে একত্রিত হইত ও যে সময় ইউরোপীয় বণিকগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও ষড়যন্ত্রে কৃতকার্য হইয়াছিল, সেই সময়ে যদি তাহারা তাহাই করিত, তাহা হইলে বোধহয়, ভারতবর্ষের কিম্বা বাংলার ইতিহাস পৃথক হইত। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যথাবিধি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া শিকার করিতে গেলে, লোকের আশা ভঙ্গ হয় না; কিন্তু তদ্বিপরীতে লোক যদি অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কার্য করে তবে কোন সুফল হয় না। তৃণ সকল একত্রিত করিয়া রজ্জু দ্বারা মত্ত হস্তীকে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু পাশ্চাত্য রাজনৈতিক বণিকগণ উপযুক্ত কৌশলে ও অবসরে হস্তীকে পঙ্কে মগ্ন করিয়া তাহার উপর চড়িয়া কার্যসিদ্ধ করিয়াছিলেন। কবিরা তাই বলিয়া থাকেন যে, লক্ষ্মী উদ্যোগী বিমৃশ্যকারী ব্যক্তির গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আশ্রয় করেন। মহাভারতে সেইজন্যই পরম রাজনৈতিক যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ার সময় সমস্ত অপমান অবনত মস্তকে সহ্য করিয়াছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একদিনে স্থাপিত হয় নাই। দুইশত বর্ষের উদ্যোগ, অধ্যবসায়, কার্য কুশলতা ও যুদ্ধ বিদ্যার ফলে হইয়াছিল। তাহার বিবরণ ঘোরকলির দ্বিতীয় মহাভারত বলিলেই চলে। তখনকার সকল অভিনয়েই ইংরাজ জাতির দৈব সহায় হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী— ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর বিলাতের অলড্যারম্যানের বাড়িতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। সেই গৃহটি শেষে বিলাতে " Founder's Hall" নামে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়া পড়ে। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর ওলন্দাজগণের নিকট ভারতবর্ষের মরিচাদি দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক মূল্যে খরিদ করিতে হইতেছে দেখিয়া, ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য সত্তর হাজার পাউণ্ড মূলধন স্থির করিয়া একজন গভর্নর ও কতিপয় ডিরেক্টরের অধীনে একশত পাঁচিশ জন বিলাতী বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত করে। রাজ্ঞী এলিজাবেথ উহাদের সনন্দ প্রদান করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের দরবারে জন মিডেল হল কয়েকটি রত্ন আর ঘোটকাদি উপহার লইয়া উপস্থিত হন। তিনি পার্সি ভাষা জানিতেন না। পর্তুগীজ জেসুইট ধর্মাবতার

পাদরীগণের ক্ষমতা ও চক্রান্তে তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। সেখানে ছয় মাস থাকিয়া পার্সি ভাষা শিক্ষা করেন ও নিজের মন্তব্য দরবারে পুনরায় সেকালের কৌশলাদির সহ অবগত করাইলেন। তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইল ও কার্য কিয়দংশ অগ্রসর হইল মাত্র। তাঁহার ধৈর্য, অধ্যাবসায় ও ঐকান্তিকতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় পর্তুগীজ ও আরমাণি বণিকগণ পরমা সুন্দরী রমণীগণকে উপহার দিতেন ও তাহারা তাহাতেই তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইতেন। সম্রাট আবার সেই সকল সুন্দরীগণকে তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে উপহার দিতেন। সম্রাটেরা ঐ সকল রমণীদানের প্রলোভন দ্বারা শত্রুগণের উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাতেই স্ত্রীজাতির দুর্দশার সীমা ছিল না, তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়া যেন পণ্যদ্রব্যের মত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতেই সমাজে অবরোধ ও সহমরণ ব্যবস্থা দ্বারা স্ত্রীজাতির ধর্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়। সর্বত্রই ব্যাভিচারবৃত্তির প্রশ্রয়ে লোকের দেশের নবাব, সম্রাট বা তাহাদের কর্মচারীদের উপর কাহারও কোনও ভক্তি বা শ্রদ্ধা ছিল না। তাহারা সর্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত যে, ভগবান করে তাহাদিগকে তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন। এইরূপ যখন দেশের অবস্থা, তখনই ইউরোপীয় বণিকগণ সম্রাটের দরবারে যাতায়াত করে ও এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহাতেই তাহারা অনায়াসে কৃতকার্য হইয়াছিল।

যখন বর্তমানের ভোগ বিলাসিতা অপেক্ষা ভবিষ্যতের উন্নতির দিকে তাকাইয়া যে জাতির মধ্যে অধিকাংশ লোক কার্যারম্ভ করে, তখনই সেই জাতির উন্নতি আরম্ভ হয়। ইউরোপের বণিকগণের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, সেইজন্যই তাহারা দেশের সমস্ত উপভোগ ও মমতা বিসর্জন করিয়া বিদেশে মৃত্যুকে বরণ করিতেও কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। ইতিহাসে উহারই দৃষ্টান্ত জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। ধর্মের সঙ্গে, কর্তব্য প্রতিপালনের সঙ্গে জাতির উন্নতি কোথায় কেমন করিয়া কি করিলে হয়, তাহা সেকালের ঘটনা সমূহের মধ্যে লক্ষ্য হয়। সেকালে 'জোর যার মুলুক তার' ''মারি অরি পারি যে কৌশলে'' এই সকল দুর্নীতির প্রশ্রয়ে দেশে ঘোর অরাজকতা আসিয়াছিল। গুপ্তহত্যা ও লোকবলই তখন এদেশে ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির সোপান; দেশে কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব ছিল না। পরস্পর পরস্পরের আন্তরিক হিংসা করিত; তাহাতেই যথা সময়ে বিদেশী বণিকগণ এদেশের লোকদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিল। সেকালের ঘটনা রাশির মধ্যে এই সহানুভূতি সূত্র বর্তমান। তাহা লক্ষ্য করিবার অগ্রে উহার সূচনাদি উল্লেখ করা হইল। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর পার্সি ভাষাজ্ঞ ইংরাজ হকিন্সের নিকট হইতে উপহারাদি গ্রহণ ও আড়াই বৎসর কাল তোষামোদাদিতে বাধ্য হইয়া শেষে তাহাকে এক পরমাসুন্দরী আরমানি রমণি উপহার দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সুচতুর কর্তব্যপরায়ণ হকিন্স তাহাতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে তিনি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। এদেশের লোকেরা কেহই তখন তাহাতে কোন আপত্তি করে নাই। পুনরায় ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো নানাবিধ উপহারে সন্তুষ্ট করিয়া দিল্লির দরবার হইতে ইংরাজদের ১৬২০ খ্রী: আগ্রায় ও ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় কুঠি খুলিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। শোনা যায় যে, ১৬৩৪ খ্রী: ইংরাজের ডাক্তার ব্রাউটন সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে ও বাংলার শাসনকর্তা সুলতান সুজার

মহিষীকে আরোগ্য করিয়া বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করে।

সাজাহান সম্রাট হইবার পূর্বে দুই বৎসর বাংলায় ছিলেন ও তিনি পর্তুগীজদের দুর্ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহারা লোকজনকে খাটাইয়া মজুরী দিত না, জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিত, কাহারও কোন কথা গ্রাহ্য করিত না ও অবসর পাইলেই সব লুটপাট করিতে ছাড়িত না। তিনি সম্রাট হইয়াই হুকুম দিলেন যে, বাংলার রাজকার্য্যের দপ্তর হুগলীতে আনিয়া সেখান হইতে যেন পর্তুগীজগণকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তিনি আকবরের ন্যায় দেশের মঙ্গলের জন্য ও বাঙালীর মনে ধর্মবল সঞ্চারণ করিবার নিমিত্ত গৌড়ের ধ্বংসের পর সরকারী খরচায় ব্রাহ্মণের দ্বারা যথারীতি দুর্গোৎসব করাইয়াছিলেন। তাহাতেই বাঙালীর ঘরে ঘরে দুর্গোৎসবেব আড়ম্বর বাড়িয়া ছিল। কিন্তু সেই সরকারী দুর্গাপূজা ঔরঙ্গজেবের সময় উঠিয়া গিয়া তাহার পরিবর্তে মহরম উৎসব আরম্ভ হয়।

ইংরাজের সৌভাগ্য বলেই শিবাজীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা না হইলে ইংরাজের উপর দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও তাহাদের উপর সম্রাট ঔরঙ্গজেবেরও দৃষ্টি পড়িত না। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সেনডেন ইংরাজের সুরাটের কুঠি রক্ষা করিয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে যে খেলাত ও তরবারি পাইয়াছিলেন ও তাঁহাদের বাণিজ্য দ্রব্যের মাশুল কমাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর অঙ্গিয়ার অধ্যক্ষ হইয়া বোম্বাই এর স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান, বিচার নীতি ও প্রজাতন্ত্র শাসন চালাইয়া সেখানকার লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এদিকে পর্তুগীজেরা লোকের নিকট হইতে এক চতুর্থাংশ খাজনা আদায় করিত, লুটপাট করিত, নরনারী লইয়া ক্রীতদাসের ব্যবসা করিত, লোক খাটাইয়া মজুরী দিত না, তদ্‌পরিবর্তে ওদিকে অঙ্গিয়ার যাহাতে কেহ অত্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য রণতরী সাজাইয়া সৈন্য সৃষ্টি, দুর্গ নির্মাণ, স্থানীয় লোকদের ভিতর আপোষে বিবাদাদি বিসম্বাদ নিষ্পত্তি, বিচারপদ্ধতি ও লজ্জাকর দণ্ড বিধান প্রচলন দ্বারা সকলের পরম হিতৈষীর কার্য করিতেছিল। ইহাতে দেশের লোকেরা বিপদে ইংরাজদিগকে উদ্ধারকর্তার ন্যায় দেখিতে লাগিল। ইহাতে বোম্বাই শহর অতি অল্প দিনের মধ্যে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিল।

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে মসলিপট্টনের নিকট অমর গাঁয়ে ইংরাজের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল, ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আট জন ইংরাজ বণিক সেই সময়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে উড়িষ্যার মোগল শাসনকর্তার পদ চুম্বন ভান ও নানা উপহারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সেখানে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। ডাঃ ব্রাউটন ১৬৩৪ খ্রীঃ দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৩৯ খ্রীঃ চন্দ্রাগিরির রাজার নিকট হইতে **মাদ্রাজ** খরিদ করিয়া সেইখানে সেন্ট জর্জ দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। ১৬৪০ খ্রীঃ হুগলীতে ১৬৪২ খ্রীঃ জলেশ্বরে ও ১৬৫৮ খ্রীঃ কাশীমবাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপন হইয়াছিল। দিল্লীর সিংহাসন ঔরঙ্গজেব কৌশলে অধিকার করিয়াছিল। সেই সময় ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের প্রাদুর্ভাব ও প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও সেই সময়ে ভারতে বাণিজ্য করিবার সনন্দ আর একদল বণিক পাইয়াছিল। ১৬৬১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া **বোম্বাই** শহর যৌতুক পাইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহা তাহার নিকট হইতে **বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায় বিলি করিয়া**

লইয়া ছিলেন। এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর **বোম্বাই মাদ্রাজ লাভ হইয়াছিল।** বোম্বাইয়ের টাকশালে কোম্পানীর মুদ্রা প্রস্তুত হইত। তাহার ওজন ঠিক ও খাদ কম থাকায় ঐ অঞ্চলের বাজারে তাহা বেশি চলিত এবং মুদ্রার উপর লোকের বিশ্বাস ও আস্থা হয়।

ছত্রপতি শিবাজী— ১৬৭০ খ্রীঃ অঙ্গিয়ার মারহাট্টা আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন সত্য বটে; কিন্তু শিবাজী ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি হঠাৎ হুবলী আক্রমণ করিয়া ধারওয়ার পর্যন্ত লুঠ করিলেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ তাহাতেই শিবাজী ইংরাজদিগকে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। হুবলী তখন ধারওয়ার বিভাগের কার্পাসের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইংরাজ সেই কার্পাস লইয়া বাণিজ্য করিত। ঐ স্থান গেলে ঐ ব্যবসা চলে না বলিয়া অঙ্গিয়ার অর্থ দিয়া সমস্ত মিটাইয়া ফেলেন। এইরূপে শিবাজী ইংরাজদিগকে হস্তগত করিয়াই ও তাহাদের নিকট হইতে উপঢৌকন ও কর লইয়া রায়গড়ে প্রকাশ্যভাবে স্বাধীন সম্রাটের ন্যায় নিজ রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইরূপে ঔরঙ্গজেবও শিবাজীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পর্তুগীজ বোম্বাটিয়াদের অত্যাচারে ও দেশের দুরবস্থায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণের বীরত্ব ও চতুরতায় ইংরাজদের নৌ সেনাবল ও সৈন্য সামন্ত পরিবর্দ্ধিত ও অবাধে স্থানে স্থানে দুর্গাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে দেওয়ায়, তাহাদের ভবিষ্যৎ রাজশক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা প্রকাশ্যভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। ইংরাজ দূত ডাক্তার ফ্রায়ার নানা কৌশলে ও বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দ্বারা শিবাজীর নিকট হইতে ঐ দেশে বাণিজ্য করিবার ও মুদ্রা প্রচলন করিবার অনুমতি লাভ করেন। এদেশে ইংরাজি ডাক্তারেরাই ইংরাজের ব্যবসার পথ পরিস্কার করিয়াছিল।

বাংলায় ১৬৭২ খ্রীঃ সায়েস্তা খাঁর আমলে তাঁহার দ্বারা এইরূপ এক আদেশ পত্র ইংরাজেরা প্রচারিত করাইয়া ছিল যে, যাহাতে ইংরাজেরা তখন অবাধে মালপত্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আমদানি রপ্তানি করিতে পারে এবং দিনেমানেরা সেইরূপ কোন কিছু করিতে পারে না। তখন অন্যান্য সওদাগর বা তন্তুবায়গণ ইংরাজদিগকে কোনও মতে ঠকাইতে না পারে সে কথারও উল্লেখ ছিল। ১৬৭৫ খ্রীঃ ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় বাণিজ্যারম্ভ ও তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিল। দিনেমারেরা বরাহনগরে শূকরমাংস লবনে জারিত করিয়া তাহা ইউরোপে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইত। প্রথম ১৬৪৮ খ্রীঃ ইংরাজ পাদরী জন ইভান্স বাংলাদেশে আসিয়াছিল ও ১৬৭৯ খ্রীঃ ইংরাজদের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ **ফ্যাকন** মেটিয়াবুরুজ হইয়া হুগলীতে গিয়াছিল। উক্ত বাংলার ইংরাজের কুঠিগুলি মাদ্রাজ কুঠির অধীন ছিল বটে কিন্তু কর্মচারীগণ যথেচ্ছাচার গুপ্ত বাণিজ্যে ও বিশ্বাসঘাতকতায় কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি করিতেছিল। কাশীমবাজারের কুঠিতে কোম্পানীর খাজাঞ্চি রঘুনাথ পোদ্দার হঠাৎ খুন হয়। উক্ত হত্যাকাণ্ডর গোলযোগ বিলাত হইতে ষ্ট্রীনসম মাস্টার আসিয়া মোগল সরকারে তের হাজার টাকা দিয়া মিটাইয়া ফেলেন। তিনি ভিন্ সেন্টকে কাজের লোক বলিয়া পদচ্যুত করেন নাই এবং কুঠিগুলি সম্বন্ধে নানা সুব্যবস্থা করিয়া যান। তাহাতে ঘরবাড়ি পাকা হইয়াছিল। তখনকার কুঠির বড় সাহেবরা পালকী ব্যবহার করিতেন, তাহা সেকালের জমিদারেরা করিতে পারিত না, পাদ্রী ও অন্যান্য কর্মচারীগণের মাথায় ছাতা ধরিবার ব্যবস্থা ছিল। ১৬৭৯ খ্রীঃ মাদ্রাজের গভর্নর হুগলীতে আসিয়া কর্মচারীগণের নৈতিক উন্নতি সাধন

করিবার জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম করিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তখন বাংলার কর্মচারীরা ঈশ্বরভজনাদি করিত না, মিথ্যা শপথ ও ব্যাভিচারাদিতে লিপ্ত থাকিত। তাহারা রাত্রে গৃহে থাকিত না, তাহাদের অন্যান্য দোষও যথেষ্ট ছিল।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা নূতন ফরমান পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাতে তাঁহাদের বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। ইংরাজদিগের হুগলীতে বাণিজ্য করিবার বড় সুবিধা হইল না। শেষে জব চার্ণকের সহিত মোগল কর্মচারীদের বিলক্ষণ ঝগড়া বাধিয়া উঠিল, এমন কি, দুই পক্ষে ছোট খাট যুদ্ধ হইয়াছিল। জলযুদ্ধে ইংরাজেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল; কিন্তু স্থলযুদ্ধে নিস্তার নাই ভাবিয়া জব চার্ণক সুতানুটি ও কলিকাতাতে উপস্থিত হন। উহা তখন যেমন মহাজঙ্গলময়, তেমনি গঙ্গার মোহনার অতি সন্নিকট ও নদীর জল গভীর থাকায় সেখানে অনায়াসে বড় বড় রণতরী বা ব্যবসায়ী জাহাজ থাকিতে পারিত। আরও ঐরূপ স্থানে সম্রাটের কর্মচারীদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করাও সহজসাধ্য বোধহয়। এতদ্ভিন্ন সেখানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিলে নদীর পথ তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকিবে। সে সময় কলিকাতায় মল্লিকেরা থাকিতেন না; তাঁহারা তখন ব্যবসার জন্য যাতায়াত করিতেন মাত্র। জব চার্ণক সেই মল্লিকদের পূর্বপুরুষের পরামর্শে সুতানুটি ও কলিকাতায় আসিয়াছিল ও শেষে তাহারাও সেইখানে কুঠি করে। সেই মল্লিক বংশের পূর্বপুরুষ রাজারামের সহিত ইংরাজদের ব্যবসার সম্বন্ধ ছিল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরাজগণের নিকট হইতে সম্রাটের পুরাতন সনন্দ তলব করেন। ইংরাজেরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা নূতন বন্দোবস্ত করিবার জন্য নবাবের সেরেস্তায় সেই রাজাবাম মল্লিককে পাঠান। তিনি পারসী ও উর্দু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অবস্থাভিজ্ঞ ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। এদেশে ব্যবসার সুবিধার বিষয় বিজ্ঞ ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্যে তাহা করিতে পারিবে না বলিয়াই রাজারামকে চারিশত টাকা পাথেয় ও দেওয়ানের খাস কর্মচারীর জন্য কতকগুলি উপঢৌকনাদি দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা রাজারামকে এই গুরুতর কর্মের ভার দিয়া ভাল করিয়াছিল। নবারের অর্থলোলুপ কর্মচারীরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবার পাত্র ছিলেন না, সেইজন্য রাজারাম তাঁহাদের দাবীর টাকা দেওয়া সম্বন্ধে ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। শেষে যখন হঠাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ আসিয়া পৌছিল, তখন আর কিছুই দিতে হইল না, চারিদিকে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রাজারামের দেহান্ত হইল কিন্তু নবারের কর্মচারীরা রাজারামের চতুরতায় অসন্তুষ্ট হয়। শেষে তাহার বংশধর দর্পনারায়ণের উপর উক্ত কর্মচারীরা কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে সেইজন্য তখন কলিকাতায় দর্পনারায়ণ সগোষ্ঠী বড়বাজারে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। ভবিষ্যতে ইংরাজদের সংশ্রবে থাকিলে মুসলমান কর্মচারীদের বিষনজরে পড়িতে হইবে ভাবিয়া দর্পনারায়ণ ইংরাজদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজের সওদাগরী ব্যবসায় কলিকাতায় অনেক উন্নতি করেন।

জব চার্ণক— জব চার্ণক ঘটনার স্রোতে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে সেই সময়ের ঘটনাবলির ও জব চার্ণকের কার্যের সহিত কলিকাতার প্রতিষ্ঠার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, দেখা যায়। কলিকাতায় শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের এদেশী সিপাহী রাখিতে হইয়াছিল। সেই অজ্ঞ সিপাহীরা কামানের গোলার বল

জানিত না, তাহারা কখনও ভাবে নাই যে, এই কামানের গোলার ভয়ে কলিকাতার অধিবাসীরা বিদ্রোহীগণের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। যখন পরিণামে তাহাই হইল, তখন তাহারা পরম হিন্দু বলিয়া উহা মা কালীর মায়া ও দয়া ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়া স্থির করে। উৎসাহিত হইয়া "ব্যোম কালী কল্‌কত্তাওয়ালী, তেরা নাম না যায় খালি" এই ভৈরব রণ রবে সর্বদাই আস্ফালন করিত। সেই কথা নির্দিষ্ট সময়ে তোপের আওয়াজে কলিকাতার লোক আজও তাহা বলিয়া থাকে। মুসলমান রাজকর্মচারিগণের নিকট ইংরাজেরা জব চার্ণকের কার্যকলাপে ছেলেদের জুজুর মত হইয়াছিল। কারণ তাহারা ইংরাজের নিকট বেশ নাকাল হইয়াছিল—তাহাদিগকে জব চার্ণকই অনেক বার শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন সেই সব ঘটনা সংক্ষেপ করিলে চার্ণকের কার্যকুশলতার পরিচয়, বা কোন ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যাইবে। পলাশী যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্বে জর্ব চার্ণক কাশীমবাজারের কুঠিতে ২০ পাউণ্ড বেতনে চাকরী করিতেন ও পাটনা ফ্যাক্টরীতে ষোল বৎসর অধ্যক্ষ হইয়া কার্য করিতেন। সেই সময়ে অনেক ইংরাজই এ দেশের নিয়মানুসারে ঢিলা পায়জামা ও পোষাকাদি পরিতেন ও ক্রমে ক্রমে এদেশের লোকের রীতি নীতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেন, এমনকি, এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। জব চার্ণকেরও তাহাই হইয়াছিল। পাটনায় এক সতীদাহে তিনি এক ষোড়শী হিন্দু রমণীর প্রণয়ের ও অনুরাগের পরাকাষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে সিপাইয়ের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাহার গর্ভস্থ কন্যাগুলিকে সৎপাত্রস্থ করিয়াছিলেন। আয়ার, বৌরিজ প্রমুখ উচ্চ পদস্থ কোম্পানীর কর্মচারীগণের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। উহাতেই জব চার্ণকের কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। উইলিয়ম হেজস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার প্রধান অধ্যক্ষ গভর্নর ছিলেন ও তাঁহার অধীনে সাত জনের এক মন্ত্রীসভা ছিল। জব চার্ণক ঐ সভার সভ্য ছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা বাদশাহী ছাড় ও নিশান অর্থ লাভ-লালসায় অপব্যবহার করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি করিত। উক্ত হেজেস তাহা দমন করিবার জন্য নেলারকে নজরবন্দী, এলিস্‌কে কর্মচ্যুত ও ওয়াটসনকে অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই জব চার্ণকের অনুগত ছিল। হেজেসের পদচ্যুতির পূর্বেই জব চার্ণক পদচ্যুতির কথা বলিতেন। হেজেসের মত শক্তিমান কার্যক্ষম পুরুষ জব চার্ণকের আক্রমণে ও কথায় পদচ্যুত হইয়াছিল। বেয়ার্ড সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে হুগলীতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। শেষে ১৬৮৫ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে সেই পদে জব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোগল রাজকর্মচারিগণের চক্রান্তে এদেশের মহাজনেরা চার্ণকের নামে টাকা পাওনার নালিশ করিয়া ও তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ নজরবন্দীরূপে কাশিমবাজারে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৬৮৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে চার্ণক হুগলীতে পলাইয়া গিয়াছিল। সেখানে একটা সামান্য ঘটনা হইতে আগুণ জ্বলিয়া উঠে, মোগল সৈন্যগণ হুগলী ঘিরিয়া ফেলিল। চার্ণক ৪০০শ সৈন্য লইয়া দুই তিন হাজার মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব ভাবিয়া, কাপ্তেন আর বথনটের অসীম সাহস ও রণকৌশলে এবং নিজের ভগবদত্ত বুদ্ধি ও বীরত্বে কোনক্রমে নদীপথে মোগল সৈন্য বিধ্বংস্ত করিয়া সুতানুটিতে আসিয়াউপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে

ইংরাজেরা মালদহে রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। কেহ বলে, চার্ণক তলোয়ার দিয়া লোহার শিকল কাটিয়াছিল, কেহ বলিত আতুষী কাচ সূর্যরশ্মিতে ধরাইয়া হুগলী পোড়াইয়া দিয়াছিল; নানা গল্পই উঠিয়াছিল। উহাতে লোকে ইংরাজেরা যে বীরপুরুষ ও আত্মরক্ষা করিতে পারে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। জব চার্ণকের সুতানটিতে আশ্রয় লইবার মূল কারণ কোনরূপে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। মোগলের হাতে নির্মুল বা অপদস্থ হওয়া অপেক্ষা রোগে কষ্টে দু-দশ জনের মরা ভাল, এই ভাবিয়া যেখানে আর মোগল সেনা তাহাকে নাকাল করিতে বা ধরিতে পারিবে না, সেইখানে আশ্রয় লওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতা ও সুতানটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জলে কুমীর ও ডাঙায় সাপ ও বাঘ; নদীর জল গভীর ও নদীর বাঁকও বেশ সুবিধাজনক ছিল। তাহার উপর আবার আদিগঙ্গা জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। জোয়ারের জলে ঐ বাদা জায়গা ডুবিয়া যাইত, জঙ্গলের মধ্যে খাল বিলও বেশ ছিল, আর হোগলা বনেরও অভাব ছিল না। তখন তাহারা এমন আত্মরক্ষার স্থান আর কোথায় পাইবে? আরও তখন এই কলিকাতার সম্বন্ধে একটি হিন্দি কথা চলিত ছিল, যাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের সিপাহীগণ ঘরে বসিয়া মৌহা খাইবে, তথাপি পেটের জন্য কলিকাতায় আসিবে না। "দাদ হোয় খাজ হোয়, আর হোয় হৌ হা, কলকাত্তা নাহি যাও, বিন খাও মৌহা।" সেইজন্যই তখন জব চার্ণক সুতানটিতে আশ্রয় লইয়াছিল। চতুর নবাব সায়েস্তা খাঁ এই গোলযোগ মিটাইবার জন্য ভরমল নামক একজন বিশ্বস্ত মোগল কর্মচারীকে সুতানটিতে পাঠাইয়াছিলেন।

জর্ব চার্ণক ভরমলকে ইংরাজ হিতৈষী জানিয়া তাহার হাতে সন্ধিপত্র পাঠাইয়াছিলেন, ও তাহা যে অস্বাক্ষরিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে সায়েস্তা খাঁর এই দুরভিসন্ধিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া এখনকার যেখানে মেটেবুরুজ নিমক মহল ঘাট রোড আছে, তখন সেইখানে বাদশাহী নিমক মহলের ঘর ছিল, তাহা পোড়াইয়া থানা দুর্গ অধিকার করিয়াছিল ও কাপ্তেন নিকলসনকে হিজলী অধিকার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। যাহা দীনেমার ওলন্দাজ ফরাসি বণিকগণের মধ্যে কেহ করিতে সাহস করেন নাই, তাহাই জব চার্ণক করিয়া ফেলিলেন। হিজলী, সুতানটি বা কলিকাতা অপেক্ষা আরও অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। চলিত কথায় বলিত : — "একবার খেলে হিজলী পানি, যমে মানুষে টানাটানি।" এই ভাবিয়া বা হুগলীর কথা স্মরণ করিয়া হিজলীর সেনাপতি মালিক কাসেম বিনা যুদ্ধে মোগলের কামান রসদ ছাড়িয়া অপর পারে রসুলপুরে পলাইয়া যান। তাহাতেই নিকলসন সহজে হিজলী দখল করিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত ও মোগলের সেখানে একটি দুর্গ ছিল। উহার চারিদিক ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা সুরক্ষিত। মোগল রাজত্বে লবণের কর বড়ই লাভজনক ছিল। চার্ণক সেখানে গিয়া অগাধ শস্য, গৃহপালিত পশু ও কামান বারুদ লইয়া সেই জনপূর্ণ দ্বীপে বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে বালশ্বেরের মোগলদিগের দুর্গ ও তোপখানা দখল করিয়া ফেলিলেন ও দুই দিন ধরিয়া লুঠ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। জব চার্ণকের এ রাজত্ব বেশি দিন চলে নাই। মালিক কাসেম যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইয়াছিল। সেখানে এপ্রিল মাসে মড়ক দেখা দিয়াছিল, কুলি-মজুর লোকজন পলাইয়া যায় ও ইংরাজের প্রায় দুই শত সেনা রোগে ধরাশায়ী ও রসদ পাওয়া দুর্লভ হইল। শেষে অভাব ও রোগের দুঃখে দুঃসাহসিক চার্ণক ১৫০০০ হাজার মণ চাউল ও কামানাদি দখল করিয়া লইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সেখানে

আব্দুল সামেদকে বার হাজার ফৌজ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই বার চার্ণকের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইতে হইল ও ইংরাজদিগের বাণিজ্য জাহাজগুলি সমুদ্রে জিনিষপত্র লইয়া পলাইয়া গেল। এমন সময়েও চার্ণকের বুদ্ধি লোপ হয় নাই। তিনি দুইটি কামানের সাহায্যে নদীর ধারে পলায়নের বা সাহায্যের পথ পরিস্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে কাপ্তেন ডেন্‌হাম জাহাজে বিলাতী সত্তর জন মাত্র লোক লইয়া তাঁহার সাহায্যে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার কিছু উপকার হইল বটে; কিন্তু জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ভগবান সহায় হইলে বুদ্ধি যোগায়, চার্ণকের তাহাই হইয়াছিল। তিনি মোগল সেনাগণকে ভীত করিবার জন্য ক্রমাগত ঐ সকল লোককে গীতবাদ্য সহ জয়সূচক উল্লাসে গন্তব্যপথে যাতায়াত করাইতে লাগিলেন। এই খেলায় মোগলেরা প্রতারিত হইয়া ভাবিয়াছিল, না জানি বিলাত হইতে কত সৈন্যই না আসিয়াছে। সেই সুযোগে চার্ণক সন্ধির প্রস্তাব করাইয়া পাঠাইলেন। উহাতে আবদুল সামেদ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁর মঞ্জুরের জন্য ঢাকায় সন্ধিপত্র পাঠাইয়াছিলেন। তিন মাসের মধ্যে কোনও উত্তরই আসিল না দেখিয়া, চার্ণক উলুবেড়িয়ায় গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে বাংলায় বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানির বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। যখন ১৬ই আগষ্ট তারিখে নবাবের প্রত্যুত্তরে সুফল হইল না, তখন পুনরায় হুগলীতে বাণিজ্য করা অপেক্ষা সুতানটিতে করাই ভাল স্থির করিয়া জব চার্ণক সেখানে গিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টরগণের অভিমতে চট্টগ্রাম দখল করেন নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কাপ্তেন হিথরকে বিলাত হইতে তাঁহার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি কোনরূপ বড় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। চার্ণক হিথের মারফত পত্র পাইয়া বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। ভগবদত্ত প্রতিভায় তিনি ভবিষ্যত দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ইংরাজের সুতানটিতে বাণিজ্য করিলেই ভাল হইবে। হিথ্‌কে ইহার রহস্য বুঝাইবার প্রয়াস যখন ব্যর্থ হইল, তখন চার্ণক অগত্যা মান্দ্রাজে ফিরিয়া গিয়াছিল। শেষে নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে সুতানটিতে আসিয়া তিনি আপনার কথা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাই বিদেশী ইংরাজ বণিকগণকে স্রোতে ভাসাইয়া মা কালীর আশ্রয়ে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহারা মায়ের দয়ায় সসাগরা ধরার অধিপতি হইয়া রাজত্ব করিতেছেন। এইখানে ইংরাজ জাতির আগমন ও ব্যবসাদির অভ্যুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত সেই সময়ে দেশের অবস্থার কথা না বলিলে, কেমন করিয়া বন্যজন্তু পরিপূর্ণ, বন জঙ্গল ভীষণ অস্বাস্থ্যকর স্থান, ধীবর কৃষকের কলিকাতা পৃথিবীর এক প্রধান মহানগরীতে পরিণত হইয়াছিল জানা যায় না। ১৬৮৭ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট জব চার্ণকের সহিত সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর সন্ধি হয়। তদনুসারে উক্ত চার্ণক সাহেব উলুবেড়িয়াতে ডক্ আদি করিয়া জাহাজ মেরামত আরম্ভ করে। সেখানে তিন-চার মাস থাকিয়া জায়গাটি মনোমত না হওয়ায় সুতানটিতে আসিয়াছিলেন। সেই ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ডাইরী ও মন্ত্রী-সভার বই বিলাতে বর্তমান আছে। শায়েস্তা খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ বাংলার সর্বেসর্বা হইয়া পড়িলেন। সেই ইব্রাহিম খাঁর অনুরোধেই সুতানটিতে চার্ণক সাহেব আসিয়াছিলেন। সে অনুরোধের উদ্দেশ্য ও অর্থ ছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের ইংরাজের উপর শুভদৃষ্টি ছিল না। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, ইংরাজের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজত্বের আয়ের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে ও তাহাদের রণতরী সকল আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছিল, তাহার ক্ষতিও করিতে পারে, তখন তিনি চতুরতা

করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। চার্ণক সাহেবও সুতানটিতে আসিয়া ঘর দরজার অভাবে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। প্রথম অধিবেশনে কাউন্সিলের মন্তব্যে প্রকাশ হয় যে, যে সমস্ত ঘর-বাড়ি ছিল তাহা নাই; পুনরায় তাহা করিতে হইবে। একটি গুদাম, রান্নাঘর, থাকিবার ঘর, প্রহরীর ঘর ও এলিস সাহেবের থাকিবার ঘর শীঘ্রই প্রয়োজন; এজেন্ট মিঃ পিচির ঘর মেরামত করিয়া লইলেই চলিবে। যে পর্যন্ত না স্থায়ীভাবে ফ্যাক্টরীর অনুমতি পাওয়া যায়, সে পর্যন্ত চারিদিকে মাটির ঘর ও চালাঘর করিয়া চালাইতে হইবে। এদিকে ঔরঙ্গজেবের ইঙ্গিতানুসারে তাঁহার মন্ত্রী বোম্বাইয়ের গভর্ণর সার জন চাইল্ড-এর প্রেরিত কমিশনারদ্বয়ের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিয়াছিলেন ও ১৬৯০ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রিল নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরাজকে বাংলায় পুনরায় ব্যবসা করিবার জন্য সনদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৬৯০ খ্রীঃ ২৪শে আগষ্ট চার্ণক সাহেব ও কাপ্তেন ব্রুক ৩০ জন মাত্র সৈনিক সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। উহার বিবরণ এইরূপ আছে—সুতানটিতে বৈকালে আসিলাম। অবস্থা অতি শোচনীয়, অনবরত বৃষ্টি, অথচ উপযুক্ত আশ্রয়ের স্থান কিছুই নাই; আমাদের পরিত্যক্ত চালাগুলি নাই। তাহা ব্যারাকদার মল্লিক দেশীয় লোকেরা জ্বালাইয়া দিক বা লইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় স্বাস্থ্যের অনুরোধে বোটের উপর থাকা ভিন্ন উপায় নাই, বড়ই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, মল্লিকেরা ইংরাজের সহিত বাণিজ্য করিত ও তাহাদের জিম্মায় ইংরাজেরা ব্যারাক ঘর রাখিয়া চলিয়া যাইত। মল্লিকেরা তখন কলিকাতায় বসবাস করিত না। সুতরাং তাহারা ঐ ঘর সকল রক্ষা করিতে পারিত না। যাহারই উপর তাহা রক্ষা করিবার ভার দিত, তাহারা তাহা পোড়াইয়া ফেলিত বা তুলিয়া লইয়া যাইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজা রাম মল্লিক হুগলী হইতে ফারমান আনিয়া বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইংরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই কথা এই রেকর্ডে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই মল্লিকদের পূর্বে সপ্তগ্রামে বসবাস করিত, কিন্তু সেখান হইতে যখন নদীর জলাভাবে ও দস্যু উৎপীড়নে বাণিজ্য আদি চলা সম্ভব হইয়া পড়ে ও নবাবী দপ্তর সম্রাটের আদেশে হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়, তখনই তাঁহারা ত্রিবেণীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অপর পারে কাঁচড়াপাড়ায় বাগের খাল দিয়া পূর্ববঙ্গের ব্যবসাদি তখন চলিত, সেখানে মল্লিকদের ব্যবসা ছিল ও উহার উন্নতির জন্য ঐ খাল মল্লিকেরাই কাটাইয়া বিস্তার করাইয়া দিয়াছিলেন, শুনা যায়। মল্লিকেরা যে কেবল ব্যবসার খাতিরে ত্রিবেণী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, সে সময় চারিদিকে গোলযোগ ও বিদ্রোহ চলিতেছিল।

কৃষ্ণকুমারী— রহিম খাঁ ও শোভাসিংহের অত্যাচারে দেশ ঘর ফেলিয়া যাহার যে দিকে ইচ্ছা সে সেই দিকে পলাইতেছিল। বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায় পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার কন্যা কৃষ্ণকুমারী নরপিশাচ শোভা সিংহের রক্তে পিতৃতর্পণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। যে শোভাসিংহের ভয়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁর প্রেরিত নুরউল্লা খাঁ হুগলীতে পলায়ন করিয়াছিল, শেষে সেই দুর্বৃত্তের মৃত্যু এক হিন্দু রমণীর হস্তে হইয়াছিল। ইহাই ভগবানের লীলা! রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াই সেই দুর্বৃত্ত যমালয়ে গমন করিয়াছিল। সত্য সত্যই সেই সময়ে বাংলায় শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সত্যযুগে যে উপায়ে শক্তির আবির্ভাবে দুর্বৃত্ত অসুরগণের নাশ হইয়াছিল; ঘোর কলিতেও তাহারই পুনরাভিনয় হইয়াছিল। বোধহয়, সেই পুণ্যেই বর্ধমানের জমিদার রাজবংশে পরিণত হইয়াছিল। ঐ ঘটনা হইতে নাটকাদি লিখিত হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম— সেই সকল বিদ্রোহিরা বর্ধমান হইতে রাজমহল পর্যন্ত দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। হুগলীর ফৌজদার * থানা দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও বিদ্রোহীগণ তাহাদের দুইখানি রণতরী দেখিয়া ভয় পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজ বণিকগণ অনেক দেশী সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন নবাবের অনুমত্যানুসারে দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই বিদ্রোহ কলিকাতার ও ইংরাজ বণিকের ভাগ্যলক্ষ্মী উভয়ের প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে ইংরাজের দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করা কখনই সম্ভবপর হইত না। নবাবের কর্মচারিগণ ইংরাজ বণিকগণকে সে সময়ে শত্রু করা যুক্তিসঙ্গত মনে করে নাই, বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মিত্রভাবেই তখন সাহায্য চাহিয়াছিল। উহাতে কলিকাতার উন্নতি হইয়াছিল ও উহাতেই শান্তিপ্রিয় বাঙালী ও নানা জাতি অস্বাস্থ্যকর কলিকাতায় গিয়া বাস করে। উহার মূল কারণ যে, সকলেই বিদ্রোহীর দারুণ অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচিতে চাহিয়াছিল। ইহাই ঘোরকলির কথা— **তখন দেশের লোকের উপর দেশের লোকের সহানুভূতি ছিল না, দেশের লোকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিদেশী বণিকগণের সাহায্য ও শরণাপন্ন হইতে হইত।** এমনকি তখন এদেশের মুসলমান শাসনকর্তারা যে আপনাকে ও প্রজাবর্গকে বিদ্রোহীগণের হাত হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ একথা কাহারও বুঝিবার জন্য কষ্ট করিতে হয় নাই। সেইজন্যই মুসলমান শাসনকর্তারা তখন বিদেশী বণিকগণকে দুর্গাদি নির্মাণ করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন জমি জায়গা হস্তান্তর বা দুর্গাদি নির্মাণ করিতে পারিত না। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্যই মুসলমান নবাবের কর্মচারীরা ইংরাজ, ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণকে তাহাদের কুঠি ও ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য দুর্গাদি নির্মাণ ও রণতরী আদি সুসজ্জিত রাখিতে বলেন। তাহাতেই বণিকবৃন্দের ঐ সকলের উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় ও তাহারা যে দেশের রাজা অপেক্ষা বলবান তাহাও তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায়। সেই জন্যই দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঐ সকল বণিকগণের সহিত বন্ধুতা ও তাহাদের নিকট স্ব স্ব অস্থাবর সম্পত্তি আদি রাখিতে আরম্ভ করে। বিদেশী বণিকগণেরা এ দেশে দুর্গ নির্মাণ করিয়া যেমন আত্মরক্ষার উপায় করিয়াছিল, তেমনি তাহারা অলক্ষিতভাবে এদেশের লোকেদের মূল্যবাণ সম্পত্তি রক্ষা ও বিপদাপদে ত্রাণকর্তা হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতার বর্তমান দুর্গ সে সময়ে হয় নাই, উহা পলাশীর যুদ্ধের পর হইয়াছিল। সেই পুরাতন লুপ্ত দুর্গ বর্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিস ও তাহার সন্নিকটস্থ গঙ্গার তটে ছিল। লর্ড কার্জন বহু অনুসন্ধান করিয়া স্মৃতিফলক ও পিত্তল নির্মিত রেখা দ্বারা সেই দুর্গের স্থান চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই দুর্গ পূর্ব-পশ্চিমে ৭১০ ফিট্, উত্তরে ৩৪০ ফিট্ ও দক্ষিণে ৪৮৫ ফিট্ লম্বা ছিল। চার কোণে বুরুজের উপর দশটি কামান ও পূর্বের প্রধান প্রবেশ দ্বারে ৫টি কামান সজ্জিত করা হইয়াছিল। গঙ্গার ধারে বাঁধান ঘাট ও সেখানে কোম্পানীর নিশান উড়িত। উত্তরে বারুদখানা ছিল ও দক্ষিণে মালপত্র থাকিত। সেই দুর্গের মধ্যে কোম্পানীর কর্মকর্তা গভর্নরের আবাসগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। সে সকল এখন আর কিছুই নাই। কেবল সেই পুরাতন নাম "ফোর্ট উইলিয়ম" আছে, উহা বর্তমান কলিকাতা হইকোর্টের এলাকার

* বর্তমান শিবপুরের রয়েল বোটানিকাল গার্ডেনের ভিতর থানা দুর্গ ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম পুরাতন

সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই সময় হইতে ইংলণ্ডের রাজার সহিত এ দেশের যে সম্বন্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত ও স্থায়ী হয়। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্গ নির্মাণ করিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ও সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের সেই ভ্রান্তবিশ্বাস সিরাজউদ্দৌলা কার্যত প্রমাণ করিলে বর্তমান দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সেই পুরাতন দুর্গ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে দূরীকৃত করা হয় ও তাহার চতুর্দিকে চার ফিট মোটা ও আঠার ফিট উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত করা হইয়াছিল। সেকালের যাবতীয় কোম্পানীর ঘোষণা পত্রাদি সেই দুর্গদ্বারে দেওয়া হইত। সার জন গোল্ডসবরাই পুরাতন কলিকাতা দুর্গের স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন ও উহা তখন ভাগিরথীর তীরে সর্বোচ্চ স্থান ছিল।

নাম পত্তন— ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব সেরেস্তাব চিঠিপত্রে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সুতানটির নামই ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে কলিকাতার নাম পত্তন হয়। সেই নাম পত্তনের মধ্যে রহস্য আছে। কলম্বাস যেমন ভারতবর্ষে আসিবার পথ বাহির করিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলে, তেমনি ইংরাজ বণিকগণ কালিকটে বাণিজ্যকুঠি করিতে না পারিয়া যে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল তাহার সুদের সুদ ও আসল কলিকাতার নাম পত্তন করিয়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতায় আসিবার অনেক পূর্বেই আরমানি বণিকেরা কলিকাতায় সুতা ও নটীর ব্যবসা করিত। জব চার্ণক প্রাণের ভয়ে কলিকাতায় থাকিতেন না, বারাকপুরেই থাকিতেন। বর্তমান শিয়ালদহ স্টেশনের মধ্যে একস্থানে পূর্বে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল; উহারই তলায় বসিয়া জব চার্ণক ব্যবসায়ীগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন ও আহার বিহারাদি করিতেন। সেই হইতে ঐ জায়গার বৈঠকখানা নাম হইয়াছিল ও উহার নিকট বহুবাজার নামেরও বোধহয় কোন সার্থকতা থাকিবে। কেননা ফিরিঙ্গি টোলা উহারই নিকট ও তাহাদের কালী বহুবাজারেই প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতার নামের রহস্যভেদ করা জব চার্ণকের ভাগ্যে হয় নাই। কারণ তিনি ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় সমাধিস্থ হন। তাঁহার জামাতা সার চার্লস আয়ারের সময়েই কলিকাতার নাম পত্তন হইয়াছিল। উহার গূঢ় রহস্য এই যে, কালিকট ও কলিকাতার নামের সৌসাদৃশ্য ছিল। কালিকটেই পর্তুগীজেরা প্রথমে ভারতের সহিত বাণিজ্যারম্ভ করে, সেইজন্য সেইখানের দ্রব্য সুদূর ইউরোপাদির বাজারে ভারতের দ্রব্য বলিয়া বিখ্যাত হয়। সেইজন্য সেখানের দ্রব্যের নাম-ডাক যথেষ্ট ছিল। ব্যবসায়ীর নিকট তাহার মূল্য বড়ই অধিক। * আরমানি বণিকেরা তাহাদের দ্রব্যাদি কলিকাতার নাম কালিকটরূপে ব্যবহৃত করিয়া চালান দিয়া বিশেষ লাভ করিত। চতুর ইংরাজ বণিকগণ যখন তাহা জানিতে পারে তখনই তাহা করিতে আরম্ভ করে। কলিকাতার মাল কালিকটের বলিয়া চালান হইত। + সেইজন্যই সুতানটির স্থলে কলিকাতার নাম পত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। ঐরূপ

* Abbo Guyon's writings in 1774.

+ (Letter to court January 10. para 78 A D 1758.)--274 Long's Records. "We have the pleasure to inform your Honors that the word 'Alinagore' is by our present sunnud, to be omitted in the impression on our sides, an indulgence we could not obtain from Serajadowla"

ব্যবসা চালাইবার জন্যই শত সহস্র ইংরাজ বণিক বিনষ্ট হইয়াছিল ও উহার নাম গোলগথা * হইয়াছিল। এই ব্যবসার মূলোৎপাটন করিবার জন্যই সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার নাম 'আলিনগর' পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই কোম্পানীর সর্বনাশ হইয়াছিল। মীরজাফরের সহিত পলাশী যুদ্ধের পূর্বে যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল তাহার সর্তের মধ্যে কলিকাতার নাম বাহাল করা প্রধান ছিল। কোম্পানীর + সেরেস্তার কাগজে এসম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ ও সন্ধান লক্ষ্য করা যায়। আরও দেখা যায় যে লিসবন নগর ভারতীয় যাবতীয় দ্রব্যের আমদানির কেন্দ্র ছিল। লিসবন নগরের ভূমিকম্পে কোম্পানীর মাল বিক্রয় বন্ধ হইয়াছিল। ++ পরবর্ত্তীকালে এই জাল জুয়াচুরীব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে পর্তুগীজের কনসল জেনারেলের ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞাপন যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে উহার আভাস পরিষ্কার আছে ও উহা নিম্নে দেওয়া গেল।

Portuguese Consulate Office, London,
February 1st. 1825

Sir.

I beg leave to apprise you for the information of merchants and others concerned in the trade with Portugal that His most faithful Majesty in order to put a stop to the smuggling of colonial and Asiatic produce which has been carrying on lately by coasters and other small vessels in the port of his dominions by his Royal decree under date of the 3rd of January 1825 has been pleased to order as follows :--[1] The law prohibiting the importation of Asiatic goods and colonial produce not coming direct in portuguese vessels to put in full virgour. [2] The entry of such goods and produce is prohibited in Pertuguese vessels of less than 80 tons burden [3] The regulation of the first article is to be understood only with regard to the house consumption as foreign vessels of more than 80 tons burden loaded with such goods either from Portuguese or foreign dominions may tranship deposit and re-export the same [4] The regulation of the second article in general and any portuguese vessel of less than 80 tons burden that may enter any port in portugal or may be found at any distance of three leagues with such goods will be confiscated together with the cargo and the same in regard to foreign vessels of less than 80 tons that may be made at the same distance if they should not be able to prove by authentic documents that their destination is to another country and that stress of

* Hunter's Imperial Gazetter & Calcutta Review, Vol. XVIII.

+ The Mussulmans like the American were fond of droppin the indigenous names of places and using their own, though (as appears by the Ain Akberi), the name of Calcutta was known long before the English came yet they would not use it

++ 182 Long's Records "The Lisbon Earthquake postpones the Company's sales "

weather forces them to approach the coast of the Portuguese dominions. These regulations are to be put in force in 6 weeks after their publication in regard to Portuguese vessels and in 3 months to foreign.----F. I. Sampayo. Consul General.

আরও দেখা যায় যে, বয়নামা বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর আদি গ্রামগুলি জমিদারের নিকট ক্রয় করিয়াছিল। তাহাতে * যে বানান ব্যবহৃত হইয়াছে সে বর্তমান ইংরাজি বানানে পূর্ব হইতেই পরিবর্তিত হইয়াছিল। বর্তমান Calcutta নাম পুরাকালের কালিকটের প্রতিলিপি মাত্র বলিলেও বলা যায়। ইহা না হইলে সেকালের ঘোর অস্বাস্থ্যকর কলিকাতায় অজস্র লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় করিয়া বিলাতের কর্তাদের অনভিমতে ব্যবসা চালানর মূল উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? ক্লাইবকেও কলিকাতার অস্বাস্থ্যকরতার কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। তখন ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে উহা যে কিরূপ ভয়ানক ছিল তাহা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে। কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন কলিকাতার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে গঙ্গার উপর এমন অস্বাস্থ্যকর স্থান আর নির্দিষ্ট হইতে পারে না। তিনি ১৬৮৮ হইতে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। + হ্যামিলটন সাহেব বলেন ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ১২০০ ইংরাজের মধ্যে কলিকাতার ৪৬০ জনকে গোর দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতা লাভ করিয়া তাহার আয়ব্যয়ের হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাভ কিছুই ছিল না। তবে উহা লাভ করিয়া উহার জন্য এত স্বদেশবাসী ও অর্থ উৎসর্গ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবার অবশ্যই কোন না কোন গূঢ় উদ্দ্যেশ্য ছিল। তখন এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব স্থাপনের কথা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। ব্যবসায়ই তাহাদের লক্ষ্য ও ধ্যান ছিল। তাহাতেই অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণের যৎপরোনাস্তি প্রতিযোগিতা এবং সম্রাট ও তৎকর্মচারিগণের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ঔরঙ্গজেবের ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের হুকুমনামায় তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতেই সমুদ্রপথে জলদস্যুদের হাত হইতে মুসলমানগণের জাহাজাদি যাহাতে লুণ্ঠিত না হয়, তাহার জন্য ইংরাজ বণিকেরা অঙ্গীকার বদ্ধ ছিল ও সেইজন্যই তাহাদের সমাদর হইয়াছিল। বাংলায় তখন দুইজন প্রভু, একজন সুবাদার সুলতান আজিম উশ্বান, আর একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেওয়ান নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। কূটনীতিপরায়ণ ঔরঙ্গজেব বাংলার রাজস্ব হ্রাস হইতেছে দেখিয়া সুবেদারের কর্তৃত্ব হইতে রাজস্ব বিভাগ স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলেন। দেওয়ান সুবেদারের অধীনস্থ কর্মচারী হইলেও দেওয়ানের উপর কোনরূপ আদেশ চালাইতে পারিতেন না। তাহাদের উভয়ের মধ্যেও সদ্ভাব ছিল না। তাহাতেই মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কার্য মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে হইত। আর পাটনায় আজিম উশ্বান সুবেদারি করিতে লাগিলেন। তাহাতেই মুখসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ ও পাটনার নাম আজিমাবাদ হইয়াছিল। কোম্পানীর সেরেস্তার নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান নবাব বাদশাহের দপ্তরেও তাহা হইয়াছিল। এমন বিরোধ বিসম্বাদের সময় কলিকাতার কুঠি রণতরী দুর্গাদি দ্বারা দৃঢ়কৃত করিবার সেই গূঢ় উদ্দেশ্য ভিন্ন হয় নাই। আরও মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরাজ বণিকদিগের বন্ধু ছিলেন না, পরম শত্রু বলিলেও বলা যায়। তাঁহার অধীনে ও দুই প্রভুর কর্তত্বে কলিকাতার কুঠি ও দুর্গাদির

* Kalikata (vide British Museum additional Mss. No 24039)
+ Rev Long's "peeps into Social life"

জন্য অর্থবায় ও লোকক্ষয় করা বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত হয় নাই। কারণ কলিকাতায় কুঠি খুলিবার পূর্বেও ইংরাজ বণিকদের অন্যান্য স্থানে কুঠি ছিল ও মুর্শিদাবাদের কুঠি তখন বাংলার প্রধান বলিলেও বলা যায়। ইউরোপের বণিকগণ মুর্শিদকুলী খাঁর কামধেনু ছিল, তাহাতেই তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট পৌত্র আজিম উশ্বান অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়াছিলেন। পৌত্রও সেইজন্য বোধহয় মুর্শিদকুলী খাঁর দূরে থাকিতেন। ঔরঙ্গজেব পুত্র পৌত্রদিগকে বিশ্বাস করিতেন না ও তাহাদিগকে নিকটে রাখিতেন না। তাহাতেই মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল। তাহারই জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ প্রমুখ প্রিয়পাত্র কর্মচারীরা সর্বেসর্বা হইয়া পড়ে। এই সকল নানা কারণে তখন বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যাদির সুবিধা বড় বিশেষ ছিল না। আরও সেকালের নবাবের বেগমেরা পর্যন্ত ইউরোপের বণিকগণের ব্যবসার প্রতিযোগিতা করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিরাজউদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগম সেইরূপ করিতেন ও তাহাতেই সিরাজউদ্দৌলা কোম্পানীর কলিকাতায় ব্যবসা করিবার গূঢ়সন্ধিতে বাণ নিক্ষেপ করিয়া **পলাশীর যুদ্ধাদির অবতারণা করেন।** * সেইজন্যই কোম্পানীর সেরেস্তায় সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার নাম পরিবর্তন করিবে না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনেই কলিকাতার নাম বজায় ও আলিনগর আলিপুরে পরিণত হইয়াছিল। কলিকাতার নামের রহস্যের মধ্যে কালিকটের নামের সুনামের (Goodwill) সম্বন্ধ বর্তমান ছিল। সেই নিমিত্তই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর নিকট উহা অমূল্য। ইংরাজ বণিকগণ সুরাটেই প্রথম কুঠি করিয়াছিলেন ও যাবতীয় যেখানে যে কুঠি ছিল তাহারই অধীন হইয়াছিল। শেষে যখন মান্দ্রাজকে পৃথক প্রেসিডেন্সি করা হয় তখন বাংলা তাহার অধীন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ উপকূলে ওলন্দাজগণের সহিত সর্বদা প্রতিযোগিতায় বিবাদ বিসম্বাদ হইত, তাহাতে ইংরাজ কোম্পানীকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত বাংলায় বাণিজ্য করা একেবারে বন্ধ করিবার + সিদ্ধান্ত হইয়াছিল কিন্তু কলিকাতার গূঢ় ব্যবসার জন্য তাহা হয় নাই। আরও ইংরাজ জাতির ভাবী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর জন্যই, বোধহয়, বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ কতকগুলি সুব্যবস্থা দ্বারা অল্প বেতনভোগী কোম্পানীর কর্মচারীগণের স্বাধীন গোপন ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়া বেতন বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্বে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কুঠির শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও জলেশ্বর, পাটনা ও কাশিমবাজারে কুঠি হইয়াছিল। ঐ হুগলীর কুঠি সম্বন্ধে বাংলার গ্রন্থকার ও তওয়ারিখ লিখিয়াছিলেন যে, যখন কুঠির সাহেবেরা ভোজন করিতেছিল তখন হঠাৎ তাহাদের কুঠি ভাগীরথী গর্ভে বসিয়া যায়। তাহাতে মালপত্র নষ্ট ও অনেকে প্রাণ হারাইয়াছিল। উহার পর নবারের অনুমতি না লইয়া তেতলা ঘর, গড়খাত ও বুরুজ প্রস্তুত হইলে সেখানকার মোগল অধিবাসীগণ তাহাদের পর্দানশীন স্ত্রীগণের গৃহপ্রাঙ্গনে পর্দা নষ্ট হইবে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করে। কারণ অত উচ্চবাস নির্মাণ করিলে তাহা অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে মুর্শিদকুলী খাঁর হুকুমে কুঠি নির্মাণ যখন শেষ হইয়াছিল তখন তাহা বন্ধ করিতে গিয়াই জব চার্ণকের সহিত বিরোধ হয় ও কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হয়। শাহাজাদা আজিম উশ্বান ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে

* পলাশি যুদ্ধের দশ বৎসর পরে হায়দার আলি কালিকট হইতে সমস্ত ইউরোপের বণিকগণের পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

+ Bruce's Annals Vol I

ষোল হাজার টাকা নজর লইয়া কলিকাতাদি ক্রয় করিবার অনুমতি দান করেন এবং হুগলীর ফৌজদারের অর্থ লাভের আশা নষ্ট হইল দেখিয়া কলিকাতায় বিচার করিবার একজন কাজি নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু অর্থ উহাদের মন্ত্রৌষধিতে তাহা হয় নাই। উহাতে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানের অনেকেই আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সোরা, রেশমাদির ব্যবসা করিত, কলিকাতায় আসিয়া নূতন ব্যবসা আরম্ভ করে। ঐ ব্যবসা শিখাইবার গুরু আরমানি ওলন্দাজ মহাপ্রভুরা বলিয়া বোধহয়।

কাজির বিচার— সেকালে স্বয়ং সম্রাটও কাজির বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না; এমন কি, সাহাজাদা আজিম উশ্বানও মুর্শিদকুলী খাঁর অনুরোধে ও তাহা করিতেন না, তাহাতেই লোকের লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইত ও বিচার বিভ্রাট ঘটিত। সেইজন্য তখন সেই বিচারের অধীন বাস করা বড়ই বিপদের হইয়াছিল। এক মোগলের কন্যাপহরণাপরাধে হুগলীর ফৌজদারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ও একজন মুসলমান ফকিরের আজানে বাধা দেওয়ার মিথ্যাভিযোগে চুনাখালীর সম্ভ্রান্ত ধনী বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় দেশের লোক বিচলিত হইয়াছিল। তাহাতে সকলে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ও যাহাতে তাহারা ভয়ে ঐ স্থান ত্যাগ না করে সেইজন্য পুনরায় বিচারের বা দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠান, কিন্তু পরিণাম কিছুই হইল না। ইহাতেই তখন লোকে কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর হইলেও সেখানে বাস করিয়া কাজির অন্যায় বিচারের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা মঙ্গলের কথা মনে করিয়াছিল। তাহাতেই কলিকাতা অতি অল্প দিনের মধ্যে জনাকীর্ণ হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ সৌভাগ্যবলেই কলিকাতাদি স্থানকে কাজির বিচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিল।

রাজধানী— ইংরাজ জাতির রাজধানী যে সকল কারণে সচরাচর হইয়া থাকে কলিকাতায় সেরূপ হয় নাই ও উহার নামাদির সঙ্গে সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিয়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাব রাজধানী রাজমহলে স্থাপন করিয়া উহার নাম আকবরনগর করেন। পরে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ ঢাকায় ঐ রাজধানী করিলেন। অবশেষে সাহাজাদা আজিম উশ্বান পাটনাকে আজিমাবাদ ও মুর্শিদকুলী খাঁ মুখসুদাবাদকে মুর্শিদাবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, তখন রাজধানী কথায় কথায় সরিয়া যাইত। রাজকার্যের সুবিধার জন্য হইত না, বরং কোন সম্রাটের প্রতিনিধির ব্যক্তিগত অভিমত ও বিজয়চিহ্নের মত হইত এবং রাজার বা তৎপ্রতিনিধির গৌরব প্রচার করিবার জন্যই হইত। রাজার রাজ্য নিরাপদ করিবার বা রাজধানীর যোগ্যতা বিচার করিয়া হইত না। ইংরাজ জাতি কলিকাতায় রাজধানী করিবার পূর্বে ঐখানে কলির দেবতা কালীর নিকট যেমন অজস্র স্বজাতিবর্গ উৎসর্গ করিয়াছিল তেমনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া তদানীন্তন কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টি করিয়াছিল। কলির প্রভাবে যেমন যুধিষ্ঠির নলাদি রাজাদিগকে রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল, তেমনি কলিকাতার ব্যবসা ও ষড়যন্ত্রের প্রভাবে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, কলিকাতার ভিতর বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত বত্রিশ সিংহাসন ছিল বা কলিকাতার অধিষ্ঠাত্রীদেবী কালীর দয়ায় তাহাদের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। কোনরূপ যুদ্ধকৌশলে বা বিজ্ঞানের বলে বা উত্তরাধিকারী সূত্রে ইংরাজেরা বিপুল সাম্রাজ্য লাভ করে নাই। ভগবানই জানেন যে কালযবনের সহিত ইংরাজ জাতির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। কিন্তু তাহা না হইলে কি, জব চার্ণক প্রমুখ কতিপয় অন্তজ লোক কলিকাতায়

কুঠি ও ব্যবসা করিয়া বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে? ত্রেতাযুগে হনুমানের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র যেমন সীতা উদ্ধার ও লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তেমনি ইংরাজ জাতির সৌভাগ্যলক্ষ্মী উদ্ধারের সন্ধান জবচার্ণক প্রমুখ নিজের মুখ পোড়াইয়া সোনার বাংলা ছারখার করিয়াছিল। কলিকাতার নাম সেই কলঙ্ক কালিমায় বিজড়িত বলিয়া কলির রজ্জুর সহিত কলিকাতার নামের সম্বন্ধ সৃষ্টি কখনই অবান্তর বলিয়া বোধহয় না।

মুর্শিদকুলী খাঁ— একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সন্তান, ইস্পাহান নগরের একজন বণিকের কৃপায় শিক্ষিত ও লালিত পালিত হন ও শেষে বেরারের রাজস্ববিভাগে সামান্য কার্য করিতেন। স্বীয় কর্মকুশলতায় ও প্রখর বুদ্ধিকে সহায় করিয়া তিনি হায়দ্রাবাদের দেওয়ানি পদের জন্য ঔরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া জিয়াউল্লা খাঁর পদচ্যুতির পর বাংলার দেওয়ানি পদে মনোনীত করেন। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেব যখন যুদ্ধ ব্যাপারে অর্থাভাব অনুভব করিতেছিলেন চতুর মুর্শিদকুলী খাঁ সেইখানে গিয়া বাংলার বর্দ্ধিত রাজকর ও জায়গীরের উপস্বত্ব হইতে উদ্বৃত্ত টাকা সরবরাহ করিয়া "মুর্শিদকুলী খাঁ" উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। বহুকাল মধ্যে বাংলা হইতে এত অর্থ বাদশাহ সরকারে উপস্থিত হয় নাই। তাহাতেই বাংলার সর্বময় কর্তা মুর্শিদকুলী খাঁ হইয়া পড়েন। সাহাজাদা আজিম উশ্বান পাটনায় নামমাত্র সুবেদার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নামকরণ হইতে যাবতীয় উন্নতি মুর্শিদকুলী খাঁই করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল উদাহরণ স্বরূপ কোন বিবাহিতা পত্নীর ধর্মনাশ অপরাধে নিজের একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি ঐ অপরাধে হুগলীর কোতোয়ালের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হ্রাসের জন্য সম্রাটের নিকট অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন। তিনি একজন আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন; অতিথি সৎকার ও মুসলমানী পর্বাদি অতি সমারোহে করিতেন। তাঁহার চেহেলসুতুন দরবার বিখ্যাত ছিল। অত্যাচারীরা তাঁহার ভয়ে কাঁপিত। জমিদারগণ সর্বদাই গুপ্তচরাদির দ্বারা তাহাদের প্রজাবর্গের অনুযোগ অভিযোগাদি যাহাতে ঐ দরবারে উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকিত। একচেটিয়া ব্যবসায় খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির মূল্য অধিক যাহাতে না হয় তিনি তাহার সবিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। ঐ অপরাধে দোকানদার ও ব্যবসাদারের গর্দভ পৃষ্ঠে নগর পরিভ্রমণাদি দণ্ডদান করা হইত। মৃগয়ায় প্রাণিবধ ভিন্ন আর কোন ব্যসন তাঁহার ছিল না। শীতকালে রাজমহলের পাহাড় হইতে বর্ষভোগোপযোগী বরফ মাত্র ব্যবহার করা তাঁহার বিলাস ছিল। তিনি সুরা বা নৃত্য গীতাদির অনুরক্ত বা ভক্ত ছিলেন না। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ প্রধান মসজিদের অনুকরণে যে মসজিদ করেন তাহাই তাঁহার কীর্তি। সেখানে নিজের কবরের স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়া নিজের দৈন্যের উদাহরণ জাজ্বল্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। মসজিদ দর্শনার্থী যাত্রী ও উপাসকগণের পদধূলি যাহাতে উক্ত কবরের উপর পতিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে টাঁকশালাদি নির্মিত হইযাছিল। নির্দিষ্ট সময়ে তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র রাজপথ ও ভাগীরথীবক্ষ যুগপৎ বিদ্যুতের আলোকমালায় আলোকিত হইত। বেরা নামক পর্বের সময় নানা বর্ণের তরণী সকল দীপমালায় সুশোভিত হইয়া নদী বক্ষকে সমুজ্জ্বল করিত ও আপামর সাধারণ পানভোজনে আপ্যায়িত হইত। রবিওল্ আওয়েল মাসের দ্বাদশ দিবসেও সকলে বিনা ব্যয়ে ভোজনাদি ও পরিচর্যা লাভ করিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে মুর্শিদকুলী খাঁর নানাগুণ-গ্রামাদির ভূয়সী প্রশংসা সেকালের গ্রন্থকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অমানুষিক জমিদার পীড়নের দোষ হইতে অব্যাহতি দেন নাই। সেই

দোষেই ইংরাজের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল ও কলিকাতার উন্নতি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ দরিদ্র সন্তান, বোধহয় সেইজন্য তাঁহার জমিদারগণের প্রতি জাতক্রোধ ছিল। সেইজন্যই তিনি জমিদারগণকে পালকি ব্যবহার করিতে বা তাঁহার সমক্ষে আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি দিতেন না। দরবারে পরস্পরকে অভিবাদনাদি করা পর্যন্ত নিষেধ ছিল। ভ্রান্ত ধর্মনীতিবুদ্ধি প্রণোদিত রোমের ব্রুটাসের ন্যায় স্বীয় পুত্রকে লঘু অপরাধে প্রাণদণ্ড দান ও অমানুষিক জমিদারপীড়ন দ্বারা সেই সময় জমিদারগণের বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহাতেই জমিদারেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা বা তাহাদের শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়াছিল। তাহাদের নিকটই দেশের দুরবস্থা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সংবাদ চতুর বিদেশী বণিকগণ সংগ্রহ করিয়াছিল। * **সীতারাম** কলিকাতায় কোম্পানীর কাটোয়ার রামনাথের আশ্রয় লাভ ও কৃষ্ণনগরের রাজা কলিকাতার কুঠিতে সর্বদাই যাতায়াত করিত। রাজা তোডরমল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে বন্দোবস্ত করিয়া বাংলার রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সাত পুরুষের পুরাতন ভিটা ত্যাগ করিয়া অনেককে পলাইতে হইয়াছিল। আর মুর্শিদকুলী খাঁর আশ্চর্য্য সুবন্দোবস্তে সম্রাটের আশাতীত ফললাভ হইয়াছিল ও মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্ব ও কীর্তি ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাই মুসলমান রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। পাঞ্জাবী আবুরায়, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি কানুনগো চৌধুরীর কাজ করিয়া বঙ্গের বড় বড় জমিদার হইয়া পড়েন। তাহাতেই প্রাচীন জমিদারগণের সর্বনাশ হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অনেক সামান্য কর্মচারীকে জমিদার ও ধনবান + করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় বঙ্গের অনেকগুলি উত্তম জমিদারী তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামজীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত করিলেন। সেকালে কানুনগোর প্রভাব অত্যন্ত ছিল। বাদশাহের নিকট কাগজ দাখিল কানুনগোর সহি ভিন্ন হইত না। শোনা যায় যে, সেইজন্যই মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত দর্পনারায়ণের মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর মত প্রতাপশালী ব্যক্তিকেও এজন্য চিন্তিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। দর্পনারায়ণের উপর তাঁহার বিষদৃষ্টিতেই রঘুনন্দনের উন্নতির পথ পরিস্কার হয়। দর্পনারায়ণই বাংলার রাজস্ব নানা উপায়ে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ হইতে দেড় কোটি করিয়া দেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র বাংলার প্রায় পঞ্চমাংশ ভাগ নাটোর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাতেই রঘুনন্দনী বাড়ের প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। রঘুনন্দন নিকাশি কাগজে দর্পনারায়ণ সহি করতে না চাহিলে কৌশলে কানুনগোকে দিয়া খালসা দেওয়ানের পদে উন্নত ও নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়েন। রঘুনন্দন নিঃসন্তান ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কালিকাপ্রসাদও সেইরূপ ছিল। শেষে রামজীবনের পোষ্যপুত্র রামকান্তই পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর স্বামী ছিলেন। সেই নাটোরের কর্মচারী দয়ারামই দিঘাপতিয়ার জমিদারগণের পূর্বপুরুষ। সেই দয়ারাম ও রঘুনন্দনের চক্রান্তেই সীতারামের সর্বনাশ হইয়াছিল। বাংলায় সীতারাম প্রতাপাদিত্যের ন্যায় বীরধর্মী ব্যক্তি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু হায়! তাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির দুর্দশা দূর করিতে গিয়া স্বজাতি ও স্বদেশীর চক্রান্তে নির্যাতিত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্যই বাংলার

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাটোয়ার রামনাথের আশ্রয়ে সীতারাম আশ্রয় লাভ করিয়াছিল শোনা যায় ও প্রবাদ।

+ Philip's Landtenure (p p 128-129)

জমিদারেরা সীতারামের সহযোগীতা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। বাংলায় তখন বাদশাহ অপেক্ষা মুর্শিদকুলী খাঁকে লোকে ভয় করিত। মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ ও নিগ্রহে তখন বাংলায় সকলের উন্নতি অবনতি নির্ভর করিত। সেই মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ইংরাজ বণিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতা আদি গ্রাম ক্রয় ও দুর্গাদি নির্মাণ করিয়াছিল, ইহাই তাহাদের পরম সৌভাগ্যের কথা। আরও সেই সময়ে সীতারাম প্রমুখকে কলিকাতায় আশ্রয় দান করিয়া সাহস ও ধর্মের পরিচয় দান করে। ইংরাজ বণিকেরা যে সে সময় সমস্ত কার্য সবিশেষ বিবেচনা করিয়া করিয়াছিল এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। তাহারা তপস্যা দ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই সৌভাগ্যোদয়ের কেন্দ্র কলিকাতা বলিয়া কলিকাতার এত মহিমা। অদৃষ্ট কি তপস্যা দ্বারা সঞ্চয় করা যায়, সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে। যাহা দেখা যায় না তাহাই অদৃষ্ট। অনেকের মত যে, পূর্বজন্মার্জ্জিত কর্মের ফলে জন্মকালীন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চারে উন্নতি ও অবনতি এবং ভাগ্যের সূচনা হয়। সে কথা তর্কের অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে কিন্তু জাতি বা দেশ সম্বন্ধে তাহা কোনরূপেই প্রযুজ্য হইতে পারে না। জব চার্ণক, লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেস্টিংস আদি যাহারা কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা তাহারা সকলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের নিকট পুরস্কার লাভ না করিয়া বরং লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃতই হইয়াছিল। জব চার্ণক এদেশের একটি কুলটার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া জাতি ও ধর্ম ত্যাগ করে নাই ও লর্ড ক্লাইব আত্মহত্যা ও ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বস্বান্ত হওয়াও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিল, তথাপি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত বা তাহাদের দেশ ও কর্ম ত্যাগ করিয়া যায় নাই। তাহারা নিজের স্বার্থ অপেক্ষা জাতির মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ কোন কার্য করে নাই বা এদেশের কোনরূপ ধনৈশ্বর্য্যে বা রূপলালসায় মুগ্ধ হইয়া স্বজাতি বা স্বদেশ বা তাহাদের প্রভু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন কার্য করে নাই। এই মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগই ইংরাজ জাতির উন্নতির মূল কারণ। উহা ঘোর তপস্যার ফল, তাহাতেই তাহাদের ভাগ্য প্রসন্ন ও বিষম বিপদের সময়ও তাহদের ভগবান রক্ষা করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ জাতির পরস্পর উন্নতির কারণের প্রভেদ ও তারতম্য

হিন্দুর অর্থ, পদ, রাজ্য, নির্বাণ, মোক্ষাদি যাবতীয় সুখের ও সম্পদের নিদান সমস্তই তপস্যায় হয়, ইহা পুরাণ ইতিহাসাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকি, রাবণ, পরশুরাম, ভীষ্ম, বলি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকলেই তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে প্রকাশ ও সকলের বিশ্বাস। ভগবান মনু ব্রাহ্মণের জ্ঞানোপার্জন, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা ও সত্যপালন, বৈশ্যের কৃষি, গো, বাণিজ্যদি রক্ষা এবং শূদ্রের সেবাকেই তপস্যা বলিয়াছেন। শৌচ, আচার, অহিংসা, সরলতা, দেবদ্বিজে গুরুভক্তি ও ব্রহ্মচর্যাদিকে শারীরিক, চিত্তশুদ্ধি. আত্মনিগ্রহাদি সৌম্যতাকে মানসিক ও অনুদ্বেগকররহিত সত্যপ্রিয় সম্ভাষণ ও শাস্ত্রাভ্যাসাদিকে বাঙ্ময় তপস্যা বলে। এই সকল একান্তঃকরণে অনুষ্ঠিত হইলে পুরুষকার দ্বারা দৈব সহায় হয়। সেই তপস্যায় সকলে পশুভাব হইতে মনুষ্যত্ব, ঋষিত্ব ব্রহ্মত্ব ও দেবত্ব পর্যন্ত লাভ করিয়া থাকে। সাধনা দ্বারা আত্মশক্তির বিকাশের নামই তপস্যা। আর্য মুনি, ঋষি ও সুরাসুর সকলেই ইষ্ট দেবতার নিকট বরলাভ করিয়া উন্নত ও সুখভোগ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, বুদ্ধ সকলেই সেই তপস্যার বলে অমর হইয়াছেন। ভারতে শঙ্করাচার্যের দ্বারাই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুদ্ধার ও বৌদ্ধধর্মের পতন; নানকের শিক্ষা ও ধর্মোপদেশে দুর্দ্ধর্ষ শিখজাতির অভ্যুদয় ও তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপন হইয়াছিল। নানক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমাদৃত হইতেন ও তাঁর সম্বন্ধে যে উক্তি আছে তাহা সর্ববিদিত বলিলেই চলে। '**হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকা পীর, উস্কা নাম, নানক সাহেব ফকির**'। শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যাদিগ্রন্থের দ্বারা যেমন পাণ্ডিত্য ও শৈবধর্মের প্রচার করিয়া গিয়া কেবল শৈবাবতার বলিয়াই স্বীকৃত হন, কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের ন্যায় কোন শৈব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্মের অসারতা প্রমাণ দ্বারা আর্যধর্মের পুনরুত্থানে দেশের ও দশের বিশেষ কোন মঙ্গল হয় নাই ও তাহাতে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিতও হয় নাই। মহাপ্রভু চৈতন্য প্রেমভক্তি স্রোতে নির্যাতিত বৌদ্ধ যবনাদিকেও বৈষ্ণব ধর্মের বিশাল উদরে স্থান দিয়াছিলেন। লোকের মতিগতি আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে দেশের দুঃখ দূর হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে গৃহবিবাদে লোকক্ষয় ও জাতীয় ধন নষ্ট হইতেছে; উহার প্রতিকারের জন্য কোন তপস্যাই হয় নাই। কলির প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাহা হইয়াছিল তাহা স্থায়ী হয় নাই। জনকয়েক মূর্খ ইংরাজ বণিক কি তপস্যায় বিশাল ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিল তাহা খ্রীষ্টধর্মের গৌরব ভিন্ন আর কিছুই নয় বা উহা অন্য কোন অভিসম্পাতে ঘটিয়াছিল উহারই সমালোচনা উচিত।

ধর্ম— ধর্মের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এক নয়। ধর্মই মানবকে ধারণ ও পোষণ করে এবং পৃথিবীর সহিত মানব জীবজন্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করে। সেইজন্যই ধর্মের লক্ষণ : —অহিংসা অর্থাৎ যাহা দ্বারা দেশের ও দশের মঙ্গল হয় এবং দুঃখ দারিদ্র্য দূর ও শান্তিলাভ হয়। পুরাণের মতে লোকস্থিতি বিহিত করা, যুক্তিবাদিরা কর্তব্যকর্মকে এবং জ্ঞানবাদিরা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকেই ধর্ম বলে। দেশ বা জাতি বিশেষের পরিত্রাণের সোপানই ধর্ম। শিক্ষা-দীক্ষা, দেশ-কাল, পাত্র ও সম্বন্ধ লইয়া ধর্মের সৃষ্টি। বিলাতে ধর্ম বিশ্বাসেই পাদ্রী ক্রানমার অবলীলাক্রমে জ্বলন্তানলে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ দিল্লিতেও সেইরূপ করিয়া মুসলমান অধিপতি ফিরোজসাহকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ঐরূপ রাজপুতরমণীরা জ্বলন্তানলে বা বিষ গ্রহণে প্রাণত্যাগ শ্রেয় মনে করিতেন। সম্রাট ফিরোজসাহ পিতৃব্যের নৃশংস অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিপীড়িত প্রজাবর্গের অর্থাদি বিনিময়লব্ধ সন্তোষলিপি পিতৃব্যের সমাধিস্থ করা শান্তিপ্রদ ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ধর্ম লাভাকাঙ্ক্ষাতেই মুসলমান নরপতিগণ জিজিয়াদি কর ও নানা নির্যাতনাদি দ্বারা এবং অর্থ, পদ কন্যাদি দান করিয়াও হিন্দুগণকে মুসলমান করিয়াছিলেন। কতিপয় রাজপুত রাজারা অধীনতা অপেক্ষা অধর্ম আর কিছুই নাই বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা যৌনাদি সম্বন্ধ দ্বারা বা অন্য কোন হীনকার্য দ্বারা রাজ্যসম্পদ রক্ষা করা অপেক্ষা বনে বাস করা ধর্ম মনে করিতেন। চিতোরের মহারাণা আজও সেই সকল জন্য মহিমান্বিত। আজও সেই সকল রাজপুতদিগের শ্লেষোক্তি শ্লাঘার সহিত উক্ত হইয়া থাকে ঃ — **"যো রাজপুত দরবারি হুয়া, উ, তিন লোকসে বাহার গিয়া।"** কি পাপে ভারতবাসীর বর্তমান দুর্দশা ও ইংরাজ জাতির রাজত্বলাভ হইয়াছিল? অতি প্রাচীনকাল হইতে শিক্ষা, সংযম ও ধর্মানুশীলন দ্বারা ভারতবাসিরা আর্যপদবী লাভ ও সকলের আদর্শ হইয়াছিলেন। সভ্যতা ও স্বাধীনতার উৎস ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যেখানে বিশ্বব্যাপী প্রীতির ছবি ও প্রেমের আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান সেইখানেই মিত্রভাবে স্বাধীনতা বিকশিত হয়, সেখানে সীমাবদ্ধ স্বার্থপরতা বা স্বজাতি, স্বজন, স্বদেশবাৎসল্যের ভাণ নাই। সকলের সমানাধিকারাদি সংকীর্ণতার মধ্যে শত্রুর ছায়া বিদ্যমান, উহা আর্য সনাতন ধর্মের মধ্যে নাই। ফরাসি জাতির সাম্যের মধ্যে সেই ভোগের ছায়া ছিল বলিয়া বিপ্লব হইয়াছিল, আর দৈত্যকুলে **প্রহ্লাদ** হিরণ্যকশিপুর ভেদজ্ঞান নৃসিংহমূর্তির দ্বারা নষ্ট করাইয়া সকলকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বলিদানে বিরাট মূর্তি হিরণ্যগর্ভ বিষ্ণুকে বামন অবতার করিয়া তাঁহার সঙ্গে স্বর্গ অপেক্ষা পাতালে গিয়া স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করাই শ্রেয়ঃ ধর্ম মনে করিয়াছিলেন। সেইরূপ রাবণকে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্যদান ও কর গ্রহণ না করা শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি। যেখানে জেতার পরাজিতকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার কোন লক্ষ্য বা চেষ্টাই ছিল না, সেইখানেই হিন্দুর আর্যত্বের মহিমা। কলির প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের শিক্ষা, দীক্ষা, ত্যাগ ও শক্তি সামর্থ্যের জলন্ত উদাহরণ খাণ্ডবদাহন ও রাজসূয় যজ্ঞ। এক একটি লোক লইয়া জাতি, তেমনি দশটি জাত লইয়া সমাজ ও দেশ। জাতি ও সমাজের মঙ্গলের সহিত দেশের মঙ্গলও হইয়া থাকে। উহা কুক্ষিগত, ব্যক্তিগত বা জাতিগত হিতচিন্তার উপর নির্ভর করে না। দেশের মঙ্গল ব্যক্তিগত ও জাতিগত সমূহের সামঞ্জস্য ও দায়িত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পরস্পরের শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সৎচিন্তা, সাহস ও সৎকার্য্যের অনুশীলন দ্বারা বিরাট জাতীয়ভাবের

উদ্বোধন হইয়া থাকে। তাহারই অভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার হানি, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, নির্ভরাদি লোপ পায়। উহাতেই হিংসাদ্বেষাদি নগ্ন বিলাসিতার সৃষ্টি করে। তাহাতেই দেবাসুরের সংগ্রাম। তাহাতে আর্য মুনি ঋষিরা স্ব স্ব তপস্যা ও অস্থিপঞ্জরাদি দান দ্বারা দেবতার কার্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। রাবণের সহস্র মুণ্ডেও ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তি হয় নাই বলিয়াই শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব। দুর্যোধনাদির রাজ্যাদি অপহরণ বাসনা ও জতুগৃহে ও খাণ্ডব বনে পাণ্ডবগণকে নষ্ট করিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আর্বিভাব। রাজসূয়াদিতে পাণ্ডবগণের সামর্থ্য ও পুরুষকারের জ্বলন্ত উদার দৃষ্টান্তেও শিক্ষালাভ না করিতে পারিয়া তাহা কপট দ্যুতক্রীড়ায় হরণ করিতে গিয়াই দুর্যোধনাদি ভীষণ কুরুক্ষেত্রের সমরানলে নষ্ট হইয়াছিল। সেই নরনারায়ণের কীর্তিকলাপ মহাভারতের জল্পনা ও কল্পনা। আর্য হিন্দুজাতিকে ধর্ম কর্মাদি শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চম বেদস্বরূপ সেই মহাভারতের সৃষ্টি। গোব্রাহ্মণ হিতের নিমিত্তই সেই মহাযুদ্ধে দুর্যোধনাদির পূর্ণাহুতি দান হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে যুধিষ্ঠিরের স্বশরীরে স্বর্গলাভ হইয়াছিল। কারণ যুধিষ্ঠিরের শরীরে দুর্যোধনাদি কৃত শতাপরাধেও হিংসা, পাপ স্পর্শ করে নাই। সেইজন্যই তিনি ধর্মের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হন। "অহিংসা পরমো ধর্ম" উহা কি ব্রহ্মণ্যধর্ম, কি বৌদ্ধমহাপ্রাণ সকলেরই মূল মন্ত্র। অহিংসাতেই বিশ্বব্যাপী প্রীতির জ্বলন্ত তেজ স্থাবর, জঙ্গম, তৃণ, পাতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবে প্রতিফলিত হয়; উহাই সাবিত্রী মন্ত্রের স্ফুরন্ত তপস্যা ও তেজ।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কৃষির তুলনায় শিল্প হীন ও জড়বৎ; কারণ উহার দ্বারা দেশের আহার আহরণ ও অভাব দূর হয় না। সেই নিমিত্ত কৃষি ও গোপালনাদি দ্বারা ভারতবর্ষের ধন ও ধনাগম হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর, তাহাদের প্রকাশ ও পরিচয় সেই বিরাটের গোগৃহ-হরণই হইয়াছিল। পৃথিবীতে প্রথমাবস্থা হইতেই কৃষিকার্যের দ্বারাই সমাজের উন্নতি ও রক্ষা হইয়াছিল। গোজাতিই উহার প্রধান সম্পদ হইয়াছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মকর্তারা শ্রমী বৈশ্যজাতির উপর কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। 'অর' ধাতু হইতে আর্য শব্দের উৎপত্তি; ঐ ধাতুর অর্থ ভূমি কর্ষণ। যাহারা কৃষিকার্যাদি করিত তাহারা আর্য, আর যাহারা পশু পক্ষী আদি হিংসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত তাহারা অনার্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। আর্য ও অনার্য হইতেই বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি। আর্যমুনি ঋষিগণ গিরিকন্দরে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া স্বভাবের শোভার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে ভোগবিলাস স্থান পায় নাই। মানবজীবনের শৈশবাবস্থার সেই বিমল শ্রী অপূর্ব। তখন বেদ উপনিষদাদির আবশ্যকতা ছিল না। সিন্ধু নদীর উপকূলে ঋষিগণ বেদাদির দ্বারা যে ধর্ম প্রচার করেন তাহাই হিন্দুর আরাধ্য। ঋগ্বেদে ১ম, ৫১সূ, ৮ ঋকে আর্য ও অনার্য জাতির সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। পৃথুরাজার সময় বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি। আদিম অবস্থায় সকল মানবই এক ছিল; কেবল স্থান ও জলবায়ুর গুণে শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল মাত্র। সেই এক আদি মনুষ্যজাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্ম হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই কৃষি ও শিল্প দ্বারা বহুকাল হইতে জীবিকার্জন করিতেছে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ দেশের রাজা ও ধর্মযাজকগণ করিতেন ও দেশের উদ্বৃত্ত সামগ্রী অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারা বৈশ্যেরা দেশে ধনাগম করিত। গোজাতি মাতার ন্যায় শিশু ও বৃদ্ধের প্রাণরক্ষা করিত বলিয়া দেশের ও দশের আদরের ধন ও পূজ্য হইয়াছিল। মোক্ষ মূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ স্বীকার

করিয়াছেন যে বণিক জাতিই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা। বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি 'পণ' ধাতু হইতে 'বণিক' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন। যাস্ক ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যায় নিরুক্ত (২।৫।৩) উহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া পৃথিবীর সর্বত্র বণিকেরা গমনাগমন করিত ইহা প্রাচীন বেদাদি ও ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। উহাদের নিকট হইতে গ্রীক ও রোমবাসিরা ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া নৌ-বিদ্যা ও চিকিৎসাদি শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা অত্যন্ত নম্র ও নির্বিরোধী ছিল। প্রাচীনতম ঋক্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও ভাষ্যকার সায়নাচার্যের অর্থানুসারে কর প্রদান, পরাধীনতা ও তিরস্কার ভাগিতা বৈশ্যের গুণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই বৈশ্য জাতির হর্ষবর্ধনাদি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণে ভলাদ, বন্দ্য, সৎকৃত্তি প্রভৃতি বৈশ্যগণ বেদের মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিল উক্ত হয়। চণ্ডীতে ও বৈশ্য সুরথ রাজা হৃত রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তখন গুণ, কর্ম ও বৃত্তি অনুসারেই জাতি নির্ণীত হইত। ব্রাহ্মণাদির মর্যাদা শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, লাভ করিয়াছিল; বিশ্বামিত্র, মতঙ্গাদি তাহার দৃষ্টান্ত। হিন্দু জাতির অধঃপতনে, সেই উদার আদর্শ জাতি বংশগত হইয়া পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষের উৎপত্তি করে তাহাতেই হিন্দু সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষের নির্মিত জাহাজ এরূপ সুন্দর ছিল যে, উন্নতিশীল ইউরোপবাসীরা গত দুই শত বৎসরেও উচ্চতর বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল জাহাজেব বিশেষ কোনই উন্নতি করিতে পারেন নাই। উহা এশিয়াটিক সোসাটির পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় উল্লেখ আছে। বাংলার ঐ সব জাহাজ সুন্দর ও সুলভ ছিল বলিয়া তুরস্কাদি দেশে উহা অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইত। ধর্মধ্বজী পণ্ডিতগণ বিদেশে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ করিয়া নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করায় বহির্বাণিজ্য হ্রাস হইয়া যায়। এই বহির্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রুসিয়ার অধিপতি মহামতি পিটার ডেনমার্কে সামান্য মজুর সাজিয়া জাহাজ তৈয়াবির কার্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। হায়! কালের করাল গতিতে দেশের ব্রাহ্মণগণের মুর্খতায় ও বৈদেশিক বণিকগণের বর্ণিজ্যের প্রভাবে এদেশের বর্হিবাণিজ্যে ক্রমে ক্রমে বন্ধ ও একেবারে উঠিয়া যায়। আর্য বণিক জাতির কৃষি, গো, বাণিজ্য রক্ষা ও পালন করা বর্ণাশ্রম ধর্মের মূল; তাহার প্রতি দেশবাসী সকলের যতদিন ধ্যান ও ধারণা ছিল, যতদিন তাহা রাজাদি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ রক্ষাদি করিবার যত্ন ও অবসর প্রদান করিয়াছিলেন, ততদিন দেশে শিশুমৃত্যু রোগ ও শোকের প্রশ্রয় হয় নাই; লোকে বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও দীর্ঘজীবি ছিল। শঙ্করাচার্যের ধর্ম প্রচারে বা হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের লুপ্ত গৌরব বা বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই বরং বিষময় হওয়ায় মুসলমান রাজত্বের মূল পত্তন করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বে কর্মকর্তারা ঘোর অত্যাচারী হইলেও তাহারা এদেশেব কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই, সেইজন্যই দেশের লোকেরা সেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহাদের শিক্ষা বাণিজ্যে বিদেশী বণিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অক্ষম হয় নাই। সেইজন্যই ভারতবাসির দুঃখ দারিদ্র্য সাময়িক হইলেও চিরস্থায়ী হয় নাই; দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদির কোন হানি হয় নাই, বরং বৌদ্ধ বিপ্লবের পর হইতেই উহার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষেব শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের আর্বিভাবে ও প্রশয়ে উহার অধঃপতনেব সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছিল।

বিদেশী বাণিজ্য— বৈদেশিক বণিকগণের অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের ফলে যে ভারতবর্ষ দেবতার রঙ্গমঞ্চ, মুনি ঋষির আরাধ্য তীর্থস্থান এবং শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ বলিয়া জগতে সমাহৃত হইত, হায়! বর্তমানে তাহার অধিবাসিগণ অধিকাংশই মূর্খ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় দরিদ্র, নগ্ন, বিলাসী! হায়! যে পল্লীনিবাস সুখ ও স্বাস্থ্যের নিদর্শন ও আশ্রয় ছিল, তাহা এখন রোগ ও দুর্ভিক্ষের আশ্রয় হইয়া অরণ্য ও মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যে আর্যজাতি দেবতা, ঋষি ও অতিথিকে পঞ্চ বলিদান না করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে না, হায়! এখন তাহারা নিজের ও পুত্র পরিবারকে দুইবেলা অন্নদান করিতে পারে না। যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রত্যেক গ্রাম ও পল্লীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধি করিত, এখন তাহা লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে পরাধীন হইলেও তাহার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল তাহা এক বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে তাহার সে গৌরব নষ্ট হইয়াছে। হায়! গ্রাম ও নগরবাসিরা ক্রমে ক্রমে পরমুখাপেক্ষী নিরাশ্রয় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যের উন্নতির জন্যই গ্রাম ও পল্লী-সমাজ এক একজন বিচক্ষণ জমিদারের অধীনে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। কৃষকেরা জমিদারকে রাজার খাজনা শিল্পী ও বণিকগণের নিকট উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যাবতীয় অভাব দূর করিয়া সুখে সচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। বণিকদের মাশুলে রাজস্ব বিশেষ লাভবান হইত। পল্লীগ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যে সেই স্থানের অভাব পুরণ করিয়া অবশিষ্টাংশ সামগ্রী অন্যত্র যাইত। জমিদারেরা সকলের আপদ বিপদে সর্বতোভাবে রক্ষা বিধানাদি করিয়া রাজার করাদি প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেন। তখন দেশে কল, কারখানা বা যৌথ কারবার ছিল না। জমির-জমা ব্যবস্থায় যাবতীয় কাজ কর্ম চলিত, নগদ মজুরীতে কাজকর্ম হইত না! তাহাতেই সকলের জমা জমি ছিল ও পরস্পর সৌহার্দ্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত। এক গ্রামে নানা জাতি ও হিন্দু মুসলমান সুখে বাস করিত। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ হিংসা দ্বেষ ছিল না বা ধর্ম-কর্মের জন্য কোনরূপ অকৌশল বিবাদাদি ছিল না। যতদিন সেই সহিষ্ণুতা শিক্ষা-দীক্ষার সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ বর্তমান ছিল, ততদিন কোন বিশৃঙ্খলা বা অভাব হয় নাই। তাহার অভাবেই ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া নগ্ন বিলাসিতায়, স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম ও জাতীয়তার সামঞ্জস্য নষ্ট করে। বিরাট হিন্দু মুসলমান জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হওয়াতেই দৃঢ়ব্রত খ্রীষ্টান জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। অতি স্মরণাতীত কাল হইতে এদেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি জাতির সহিত পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট থাকায় উহার উত্তরোত্তর এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে যাহাতে বিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্য জাতি সকল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অক্ষম হইয়া সেই সকল দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার করিত। ভারতবর্ষ হইতে তখন কাঁচামাল বিদেশে কখনও যায় নাই; কেবল সুগন্ধি ব্যবহার্য ও খাদ্য দ্রব্যাদি যাহা ইউরোপাদিতে হইত না তাহাই যাইত। সর্বজনীন শুভ চিন্তাতেই হিন্দু জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা, উহা ভিন্ন ভিন্ন জাতির দায়িত্ব ও ধর্ম কর্মের উপর নির্ভর করিয়া বিরাট হিন্দু জাতির সৃষ্টি করে। তাহাদের মধ্যে যথারীতি সামঞ্জস্যের অভাবেই পতন হইয়াছে। পুরকালে হিন্দু রাজারা উহার প্রতিকার যজ্ঞাদিতে দেবতার আবাহন ও আহুতি দ্বারা করিতেন। তাহাতেই ব্রাহ্মণাদি সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত ও যথারীতি পুরস্কৃত হইয়া স্ব স্ব অভাব দূর করিত। সেই হইতে

সংযমাদি শিক্ষার জন্য পশুবৃত্তির নিদর্শন স্বরূপ ছাগ মহিষাদিকে দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্য বলি প্রদান করা হইত। যজ্ঞে দেবদত্ত বারি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংগৃহীত অর্থ কোষাগার হইতে মুক্ত করিয়া সকলের অভাব দূর করিত। সেই সকল যজ্ঞে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি হইত। সেই সকল ধর্মানুমত বৈদিক ক্রিয়া ক্রমে কালের করাল গতিতে নষ্ট হইয়া গেলে হিন্দুর রাজত্ব শেষ হয় ও বৌদ্ধ ও মুসলমান সাম্রাজ্যে সংগৃহীত অর্থ অন্যথা নষ্ট হইতেছিল। চতুর ইউরোপবাসিগণের মন্ত্রণা ও কৌশলে বা মোগল মন্ত্রী ও সম্রাটগণের নির্বুদ্ধিতায় তাজমহলাদিতে রাজার অর্থ নষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উহা যথার্থই সাতটি আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে একটিতে পরিগণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পতিত জমিতে কৃষিকার্যাদি দ্বারা উন্নতি, তখন কি বিদেশী কি স্বদেশী কেহই করে নাই ও দেশের যে অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের সর্বনাশ হইতেছে সে দিকে কেহই এক কপর্দক ব্যয় বা চেষ্টা করে নাই। **ভারতবর্ষে চিরকাল ধরিয়া স্থানোপযোগী ও আবশ্যকীয় যে সকল কৃষি বাণিজ্যে ও শিল্পাদি আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছিল তাহাতে হস্তক্ষেপ সর্ব প্রথমে বিদেশী ইউরোপীয় বণিকগণই করে।** দেশের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা দেশের যে অভাব দূর হইত, তাহার স্থলে নীল, আফিম, তুলা, পাট, চা আদি নতূন চাষের ব্যবস্থা করিয়া দেশের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেওয়া এবং তাহা বিদেশে রপ্তানি করা আরম্ভ হয়। বিদেশী বণিকেরাই কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দেশের মালের আড়ত ও সেই সকল স্থানে বস্ত্রাদি বয়নাদি করিয়া বিদেশে পাঠান প্রথম আরম্ভ করে। এই কেন্দ্রীভূত ব্যবসার ফলে এদেশের যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইবার পূর্বেই বিক্রীত হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে নিজের ক্ষেতের ফসল জমিদারের খাজনা ও বিদেশী বণিকের লাভাংশ না দিয়া কাহারও উদরস্থ হইবার উপায় ছিল না। ইহাতেই স্থানীয় অভাব ও আবশ্যকীয় জিনিষের মূল্য দিন দিন বাড়িতে থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা অন্য কোন বিদেশী ইউরোপীয় কোম্পানীরা কেন্দ্রীভূত ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কলিকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের উন্নতি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে যে দেশের ও দশের কি সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা মুসলমান শাসনকর্তাদের বা তাঁহাদের কোন মন্ত্রী বা জমিদারগণের লক্ষ্য পড়ে নাই। তাহাতেই দেশের সর্বনাশ হইয়াছিল। শিল্পী, কৃষক, ব্যবসায়ীরা দেশের অরাজকতায় দাদন গছান ও একচেটিয়া ব্যবসায় কোম্পানীর ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়াছিল। শেষে দেশে তখন যাত্রা কথকতায় সাধারণ অজ্ঞ লোকেদের ধর্ম শিক্ষাদি দান করা হইত। তখনকার কবির ছড়ায় উহার প্রতি কেন কটাক্ষপাত করা হয় নাই ইহাই বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। হায়! তাহাতেই সেই বাঙালীর ও বাংলার সুখ সম্পদ যাহা মুসলমান রাজত্বের ঘোর অত্যাচারের মধ্যেও বর্তমান ছিল তাহা এখন সুখস্বপ্ন বা আকাশকুসুম হইয়া দাঁড়াইছে। হায়! সেই স্মৃতির মধ্যে বাংলা ও বাঙালীর অপূর্ব যে সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য ছিল তাহা এখন আর নাই। সে বাঙালীর ভোজন শক্তি ও স্বাস্থ্য ও সুখের পল্লিনিবাস এখন কোথায়? সেই শস্য শ্যামলা হরিতক্ষেত্র পরিশোভিত নদী ও পুষ্করণী কুমুদ কাহ্লার পরিবেষ্টিত পল্লীসমাজে বাংলার গৃহলক্ষ্মীর জয়বার্তা ধন ধান্য সমাগমের সহিত যাহা হইত, তাহা এখন কোথায়? সেই হিন্দুর ভাদ্র পৌষ চৈত্র মাসের লক্ষ্মীপূজায় যে লেহ্যপেয় সুখাদ্য ফল মূল ব্যঞ্জন পলান্ন পায়স মিষ্টান্নাদির দ্বারা গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে উৎসব কোলাহল হইত তাহা এখন কোথায়? এখন সেকালের কবির বর্ণনায় তাহা উপভোগ করা ভিন্ন আর উপায় নাই। বাংলার জমিদারগণের সেই দনুজদলনী দুর্গান্নপূর্ণা পূজা উৎসবে দীন

দরিদ্রকে ধন বস্ত্রাদি বিতরণ বিবাদ বিসম্বাদ দলাদলির শান্তি ও স্নেহালিঙ্গন এখন কোথায়! সেই সকল পূজা ও উৎসবে দেবীচরণে অসুরশক্তি আত্মগ্লানি অহঙ্কার সঙ্কীর্ণতার পরাজয়বার্তা যেন সাক্ষাৎ মূর্তিমতি করিয়া শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা হইত, তাহা এখন কোথায়? হায়! সেই সকলের পবিত্র স্মৃতি সেকালের কবিরা আনন্দে বিহ্বল হইয়া গাহিয়া গিয়াছেন মাত্র এখন তাহা উপভোগ করা মূর্খতার চিহ্ন হইয়াছে। হায়! সেই সকল পূজা বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফলে ঘোর পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে সেই সকল দেব দেবীর মূর্তির পূজা তখনকার তুলনায় নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। শিল্পীরা সেই সকল দেবদেবীর প্রতিকৃতি মৃন্ময় ও হস্তিদন্তে প্রস্তুত করিয়া বিদেশী ইউরোপীয় জাতির গৃহসজ্জার সাজ সরঞ্জাম করিয়া গৌরবান্বিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা এখন আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে? সেই সকল পূজা ও উৎসবে পরস্পরের মনোমালিন্য দূর ও একতা সৃষ্টি দ্বারা আত্মরক্ষার সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় যে শক্তি উপাসনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এখন আর সেরূপ ভাবে তাহা অনুষ্ঠিত হয় না। সেই গৌরব স্মৃতি যাহারা পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিত ও জমিদার বলিয়া সমাজে সমাদৃত হইত তাহারা এখন আর নাই। তাহাদের বংশধরগণ প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা ও অত্যাচারে এখন নাই বা দীন দরিদ্র পিপীলিকাগণ যেমন আহারের জন্য চতুর্দিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, বিন্দুমাত্র রসাস্বাদন করিলে তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহা আহরণ করে ও সকলে সম্মিলিত হইয়া তাহাদের বল বুদ্ধির পরিচয় তাহাদেব অপেক্ষা শতগুণ অধিক মৃত জীবজন্তুর মাংস ভোজনাদি করে তাহাদিগকে লইয়া যায়, সেইরূপ ইউরোপের বণিকগণ এদেশের সুখস্বচ্ছন্দতা দৃষ্টিগোচর করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া মৃত্যু, রোগ, পীড়া সমস্ত বরণ করিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থাপেক্ষা জাতিগত স্বার্থের চিন্তা বলবান ছিল। তাহারাও একদিন পরাধীন ছিল, তাহারা তাহাদের দেশকে স্বাধীন শান্তিস্বস্ত্যয়নে বা যজ্ঞে করে নাই। যেমন বিদ্যুৎশিখা মেদিনীমণ্ডলে সঞ্চরণশীল মেঘলাকে তুর্যনিনাদে বিদীর্ণ ও ভেদ করিয়া ভূতলে জলধারায় নদনদী সমুদ্রাভিমুখে প্রেরণ করে, তেমনি সমস্ত জাতিগণ তাহাদের নেতৃবৃন্দের তড়িৎ প্রবাহে উদ্দীপিত ও আকৃষ্ট হইয়া কার্য নির্দ্ধারণ পূর্বক দেশবৈরী দুরাত্মগণকে শাস্তিদান করিয়া স্বদেশকে স্বাধীন করে। হিন্দুজাতির সহস্র যুগব্যাপী আবর্জনা সংস্কারাভাবে সমাজ ও ধর্মের স্তরে স্তরে স্থান লাভ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে গিরি, মরুর ব্যবধানের মত দূরে ফেলিয়া হীন ও অধীনতা পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; যেখানে রোগ সেখানে চিকিৎসা হয় নাই। জাতীয় ঐক্যের প্রধান অবলম্বন ভাষা, ধর্ম ও সমাজ। পরস্পরের ভাব বিনিময় ও সম্মিলনেব রাজপথ ভাষা, ধর্ম ও সমাজ। উহার বৈচিত্রেই ভারতবাসীর দুর্দশা। সকল ভাষা, ধর্ম ও সমাজের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও তাহাদের পরস্পর খুটিনাটিতেই সর্বনাশ। ক্ষুদ্র সংস্কীর্ণতাতেই ভেদ জ্ঞানের উৎপত্তি। তাহাতেই বিশাল বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন কোটরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ধর্ম ও সমাজের সৃষ্টি করিয়া মূল বৃক্ষের নাশ করিয়াছে। মহম্মদ, বুদ্ধ, খ্রীষ্টাদি সকলেই ধর্মের সংস্পর্শে ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য ও জাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইউরোপে সর্ব প্রথমে ফরাসি জাতির মধ্যে সাম্যনীতি ও স্বাধীনতার মন্ত্র জাগরিত হইয়া রাজা ও তাহার দেশ ও রক্ষকগণের রক্তস্রোতে ধরাতল প্লাবিত করিয়াছিল। সেই বিজয় বৈজয়ন্তীতে মহাবীর নেপোলিয়ান সিংহাসন ও পৃথিবী জয় করিবার সংকল্পে সমরানলে ইউয়োপ ছারখার করিয়াছিলেন। সেই দুর্দান্ত ফরাসি জাতিকে ইংরাজ জাতি জলে স্থলে পরাজিত করিযা পৃথিবীর পূজ্য প্রধান হয়েন। সেই ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ঔপনিবেশিক ইংরাজেরা অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ জাতির শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে স্বাধীনতার বীজ আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই শিক্ষাদীক্ষার নিকট এ দেশবাসিরা অতি আশ্চর্য কৌশলে পরাজিত হইয়াছিল। কলির প্রারম্ভে কপট দ্যুতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ রাজ্য হারাইয়া বনবাসী হইয়াছিল, নল হরিশ্চন্দ্রেরও সেই দশা, কিন্তু তাহাদের সকলেরই পুনর্রাজ্যলাভ হইয়াছিল। সেকালের অক্ষক্রীড়ায় জীবন্ত পাশা ও অক্ষ লইয়া হয় নাই; ইংরাজের রাজ্য লাভে কলিকাতায় তাহাতেই হইযাছিল। তাহাতেই ইংরাজের বিশেষত্ব ও কলিকাতার কথা মহাভারতের অপেক্ষা কোন অংশে নূন্য নহে। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া নূতন পাশাখেলার সৃষ্টি করিয়া ব্যবসা, জমিদারী চক্রান্ত, ও অর্থ বলে কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যে কতকার্য হইয়াছিল। তাহা লাভ করিবার জন্য জয়োপযোগী অর্থ, লোক বা আয়োজন করিতে হয় নাই। সমস্তই এদেশের লোকেরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। ইহাই ইংরাজদের ভাগ্যের বিশেষত্ব। কলিকাতার মন্ত্রণা সভায় অনেক জীবন্ত ঘুটী তৈয়ারি হইত ও তাহাদের খেলায় বোড়ের কিস্তিতে অনেক রাজা নবাব মাৎ হইয়াছিলেন। তাহাদের চালে এদেশের লোকগুলিকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ পশুবৎ করাইয়া কার্য করাইয়া লইত' সকলেরই তখন কলিকাতায় গিয়া কোম্পানীর কর্মচারী বা বেনিয়ান হইয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টা বলবতী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি গুরুজন ঐ কথা বলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতে আরম্ভ করে ও এমন কি উহা মেয়েদের গল্প ব্রতকথায় স্থান লাভ করিয়াছিল। যাহাতে এদেশের লোকেরা ইংরাজদিগকে পর না ভাবে সেজন্য তাহারা স্বদেশের বেশভূষা ও আচার ব্যবহারাদি ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা মসলিনের কামিজ, ঢিলে পায়জামা ও সাদা টুপি পরিয়া মুসলমান কর্মচারীর বেশে থাকিত ও তামাক খাইত। সকালে বিকালে কাজ করিয়া দুপুর বেলায় মাছ ধরিত। সন্ধ্যার সময় বিবি ডোমিঙ্গ আশের হোটেলে বসিযা গল্প-গুজব পানাহারে সময়ের সদ্ব্যবহার করিত। ভাগ্য প্রসন্ন হইলেই শত্রুর শত্রুতায় ও শুভ ফল হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ যদি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণের ন্যায় সমান কর ইংরাজ বণিকগণের নিকট দাবী করিতেন তাহা হইলে বোধহয় তাহারা কলিকাতাদি গ্রাম ক্রয় ও বাদশার নিকট দৌত্যাভিযানের ব্যবস্থা করিত না। ইংরাজগণের যাহা কিছু শিখিবার বাকি ছিল তাহা তাহারা কলিকাতায় চতুর আরমানি ব্যবসায়ীগণের নিকট শিক্ষা করে ও তাহাদের সহায়তাই নবাব উজির সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া সকল কার্যে জয়লাভ করে। কেমন করিয়া কি উপঢৌকনাদি দ্বারা এদেশের সামান্য লোক হইতে সম্রাট পর্যন্ত বশীভূত করা যায়, তাহার মন্ত্র ও কৌশল আরমানিরাই তাহাদিগকে শিখাইয়াছিল। আরমানিয়া উর্দু, পার্শি জানিত ও ইংরাজের দ্বিভাষীর কার্য করিত। খোজা সরহদ্দের নাম সেইজন্যই ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। মুর্শিদকুলি খাঁ বা দেশের বণিকগণের আপত্তিআদিতে তাহাদের কোন কিছুতে করিতে পারে নাই। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে আরমানিদের জন্য কাঠের গির্জা ইংরাজ কোম্পানীর ব্যয়ে নির্মিত ও তাহাদের উপর সদয় ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া কলিকালে ধর্ম ও প্রীতি বলাপেক্ষা যে অর্থ ও চক্রান্ত বলই শ্রেষ্ঠ সে কথার শিক্ষা ও দীক্ষা ইংরাজ জাতির হাতেকলমে কলিকাতায় হইয়াছিল ও তাহাদের গুরু আরমানিরা। তাহারা উহারই প্রার্দুভাবে সম্রাটের দরবার বা নবাবাদির নিকট প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। কলিকালের ব্রহ্মাস্ত্র কামিনী ও কাঞ্চন যাহার সহায় তাহার আর চিন্তা কি? কলিকাতায় ইংরাজ জমিদারীর কার্যের সঙ্গে উহার ব্যবসাদি করে। উহার মধ্যে নটীদাস ব্যবসায়ও করিয়াছিল। মুসলমান সম্রাট বা দেশের রাজাদির তখন এমন

কোনই ক্ষমতা ছিল না যে যাহার দ্বারা ইউরোপের বণিকগণকে জলযুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের এদেশে আসিবার পথ রোধ করিতে পারে। আর কথায় কথায় ফারমনাদি দিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ শোষন করা তখনকার সম্রাট ও তাঁহার প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের নিত্য কর্মের মধ্যে হইয়া পড়ে। সেই নিমিত্ত সেকালে ইউরোপীয় বণিকেরা তাহাদের কামধেনু স্বরূপ বড়ই আদরের ধন হইয়াছিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারির ফারমানে ইংরাজদের দেড় লক্ষ টাকা দণ্ড-বিধান হইয়াছিল ও তাহাদের বাণিজ্য করিবার অনুমতি দান করা হইয়াছিল। এই মহাপাপেই মুসলমান সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজ জাতির যদি কোন তপস্যার কথা উল্লেখ করা যোগ্য হয় তবে বলিতে হইবে যে তাহাবা সংযমী না হইলেও কামিনী-কাঞ্চনে বশীভূত হইয়া স্বজাতীয় ও স্বদেশের কোন অনিষ্টই করেন নাই। ফরাসি জাতির ইংরাজ জাতির মত সে গুণের ইতর বিশেষ হওয়ায় তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ফরাসি সৈনিক ও সেনাপতিরা এদেশের লোকদিগকে পাশ্চাত্য মতে রণবিদ্যা ও যুদ্ধ কৌশল শিক্ষাদান করে। ইংরাজ জাতি তাহা করে নাই কেবল সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করিয়া গুলি ছুড়িতে শিখাইয়াছিল, গোলাচালনাদি সমস্ত কার্যই ইংরাজরা করিত। ইংরাজদের রাজ্যলাভ "তোর শিল তোর নোড়া ভাঙবো তোর দাঁতের গোড়া" নীতিতেই হইয়াছিল। বাংলার সূক্ষ্ম সূত্র শিল্প নির্মিত "ঢাকাই মসলিন" জগদ্বিখ্যাত উহা উচ্চ মূল্যে মোগল দরবারে ও সুদূর ইউরোপে বিক্রয় হইত। প্রবাদ আছে যে এক রতি ওজনের তুলায় একশত পাঁচাত্তর হাত সূতা কাটা হইত। দেশের কিরূপ বিলাসিতার বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা উহাতেই লক্ষ্য করা যায়। তখন দেশে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নবাব বাদশারা কোনরূপ উপযুক্ত সৈন্যসামন্তাদি প্রস্তুত বা রক্ষা করিতেন না। বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্য সীতারাম প্রভৃতি যাহা কিছু করিয়া মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু ইংরাজের অস্ত্র-শস্ত্রাদির বা রণ-বিদ্যায় অনুমত ছিল না। তাহাতেই ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারের নিকট হইতে ঐ সকল স্থানে অবাধ বাণিজ্যের স্বত্বলাভ করিয়া কলিকাতা হইতে উহার কতিপয় সুবন্দোবস্তের জল্পনা আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা যেমন দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল তেমনি ভাগিরথীবক্ষে দুইখানি জাহাজ কামানাদি দ্বারা সুজজ্জিত করিয়া রাখিত। হুগলী, চুঁচুড়া, ফরাস ডাঙ্গায় ওলন্দাজ দিনেমার ফরাসিগণও সেইরূপ করিয়াছিল। অনলবর্ষী কামানের ভয়ে দেশের সৈন্যসামন্ত ভয়ে কাঁপিত সামান্য লোকেরত কথাই নাই। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিয়া কর্মচারী বা সুবেদারাদির উদর পূরণ করা যুক্তিসঙ্গত নয় ইহা তাহাদের সুহৃদ রাজারামের পরামর্শানুসারে স্থির করিয়া দুইটি কোম্পানী এক হইয়া হুগলী হইতে সমস্ত মালপত্র কলিকাতায় আনিয়াছিলেন ইহা সেকালের রোটেশন গভর্নমেন্টের কাগজপত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রথমে উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে একজনের নাম মিঃ টবাস কলি ছিল। রাজা মুকুন্দদেবের রাজধানী মালকণ্ডির কাপড় আজও বিবাহে বাঙালী বণিকে ব্যবহার করিয়া থাকে। মালখণ্ডি রাজসভায় বিবরণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দৈব প্রতিকূলতাবশতঃ সেখানে ইংরাজেরা কুঠি বা বাণিজ্য করা অপেক্ষা বাংলায় বাণিজ্যাদি করা স্থির করিয়াছিল। তখন বাংলার প্রধান লাভকর বাণিজ্য দ্রব্য সেরা চিনি ও রেশম ছিল। হিজলীর নিকট বাদশাহী লবণের কারখানা ও সুন্দরবন হইতে মোম ও মধুর ব্যবসা মোগল সম্রাটের একচেটিয়া ছিল। উহার নিকট বেগম রিডার বলিয়া স্থানে আরকানী বোম্বেটিয়াগণের আড্ডায়

ঐরূপ নাম হইয়াছিল। তাহারা লুটপাট করিত ইংরাজেরা কলিকাতায় থাকিলে তাহার প্রতিবাদ হইবে এই আশায় তাহাদিগকে ঐ স্থান বিক্রয় ও ব্যবসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা মসলিপট্টনের ছিট ও কাপড়ের ব্যবসা করিত। যেমন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব একজন বিখ্যাত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন তেমনি তাঁহার প্রিয়পাত্র মুর্শিদকুলি খাঁ আনুষ্ঠানিক মুসলমান ও তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে * সইফি মন্ত্রে সিদ্ধ করিয়াছিলেন ও উহাতে তিনি যুদ্ধাধি জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া গিয়াছেন। তিনি পীর অর্থাৎ সাধু পুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। কাটরার মসজিদ তাঁহার কীর্তি, তাঁহার চেহেল সতুন দরবারও উল্লেখযোগ্য। উহা চল্লিশটি স্তম্ভে সুশোভিত বাংলার জমিদারেরা সেইখানেই শুভ পূণ্যাহ কার্য করিত। ঐ দরবারে প্রবেশের সময় তখন অনেক জমিদার ভীত হইত বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া জমিদারেরা সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইতে ভয় করে নাই। মুর্শিদকুলী খাঁ অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত পাঁচবার নামাজ ও সম্পূর্ণ কোরাণ পাঠ করিতেন। অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন উপবাস, বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উপাসনা ও শুক্রবারে রোজা রাখিতেন। তাঁহার সে তপস্যায় ও বাদসাহের গোঁড়ামীতে ইংরাজ বণিকগণের তখন কোন ক্ষতিই হয় নাই, বরং তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে ইংরাজ বণিকগণ কিছুমাত্র ভীত বা তাঁহার তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইংরাজেরা উহাদের শত্রগণকে আশ্রয় দান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। তখন মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরাজ বণিকগণের বিরুদ্ধে যাহা কিছু করা উচিত তাহা সমস্তই করিয়াছিলেন। বাদসাহ সুবেদারের হুকুম ও বয়নামার কূটার্থ দ্বারা উহা কার্যে পরিণত করিবার যথেষ্ট বাধা দান করিতেন। তিনি হুগলীর ফৌজদারকে দিয়া এদেশের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী ও বণিকগণকে প্রকাশ্য সভায় ইংরাজ বণিকগণের সহিত ব্যবসা করা নিবারণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট পুত্র ফরক্শিয়ার ফৌজদারকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, উহা মুর্শিদকুলী খাঁর উপদেশ মতই হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁই ফৌজদারের বেতন বার্ষিক ২৪০০০ টাকা হইতে ৩২০০০ টাকা করিয়াছিলেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নায়েব নাজিম ও দেওয়ানি পদ লাভ করিয়াছিলেন। তখন মুসলমানগণের তপস্যায় তাহাদের স্ব স্ব পদ বৃদ্ধি নবাব মন্ত্রীতে উন্নীত হইত বটে, কিন্তু তখন উহাতে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হয় নাই, বরং শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। উহাদের তপস্যা ইংরাজেব মত বলবান ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁর পারিবারিক জীবন সুখময় ছিল না। তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে "কাজীশরফ খোদাকা তরফ" ঔরঙ্গজেবী নীতির বশবর্ত্তী হইয়া হারাইয়াছিলেন, আর সুজাউদ্দীনের হস্তে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে দান করিয়াও সুখী হন নাই। স্বামীর ব্যভিচার দোষে ক্ষুণ্ণ হইয়া জিন্নেতুন্নেসা বেগম পিতার নিকটেই থাকিতেন, পতি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ও নায়েব দেওয়ান স্বরূপে নিজের সুখ সম্ভোগে মত্ত থাকিতেন। তিনি পারশ্যদেশীয় প্রখ্যাত তুর্কবংশ সম্ভুত ছিলেন ও তাঁহার আত্মীয় আলিবর্দি খাঁ তাঁহার নিকট উড়িষ্যায় থাকিত। আলিবর্দি খাঁর পিতামহ বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের দুই ভাই ছিলেন ও সেইজন্য বাদশাহ সবকারে সুপরিচিত ছিলেন। ভাগ্যান্বেষী অজ্ঞাত আলিবর্দি খাঁ

* সিরাজ গ্রন্থকাব বলিয়াছেন— মুর্শিদকুলী খাঁ রসিদ খাঁব সহিত হস্তীপৃষ্ঠে সইফি শাস্ত্র পাঠ কবিয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন ও নিহত সেনা ও সেনাপতিগণের ছিন্ন মস্তক প্রকাশ্য রাজপথে প্রত্যেক স্তম্ভের উপব বাখিবার ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট মুর্শিদাবাদে আসিয়া সুবিধা করিতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর কন্যা পিতার মত ধর্মপরায়ণা ছিলেন ও পতি সুখে একরূপ বঞ্চিত হইয়াও পতিব্রতধর্ম প্রতিপালন করিতেন। বাংলার ইতিহাস বিশ্রুত এক মসনদ যাহা সম্রাট সাজাহানের পুত্র শাহসুজার আমলে প্রস্তুত হইয়াছিল; উহা রাজমহলে, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে চেহেলসতুন দরবারে বিদ্যমান ছিল। উহারই উপর বাংলার নবাবেরা অভিষিক্ত হইতেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, বঙ্গীয় নবাবগণের দুঃখ দারিদ্র্য দেখিয়া ঐ প্রস্তরময় সিংহাসনের বুক ফাটিয়া রক্ত ও বাষ্পবারি বিসর্জন হইয়া থাকে। সেই মসনদ লর্ড কার্জনের চেষ্টায় কলিকাতার মিউজিয়মে শুভাগমন করিলে ভারত সম্রাজ্যের ব্রিটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লিতে অন্তর্হিত হয়। সেইজন্য উহাকে শুভ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া অনেকেরই ধারণা নাই। উহার মধ্যে যে, কতকগুলি লাল দাগ আছে, উহা বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, উহার মধ্যে লৌহের ভাগের শীতল হইলেই কণা জমিয়া ঘর্ম নিঃসৃত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে মুসলমানী বিচার প্রণালীর বিলক্ষণ পরিবর্তন হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদে দেওয়ানি ও ফৌজদারী চারিটি আদালতে বাংলার যাবতীয় বিচার কার্য হইত। প্রধান প্রধান কানুনগোরা রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কার্য করিত ও সেই পদে কার্য করিতে করিতে তাহারা বাংলার জমিদার হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর গোড়ামি থাকিলেও তিনি গুণগ্রহী ছিলেন ও তাঁহার অধীনে অনেক হিন্দু বাঙালী প্রধান কর্মচারী ছিল। লাহরী মল্ল, রঘুরাম প্রভৃতি সেনাপতি, দর্পনারায়ণ ও রঘুনন্দনের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার ইতিহাস বাঙালীর ভাগ্যদোষেই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন। উহাতেই বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ ও মুসলমান লেখকগণ বাঙালীর চরিত্রে অযথা নানারূপ কালিমা ও কলঙ্কদান করিয়া থাকেন। বাঙালী কবিগণ ও ইংরাজী লেখকগণ বাংলা ও বাঙালীর দুঃখাদি উহারই রাজত্বে হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর অবস্থা তখন হইতে এখন কোন অংশে উন্নত হয় নাই, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। মহাবীর অলেকজাণ্ডারের সময় হইতে ইউরোপের বণিকগণের এদেশে শুভাগমণের সময় পর্যন্ত সেকালের বাঙালীর বীরত্ব কাহিনী ও গুণগরীমায় মুসলমান সম্রাট ও নবাবগণ মুগ্ধ ছিলেন ও তাহাদিগকে কন্যা, রাজ্যাদি দান দ্বারা মুসলমান করিয়া দেশে অনেক কালাপাহাড়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইংরাজ জাতির মধ্যে সেরূপ কালাপাহাড় নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। উহাই তাহাদের ঘোর তপস্যায় ফল ও উন্নতির মূল কারণ। বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশ-স্বজাতিদ্রোহিতাদি দোষেই সম্রাট নরপতি ও জাতি পদদলিত হইয়া থাকে। ইতিহাসে উহার শত সহস্র উদাহরণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বাংলাদেশের কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বিখ্যাত ছিল ও উহা রোমাদি নগরে আদরের সহিত গৃহীত হইত। মুসলমান রাজত্ব কালে সেই বাণিজ্যের কর্ম আরবাদি জাতি করিতে লাগিল, অগত্যা বাঙালী বণিকেরা উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। উহাতেই ভারতে আসিবার পথ বহু দিন পরে ইউরোপবাসিগণ আবিষ্কার করে ও এদেশের বর্হিবাণিজ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। মুসলমান রাজত্বকালে বাহির ও অন্তর্বাণিজ্যের হ্রাস ও দস্যুভয় ও উৎপীড়ন হইয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

টাকা— মোগল রাজ্যারম্ভে সর্ব প্রথমে গোলাকার টাকা প্রচলিত হয় ও তুরানি ভাষায় 'তঙ্কা' হইতে টাকা শব্দের উৎপত্তি। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বকালে সমচতুষ্কোণ বিশুদ্ধ রূপার টাকা ছিল। সেই টাকাই ওজন ও মাপের মূল ছিল। সরাসরি চব্বিশটি টাকায় একহাত ও একশত টাকার ওজনে একসের হইত। রাজার নামাদি উহাতে লেখা থাকিত।

তখন সিকি, দুয়ানি, আনি বা আধুলি ছিল না। কড়ির ব্যবহার ও বিনিময় অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। তখন এদেশে জিনিসের বিনিময়ে টাকার দামের জুয়াখেলা বা ব্যবসা ছিল না। বিখ্যাত সুন্দরী **নুরজাহানই** টাকা ভাঙাইয়া কড়ির বোঝা বওয়ার দুষ্কৃতি দূর করিয়া তামার পয়সা প্রচলিত করিয়াছিলেন। উহাতে কিছুই লেখা থাকিত না। রাজকীয় তত্ত্বাবধানে যে কেহ উহা নির্মাণ করিতে পারিত। সেইজন্য তাহার ওজন ও আকৃতির সামঞ্জস্যের অভাব হইত। উহাকে ঢেপুয়া বলিত ও এক টাকায় ষোল গণ্ডা ও এক ঢেপুয়া বিশ গণ্ডা কড়ির সংখ্যা নিরুপণ করিত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঢাকা, শান্তিপুর ও পাবনায় কাপড় সূতা ও মালদহ, রাজশাহী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড় প্রসিদ্ধ ছিল। রংপুরের হাড়ের জিনিস ও শ্রীহট্টের পাটিও তেমনি খ্যাত ছিল। মোগল রাজত্বকালে উহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও বাংলাদেশের গব্যঘৃত, ঢাকাই সোনা-রূপার অলঙ্কার; মুর্শিদাবাদের খাগড়াই বাসন, পাট, তামাক ও নারিকেলাদি দিল্লিতে যাইত ও বড় আদরের ধন ছিল। তখন সমস্ত শহরে ও পরগণার সদর কশবাতে ডাকঘর ছিল। রাজা জমিদারের চিঠি মাত্র বিলি করা হইত, অন্যান্য লোকের চিঠি মাশুল দিয়া লইয়া আসিতে হইত। তখন এখনকার মত টিকিট দিয়া মাশুল আদায় করিবার ব্যবস্থা ছিল না। দূরত্ব অনুসারে মাশুলের হারের কম বেশি হইত। জমিদারগণকে তাহাদের চিঠি বিলির দরুণ বার্ষিক মাশুল দিতে হইত। সম্রাট **শেরশাহই** সর্বপ্রথমে এদেশে ডাকঘরের সৃষ্টি করেন। তখনকাব বাদশাহ নবাবেরা হিন্দু কর্মচাবীগণকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত ও তাহারা রাজকার্যের যাবতীয় কার্য সুশৃঙ্খলায় সম্পাদন করিত। কার্য দক্ষতায় মুসলমানেরা হিন্দুর সমকক্ষ না হইলেও তাহারা সম্বন্ধ, ধর্ম বিদ্বেষাদি নানা কৌশলে নবাব বাদশাব নিকট প্রিয় ও উচ্চপদ লাভ করিত। উহাতেই মুসলমান রাজত্বের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। মুসলমান ধর্মপুস্তকে কুল ও মানের মর্যাদা বলিয়া কোন কিছু ছিল না, মুসলমান সকলেই সমান, অন্য সকলেই কাফের; উহাদিগকে মুসলমান করিতে পারিলে মহাপুণ্য। কেবল মহম্মদের বংশে কুল ও আভিজাত্যগৌরবের উৎপত্তি হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদের মধ্যেও দলাদলি ও মতভেদাদি লইয়া মারামারি আরম্ভ হয়। তাহাতেই তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। মোগল সাম্রাজ্যে সংবাদপত্রও বর্তমান ছিল, কারণ 'কানুন এজং' নামক পারস্য গ্রন্থে দেখা যায় যে, পাণিপথ যুদ্ধের শিবিরে সংবাদপত্র বাবর পাঠ করিয়াছিলেন ও সেই সময়ে হিন্দুরাজারা আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল। আইনি আকবরীতেও প্রতি মাসে গভর্নমেন্ট গেজেটের মত সংবাদপত্র বাহির হইত। আগরার দরবারে শাজাহান সংবাদপত্র পাঠে সে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু সংবাদ ও পীড়ার সমাচার ''পায়গম-এ-হিন্দু'' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। * তখন লাঠির বলে বাংলাদেশে জমিদারেরা রাজার মত রাজত্ব করিত। গোলাগুলির ব্যবহার করিতে তাহারা জানিত না। পাঠান রাজত্বকালে বাংলায় বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া সকলকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়াছিল। তখন উহাদিগের ও দুর্দান্ত জমিদারগণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন দিল্লির দরবারে আকবর প্রমুখ সম্রাটকে অনুরোধাদি করিতে হইত, তেমনি এদেশের কতকগুলি অকর্মণ্য কুলাঙ্গারগণ স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির

* বাদসাহদের প্রত্যেক শাসনকেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণের জন্য ''সওয়ানে নেগার'' নামক কর্মচাবী নিযুক্ত থাকিত।

জন্য ইউরোপের বণিকগণকে ধন লোক ও পরামর্শাদি দ্বারা বিলক্ষণ সাহায্য করিত। এদেশের লোকেরা উক্ত বণিকগণের আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও গোলাগুলি বর্ষণ দ্বারা মুসলমানগণকে যৎপরোনাস্তি বিপর্যস্ত করিতে দেখিয়া ঐ পথ অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়াছিল। সুলেমান নিজের সঞ্চিত অর্থ ও লোকবল দ্বারা কখন বাংলাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং সম্রাট আকবরের আনুগত্য কর ও উপঢৌকনাদি দ্বারা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র দাউদ খাঁই মুর্খ আমাত্যগণের পরামর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া দিল্লী সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইউরোপের বণিকগণের ব্যবসা ও রাজ্যলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বাংলাদেশে কর সংগ্রহ করিবার জন্য ও সম্রাটের হুকুম অমান্যের সময়ই দেশে সৈন্য সামন্ত আগমন করিত। তখন দেশরক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ উপযুক্ত সৈন্যসামন্ত ও সময়োপযোগী কোন ব্যবস্থা ছিল না ও হয় নাই। নবাবেরা ইহার জন্য ইউরোপীয় বণিকগণের বারম্বার পরাস্ত ও অপদস্থিত হইয়াও উহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করে নাই। সেই মূর্খতার কিয়ৎকাল মার্হাটাগণ এদেশে উৎপাত করিয়াছিল ও শেষে সুদূরের ইউরোপীয় বণিকগণের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপিত করে। মূর্খ বাংলার জমিদারগণ প্রতাপাদিত্যাদির পরিণাম দর্শন করিয়া আর কেহ সে পথের পথিক হইতে সাহসী হয় নাই। পাঠান রাজত্বকালে সে সকল বাঙালী রাজকার্য করিত, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ষড়যন্ত্রপ্রিয় ও শেষে জমিদার হইয়াছিল। সেকালে বিধর্মীর নিকট হিন্দুর কর্ম করা ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। উহাতেই যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা উহা উপেক্ষা করিয়াছিল তাহারা সম্মানিত ও জমিদার হইত। সেই সকল মহাপ্রভুরা সেই সময় হইতে মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী স্ত্রীলোক হইলেও অর্ন্তদৃষ্টি বলে উহা অনুমোদন করেন নাই। বাঙালী জাতির মধ্যে একতা, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়তার অভাবে বাংলাদেশ নদ-নদী, খাল-বিল জঙ্গলাদি দ্বারা স্বাভাবিক দুর্ভেদ্য হইলেও কতিপয় পাঠান সর্দারগণের ও কানুনগোর হস্তগত হইয়াছিল। আবার তাহাদের উপর দিল্লির সম্রাটের অবাধ্য পুত্র পৌত্র বা উমেদারগণ আসিয়া রাজত্ব করিত। উহাতে দেশের ও দশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইত না এবং কেহই উপযুক্ত শিক্ষাদির অভাবে উহা দূর করিবার পথ নির্ধারণ করিতে পারে নাই। কেবল আত্মাভিমান ও অর্থ রক্ষার জন্য সক্ষম ইউরোপের বণিকগণের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই স্থির করিয়াছিল। ইউরোপে সাধারণ প্রজাগণ প্রাণপণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সর্বদাই তৎপর, কিন্তু ভারতবর্ষে সহস্র যুগব্যাপী রাজতন্ত্র শাসন প্রণালীর ফলে জাতীয়তার জ্ঞান বহু দিন হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। তখন লোকের জাতীয় জয়, পরাজয় ও স্বাধীনতা জ্ঞান ছিল না। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সমস্ত জাতির সেই জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ বিনায়াসে এই বিশাল সাম্রাজ্য বাণিজ্য করিতে আসিয়া লাভ করিয়াছিল।

তখন নবদ্বীপে নব ন্যায়ের তর্কে বালক নিমাই এর নিকট দিগ্বিজয়ীর পরাজয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। ডাকাত বেণী রায়ের মত কেহই তখন চলন বিলে "**যবন মর্দিনীর**" মূর্তি স্থাপন করিয়া অত্যাচারীর মুণ্ড উৎসর্গ করিতে পারেন নাই। মানসিংহ তাহার ভ্রাতাকে দিয়া তাহার সহিত সন্ধিই করিয়াছিলেন। উহাতে কালীর দেবত্র সম্পত্তি লাভ ও তাঁহার দলবল সকলেই জায়গীর লাভ করে। সেই মূর্তি ভূমিকম্পে অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যই দেশ রক্ষার জন্য পর্তুগীজদিগের সাহায্যে বাঙালী জাতিকে বৈদেশিক যুদ্ধ প্রণালীতে অভ্যস্ত করিয়া মোগল বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, আর কেহই উহা করে নাই,

সেই মহাপাপেও মুসলমান নবাব সম্রাটের অধঃপতনে বৈদেশিক বণিকগণ দেশ, বাণিজ্য ও ধনরত্নাদি সমস্তই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। প্রতাপ সময়োপযোগী সামাজিক সংস্কার করিতে গিয়া সমাজের চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। সেকালে তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে গিয়া লোকগঞ্জনায় তাঁহার বিধবা কন্যা আত্মহত্যা করে ও তাঁহার মনোরথ সিদ্ধি হয় নাই। তিনি জাতি বিচার করিতেন না, তিনি বলবান নিম্ন শ্রেণীর বাগদি চণ্ডালাদিকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া সকলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে * যখন রাধানাথ রায়কে বাকি খাজনার জন্য অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মুসলমান হইতে হইয়াছিল তখন সমাজ নীরব, জমিদারেরা চাঁদা করিয়াও তাহাকে রক্ষা করেন নাই। সেই মহাপাপেই আর্যাবর্ত বিদেশী বণিকগণের করতলস্থ হইয়াছিল।

"Ambition, the desire of active souls
That pushes them beyond the bounds of nature
And elevates the Hero to the Gods"

মহাবীর আলেকজান্ডার যে সমরকন্দের সিংহাসনে সেকেন্দর বাদশা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই সিংহাসনে টাইমুর ও তাঁহার প্রপৌত্র বাবর বসিয়াছিল। যখন ভাস্কোদাগামা কালিকটে পদার্পণ করে ও ইউরোপের বিদেশী বণিকগণ ভারতে বাণিজ্যারম্ভের সূত্রপাত করে, তখনই বাবর সমর বিজয়লাভের জয়োল্লাসে উক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি বিলাসবিমুগ্ধ মুসলমান নবাব বা সম্রাট ছিলেন না। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিলাসিতার সুকোমল অঙ্কে লালিত ও পালিত হয় নাই। তাঁহার জীবন ভীষণ ক্লেশ পরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল জয় ও পরাজয়ের সন্ধিস্থলে সর্বদাই ব্যবস্থিত ছিল। তিনবার রাজ্যলাভ ও তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই। তিনি নিজের সুখের জন্য লালায়িত ছিলেন না, তাঁহার অনুচরবর্গ ও সৈন্যের সঙ্গে একত্রে বাস ও তাহাদের সহিত কোনরূপ তারতম্য বিহীন সুখ দুঃখ ভোগ করাই তাঁহার প্রিয় ছিল ও উহাতেই তিনি বহু অসুবিধার মধ্যে তাহাদের সাহায্যে জয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত কবি ও হৃদয়বান মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি জীবনের সুখ দুঃখ কর্তব্যের অনুরোধ কোন কষ্ট ক্লেশ বহন করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি পারসি বয়ানের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। বন্ধুর সহিত মৃত্যুও যে উৎসবময় হইয়া পড়ে এই কথার সারমর্ম যেন তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়াছিল। ১৩৯৮ খ্রীঃ টাইমুর ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল সেই কথা একশতদশ বৎসরের এক বৃদ্ধা রমণীর মুখে তাহার বাড়িতে বৃদ্ধার পৌত্র প্রপৌত্রগণের সঙ্গে শুনিয়া বাবরের হৃদয়ে সেই ভারতাধিকারের বাসনা জাগিয়া উঠে। বাবর তাঁহার জীবনী লিখিয়া সেকালের অনেক কথা ও আপনার শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় দান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কাবুল জয় করিয়া সৈন্যসামন্ত ও অশ্ববৃন্দের আহারাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্যই ভারতাধিকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাঁহার সেই দিকে লক্ষ্য হয়। টাইমুর ভারতের বহু মূল্য ধনরত্নরাজি ও শিক্ষাদীক্ষা কারুকার্য্যাদি দ্বারা সমরকন্দের ও স্বজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সেখানে মানমন্দির, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, কবি আদি, বিদ্বান ও ব্যবসায়ী লোক ছিল। সেখানকার বিবিধ ফলমূল অতীব সুস্বাদু ও তদ্ভিন্ন

* কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান জমিদারেরা তাঁহারই বংশধর।

সেখানকার যাবতীয় শ্রমলব্ধ শস্যদ্রব্যাদি চারিদিকে রপ্তানি হইত ও পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাগজ ও লাল রঙ আমদানি হইত। সেখানে বাণিজ্য ও বাজারের যেমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, তেমনি স্থাপিত বিদ্যার সমাদর ছিল। চেহেল সেতুন দরবার ও অন্যান্য অট্টালিকা বড়ই সুন্দর বলিয়া উহার অনুকরণ হইয়াছিল। বাবর ভারতবর্ষে তাঁহার দেশের মত সুস্বাদু ফল মূল ও আহারাদি নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া গিয়াছেন ও সেইজন্য উহা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সেই সকলের চাষাদি এদেশের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য আরম্ভ করান। সেই সময় হইতেই কাবুলের সুস্বাদু ফল মূল ও মেওয়া ভারতবাসির আদরের ধন হয়। বাবর এদেশের লোকেরা আপনার দেশের লোকেদের মত সামাজিক বা যন্ত্রবিদ্যা পারদর্শী বা স্থাপত্যবিদ্যা কুশল ছিল না বলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় সবিশেষ জানিবার তাঁহার সুবিধা হয় নাই বলিয়াই এইরূপ বলিয়াছিলেন। বাবরের জীবনীতে সেকালের মোগল জাতির উন্নতির মূল কারণ, তাঁহার অনন্য সাধারণ অধ্যাবসায়, ধৈর্য, বলবীর্য, সহিষ্ণুতা, শিক্ষা, দীক্ষা প্রমাণ করে। বাবর সেই সকলের আধার বলিয়াই তিনি ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একদিনে অশ্বারোহনে চল্লিশ ক্রোশ যাইতে পারিতেন ও সন্তরণ পটু ছিলেন। তাঁহার একাধিক পত্নী থাকিলেও তিনি তাহার জন্য তাঁহার বংশধরগণের ন্যায় রাজ্য ও লোকক্ষয় করেন নাই। বাবরই বাংলার পাঠান রাজত্বের বিদ্রোহানল যুদ্ধ করিয়া শান্ত করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গায় সাঁতার দিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু বাবর দীর্ঘজীবী হন নাই। তাঁহার লীলাখেলা ৪৮ বৎসরেই শেষ হয়! তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৪৮৩ খ্রীঃ ও মৃত্যু ২৬শে ডিসেম্বর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে হয়। তাঁহার নামের অর্থ ভক্ত, বাবরের সেই পরিচয় দিবার গুণ তাঁহাতে ছিল। মামুদ গজনী বহুবার ভারত আক্রমণ করিয়া গজনীকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছিলেন। শেষে তুর্কজাতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন ভ্রাতা মইজুদ্দিনকে গজনীর শাসন দণ্ড প্রদান করেন। মইজুদ্দিনই মহম্মদঘোরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ভারতে দ্বেষদ্রোহী বিভীষণ জয়চন্দ্রের প্রলোভনে ও উত্তেজনায় পরাজিত হইয়াও আর্যবলদৃপ্ত ক্ষত্রি বীর মহারাজা পৃত্থিরাজ ও মহারানা সমর সিংহকে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। সেই হইতেই মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছিল। শেষে সেই গজনী বাবরের প্রপিতামহ চেঙ্গিস খাঁর হস্তগত হইলে বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। ভারতে দাসবংশীয় মুসলমানেরাও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ক্রীতদাস আলপ্তগিন সমরকন্দের রাজদরবারে উচ্চ পদবী লাভ করিয়া শেষে বলপূর্বক গজনী অধিকার করে। তাঁহার কন্যার পাণি পীড়ন করিয়া ক্রীতদাস সবুক্তগিন গজনীর শাসনকর্তা হন। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পুত্রই ইতিহাস বিশ্রুত মামুদ গজনীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুবার ভারত আক্রমণ করেন। লাহোরে সেই গজনীর বংশধর খসরু মালিককে ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত ও বন্দি করিয়া মুসলমান দাসবংশের সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়। মহম্মদ ঘোরী বিশ্বাসঘাতক জয়চন্দ্রের প্রাণ ও রাজ্যাপহরণ করিয়া শেষে অসভ্য পার্বতীয় জাতির হস্তে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ বিসর্জন করে। সেই মহম্মদঘোরীর ক্রীতদাস কুতবউদ্দীন দিল্লির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার নামে মসজিদ ও মিনারে তাঁহার সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সেই কুতবউদ্দীনই বাংলার ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজিকে প্রেরণ করিয়া জয় করে।

হায়! ভারতের স্বাধীনতা সূর্য সেই হিন্দুর রাজাদের মৃত্যু ও তাহাদের বংশধরগণের কর্তব্য জ্ঞানের অভাবে দেবভোগ্য আর্যাবর্ত ক্রীতদাসগণের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। সেই কলঙ্ক

মোচন করিবার জন্য ভারতে কোন হিন্দু জাতি বা রাজার আবির্ভাব হয় নাই— ইহাই দেবতার অভিশাপ। হায়! গজনীর ও সমরকন্দের সিংহাসনাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সাম্রাজ্যাধিকার সেই সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে কুতবউদ্দিনের অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া মৃতু হইলেও মুসলমান সাম্রাজ্যের শেষ হয় নাই। বাবর তাহার জীবনীতে রাজপুত জাতির বলবীর্য ও রণকৌশল প্রশংশা করিলেও তাহাদের এই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টা না করায় যে মহাপাপ হইয়াছিল তাহার আর প্রায়শ্চিত্তের উপায় নাই। দ্বাদশ অশ্বারোহি সৈন্য দ্বারা বক্তিয়ারের বাংলা অধিকার ও বাবরের দ্বাদশ সহস্র অনুচরবৃন্দের সহিত সৈন্যাদি দ্বারা ভারতাধিকার প্রহেলিকাময় হইয়া রহিয়াছে। যখন মুসলমান জাতির ক্রীতদাসের মধ্যেও যখন স্বাধীনতা ও রাজত্ব লাভের চেষ্টা বলবতী হইয়াছিল, তখন হিন্দু রাজারা বা তদ্বংশধরেরা পৈত্রিক সম্পত্তি বা রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করাও ধারণার বহির্ভূত হইয়াছিল। তখন বিদেশী মুসলমান বা তাহাদের ক্রীতদাসেরা ক্রমাগত যে রাজ্যলাভ করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তখন ভারতবাসীর কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল উহাতেই স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে।

হায়! সে সময়ে হিন্দুরা মুসলমান নবাবাদির অনুগ্রহে দেশের লোকের সর্বনাশ করিয়া নিজে পদস্থ জমিদার হওয়া ধর্মসঙ্গত মনে করিয়াছিল। মুর্শিদখুলী খাঁর অত্যাচারে উদয়নারায়ণ সর্বস্বান্ত ও রামজীবন নাটোরের জমিদার হইলেন তাহাতে কেহ কোন কথা কহিল না, সমাজ বা জমিদারগণ কোন আপত্তি করিল না তখন বিদেশী বণিকগণ এদেশের ধন ধান্য ব্যবসা ও রাজ্যলাভ করিবে, উহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তখন দেশের লোককে মাতৃভাষা শিক্ষা না করিয়া প্রাণ, মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য পারসী ও উর্দু শিক্ষা করিতে হইত। অগত্যা শাস্ত্রাদি অধ্যয়নও রক্ষা করা কেবল ব্রাহ্মণ জাতির একচেটিয়া হইয়াছিল। তখন আজকালের মত বিদ্যালয়ে অর্থ দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করিবার উপায় ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে দিয়া যাবতীয় হীন সাংসারিক ও পারিবারিক কার্য করাইয়া লইত, অনুগ্রহ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট বা উদ্বর্ত্তান্ন দান ও ব্রাহ্মণছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিত। সেকালের জমিদারেরা অধ্যাপকগণের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা, জমি-জায়গা বা বাৎসরিক বৃত্তি দ্বারা করিতেন। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপকের ব্যবস্থাদি ও দণ্ডাদি দ্বারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব বা অত্যাচার করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেন। তখন কথায় কথায় লোকের জাতপাত ও সমাজচ্যুতি হইত। তখন ব্রাহ্মণেরা প্রবল তাহাদিগকে জমিদার ও নবাবের কর্মচারীরা অর্থাদি দ্বারা বশীভূত করিয়া দেশের ও দশের বহু প্রকারে নানা অনিষ্ট করিয়াছে। এইরূপে জমিদার, ব্রাহ্মণ, নবাব ও কর্মচারীরা জাতির হর্ত্তাকর্তা হন। কেহ অধ্যাপকগণের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কার্য করিতে সাহস করিত না। উহাতেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ যখন এমনই বিশৃঙ্খল তখন বিজাতীয় বিধর্মী বিদেশী বণিকগণ যে, দেশ ও রাজ্য লাভ করিবে উহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হিন্দুর মন্দির মুসলমানের মসজিদ বিনা আপত্তিতে পরিবর্তিত হইত। বলবান মুসলমান নবাব বা উচ্চ কর্মচারীরা বলপূর্বক সুন্দরী রমণী গ্রহণ করিত, কাহারও কোন কথা বলিবার বা অভিযোগ করিবার স্থান ও উপায় ছিল না। তখন দেশবাসি সেই অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত বিদেশী বণিকগণকে রাজার ন্যায় সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হইত না বা জাতি কুলাদি রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায়ই তখন বর্তমান ছিল না বলিলেই অত্যুক্তি মনে হয় না। সেকালের জমিদারেরা জমির মালিক

ছিল না, কর সংগ্রাহক বৃত্তিভোগী মাত্র ছিল। তখন তোষামোদ ও অর্থ বলই উন্নতির কারণ হইয়াছিল; গুণের আদর অতি অল্পই ছিল। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইত, ঘটনাচক্রে মূর্খ পণ্ডিতও বুদ্ধিমান হইত। অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি সম্রাটের সিংহাসন হইতে উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে সম্মানিত হইত। তখন অলীক গর্বাভিমানে কত শত যুদ্ধ ও রাজ্য ক্ষয় হইত। যড়যন্ত্র করিয়া বলবানকে পক্ষভুক্ত করিয়া শত্রুর সর্বনাশ করা সনাতন ধর্মস্বরূপ হইয়াছিল। পিতা পিতৃব্য হত্যা বা কারারুদ্ধ বা বিশ্বাস বিমুগ্ধ প্রভুকে হত্যা বা গরল দানে রাজ্য লাভ করা, তখনকার রাজা হইতে দাসগণের বিবেক বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। উহাতেই বিদেশী বণিকেরা অন্যের রাজ্যাদি লাভের সহায়তা করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঈর্ষা মূর্তিমান হইয়া আর্য রাজনীতির নিয়মাবলি সমূহের প্রতি লোকের দৃষ্টিপাত ছিল না। বিদেশী বণিকগণের শুভাগমনেও ব্যবসায়ে স্বর্ণ প্রসূ ভারতের সুলভ দ্রব্যের বিনিময়ে বৈদেশিক ধন রত্নাদি আহরণ করা শেষ হইয়াছিল। দেশের ভিতর পণ্যদ্রব্যাদির উপর শুল্কাদিতে যে রাজস্ব আদায় হইত উহার সর্বনাশ ইউরোপের বণিকগণের চতুরতায় হইয়াছিল। মূর্খ বাদশা নবাব তাহাদের প্রতিনিধিগণ উপহার উপঢৌকনাদিতে বশীভূত হইয়া দেশের বণিকগণের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যের উপর শতকরা পাঁচ হইতে কুড়ি টাকা মাশুল আদায় করিত কিন্তু ইউরোপের বণিকগণের নিকট হইতে এককালে বার্ষিক দুই তিন সহস্র টাকা মাশুল নির্ধারণ করিয়া দেশের যাবতীয় বাণিজ্য তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে তখন রাজস্বের কিরূপ যে ক্ষতি হইয়াছিল উহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। কলিকাতাদি স্থানসমূহ সেই বিদেশী বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই উহাকে সমধিক সমৃদ্ধশালী করিয়াছিল। শাসনকর্তাদের ক্ষমতার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কর্মচারিরা যথেচ্ছাচারী ও অর্থলোভী হইয়া পড়ে। দেশের দুরবস্থার প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। বিদেশী বণিকগণ অর্থবলে ও কৌশলে সেই সকল অকর্মন্য শাসনকর্তা ও তাহাদের কর্মচাবিগণকে বাধ্য ও বশীভূত করিয়া এদেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, জমিদারী ও রাজত্ব ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত করিয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহা ক্রমে ক্রমে যতই হ্রাস হইয়া পড়ে, ততই জমিদারগণের উপর অত্যাচার ও কর বৃদ্ধি হইতে থাকে। উহাব বিষময় ফলেই দেশের বাংলার জমিদারগণ সাতপুরুষের জমিদারী হইতে বঞ্চিত ও প্রজাবর্গের আর্তনাদে দেশে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান রাজকর্মচারীরা ক্রমে ক্রমে অর্থাদিকৌশল দ্বারা সেই সকল জমিদারী হস্তগত করিয়া দিল্লির দরবার হইতে খেলাৎ মনশাবদারী আনাইয়া প্রজাপীড়ন ও জমিদারী আরম্ভ করে। তাহাতেই প্রজারা চাষাদি ত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ণ করে। বাংলার সেই অত্যাচার ও দুরবস্থার সময় লাঠিয়াল পাইকেরা ডাকাত জমিদারগণের প্রজাপীড়ন ও অবসর ক্রমে ডাকাতি করিত। দেশের এমন দুরবস্থার সময় ইউরোপের বণিকগণের এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজ্যলাভ করার বিশেষ পৌরুষেরও সৌভাগ্যের কথা বলিয়া বোধহয় না। ইংরাজের রাজ্যলাভে কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের বিশ্বাসঘাতকতায় বা মূর্খতায় হয় নাই, কিম্বা ইংরাজ জাতির ক্লাইভ প্রমুখ ব্যক্তির শৌর্যবীর্যে বা ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস প্রমুখের রাজকার্য কৌশলে বা নৈপুণ্যে উহা আদৌ হয় নাই। কিছুদিন পূর্বে যাহা মূর্খ পাঠানগণ করিয়াছিল উহাই চতুর বণিকেরা বিশেষ কোন ঘোর তপস্যা বা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়া লাভ করে নাই। মোগল শাসক সম্প্রদায় যে কিছু প্রতিকূলতাচরণ ও শত্রুতা করিয়াছিল, উহা কেবল অর্থলাভ

লালসা প্রণোদিত ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। বিদেশী বণিকজাতি অর্থলাভ লালসায় সেই সকল গর্হিত অত্যাচারের অতি সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়া তাহাদের জরিমানা উৎকোচাদি দিয়া গূঢ় উদ্দেশ্য সফল করিয়া কোন বিশেষ গুণগরিমার পরিচয় দান করেন নাই, বরং তাঁহারা কলির ধর্ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াই দেশের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। উহাতে যেন কলির কল্কী অবতার ক্লাইভকে বোধ হইয়াছিল। কলিকাতায় সেই অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। কলিকাতায় ইংরাজের পরাজয় উহার উদ্ধার ও সিরাজের পরাজয় ও হত্যায় ক্লাইবকে কল্কী অবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করা দোষের হয় নাই। তিনি যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া বহুদিনের মুসলমান রাজত্বের মূলোৎপাটন ও দেওয়ানি লাভ করিয়াছিলেন সেরূপ সৌভাগ্য দেখিয়া যে কেবলমাত্র হিন্দু জাতি যে তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল উহা নয়, কি মুসলমান কি ইংরাজ সকলেই তাঁহার গুণ ও শৌর্য্যবীর্যে মুগ্ধ। তাঁহার স্মৃতি কলিকাতার সেকালে প্রধান রাস্তার নামকরণে রক্ষিত কিন্তু তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন মূর্তি যাহা এতকাল হয় নাই উহা লর্ড কার্জন করিয়া মারকুইস উপাধি লাভ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন।

পরকাল বিমুগ্ধ হিন্দু জাতির শিরোমণি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ সকলেই সেই বিশ্বাসে ক্লাইভ ও ইংরাজ জাতির পক্ষপাতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি, মীরজাফর মনিবেগমাদি সকলেই ক্লাইভের গুণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সহিত সমস্ত পরামর্শ ও প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে উইলে অর্থদান পর্যন্ত করা কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন। পূর্বজন্মার্জিত তপস্যাই সৌভাগ্যের মূল ইহা অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করিয়া থাকে। সেই মতানুসারে ক্লাইভ ও ইংরাজ জাতির পূর্বজন্মার্জিত তপস্যার ফলেই কলি ও শক্তিমতি কালীদেবীর অনুগ্রহে কলিকাতা উদ্ধার ও পলাশির যুদ্ধ জয় করিয়া বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী জব্‌ চার্ণব প্রভৃতিরা তাঁহার ভোগৈশ্বর্যের ও কীর্তি মহিমার পরিচয় দিবার জন্য যেন দূত স্বরূপ যাহা কিছু করিবার তাহা করিয়াছিলেন। রাম না হইতে হইতেই যেমন বাল্মিকী রামায়ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এইরূপ প্রবাদ, তেমনি ক্লাইভের প্রতিদ্বন্দী বলিয়া সিরাজকে রাবণের আসন দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ঐতিহাসিক ও কবিরা বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর বলবীর্যের সবিশেষ প্রসংশা করিয়া জেতার মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন। উদ্দাম চিত্তবৃত্তিকে কেবল রুদ্ধ করিয়া যে বিষময় ফল হয়, ইতিহাসে উহার উদাহরণ মহজুদ্দীন কারেকোবাদ, সিরাজউদ্দৌলা নয়, ইহা বলিয়া অবতারণিকা করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্বয়ং মহাত্মা ব্যাসদেব মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বের ৩য় অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছেন যে, মানব সমস্ত কর্মই ঈশ্বর প্রেরণায় করিয়া থাকে, উহাতে বিশেষ ব্যক্তির কোন অপরাধ নাই ঃ—

> "নহি কশ্চিৎ স্বয়ং মর্ত্তাঃ স্ববশঃ কুরুতে ক্রিয়াং।
> ঈশ্বরেণ চ যুক্তোহয়ং সাধ্বসাধু চ মানবঃ
> করোতি পুরুষঃ কর্ম তত্র কা পরিদেবনা।।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় জমিদারী ও ব্যবসা

কলিকাতা কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের মন্তব্যে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, ইংরাজেরা যে পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ঘর করিবার অনুমতি পান নাই, তদবধি চালা মাটির ঘরেই মালাদি রাখিতেন এবং তাঁবুতে বা জাহাজাদিতে বসবাস করিতেন। উহারা সেরেস্তার কাগজাদি লালদিঘির উপর জমিদারদের কাছারি বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিতেন। তখন লালদিঘি এত বড় ছিল না। সেই পূর্ব স্মৃতিই, বোধহয়, এখন উহার ধারে ট্রেডস্ এসোসিয়েসন ডেলহাউসির স্মৃতির সঙ্গে সম্মিলিত। ঐ দিঘির উপর জমিদারদের বিগ্রহের দোলমঞ্চ ছিল। তাহাদের আমমোক্তার ফিরিঙ্গি এন্টুনি দোলের সময় উৎসবাদিতে ইংরাজ কর্মচারীগণকে ভিতরে গিয়া উহা দেখিতে না দেওয়ায় চার্ণক চাবুকের বহরে রসিকতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এন্টুনি সেই অপমানের প্রতিকার করিতে না পারিয়া অগত্যা কলিকাতা ত্যাগ ও কাঁচড়াপাড়ায় বাসারম্ভ করে। হুগলীতে বিবাদ ও কলিকাতার জমিদারের অমোক্তারকে ঐরূপ অপমান করা মুষ্টিমেয় ইংরাজের মধ্যে চার্ণকই স্বীয় হঠকারিতার পরিচয় দিয়া ভবিষ্যতে ইংরাজের কলিকাতা লাভ ও তথায় বাণিজ্য ও রাজ্য লক্ষ্মী সূত্রপাতের উপলক্ষ্য হইয়াছিল। ইংরাজরো কি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া সেকালে সেই ঘোর অস্বাস্থ্যকর কলিকাতায় চালাঘরে ব্যবসা আরম্ভ করে, উহা উপলব্ধি করা কল্পনার চক্ষেও অসম্ভব। হুগলীর ব্যাপারে যখন মুসলমান কর্তৃপক্ষেরা ইংরাজের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া, তখন সাবর্ণ চৌধুরীরা তাহাদের আমোক্তারের অপমান গলাধঃকরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই স্থির করে ও তাহাদের সহিত ভবিষ্যতে পুনরায় বিবাদ-বিসম্বাদ ও অপমানের ভয়ে জমিদারীর স্বত্ত্ব বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কোম্পানীকে উহা খরিদ করিবার অনুমতি লাভের জন্য মুসলমান সুবেদারাদিকে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল; কিন্তু দলিলে জমিদারের ভাগ্যে বিক্রয় মূল্য মোট তের শত টাকা মাত্র উল্লেখ আছে। ৯ই নভেম্বর ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা কলিকাতাদি কয়েকখানি গ্রাম যে দলিলে খরিদ করেন, এখনও উহা অতি যত্নে বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে। এখনকার কলিকাতার অত্যন্ত অলিগলির মধ্যে এক কাঠার দাম তখনকার সমস্ত কলিকাতাদির দামের চর্তুগুণ হইয়াছে।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ রালফ্ শেলড্ন্ কলিকাতার প্রথম কলেক্টর হইয়া জমি বিলি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুসলমান শাসনকর্তাকে তাহাদের খরিদা জমিদারীর খাজনা বার শত টাকা দিত। প্রথমে কিছুই লাভ ছিল না, কিন্তু চার বৎসরের মধ্যে ৪৮০ চারি শত আশি টাকা লাভ হইয়াছিল ও ক্রমশঃ উত্তরোত্তর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইতে থাকে

শেষে ১৭০৯ খ্রীঃ ১৩০০ টাকা হয়। নয় বৎসরে দেখা যায় যে, যত টাকার খরিদ, তত টাকা বাৎসরিক লাভ। সাহাজাদা আজিম উশ্বান বঙ্গদেশ হইতে যত অর্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কোন মুসলমান শাসনকর্তাই করতে পারেন নাই। তিনিই কলিকাতাদি গ্রাম প্রায় ২০০০০ টাকা নজর লইয়া ইংরাজ বণিকগণকে বিক্রয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর উহাতে সম্পূর্ণ অমত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর অমতেই ইংরাজদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় ও খরচা বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলায় নবাবী আমলের কর্তৃত্ব মুর্শিদকুলী খাঁর আমল হইতেই সূত্রপাত হয়। ঔরঙ্গজেব ইংরাজদের উপর বিরক্ত হইয়া ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে যে পরওনা জারি করেন উহাতে এক বৎসরে কোম্পানীর বাষট্টি হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। অতএব উহাতেই দেখা যায় যে কলিকাতায় জমিদারী ও ব্যবসা ইংরাজ কোম্পানীর একাদশ বৃহস্পতির সময় হয় নাই।

মল্লিক— রাজারামের দৌত্যাভিযান ও চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ এবং হুগলীর কুঠি বন্ধ হইয়া কলিকাতায় সেই যুক্ত কোম্পানী ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ হইতে এক মোহর দস্তকে কার্যারম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে উভয় কোম্পানীর আত্মকলহ শেষ হওয়ায় মুসলমান কর্তৃপক্ষগণের লাভের বিলক্ষণ হানি হয়। উহারা রাজারামের উপর খড়্গ হস্ত হয় ও অগত্যা তিনি ত্রিবেণী হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। উক্ত রাজারামের দুই পুত্র, দর্পনারায়ণ ও সন্তোষ কুমার। উহারা কলিকাতায় মল্লিক বংশের বসবাস উপযোগী অট্টালিকা ও বাজারাদি করিয়াছিলেন। কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজে সেই সন্তোষ বাজারের উল্লেখ আছে ও সন্তোষ মল্লিক অনুরোধ করায় রামভদ্রকে নন্দরাম সেনের কার্য বাজারের হিসাব পরিদর্শনাদির ভার দেওয়া হয়। নন্দরাম সেনের নাম কলিকাতার রাস্তা ও শিব প্রতিষ্ঠায় বর্তমান। উপযুক্ত বিশ্বাসী লোকের অভাবে ঐ পদ বহু দিন খালি থাকে। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কলিকাতার মণ্ডী বাজার ও সন্তোষ বাজারের নাম মাত্র পাওয়া যায়। তৎপরে বড়বাজার ও লালবাজারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাল দিঘির পঙ্কোদ্ধার চারিপাশে পথ-ঘাট, সব্জী ও ফলের বাগান করা হয়। ইংরাজ কর্মচারী সেই লালদিঘির মিঠা পাণির বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়েন ও ঐকথা চলিয়া আসিতেছে। সেকালে সেই জলাবাদা ভীষণ জঙ্গল ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল পরিবেষ্ঠিত কলিকাতায় কোম্পানীর কর্মচারীরা হরিণ বাঘ শিকারাদি করিত। কোম্পানীর জমিদারিতে প্রথমে রাজারাম মল্লিক বিনা খাজনায় বড়বাজারের জমি জায়গায় ঘরবাড়ি ও বাজার করিতে পাইয়াছিলেন পরে অতি অল্প খাজনায় অন্যান্যকে জমি বিলি পাট্টাদির দ্বারা করিতে আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতার অভ্যন্তরীণ জমিজমা বিলি জরিপাদি ও অন্যান্য যাবতীয় কার্য ইংরাজ কোম্পানীই করিত। তখন পুরাতন দুর্গের মধ্যে কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী গভর্নরের বাড়ি অতি সুন্দর ও প্রশস্ত ছিল ও উহার বাহিরে চতুর্দিকে ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে বাড়ি আদি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাল দিঘির উত্তরে (বর্তমান সেক্রেটারিয়েট অফিসের স্থানে) কলিকাতার প্রথম গির্জা সেন্ট এন নির্মিত হইয়াছিল। লালবাজারের পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে উমি চাঁদ প্রভৃতির বাগানাদি হয় ও সেইখানে উহারা কোম্পানীর কর্মচারীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিত। এইরূপে কলিকাতার উন্নতি বসবাস উহাদের দ্বারা হইয়াছিল। দলিলাদি রেজিস্ট্রী করার ভার কালেক্টারগণের উপর ছিল ও উহা না করিলে জরিমানা আদায় করার ব্যবস্থা ছিল। ঐ জরিমানার টাকা হইতে রাস্তাদি সংস্কার করা হইত। বাড়ি-ঘর-জমি বিক্রিতে শতকরা ৫

টাকার হিসাবে কর আদায় করা হইত। কোম্পানীর কর্মচারিরা মাসিক কুড়ি টাকা বেতন, খোরাকি ও জ্বালানি কাঠ পাইত। কলিকাতার চারিদিকে পাহারা দিবার জন্য এদেশী ৬০ ষাটজন লোক, একজন ইংরাজ করপোরাল ও ছয় জন গোরা সৈন্যের অধীনে কার্য করিত। থানার কোতয়াল তাহাদের সাহায্য করিত। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কোম্পানীর বিচার পদ্ধতির প্রতিষ্টা হয়। প্রতি শনিবার নয় ঘটিকা হইতে ১২টা পর্যন্ত কাউন্সিলের তিনজন সভ্য বিচার করিত ও অপরাধির জরিমানার টাকা হইতে শহরের খানা ডোবা ভরাট ও নর্দমাদির সংস্কারাদি করা হইত। চোর ডাকাতকে গলায় তপ্ত লোহার ছাঁকা দিয়া গঙ্গা পার করিয়া দেওয়া হইত। পুরাতন দুর্গের চারিধারে জঙ্গল পরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় নালাদির যথারীতি সংস্কার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম হাসপাতাল হয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে শহরে কোম্পানীর কর্তপক্ষগণের অনভিমতে বাড়ি ঘর পাঁচিল পুষ্করণাদি যথেচ্ছা করিবার ক্ষমতা কোম্পানীর কাউন্সিল বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭০৪ হইতে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আট জন কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি মাসে কালেক্টার কাউন্সিলে খাজনা আদায় ও আয় ব্যয় দাখিল করিত। কলিকাতা কাউন্সিলের মেম্বারেরা প্রত্যেকে বার্ষিক সাড়ে ছয়শত টাকা ও প্রেসিডেন্ট ও পাদরী সাহেব বার্ষিক পনের শত টাকা বেতন পাইতেন। বিবাহিত কর্মচারীরা দুর্গের বাহিরে থাকিত ও বাড়ি ভাড়ার জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা পাইত; প্রেসিডেন্টের থাকিবার পৃথক বাড়ি ছিল। তখন তাহারা বায়ু পরিবর্তন করিবার জন্য নদীয়ায় যাইত। তখন কলিকাতায় সবে মাত্র আটটি পাকা বাড়ি ও আট হাজার মেটে ঘর, দুইটি রাস্তা ও দুটি গলিতে যাতায়াতের পথ ছিল। ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরের ছোট ছোট ঘরগুলি ভাঙিয়া গুদাম ও কর্মচারীগণের থাকিবার ঘরাদি ডক ও ঘাটাদি বাঁধানাদি কার্য আরম্ভ হয়। তখনকার কলিকাতার অধিকাংশ স্থানই বন ও জঙ্গলময়; মধ্যে মধ্যে কলাবাগান, শাক-শব্জীর ক্ষেত্র ও চাষ কার্যাদি হইত। সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকল ধর্মের লোকের সহিত সাম্যাদি রাজনীতির মন্ত্রৌষধিতে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার ও দৃঢ় করিয়াছিলেন ও তাহার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের সময় হইতেই উহার পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। শায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলায় সুখশান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা চিরস্থায়ী হয় নাই। শোভাসিংহাদির বিদ্রোহানল বাংলাকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বিদ্রোহী রহিম সার মস্তক ছিন্ন করিয়া হামিদ খাঁ কোসেরী বলবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় দিয়া আজিম উশ্বানের বাংলায় সুবেদারীর পথ পরিস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় ইংরাজদের কলিকাতাদি লাভ ও নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বাংলায় কর্তৃত্ব লাভ হইয়াছিল।

ইংরাজের স্বদেশী বাণিজ্য—বঙ্গভূমির শস্যসম্পদ প্রাকৃতিক অনুকম্পায় ভারতে শ্রেষ্ঠ বলিলেও বলা যায় ও সেই সোনার বাংলার ধনসম্পত্তি বাণিজ্য দ্বারা রক্ষিত হইত। কিরূপে উহার মূলে ইংরাজ জাতি কলিকাতাদি জমিদারী লাভ করিয়াই কুঠারাঘাত করিয়াছিল, উহা ইতিহাসের কথা। * বিলাতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে যে আইন পাশ হয় তাহার মর্ম এই যে, পূর্বদেশের (East India) ব্যবসায় স্বদেশের সর্বনাশ করা যাইতে পারে না। স্বদেশের ধন মুদ্রাদি নষ্ট করিয়া বিদেশের দ্রব্যাদি ক্রয় করায় স্বদেশের লোকের অভাব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি

*11&12 will III ch.10 (1700) An act for the more effectual employing the power by encouraging the manufactures of this kingdom

করা যুক্তিসঙ্গত নয়; সেইজন্য ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯এ সেপ্টেম্বরের পর হইতে কোন ইংরাজই বাংলার সিল্ক কেলিকো আদি ও অন্যান্য যাবতীয় ভারতীয় পণ্য দ্রব্যাদি স্বদেশে আনয়ন বা ব্যবহার করিতে পারিবে না ও তাহা করিলে তাহার যথারীতি গুরুতর দণ্ডবিধান করা হইবে। আর যদি কেহ সেই সকল দ্রব্য বিলাতে আনয়ন করে, তবে উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই সকল পুনরায় সেই দেশে ফেরত পাঠান হইবে। এই গূঢ় নীতির বশবর্তী হইয়া কলিকাতায় ইংরাজ জাতি জমিদারী ও ব্যবসা আরম্ভ করে। তখন কলির সহিত কলিকাতার উন্নতি ও সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, ইহা সিদ্ধান্ত করা একেবারে অযৌক্তিক নয়। ইহা উল্লেখ করিলেই সেকালে বাণিজ্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে সমস্ত কথাই বলা হইল মনে হয়।

২১ এ ফেব্রুয়ারী ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব সমগ্র ভারতের সাম্রাজ্য একচ্ছত্রীকরণে মুসলমান ধর্মের উন্নতি ও দাক্ষিণাত্য জয় করিতে গিয়া জীবনের শেষ দশায় রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে ৯২ বৎসরে ইহলীলা শেষ হইয়াছিল। মুসলমান গ্রন্থকারগণ ঔরঙ্গজেবকে মনস্বিতা ও ধর্মোপাসনায় উচ্চস্থান দিয়া আলমগীর উপাধিতে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। সিংহাসন লাভার্থ পিতা ও ভ্রাতার প্রতি যাবতীয় ধর্ম বিগর্হিত নৃশংস ব্যবহার ও হিন্দুদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ ও তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দান উপেক্ষা করায় ভগবান তাঁহার সেই চিরবাঞ্ছিত শুক্রবারের মৃত্যু কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহার ধর্মজীবনের প্রশংসা অবশ্যম্ভাবী। দিল্লির সিংহাসন বিনা রক্তপাতে প্রায়ই অধিকার হয় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব মৃত্যুকালে নিজ মুখে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাতরোক্তি লিখিয়া রাখিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন উহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। সে সময়ে অন্য কাহারও নামে কোন জাহাজের নামকরণ বড়ই সম্মানের চিহ্ন ছিল, তদনুসারে যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একখানা ৪৫০ টন জাহাজের নাম "ঔরঙ্গজেব" রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে পিতার ন্যায় ঔরঙ্গজেবের পুত্রেরাও বুঝিয়াছিল যে, এক কম্বলে দশ দরবেশের স্থানের অভাব হয় না, কিন্তু এক সাম্রাজ্যে দুই রাজা থাকিতে পারে না। আজিম উশ্বানের পিতারই ভাগ্যে দিল্লির সিংহাসন লাভ হইয়াছিল ও তাঁহাকে বাংলা ত্যাগ করিয়া দিল্লিতে থাকিতে হয়। তিনি খাঁ হইতে সম্মানিত করিয়া তাঁহার পুত্র ফরকশেরকে নামে মাত্র সুবেদারি দিয়া রাখিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর পরামর্শানুসারে ফরকশের প্রায় যাবতীয় কার্য করিতেন। উহাতে যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাশিমবাজার হইতে মালপত্রাদি কলিকাতায় আনাইলেন। আজিম উশ্বানের পিতার সাম্রাজ্য ভোগ বেশি দিন হইল না। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ বাহাদুর শার মৃত্যু হয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়জুদ্দিন আজিম উশ্বানকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়া দিল্লির সিংহাসনে জেহেন্দার শা নাম ধারণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। সেই দিল্লির সিংহাসনারোহণের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বন্দি কর্মচারীদের মুক্তিলাভ ও মাল আটকাদি ছাড়াইতে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। চিরন্তন প্রথানুসারে বিপ্লবের সময় ইউরোপের বণিকগণ কুঠি আদি দৃঢ় করিত। ইংরেজেরাও কলিকাতার দুর্গাদির চতুর্দিকে গড় খাত ও বুরুজের উপরে কামানাদি সুসজ্জিত করে। সেই সময়েই বাংলার প্রেসিডেন্ট মাদ্রাজের অধিনতা পাশ ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার রোটেশন গর্ভনমেন্টের শেষ হয়।

ফৌজদারী বালাখানা— ঐ বৎসর ২০এ জুলাই তারিখে কলিকাতার নূতন গভর্নর আসিবার সময় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আট হাজার হিন্দু, দুই হাজার একশত পঞ্চাশ জন মুসলমান ও আঠার শত খ্রীষ্টান উপস্থিত হইয়াছিল। বিপ্লব হাঙ্গামায় অতি অল্প দিনের

মধ্যেই কলিকাতার অধিবাসির সংখ্যা ঐরূপ অধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল ও পাঁচ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় হুগলীর ফৌজদার অভ্যর্থনা করার জন্য এক উৎসব হইয়াছিল। কোম্পানীর দালাল জনার্দন শেঠের উদ্যোগে ও কৌশলে উহার আয়োজন আদি হইয়াছিল। বর্তমান কলুটোলা স্ট্রীট ও চিৎপুর রোডের মোড়ের বাড়িতে হুগলির ফৌজদারের বালাখানা বাড়ি ছিল; এখনও ঐ স্থান ঐ নামে পরিচিত। সেকালে হুগলীর ফৌজদার যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তখনই তিনি ঐখানে থাকিতেন। উভয়পক্ষের প্রীতি প্রদর্শন ও পূজা উপহারাদিসহ শিষ্টাচারের বিনিময়, যেমন ফৌজদাবের কলিকাতায় হইয়াছিল তেমনি নভেম্বর মাসে যুক্ত কোম্পানীর গভর্নরের হুগলীতে হইয়াছিল। গভর্নরকে ফৌজদার পোষাক, ঘোড়া ও সম্রাটের সম্মানলিপি আদি পরস্পর আদান-প্রদান করিয়াছিল। আজিম উশ্বানের পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিশোধ ও দিল্লির সিংহাসন অধিকার করা যুবরাজ ফরকশেরের লক্ষ্য হইয়াছিল। তিনি উহা অবিলম্বে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। উহাতেই তখনকার ইংরাজ কর্তপক্ষগণের উদ্বেগ ও অশান্তি কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছিল। তাঁহারা নূতন বাদশাকে স্বর্ণরঞ্জিত পার্শ্বি লিখিত পৃথিবীর ম্যাপ আয়নাদি উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

শেঠ— কলিকাতায় তখন গঙ্গার জল বিক্রি করার ব্যবসা ছিল। বৈষ্ণবচরণ শেঠের পিতার শিলমোহর করা গঙ্গাজল দেশ বিদেশে যাইত ও ত্রৈলঙ্গ্য দেশে শ্রীশ্রীঁরামচন্দ্রের পূজায় ঐ জল ভিন্ন অন্য কোন জল ব্যবহার হইত না। উক্ত তাঁতি শেঠেরাও কোম্পানীর দালাল ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীগণের পরামর্শে ও কৌশলে মুর্শিদাবাদে উহাদের গুরু পত্নীর মৃত স্বামির জ্ঞাতিরা উহাদের প্রাপ্য সম্পত্তি লাভের দরখাস্ত করিলে উহারা সেই বিচার তলবের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। সেকালে অবীরা বিধবার স্বামির সম্পত্তি পাইত না। সেকালে কোম্পানীর কর্মচারীরা যে কেবল ব্যবসা ও জমিদারী করিত উহা নয়; এইরূপ কার্যাদিতেও অনেককে মুর্শিদাবাদের বিচার বিভ্রাট ও তলবের অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইয়া বিপন্ন লোকের বিশেষ সহায়তা করিয়া তাহাদিগের নিকট প্রচুর অর্থ লাভ করিত। সেইজন্য তখন কলিকাতায় অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সঙ্গতিপন্ন ও বিপন্ন লোক বসবাস করিতে আসিত। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাস আহার্য বস্তু সকল দুর্মূল্য হওয়ায় কোম্পানী দরিদ্র প্রজাগণের দুঃখ দূর ও প্রজা বৃদ্ধি করিবার জন্য পাঁচশত মন চাউল বিতরণ করিয়াছিল। উহা তাহারা তখনকার এদেশের জমিদারেরা ঐরূপ করিত দেখিয়া করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু উহাতে তাহাদের উপর সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়াছিল। আরমানি সওদাগর খোজা সরহদ্দ প্রভৃতিকে ঋণদানে বাধ্য করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পরামর্শ ও অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রাহ করা উক্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের তখন নিত্য কর্ম ছিল। কলিকাতার দুর্গের পার্শ্বের সদর রাস্তা মেরামত ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য কলিকাতার পূর্বোক্ত জনার্দন, গোপাল, যদু, বারাণসী ও জয়কৃষ্ণ শেঠেরা শেঠের বাগান পাইয়াছিল। তখন কোম্পানীর সনন্দে প্রতি বিঘা তিন টাকার অধিক জমি বিলির হার করিবার ক্ষমতা ছিল না। কলিকাতায় তখন ধান জমির পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক, উহার পর তামাক ও পানের বোরজ আদি ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা তখন রূপার বাসনে খাবার খাইত ও ডাক্তার বা উচ্চ কর্মচারীরা রূপার ঝালর দেওয়া পাল্কী ও ছাতা ব্যবহার করিত। সেকালে কোম্পানীর দালাল নিয়োগাদির সময় নূতন দালালকে এক বোতল গোলাপজল, পান ও শিরোপা দান করা রীতি ছিল। কোম্পানীর

বিশ্বাসযোগ্য শুভানুধ্যায়ী লোকেরাই ঐ দালালি পদে প্রতিষ্ঠিত হইত। দালালেরা প্রতি টাকায় আধ পয়সা কমিশন ও সামান্য বেতন পাইত বটে, কিন্তু তদপেক্ষা তাহারা খরিদ বিক্রির কমিশন ও দরে বেশ পোষাইয়া লইত ও উহাতেই তাহারা ধনবান হইত। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা জয়ের সময় সেকালের কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজপত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়।

দাস ব্যবসা ও জরিপ— কলিকাতায় কোম্পানী দাসব্যবসা করিতেন ও ক্রীতদাসেরা কোম্পানীর কর্মচারীগণের সেবা শুশ্রুষাদি সকল কার্যই করিত। তখন কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজ নামে কলিকাতার জমি বিলি লইয়া জমিদার ও বাড়ি ঘরাদি করিত। অনারেবল মিঃ জন বেয়ার্ডকে বাৎসরিক ৫/১০ খাজনায় এক বিঘা ষোল কাঠা জমি, জেমস্ জনসনকে দুই বিঘা চার কাঠা বাৎসরিক ৭/৯ খাজনায়, ডাক্তার ওয়ারেনকে দুই বিঘা আঠার কাঠা বাৎসরিক ৮/৯/১৫ খাজনায় বিলি করা হইয়াছিল। জমিদার বৌচার সাহেব গোবিন্দপুরে বাজার বসাইবার আদেশ দিয়াছিলেন।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী তাহাদের জমিদারী জরিপাদি বাস্তু পতিত ও আবাদ জমির বিবরণ এইরূপ দেখা যায়— মোট জমি ৫০৭৬ বিঘা ১৯ কাঠা ঃ—

		বাস্তু	ধান	পতিত	বাকী
সুতানটি	১৬৯২ বিঘা ১২ কাঠা	১৩৪ বিঘা ৪ কাঠা	৫১৭ বিঘা ১২ কাঠা	৫০০ বিঘা	শাকসব্জী
কলিকাতা	১৭১৭ „ ১০ „	২৪৮ „ ৬ „	৫০০ „ „	৪০০ „	ঐ
বড়বাজার	৪৮৮ „ ১০ „	৪০১ „ ১১ „		১৫ „	ঐ
গোবিন্দপুর	১১৭৮ „ ৭ „	৫৭ „ ৯ „	৫১০ „ ১১ „	৩০০ „	ঐ

পুরাতন পাট্টা কবুলিয়ত হইতে দেখা যায় যে, কোম্পানী হিসাব পত্রাদি বাংলা সেরেস্তার মত রাখিত, পাট্টাদিও ইংরাজি ও বাংলাদি ভাষায় লিখিত হইত। রালফ শেলডনের অধীন সহকারী কালেক্টার নন্দরাম সেন ছিল। সে তহবিল তছরূপ করায় পদচ্যুত হইয়াছিল। উহাকে হুগলী হইতে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। উহার পরে জগৎদাস, গোবিন্দরাম মিত্র প্রভৃতি হইয়াছিল। গোবিন্দরাম বড়ই দুর্দান্ত ছিলেন; হলওয়েল সাহেব উহারও বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু নন্দরাম সেনের মত পালাইয়া যান নাই। তিনি নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন যে, পদের মর্যাদা ও কর্ম করিবার উপযুক্ত বেতনের অভাবে বাধ্য হইয়া তিনি যথারীতি খরচা পূর্বাপর সকলে যেরূপ করিয়া আসিতেছে সেইরূপ করিয়া কোন দোষই করেন নাই। উইলসন সাহেব ঐ সময়ের ইতিবৃত্ত লেখক, তিনি উহার সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন উহাতে তখন যে কোম্পানী তাহাদের কর্মচারীগণকে যথোপযুক্ত বেতনাদি দান করিত না, একথা স্বীকার করিতে হয়। কালেক্টারকে খাজনা পত্রাদি যেমন আদায় ও তৎসংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হইত, তেমনি ফৌজদারী মীমাংসায়েও তাঁহার হাত ছিল। কলিকাতার জমি বিলি জব চার্ণকের আমল হইতেই আরম্ভ হয়। তখন জায়গা জমির খাজনা বিলি করিবার ক্ষমতা চার্ণকের ছিল না বটে, কিন্তু তখন তাহার উপর কথা কহিবার কি জমিদার বা কি কোম্পানীর কর্মচারীগণের মধ্যে কাহারও সাহস না থাকায় অনায়াসে কলিকাতার অনেক স্থান আবাদ হইয়াছিল।

আদিম বাসিন্দা— তখন লোকে যে যেখানে বাস করিত তাহার চারিদিকে বাঁশ বা কাঠের বেড়া দিয়া হিংস্র জন্তুদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায় করিতে হইত। সেই বেড়ার মধ্যে গৃহাদি নির্মিত হইত ও উহার পরিচয় অমুকের বেড়া বলিয়া হইত। কোম্পানী যেখানে আসিয়া মালপত্রাদি রাখিত ও তাহাদের জাহাজের সারেঙ আদি থাকিত, উহাকে **সারেঙ বের** বলিত। উহা কলিকাতার বড়বাজারে ছিল। সেইখানেই কলিকাতার রাজারাম মল্লিকেরা প্রথম বাস করেন। উহাদের নিকট একজন পাঞ্জাবী বাস করিত। সেকালের তিনি একজন কলিকাতার ব্যবসাদার ও পুরাতন বাসিন্দা। তাহার বংশধব কলিকাতার ইতিহাসে একজন প্রধান অভিনেতা বলিলেও বলা যায়। তিনি লাহোর নিবাসী মুলুকচাঁদ টণ্ডন, ব্যবসা করিবার জন্য বাংলাদেশে বাস করেন। তাঁহার বাড়িও বড়বাজারে ছিল ও তিনি সুন্দরবনের বিনায়াসলব্ধজাত দ্রব্যাদি লইয়া ব্যবসা করিতেন। তখন সুন্দরবনের বাঁশ, গোলপাতা, উলুখড়, খাস, হেঁতাল, বেত, কুচিলা, গালা, হরিতকি, মধু ও মোম অতি উত্তম ব্যবসার জিনিস ছিল। মুলুক চাঁদের পুত্র **দেওয়ান কাশীনাথ** কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে শিব প্রতিষ্ঠা ও জুম্মা পীরের দরগাদি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও বহু মূল্যবান সম্পত্তি দেবতার সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া যান। সেইখানে তাঁহার নিকট আত্মীয় রাজা হুজুরীমল কলিকাতায় আর একজন নামজাদা বাসিন্দা ছিলেন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ানক ঝড়ে সুন্দরবনের দুরবস্থা হইয়াছিল। বেলা তিনটার সময় হঠাৎ সমুদ্রের জলে দেশ ভাসিয়া গিয়া শত সহস্র লোক ও আবাদ নষ্ট হইয়া যায়, উহাতেই উহা ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। কি আক্ষেপের বিষয়! লোকে বনের দ্রব্য লইয়া ব্যবসারম্ভ করিল, কিন্তু আর কেহই উহা আবাদ করিবার চেষ্টা করিল না। সেই সকল দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করিবার জন্য সুদূর পাঞ্জাবের বণিকেরা কলিকাতাদি স্থানে বাস করে এবং ইউরোপবাসিগণ এদেশে বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিলেন।

প্রাচীন বাণিজ্য সম্বন্ধ— পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ জাতিই আর্য হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন নরপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া অনেক স্বাধীন বৃত্তি হিন্দুরা সুদূর ইউরোপ আফ্রিকাদি স্থানে বাস করে। আচার্য মোক্ষমূলর প্রমুখ ভাষা তত্ত্ববিদ্‌গণ উহারই পোষকতা করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একখণ্ড তাম্রফলকে প্রকাশ হইয়াছে যে, ভারতবাসীরা খ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু পূর্বে ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থে গমন করিত। ইংলণ্ডের মধ্য হইতে উহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উত্থিত হইয়াছিল। সম্রাট হারুণ অল রসিদ গণিত চরক সুশ্রুতাদি ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রচার করেন। রামায়ণে হুনাদি পরাক্রান্ত জাতিগণ হিমালয়ের উত্তর দেশে বাস করিত উল্লেখ আছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছাদির নিমন্ত্রণাদিতে সেকালের বাণিজ্য সংঘটিত পূর্ব সম্বন্ধাদি নির্দেশ করে। ঐ যজ্ঞের উপহারে সেকালের ভারতের ও অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য যাহার জন্য যাহার সুখ্যাতি ছিল, উহার উল্লেখ আছে। সেকালের সংস্কৃত নাটকাদিতেও বণিকগণের সমুদ্র যাত্রার কথা উল্লিখিত আছে। কালের কুটিল গতিতে ও ভাগ্যচক্রের আবর্তনে ইউরোপবাসিরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে ও উহাতে এদেশের বর্হিবাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য সমস্তই তাহাদের করায়ত্ত হয়। রামায়ণ মহাভারতোক্ত সেকালের আর্য-মহিমা সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি এখন যেন, কবি কল্পনা ও স্বপ্ন হইয়াছে।

মুসলমানী ব্যবসা— সপ্তম শতাব্দীতেই পারস্য ও আরবদেশের বণিকগণ ভারতীয়

বাণিজ্য বহুল পরিমাণে করিতে আরম্ভ করে। চাণক্যাদির অর্থশাস্ত্রে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্কাদির হার ও আদায়ের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছিল। শাস্ত্রকারেরা বাণিজ্যের প্রশংসা ও উন্নতির মূল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন বাণিজ্যের মত লক্ষ্মী লাভের উপায় কৃষি, রাজসেবা বা ভিক্ষায় হইতে পারে না। * হায়! কলিকাতায় ইংরাজ জাতি ব্যবসা করিবার সময় লোকদিগকে জমি ও অর্থাদি ভিক্ষাস্বরূপ দান করিয়াছিল। কলিকাতার লাভে ও বিক্রয়ে বাংলার অতীত দুরবস্থার সম্বন্ধ যে বর্তমান নাই, একথা বলা যায় না। হায়! সেই আর্য বাণিজ্য প্রধান ভারতবর্ষ আজ ইতিহাসে কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া উল্লিখিত হয়। যে বাণিজ্যের প্রভাবে ইংরাজ রাজত্বে সূর্য অস্তমিত হয় না, সেই বাণিজ্যে আজ ভারতবাসি উহাতে বঞ্চিত। সূক্ষ্ম চক্ষে দেখিতে গেলে এখন সমস্তই সম্পূর্ণ দাসত্বে পরিণত হইয়াছে যে জমিদারের জমিদারী উচ্ছেদ করিতে গেলে তখন দিল্লি দরবারের পরওয়ানা ও সৈন্যসামন্ত প্রয়োজন হইত, উহা এখন সূর্যাস্ত নিয়মে বৎসর বৎসর বিনা বিঘ্নে হইতেছে। কোনরূপ কর্তৃত্বাধীকার জমিদারের প্রজার উপর করিবার ক্ষমতা নাই। এখন শিল্পী ও কৃষিকার্য্য স্বেচ্ছামত করিবার উপায় নাই। উহা রাজার অভিমতে করিতে হইবে। উহা দ্বারাই উদরান্নের সংস্থান হওয়া দুরূহ হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজসেবায় সম্পূর্ণ পরাধীন হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। বিদেশী সওদাগর ও ব্যবসাদারগণের প্রতিযোগিতা করা ত' দূরের কথা, তাহাদের অধীনে সম্পূর্ণ ব্যবসা করা ভিন্ন উপায় নাই; উহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই অধিকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এই দাসত্বের শৃঙ্খল যেন কলিকাতাধিকার ও বিদেশীয় বাণিজ্যের সূত্রপাতেই আরম্ভ হইয়াছিল। ইংরাজ জাতিকে বিলাত হইতে নগদ টাকা বা সৈন্যসামন্ত আনয়ন করিয়া ব্যবসা বা জমিদারী করিতে হয় নাই। এদেশের ব্যবসায়ীরাই বেনিয়ানের কার্য ও ঋণদান করিয়া তাহাদের ব্যবসার সম্পূর্ণ সহায়তা করিত। সেকালের কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজে উহার উল্লেখ আছে ঃ— "নগদ টাকা তহবিলে না থাকায় ও টাকার তাগাদা বন্ধ করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের পাওনা টাকা তাহাদের নিকট হইতে লক্ষ টাকা ঋণ সুদ দিয়া লওয়া স্থির হইল। ইতি ১৭১৩— ১৭ই জানুয়ারী।" তাঁতিরা ইংরাজ বণিকগণের সহিত সুতা কাপড়াদির ব্যবসা ও সুবর্ণ বণিকেরা টাকা ধার ও বেণিয়ানি করিয়া সুদ ও কমিশন দ্বারা অর্থোপার্জন করিত। তখন কোম্পানীর কর্মচারীরা অল্প বেতন পাইত, উহাতে তাহাদের আহার বিহারাদির সঙ্কুলান হইত না। সেইজন্য তাহারা সকলেই ব্যবসাদি করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিত। সুতরাং এদেশের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা তাহাদের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত নিগৃহীত হইত। তখন উহার কোন প্রতিকারেরও উপায় ছিল না। মুসলমান উচ্চ-কর্মচারীরাও তখন ধর্ম ও নীতিতে তাহাদের অপেক্ষা উন্নত ছিল না এবং সম্রাট, নবাব, রাজা ও জমিদারেরা স্ব স্ব বিলাস বিভব ও সুখ স্বচ্ছন্দতায় অন্ধ হইয়াছিল। বাংলায় পাঠান রাজত্বকালে জমিদারেরাই সর্বময় কর্তা হইয়াছিল। তাহাদের নিকট খাজনা আদায় করাই মোগল দরবারে রাজ প্রতিনিধিবর্গের লক্ষ্য হইয়াছিল। ইংরাজেরাও সেই খাজনা দিয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছিল। উহার কেহই কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কোম্পানী উহাতেই অনায়াসে কলিকাতার কালেক্টর বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা টোল কুতঘাটাদি আদায় আরম্ভ

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবনৈবচ।"

মুসলমানদের আমল হইতেই জমিদারগণ মূর্খ ও অত্যাচারী হইয়া দেশের দুরবস্থার কারণ হইয়াছিল। শেষে তাহারাও নিগৃহীত হইয়াছিল। দেশে তখন কিসে সকলের উন্নতি ও অত্যাচারাদি দূর হইবে উহার উপায়াদি উদ্ভাবন করা যে কর্তব্যকর্ম, উহা কাহারও ধারণাই ছিল না। অনন্তর প্রজারা যোল আনার ধন দশ আনায় বেচিতে বাধ্য হইত। যাহার যাহা কিছু ছিল মুসলমান ডিহিদারদের অত্যাচারে তাহা বেচিয়া খাজনা ও উপহারাদি দিয়া তাহাদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। তাহার সেই দুরবস্থার কথা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ও * বৈষ্ণবগ্রন্থাদিতে সবিশেষ উল্লেখ আছে। উহা উল্লেখ না করিলে স্পষ্ট করিয়া বোঝাইবার উপায় নাই যে, কেমন করিয়া বিদেশী বণিকেরা এদেশের জমিদার, ব্যবসাদার ও সর্বময় বিধাতা পুরুষ হইয়াছিল।

লক্ষ্মী পূজা— ধান্যই লক্ষ্মীর আধার বলিয়া বাংলায় লক্ষ্মীর পূজা ধান্যের রেকেই স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রায় হইয়া থাকে। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসেই ধান্য গৃহে আনিবার সময়ই ঐ পূজা এখনও পর্যন্ত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে ধান্যের উৎপত্তির সহিত নববর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন চন্দ্র বা সূর্যের গতিদর্শন করিয়া উহা করা হয় নাই। সেইজন্যই তখন যে মাস হইতে বর্ষারম্ভ হইত উহাকে অগ্রহায়ণ মাস বলিত। কৃষি ও বাণিজ্যেই ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জা ও উন্নতি। সেই কৃষি বাণিজ্যের দুর্দশার কারণ দেশের মূর্খ শাসনকর্তারা, উঁহারা কেবল অর্থগৃধ্নু বিলাসিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা দেশের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। উহার জন্য বিদেশী বণিকেরা কোনরূপ দোষী বা দায়ী নহে। রাজা মানসিংহের আমল হইতেই যে সকল জমিতে চাষাদি হইত না, পতিত ছিল উহার উপর খাজনা ধরা হইয়াছিল। উহাতেই জমিদারেরা খাজনার জন্য নজরবন্দি, জেল পর্যন্ত খাটিত, এবং শেষে যখন মুসলমান রাজত্বের অত্যাচার ষোলকলায় পূর্ণ হয়, তখন হিন্দু জমিদারগণের জন্য অন্ধকূপ হত্যার অপেক্ষা শতগুণ ভীষণতর বৈকুণ্ঠেরও ব্যবস্থা মুর্শিদকুলি খাঁর পোষ্যপুত্র রেজা খাঁ করিয়াছিল।

করাচির অন্তর্গত সেহওয়ান নামক পুরাতন সহরে মহাবীর (আলেকজাণ্ডার) সেকেন্দার সা নির্মিত পুরাতন দুর্গ আছে। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ ঐ করাচি দখল করে। ক্লাইবের ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা আরকটের এক দুর্গ লাভ হইতেই হয়। যদি দিনেমানেরা অম্বোয়িনার হত্যায় ইংরাজদের ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধ করিয়া না দিত, ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তখন তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে না হইত; তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যলিপি অন্যরূপ হইত এইরূপই অনুমান হয়।

বিলাতের রাজার লাভ— ভারতে ইংরাজ জাতি বাণিজ্য করিতে আসিবে উহার সনন্দ লইবার জন্য অনুমতি দান দ্বারা তখন ইংলণ্ডের রাজার বিলক্ষণ অর্থাগম হইত। বিলাতের

* 'মাপে কোণে দিয়ে দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহরি।
'সবকার হৈল কাল, খিল ভূমি লেখে মাল, বিনা উপকারে মায় খতি।'
'পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।'
'ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
'প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।
'পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ারে জুড়িয়া দেয় খানা।
'প্রজারা ব্যাকুলচিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা।

রাজা তৃতীয় উইলিয়ম যাঁহার নামে কলিকাতার দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল, তিনি নূতন ইংরাজ কোম্পানীকে সনন্দ দিবার সময় উভয় কোম্পানীকে সম্মিলিত হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ * করিয়াছিলেন। বিদেশী রাজা উভয় কোম্পানীর নিকট হইতে সনন্দ দানের সময় অর্থাদি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কর্তব্য কর্ম করিতে অবহেলা করেন নাই। এই সম্মিলনের জন্য যে শুধু রাজা অনুরোধ করিয়াছিলেন, উহা নয়, বিলাতের পার্লামেন্ট ঐ উদ্দেশ্যে দু-একটি আইনাদি পাশ করিয়াছিল। উভয় কোম্পানীর হিসাবাদির গণ্ডগোল আর্ল গডলফিনের মধ্যস্থতায় মিটিয়া যায়। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন কোম্পানীর সহিত সম্মিলিত হইয়া " United Company of merchants trading to the East Indies " বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ জাতি ও উহাদের রাজারা ভবিষ্যত উন্নতির সূত্রপাতের পথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কন্টক যেমন করিয়া উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেরূপ ভারতবাসী ও তাহাদের অধিপতিরা বর্হিবাণিজ্য বা ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের রক্ষার সম্বন্ধে কেহই কিছুই করে নাই, উহাতেই সর্বনাশ হইয়াছিল। বিলাতের রাজা ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে জেনারেল সেসাইটির নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার সনন্দ দান করিয়া কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড আট টাকা ব্যাজে লইয়াছিল এবং ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ যুক্ত কোম্পানীর নিকট বার লক্ষ পাউণ্ড বিনাসুদে লাভ করিয়াছিলেন। ভারতে বাণিজ্যারম্ভের সূত্রপাতেই বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের এইরূপ লাভ ও অর্থ সঞ্চয় আরম্ভ হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়! বিলাতে পার্লামেন্ট ও রাজারা ভারতবর্ষে ব্যবসা করিতে সনন্দ স্বত্বাদি ক্ষমতা দানে এইরূপ লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু উহার তুলনায় এদেশের সম্রাট নবাবদের কিছুই লাভ হয় নাই। পুরাতন কোম্পানী ছয় লক্ষ পাউণ্ড এদেশের ব্যবসায় প্রতি বৎসর খাটাইত ও তাহাতে অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছিল। নতুন কোম্পানীর নগদ টাকা বড় বিশেষ কিছু ছিল না। বিলাতের গভর্নমেন্টের নিকট হইতে তাহাদের ধার দেওয়া টাকার সুদের উপর নির্ভর করিযা কার্য করিতে হইত। এইরূপ ঋণদান করার মূলে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। বিলাতের ব্যাঙ্কওয়ালারা যে টাকা গভর্নমেন্টকে কর্জ দিয়া থাকেন, সেই টাকার নোট বাহির করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যেই ইংরাজ ব্যবসাদারেরা বিলাতে কর্তপক্ষগণকে টাকা সুদে ও বিনা সুদে ধার দিয়াছিলেন ও উহা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কার্যে পরিণত করিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা তাহাদের নোট চালাইবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা উহাতেই নিরস্ত হইবার পাত্র ছিল না। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ মার্চ পর্যন্ত উহারা ভারতবর্ষে একচেটিয়া ব্যবসা করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। রানী এলিজাবেথই ইংরাজ জাতিকে প্রথমে যৌথ ও একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। কালে উহার বিষময় ফল কিরূপ হইয়াছিল উহার সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া উচিত। উহাতে বাণিজ্যের সঙ্গে অর্থনীতির জটিল সম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে। সেকালে বাষ্পীয় পোতাদি দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য চলিত না। অনুকুল বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া জাহাজাদি বহুদিনে ব্যবসার দ্রব্যাদি লইয়া যাতায়াত করিত। উহার জন্য অনেক অর্থ ও লোক নষ্ট হইয়াছিল। এক সময় মুসলমানেরা সুদূর ইউরোপে রাজ্যাদি অধিকার করিয়া সমগ্র ইউরোপবাসিকে বিচলিত করিয়াছিল।

* F P. Robinsons The Trade of the East India Company. "Gentlemen, you know my mind already I am for union If world be most for the interest of the Indian trade "

গূঢ়োদ্দেশ্য— ১২৪৫ খ্রীঃ খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য লায়ন্স নগরীতে মহাসভা হইয়াছিল; উহাতে খ্রীষ্টান জাতিকে জাগরিত ও মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য উৎসাহিত করে। সেই উদ্দিপনায় জন কয়েক খ্রীষ্টান ভারতে প্রথমে পদার্পণ ও জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। শেষে যেমন বক একপদ উন্নত করিয়া নদ, নদী বা জলাশয়ের তীরে আহারের অন্বেষণে নিরীহের মত বসিয়া থাকে, তেমনি ইউরোপের বণিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের নানা স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল ও কুঠি করিয়া নানা বাণিজ্যাদি আরম্ভ করে। ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীরা উহাদিগকে পথ দেখাইয়া এদেশে আনয়ন করে নাই। উহা নিশ্চয়ই তাহাদের গৌরবের কথা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় ২০শে ডিসেম্বর ১৬৮৬ যে কলিকাতায় শত বিঘ্ন বিবাদ ও অস্বাস্থ্যকর হেতু সত্ত্বেও ইংরাজের কুঠি ও ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল, উহাতেই শেষে মুসলমান রাজত্বের মুলোৎপাটন হইয়াছিল। সম্রাট আকবর পারস্যদেশ হইতে লোক আনাইয়া ভারতে গালিচার বয়নারম্ভ করেন, নুরজাহানাদি গোলাপ জল ও আতর সৃষ্টি ও প্রচার করেন, শাজাহান তাজমহল পৃথিবীর আশ্চর্য কীর্ত্তির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য বিদেশী বণিকেরা বহুমূল্য ধন রত্নাদি আহরণ করিয়া বিক্রয় করিত। পারসিক, ইহুদী ও আরমানিরা পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরী আহরণ করিয়া তাঁহাদের ভোগবিলাসের সহায়তা করিতেন। সেই রমনী-রত্ন-লাভের জন্য কত শত দেশ ও লোক অকালে নষ্ট হইয়াছে। আলাউদ্দীন খিলজী কমলাদেবীকে লাভ করিবার জন্য গুজরাট জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু চিতোরের পদ্মিনী চিতাভস্মে নষ্ট হইয়া উহার সে বাসনা পরিতৃপ্তি আকাশ কুসুমে পরিণত করিয়াছিলেন। বাইবেলের বিখ্যাত রাজা সুলেমানের দরবারে ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে। কচিনের ইহুদীদিগের মন্দিরের খোদিত তাম্রলিপিতে তাহারা সেখানে নেবু চাঁদ নেজারের রাজত্বের শেষ ভাগে আসিয়াছিল উল্লেখ আছে।

দেশে দাসত্বের সৃষ্টি— এদেশে সর্বপ্রথমে সপ্তম শতাব্দীতে পাবসিক ও আরবিক বণিকগণই ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া নির্বিবাদে এক প্রকার এক চেটিয়া ব্যবসা করিয়াছিল। হায়! উহাতেই বাণিজ্য প্রধান রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে কৃষিপ্রধান দেশ হইয়া পড়ে। শেষে এখন ভারতে একমাত্র কৃষকই ধান্যাদি উৎপন্ন করিতে থাকে। জমিদার কর সংগ্রহাদি করিবার দায়িত্বাদি লইয়া কিঞ্চিৎ উপস্বত্ব ভোগ করিত মাত্র; অন্যান্য সকলে শিক্ষা ও শিল্পাদি দ্বারা কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে। উহাতেই দেশে দাসত্বের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। বাণিজ্যে মানব হৃদয়ে দুর্দমনীয় সাহস, বল, অধ্যাবসায়, স্বাবলম্বনাদি বৃত্তি প্রকাশ ও স্ফূর্তি করে ও উহা বিশ্বাস ও সততায় বর্দ্ধিত ও প্রতিষ্ঠিত। উহা কেবল দ্রব্য বিনিময় দ্বারা হয় না। সম্রাট আকবর জিজিয়া ও তীর্থযাত্রীর করাদি প্রত্যাহার করিয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতে দেশের ও দশের আভ্যন্তরীণ কোন দুঃখ দারিদ্র্য দূর হয় নাই। দেশের বাণিজ্যাদির বিস্তার হওয়া ত দূরের কথা, উহা তখন নষ্ট হইয়াছিল ও দেশে ধনাগমের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়াছিল। কেবল বিলাসের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রাজকোষাদি শূন্য হইয়াছিল। উত্তরোত্তর রাজস্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় দেশের জমি পতিত হইয়াছিল ও কৃষকেরা জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া শাসনকর্তাদিগের সুবিচার লাভ করিতে না পারায় পলাতক হইতে বাধ্য হইত। দেশের ও দশের দুঃখ দূর করিয়া উন্নতি বিধান কোন শাসনকর্তারই লক্ষ্য ছিল না। সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে ইউরোপের বণিকগণ দেশের উৎপীড়িত লোকের বিপদের সহায় মধুসূদন হইয়াছিল। হায়! যে কার্পাস বীজ এক সময়ে অতুৎকৃষ্ট

বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে মিশরে যাইত, কালের করাল গতিকে উহাই আবার সেইখান হইতে আনীত হইতেছে। সম্রাট নবাব বা তাহাদের কোন কর্মচারীরা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য করে নাই ও বিদেশী বাণিজ্যের প্রসারের বিপক্ষে কেহই দণ্ডায়মান হয় নাই। বরং সকলে তাহাদের সহিত ব্যবসা করাই মঙ্গলের বিষয় মনে করিয়াছিল। এমনকি, উহা নবাবের কন্যাগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহারা ইউরোপের ব্যবসায়ীগণের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ঐতিহাসিক * হিল সাহেব বলিয়াছেন যে, সেইজন্য তাহারা ইংরাজরে প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিল। সেই বিদেশী বাণিজ্যের মূল সূত্রপাত মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় হইয়াছিল। সেইজন্য কলিকাতার নামের সার্থকতা কলির কাতা অর্থাৎ রজ্জুর দ্বারা সকলকে বদ্ধ ও দাস করিয়াছিল ইহাই প্রশস্ত বলিয়া বোধহয়। বিদেশী বাণিজ্যের আশ্চর্য মহিমায় বাংলার নবাবজাদীরাও ইংরাজের পক্ষপাতী হইয়া নিজেদের বংশধরগণের সর্বনাশ করিয়াছিল।

শাসন প্রণালী— ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বাংলায় নানা আড়ম্বরের সহিত কোম্পানীর যে শাসন প্রণালী প্রচলিত হয়, উহাতে দুইজন সভাপতি প্রতি সপ্তাহে এক একজন সভাপতি লইয়া আটজন সভ্যের সঙ্গে বাংলার যাবতীয় কার্য পর্যালোচনা করিতেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিবর্তন হয়। গভর্নর ওয়েলডনই কলিকাতায় পৌঁছিয়া উহা করেন। তাঁহার অভ্যর্থনায় এরূপ জনতা হইয়াছিল যে, তিনি অতি কষ্টে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে গঙ্গার ঘাট বাঁধান ও নিম্নপদস্থ কোম্পানীর কর্মচারীগণের বাসগৃহের নির্মাণ শেষ হয়। ওয়েলডনাদির গভর্নরপদ বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, তবে ঐ সম্বন্ধে গভর্নর হেজেসের নাম গভর্নরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই আমলে দুর্গের আয়তন বৃদ্ধি, পেরিনের বাগানের নিকট পয়ঃপ্রণালী ও সেতু ডক ও নূতন গুদামাদি নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহারই আমলে বাদশাহি পরোয়ানাব জন্য দিল্লিতে দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছিল ও উহাতে কৃতকার্য হইয়াই কলিকাতায় বাণিজ্যাদির উন্নতির সুবিধা আরম্ভ হয়। মোগল সাম্রাজ্যের নিয়মানুসারে প্রত্যেক নূতন সম্রাটের সিংহাসনাধিকার করিবার সময় নূতন সনন্দ আবশ্যক হইত। যুবরাজ ফরকসিযার ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার ছিলেন ও বর্ধমানের সাহ সুফি ফকিরদের আশীর্বাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীতে সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রেরিত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, অশ্ব, লিপি আদি হুগলীর ফৌজদার জেয়াদ্দিন কোম্পানীর গভর্নরকে দিয়াছিলেন। ফরকশিয়ার দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিবার পূর্বে বাংলার রাজস্ব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট চাহিয়া পান নাই বলিয়া উহা ষড়যন্ত্র করিয়া এলাহাবাদে লুঠ করিয়া লন। ফরকশিয়ার সম্রাট হইলে রসিদ খাঁকে বাংলার নাজিমের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃতকার্য না হইলেও মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে উহার প্রতিশোধ লন নাই। তিনিই বাংলার সর্বময় কর্তা হইয়া রহিলেন। তখন দিল্লির শাসন প্রণালী এতই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। যখন ইংরাজ কোম্পানী দিল্লিতে দৌত্যাভিযান প্রেরণ করিয়াছিল তখন দিল্লির সিংহাসনাধিপতির বাংলার মুর্শিদকুলী খাঁর উপর কর্তৃত্ব শেষ হইয়া যায়। সেইজন্য উপহারাদি গ্রহণ করিয়া উহাকেই বাংলার দেওয়ান পদে বাহাল রাখা হয়। সুবিচারক মুর্শিদকুলী খাঁ ইউরোপের বণিকগণের মধ্যে ইতর বিশেষ করিয়া ইংরাজগণকে যথারীতি শুল্ক দিতে বাধ্য করিতে চাওয়ায় ইংরাজেরা পূর্বোক্ত দৌত্যাভিযান প্রেরণ কবিয়াছিল। ডাক্তার হামিলটন চিকিৎসকরূপে ও একজন

Indian Record Series I (X C ii)

আরমানি সওদাগর খোজা সরহাদ দ্বিভাষিরূপে ঐ দৌত্যাভিযানে গমন করেন। তদ্ভিন্ন জন সর্ম্মান ও এডওয়ার্ড নিকলসন প্রধান দূত স্বরূপ গিয়াছিলেন। ১৭১৫ খ্রীঃ ৮ই জুলাই তারিখে দিল্লি গিয়া প্রায় সার্দ্ধ তিন লক্ষ টাকার উপহার দিয়া সর্ম্মান সাহেবের এক প্রস্থ মণি খচিত কলগী পরিচ্ছদের সহিত লাভ করা ভিন্ন আর কোন বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। খোজা সরহাদের ভাগ্যেও সেইরূপ হইয়াছিল। সেকালের নামজাদা সর্ম্মানের বাগান বর্তমান খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজারের উত্তরে এখন যেখানে সৈনিকগণের ব্যারাকসমূহ আছে সেইখানেই ছিল।

ডাক্তার হ্যামিল্টন— ভগবান সহায় হইলে সমস্তই সুবিধা হইয়া যায়, একথা তখনকার এক ঘটনায় প্রমাণ হইয়া যায়। সেই সময়ে যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের রূপসী কন্যার সহিত বাদশাহের পরিণয় ক্রিয়াব উৎসবে দিল্লিতে মহা আনন্দোৎসব হইতেছিল। সেইজন্য যখন পাত্রীপক্ষ উপস্থিত, এমন সময় বাদসাহ হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন, উঁহার চিকিৎসকগণ কেহই কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না, তখন ইংরাজের সৌভাগ্যগুণে ডাক্তার হামিল্টন অস্ত্রের সাহায্যে সম্রাটের স্ফোটক ভেদ করিয়া শীঘ্র আবাম করাইয়া দেন। ইংরাজ ডাক্তার সেই চিকিৎসার পুরস্কার নিজের স্বার্থাপেক্ষা অন্নদাতা কোম্পানীর বা দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চাহিয়াছিলেন। উহাতেই ইংরাজ কোম্পানি কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮ খানি গ্রাম খরিদ করিতে পারিয়াছিলেন ও তদ্ভিন্ন তেত্রিশটি আবশ্যকীয় স্বত্বাধিকার লাভ করেন। সকলগুলি কার্যে পরিণত না হইলেও উহাতে কোম্পানীর বাণিজ্য ও জমিদার বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। সেকালের কোম্পানীর কর্মচারিগণের মধ্যে যদি কর্তব্যবুদ্ধি ও স্বজাতি প্রীতির জন্য কাহারও নাম উল্লেখযোগ্য হয়, তবে সে সম্বন্ধে ডাক্তার হামিল্টনের নাম শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভগবান ধরাধামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও বাণিজ্যের মূল দৃঢ় করিবার জন্যই যেন, ডাক্তার হামিল্টনকে দিল্লিতে পাঠাইয়াছিলেন ও যেই সেই কার্য শেষ হইল অমনি. তিনি ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বব কলিকাতায় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ডাক্তার হামিল্টনই কলিকাতার নাম জাহির করিয়াছিলেন ও সেইজন্যই যেন কলিকাতা তাহাকে সমাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিল। সেই সমাধিতে ও তিনি সম্রাটের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর শত সহস্র বাধা ও প্রতিকুলাচারণ সত্ত্বেও কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

হজবল হুকুম— কোম্পানীর যতগুলি স্বত্বলাভ হইয়াছিল উহার মধ্যে এইগুলি প্রধান (১) ইউরোপীয় বা দেশীয় লোকেরা কোম্পানির টাকা ঋণ গ্রহণ করিলে স্থানীয় মুসলমান কর্তৃপক্ষগণকে কলিকাতা কাউন্সিলের আবেদনানুসারে মালের ছাড় ও তাহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইবেন। (২) কলিকাতার প্রেসিডেন্ট সাহেবের সহি দেখিবামাত্র উহা বিনা বাধায় ছাড়িয়া দিতে হইবে। (৩) মুর্শিদাবাদের ট্যাকশালে ইংরাজেরা তাহাদের প্রয়োজন মত সপ্তাহে তিন দিনের জন্য তাহাদের প্রয়োজনীয় মুদ্রাসকল প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারিবে। উহাই ইতিহাসে "হজবল হুকুম" বলিয়া বিখ্যাত। ইহার জন্য ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে কলিকাতায় এক মহা-আনন্দোৎসব হইয়াছিল। উহাতে মুহুর্মুহু তোপধ্বনি আতস বাজী পানাহার প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কোম্পানীর সম্রাটের ট্যাকশালের মুদ্রা পূর্বমত বাদশাহী দরবারে চলা বন্ধ হইয়াছিল। উহাতে কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের বাদশাহী ঠ্যাকশালে বিনা মাশুলে মুদ্রা প্রস্তুত ও পূর্বমত অবাধ

বাণিজ্য স্বত্ব বড়ই আনন্দের বিষয় হইয়াছিল।

দিল্লিশ্বরের প্রভুশক্তি মুর্শিদকুলি খাঁ স্বীকার করিলেও উঁহার দুর্বলতার বিষয় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তন্নিমিত্ত তিনি বাদশাহি ফার্মানে সমুদ্র পথে যাবতীয় মাল আমদানি ও রপ্তানি বিনা মাশুলে করিতে দিবার অনুমতি থাকিলেও, কিন্তু উহাতে এদেশের এক স্থান হইতে অন্যত্র মাল বিনামাশুলে চালাইবার ক্ষমতা দান করিলে দেশের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে বলিয়া তিনি উহা করিতে দেন নাই। ইহাতেও দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে মাল বার্ষিক দশ হাজার টন রপ্তানি হইয়াছিল। কোম্পানীর দিন দিন বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতারও উন্নতি হইয়াছিল। তখন বহুদেশীয় মহাজনেরা তাহাদের সহিত ব্যবসা করিবার জন্য কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন কোম্পানির কর্মচারীরা সাময়িক উপহারাদি দ্বারা মুসলমান কর্মচারী বা শাসনকর্তাগণকে হস্তগত করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিত। এদেশের ব্যবসাদারেরা ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের সংস্রবে কার্যাদি করায় তখন এদেশের প্রাচীন ব্যবসা প্রণালীর বহু পরিবর্তন হইয়া যায়। মুসলমান কর্তৃপক্ষেরা কখনই ব্যবসা দ্বারা ধনোপার্জন করে নাই ও স্বদেশী ব্যবসার উন্নতি সাধন করা রাজার ধর্ম উহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশে অরাজকতা ও বিদ্রোহিতায় সকলেই বিব্রত হইয়াছিল। রাজনীতি ও রাজকার্য কাহারও শিক্ষা ও দীক্ষার বিষয় ছিল না। দেশবাসী সকলেই স্ব স্ব প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিব্রত। সুতরাং দেশের বা দশের উন্নতি বা মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার লোকের অবসর বা সুবিধা ছিল না। ইহাতেই দেশ অধঃপাতে গিয়াছিল। তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সকলেই স্ব স্ব সুবিধা ও উন্নতিব জন্য দেশের বা দশের দুঃখের দিকে তাকাইত না। শাসনকর্তারা বিলাস ও অন্ধ গোড়ামীর বশবর্তী হইয়া সাধারণ প্রজাবর্গের চক্ষুশূল হইয়াছিল। কেমন করিয়া তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে ধন, প্রাণ ও আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করিবে, এই চিন্তাই তখন সর্বদাই সকলের ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়াছিল। অধিকাংশ রাজপুত রাজারা মোগল সম্রাটের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করা শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। মানসিংহ প্রমুখ রাজারা সম্রাটের সেনাপতির কার্য করিয়া প্রাণদান, বংশলোপ বা দেশদ্রোহির কার্য করাকে পাপ মনে করেন নাই। বাংলার সীতারাম, বেণী রায় জমিদার হইলেও মুর্শিদকুলী খাঁর মত দুর্দান্ত শাসনকর্তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। রেজা খাঁ প্রমুখের নারকীয় করাদি আদায়ের প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা জীবন ও জমিদারী উৎসর্গ করা শতাংশ শ্রেয় মনে করিয়াছিল। **ইহাই বাংলা ও বাঙালীর বিশেষত্ব**। বাঙ্গালীর আর্য মহিমা ও গুণ-গরীমার যদি কিছু স্বত্ব সাবস্থ্য করিবার দাবী থাকে, তবে ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হায়! বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিসম্পাতে বাঙ্গালীকে অনার্য জাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন। জাতির পরিচয় আকার প্রকার অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষের রক্তের মহিমায় উহাদের কার্যের দ্বারা বিচার করা যুক্তি সঙ্গত। বাংলা ও বাঙালীর কলঙ্ক মোচন করা বাঙালীর কর্তব্যকর্ম, কিন্তু উহা জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে কলঙ্ক দান করা যে মহাপাপ ইহা ধারণা হয় না। ইহা কি দুঃখের বিষয়। কালের কুটিল কি প্রভাব! ইংরাজ জাতির শতাধিক বৎসর রাজত্বের ফলে শিক্ষিত বাঙালীর এই দুর্দশা হইয়াছে; হিন্দুব বেদ আর্য উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইংরাজের ভাষায় ইংরাজী অধ্যাপকের মতানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবাসী শিক্ষা ও পরীক্ষা দিতেছে। উহাতে প্রাচীন আর্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি যে কি বিষময় অযথা অশ্রদ্ধাব সৃষ্টি করিতেছে, উহা উল্লেখ করা অপেক্ষা অনুভব করাই মঙ্গলের বিষয়।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের নাটক নভেল যে পরিমাণে বিক্রয় ও শ্রদ্ধার সহিত যুবক মণ্ডলী কর্তৃক পঠিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার বিষয়ীকৃত হইয়া পড়িয়াছে, উহার শতাংশের একাংশও হিন্দুর আর্য শাস্ত্র গ্রন্থাদির ভাগ্যে ঘটে নাই। হায়! বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য মহাত্মারা বাইবেল পড়িয়া পরীক্ষা না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কৃতিসন্তান মধ্যে গণ্য হইতে পারে না স্থির করিয়াছেন। এই সকল দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হায়! এখনও কি উহার প্রতিকার করিবার সময় হয় নাই? মুসলমান রাজত্বে আর্য সংস্কৃত ভাষার অনাদর ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাই তখন গণ্যমান্য ও বরেণ্য ছিলেন; তাঁহারা বুদ্ধিমান ছিলেন ও কিন্তু তাঁহারা কেহই রাজনীতি, অর্থনীতি, বা মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য করিতেন না। কাব্য ও শাস্ত্রাদির চর্চায় সেবকমণ্ডলীর উপর কর্তৃত্বই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। সমাজের কুসংস্কারাদি বা সংকীর্ণতা দূর করা তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে করেন নাই, বরং তাঁহারা উহার সর্বতোভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দায়ীও দেশের ও দশের সর্বনাশের মূল কারণ। হায়! বাংলার রঘুনন্দনের মত স্মার্তেব ও অনেক দ্বিগ্বজয়ী নৈয়ায়িকের আবির্ভাব হইয়াছিল ও চৈতন্যের মত প্রেমভক্তির অবতার হইয়াছিল; কিন্তু কেহই প্রতাপাদিত্যের মত প্রতাপান্বিত স্বাধীনচেতা স্বদেশভক্ত জমিদার দিল্লির সম্রাট আকবরকে উপর্য্যুপরি পরাস্ত করিয়া বাংলা ও বাঙালীকে অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। ইহাই বিধাতার শাপ ও বিড়ম্বনা। সেইজন্যই বাঙালীরা অকস্মাৎ উত্তেজিত কর্মতৎপর ও বুদ্ধিমান হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আপনাকে কার্যক্ষেত্রে উন্নত বা স্বাধীন করিতে পারে নাই। ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের অনার্য বলিয়া ঘৃণিত হইবার কারণ বা নিদর্শন নহে। বাঙালী অধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সম্রাট হইলেও আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুর্দৈবেই উৎপীড়িত নিগৃহীত। প্রকৃতির অনুকম্পায় বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, স্বর্ণপ্রসূ হইলেও বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারি আদির হস্ত হইতে রক্ষালাভ করে নাই ও উহাতে সর্বদাই বিব্রত। প্রকৃতির ঐশ্বর্যই উহার দাসত্বের মূল কারণ। দেশবাসী অল্প পরিশ্রমে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি লাভ করিয়া বিলাসী হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক জলবায়ুর গুণে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে হীন হইয়া পড়ে। ইহা বলিয়া যে, বাংলায় বীরের অভাব ছিল তাহা নয়। দয়ারাম রায়ই গুপ্তচর দ্বারা মেনা হাতীর প্রাণ সংহার করিয়া দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হন। হায়! সেই কুম্ভকর্ণের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন মহাবীরকে হত্যা করা ভাল হয় নাই। সেই মহাবীরের মৃত্যুতেই সীতারামের পতনের কারণ হইয়াছিল। নবাব দয়ারামকে সীতারামের অস্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ দান করিয়া পুরস্কৃত করেন। অপরাংশ নাটোর ও নলডাঙা লাভ করেন। বাঙালীই বাঙ্গলার সর্বনাশ করিয়াছিল। বাংলার সুবেদার জমিদারগণকে বাদশাহী সনদ প্রচলিত প্রথানুসারে যথারীতি আনাইয়া দিতেন। সম্রাট ফরকশিয়ারই ঐ সকল সনদ দান করিয়াছিলেন। সেকালের জমিদারেরা নানকর বলিয়া পরিবার পোষণের জন্য নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি লাভ করিত। কলিকাতায় ইংরাজেরা জমিদার হইবার সময়েই নাটোর, দিঘাপতিয়া, দিনাজপুরাদি জমিদারগণের সৃষ্টি হইয়াছিল ও তাহারা সকলেই সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদিগের মধ্যেও পরাক্রান্ত মহাবীরের অভাব ছিল না * সে সম্বন্ধে মির্জা আকরাশিয়ার খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। ফরকশিয়ার ফিরিঙ্গি গোলন্দাজদের দ্বারা নানা কৌশলে "মালেক ময়দান" নামক একটি বৃহৎ কামান শকরীগলির নিকট কর্দমাক্ত নিম্ন

* রিয়াজ উস্ সালাতিন পৃ. ২২৫।

ভূমিতে পড়িয়াছিল। উহা উত্তোলন করিতে না পারিলে, শেষে তাঁহার কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য ঐ কামানের চাকার নীচে দুই হস্ত দিয়া মির্জা আফারশিয়ার বক্ষস্থল পর্যন্ত তুলিয়া উচ্চ স্থানে রাখিয়া দেন। উহাতে তাঁহার চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ কামান টানিতে দুইটি হাতি বা পঞ্চাশটি গরুর আবশ্যক হইত ও উহার গোলা একমণ লাগিত। * রাঢ় নিবাসী সৈয়দ আদুল্লা খাঁ ও হোসেন আলী দুই জন রণকুশল বীরের সাহায্যে সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছিল। মুর্খ জাহান্দর সাহ তাহাদিগকে পদচ্যুত করায় তাহারা ফরকশিয়ারের পিতার নিকট যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল সেই ঋণ পরিশোধ করিবার উঁহার সহায়তা করিয়াছিল। ব্যক্তিগত বীরত্বে ও পরামর্শে রাজ্যলাভ বা জাতি স্বাধীন হইতে পারে না। যখন আপামর সকলেরই হৃদয়ে স্বাধীন হইবার জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্খা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, যখন সেইজন্য কোন কিছু উৎসর্গ করা কঠিন বলিয়া বোধ হয় না, তখনই স্বরাজ ও স্বাধীনতা লাভ হয়, পৃথিবীর ইতিহাসের ঘটনাবলি ইহার প্রমাণ। বাল্মিকী, ভূষণ, রুশো, গারিবল্ডি ইহার আচার্য। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করেন, শিবাজী মার্হাট্টা জাতির অভ্যুদয়ের কারণ, ফরাসি বিপ্লব, ইটালির স্বাধীনতা, উহাই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে। কলিকাতায় ইংরাজ জাতি যে সাহস ও সহিষ্ণুতার শত শত স্বদেশভক্ত জীবকে বলিদান ও সমাধিস্থ করিয়াছিল, উহার মধ্যে ডাক্তার হামিলটন, জবচার্ণক প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। জবচার্ণকের নামে রাস্তা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়। ডাক্তার বৌটন বা হামিলটনের সেরূপ কিছুই নাই। উহা নিশ্চয়ই ইংরাজ জাতির কলঙ্কের কথা। অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিরক্ষা অপেক্ষা উহাদের স্মৃতি জাগরূপ রাখা ইংরাজ জাতির প্রধান কর্তব্য কর্ম। মুসলমান জাতির কিরূপ অধঃপতন হইয়াছিল উহা সম্যক উপলব্ধি করিতে গেলে কেমন করিয়া তখন ফরকশিয়ার দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন উহা উল্লেখ করিলেই চলিবে। কাজোয়ার যুদ্ধে জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র এয়াজউদ্দিন পরাভূত ও নিহত হইলে অপদার্থ ভীরু বাদশা জাহান্দারশা শ্মশ্রু ত্যাগ করিয়া হিন্দু সাজিয়া লালকুমারী নামক বারবণিতার সঙ্গে পলায়ন করেন। শেষে দিল্লির শহর কোতোয়াল আসাদউল্লার বাড়িতে ধৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। সম্রাট ফরকশিয়ার সেই নৃশংস জাহান্দারশার অমানুষিক হত্যা করিয়া সিংহাসন দখলের প্রতিশোধ লইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিল। তাঁহার মন্ত্রী জুলফিকার খাঁই জাহান্দারশার দক্ষিণ হস্ত ও পরামর্শদাতা, সেজন্য তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া উভয়ের মৃতদেহ হস্তীতে তুলিয়া ফরকশিয়ার দিল্লিতে সদলবলে প্রবেশ করেন।

সম্রাট ফরকশিয়ারের প্রদত্ত ফারমানে ৩৮ খানি গ্রামের তালিকা তৎকালীন রাজস্বের সহিত দেওয়া গেল।

পরগণা	স্থানের নাম		রাজস্ব	স্থানের নাম		রাজস্ব
বোরো ও পাইকান	শালিখা	(১)	২৭৭	হাওড়া	(২)	৩৮২
ঐ	কাসুন্দিয়া	(১)	১৩০	রামকৃষ্ণপুর	(৪)	১৭০
ঐ	ব্যাটরা	(৩)	৫৮১	বেতোড়ের হাট তখন প্রসিদ্ধ ছিল		
আমিরাবাদ	দক্ষিণ পাইকপাড়া	(৬)	১৪৫	চিৎপুর	(৭)	২৫২

* সায়েরমুতাক্ষরীনা

পাইকার	হোগলকুড়ে (চণ্ডী)	(৮)	১৩৭	উল্টাডিঙ্গি	(৯)	৩১৫
ঐ	দক্ষিণ পাইকপাড়া	(১০)	৪২৫	গোবরা	(১১)	১০০
ঐ	বাহির ঐ	(১২)	১২৫	শ্রীরামপুর ইটালী	(১৩)	১২৭
পাইকার	ইটালী (হিণ্ডানী)	(১৪)	২২৯	গোঁদল পাড়া	(১৫)	১০১
ঐ	কাঁকুড়গাছি	(১৬)	২০৮	কুলিয়া	(১৭)	৫৭২
ঐ	শুঁড়া	(১৮)	৬৪৮	ট্যাংরা	(১৯)	২২৮
ঐ	বাহির ঐ	(২০)	৪০	শিয়ালদহ	(২১)	১১৮
কলিকাতা	ধলন্দা	(২২)	৩০৬	বির্জ্জি	(২৩)	২৮৩
ঐ	তিলতলা (তালতলা)	(২৪)	২০৭	তোপসে	(২৫)	২৯০
ঐ	সানগাছি	(২৬)	২১১	চৌরঙ্গী	(১৭)	৮৮
ঐ	কালিঙ্গা	(২৮)	৩৮৩	চৌবাঘা.	(২৯)	৩৭
ঐ	জলা ঐ	(৩০)	১১৪	মির্জ্জাপুর	(৩১)	১৭৩
ঐ	বেলগাছিয়া	(৩২)	৩০৫	শেখপাড়া	(৩৩)	৪১
মানপুর	সিমলে	(৩৪)	৮২	মাকন্দা	(৩৫)	১১৮
ঐ	মার্কুলী	(৩৬)	২২	কামার পাড়া	(৩৭)	৬৩
কলিকাতা	বাঘমারী	(৩৮)	৪৯			

বঙ্গদেশে চোর ডাকাতের উৎপাত মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময়ে নিবারিত হইয়াছিল। ইহা মুসলমান গ্রন্থকারগণ উল্লিখিত করিয়াছেন ও মহম্মদ জানের নাম শুনিলে চোর ডাকাতেরা ভয়ে কাঁপিত। তিনি দস্যুদিগকে ধরিয়া কুড়াল দ্বারা কাটিয়া পথের ধারের গাছে লটকাইয়া রাখিতেন। তাঁহার নাম সেই জন্য "কুড়লিয়া" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহার পাল্কীর অগ্রে ঘাতকগণ কুড়াল হস্তে গমন করিত। সেইজন্যই কলিকাতায় তাহারা বোধহয় আসিয়াছিল। কলিকাতার সন্নিকটবর্তী স্থানে অনেক ডাকাতের কালী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী ও বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতে যেমন চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যে সর্বদা যুদ্ধার্থ সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত থাকিত ও তাহাদের যুদ্ধ কৌশল ও বলবীর্য পাশ্চাত্য দূতগণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে সময়ের নগর রক্ষণাবেক্ষণ রাজকর্মচারীরা এমন সুন্দরভাবে করিত যে, তাহারা স্বীকার করেন যে, সেরূপ সুবন্দোবস্ত ইউরোপের পুলিশেরা করিতে পারে না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সেরূপ কোন কিছুই লিখিয়া যান নাই, ইহা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়।

ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য করিয়া স্পেন, পর্তুগালের ঐশ্বর্য ও উন্নতিতে একদিন জগতকে স্তম্ভিত ও কম্পিত হইয়াছিল। তাহাদের পদানুসরণ করিয়া ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি অনেক জাতিই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র ইংরাজ জাতির প্রতি সৌভাগ্য লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশেই সেই সমস্ত ইউরোপের উন্নতিশীল জাতির বাণিজ্য, কুঠি ও পরস্পর স্বার্থ-ঘটিত বিবাদ বিসম্বাদও উত্থান পতনের লীলাক্ষেত্র। সেই কর্মময় জীবন্ত জাতির অতীত ইতিহাসের সহিত হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, বরানগর, ঢাকা ও কলিকাতার সম্বন্ধ বর্তমান। ভারতের পশ্চিমোপকূলের সহিত কলিকাতার বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে। কালিকটে ১৫০০

খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বেই যেমন জামোরিনের দরবারে পর্তুগীজেরা আশ্রয় লাভ করিয়া সেই মালাবার উপকূল হইতে পারস্য উপসাগর ও বাংলার প্রধান প্রধান বন্দরে আধিপত্য স্থাপন করে, তেমনি ইংরাজ জাতি স্পেনের অজেয় রণতরীর ধ্বংস ভগবানের অনুকুলতার পরিচয় দিয়া সেই স্পেন পর্তুগীজ প্রমুখ ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী বণিকগণের ক্ষমতা ও বাণিজ্যাদির হ্রাস করিয়াছিলেন। উহা কলিকাতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। উহাতেই ইংরাজ জাতিকে কলির অবতার বলিয়া উল্লেখ করিলে কোন দোষ হইতে পারে না। বর্তমানে ফরাসীর পণ্ডীচারী চন্দননগর পর্তুগীজের গোরাদি ব্যতীত ইউরোপের জাতিসমূহের অতীতের অস্তিত্বের সম্বন্ধ যেন তাহাদের সমাধি ক্ষেত্রের সহিত সমস্তই লোপ হইয়াছে। হায়! বর্তমান উচ্চ শিক্ষা, বিচার ও শাসন সংসর্গে সর্বোচ্চ রাজপদ ভারতবাসীর করায়ত্ত হইয়াও কেন সেকালের সুখ, সম্পদ ও গৌরব দূরে পড়িয়াছে? বিপ্লবগ্রস্থ ভারতবাসী তখন কেন উদরান্নের এত লালায়িত ছিল না, এখন কেন দুইবেলা পেট ভরিয়া ,উদর পোষণ করিতে পারে না? তখন দেশের দ্রব্য দেশের লোক ভোগ করিত, এখন কেন তাহা দুর্মূল্য হইয়া বিলাসের সামগ্রী ও দেশবাসির পরিশ্রমে তাহাদের উপভোগের সীমাতিক্রম করিয়াছে? এই সকল জটিল প্রশ্ন দিন দিন জটিলতর হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুশাসনেও অশান্তির কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবসায়ী যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্ব্যবহারে তাহাদের রাজ্যাবসন হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থোদ্দেশ্য— যতদিন ভারতবর্ষ যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ছিল সেই কথা কলিকাতার ইতিহাসে লিখিত হইতেছে। ইহাতে ব্রিটিশ শাসনের কোন কথায় উল্লিখিত হয় নাই ও হইবে না। তবে কেমন করিয়া যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যৈশ্বর্যের উদয় ও অস্ত হইয়াছিল উহাই উল্লিখিত হইবে। বর্তমান শাসন বা ব্রিটিশ শাসন প্রণালী বা শাসন কর্তাদের কোন কথাই নাই ও থাকিবে না। তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কটাক্ষপাত কলিকাতার কথায় করা হইবে না, বর্তমান অশান্তির সূত্রপাত কোথায় উহারই বিচার ঐতিহাসিকের লক্ষ্য ও কর্তব্য কর্ম। সেই অশান্তির মূলোৎপাটন করা সকলেরই কর্তব্য কর্ম। সেই সাধু উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা স্বদেশভক্ত ও রাজভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই অনুমোদন করিবেন, সন্দেহ নাই।

মহাভারতাদিতে যেমন প্রথমেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য উক্ত হইয়াছে তদনুসারে যে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল সেই সময়ের চিত্র ও ঘটনাদি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা হইল। বর্তমান যুগে ইহা না করা বিপদের কথা। ভারতে সর্বত্রই অশান্তি তাহার প্রচার করা বা যাহাতে উহা বৃদ্ধি হয়, উহা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, অথবা ইউরোপের কোন জাতি বিশেষের প্রতি অযথা কটাক্ষপাত বা ঘৃণোদ্রেক, করা ইহার উদ্দেশ্য নয়। ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের পূর্বে ব্যবসায়ীগণের শাসন পদ্ধতির অভিসম্পাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব পলাশি যুদ্ধের একশত বৎসর পরে শেষ হইয়াছিল। এই গ্রন্থের উহার মূল উদ্দেশ্য সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা হইতে রাজ্যাবসান পর্যন্তের ইতিহাস ও সমালোচনা। উহা সরস সুরুচি মার্জিত করিবার জন্য যেখানে যেটুকু বলা বা করা আবশ্যক উহাই করা হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘটনা বৈচিত্র্যে মারাঠা ও শিখের অভ্যুদয়

শতবর্ষব্যাপী ঘটনা বৈচিত্রের সহিত ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ছায়াপাত স্বরূপ ঐতিহাসিক সমন্ধসূত্র পর্যালোচনা করা কৌতুহলপ্রদ। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, কারণ কলিকাতার কথায় প্রধান প্রধান অভিনেতৃগণের মধ্যে লর্ড ক্লাইবের জন্ম ও বাংলার সর্বময় কর্তা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ও রুসিয়ার অধিপতি মহাত্মা পিটারের ইহলোক ত্যাগ ঐ বৎসরেই হইয়াছিল। উপন্যাসের অভিনয়ের মত বাংলার সিংহাসনের জন্য পিতাপুত্রের রণ সজ্জা ও শেষে পিতাপুত্রের সম্মিলন সৌহার্দ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর পত্নী ও কন্যার নাম ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। জিন্নেতুন্নেসা স্বামী সুজা খাঁর ব্যভিচার দোষে বিরক্ত হইয়া পুত্রকে লইয়া পিতার নিকট থাকিতেন ও মুর্শিদকুলি খাঁ দৌহিত্রকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই আলীবর্দি খাঁর মন্ত্রণায় বাংলার সুবেদারীর সনন্দ সুজা খাঁর নামে দিল্লির দরবারে পেশ ও যুদ্ধ যাত্রার পথেই উহা তাঁহার হস্তগত হয়। পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে রাজ্যলাভ লালসায় যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নয় ইহা পতিভক্তিপরায়ণা জিন্নেতুন্নেসা সরফরাজের মাতা বোঝাইতে তিনি পিতার রাজ্যলাভের সহায়তা ও সম্মতি দান করিয়াছিলেন। সরফরাজ খাঁর মাতৃপিতৃ ভক্তির উদাহরণ মুসলমানজাতির গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ক্লাইভ জন্মাইবার একশত বৎসর পূর্বে ইংরাজ বণিকগণ বর্তমান মাদ্রাজের ছত্রিশ মাইল উত্তরে আরমেগন নামক স্থানে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। তাহার দুই বৎসর পরে ৬ই এপ্রিল ১৬২৭ খ্রীঃ মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সহিত বাংলার ও দিল্লির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় মেয়র আদালত করিবার অনুমতি ইংল্যাণ্ডধিপতি প্রথম জেমসের নিকট গ্রহণ করা হইয়াছিল। চন্দননগরের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইভের প্রতিদ্বন্দী ফ্রান্সিস ডুপ্লের পদচ্যুতি ও সম্রাট সাহ আলম যিনি ক্লাইবকে দেওয়ানি দান করিয়াছিলেন প্রায় সকলেই এক সময়েই জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মি. ফ্রান্সিস যে মাদ্রাজ ও ফোর্ট সেন্টজর্জ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শত বৎসর পরে নাদিরশা দিল্লি দখল ও উহা ভস্ম করিয়া ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের মুলোৎপাটন করেন।

শিবাজী— ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর অনুপস্থিতিতে যে সকল দুর্গাদি জয় করিয়া মারাঠা শক্তি খর্ব করিতে পারেন নাই। উহার প্রতিশোধ স্বরূপ শিবাজী বরযাত্রীর দলের অছিলায় শায়েস্তা খাঁর পুত্র ও রক্ষকগণকে হত্যা করিয়া সাক্ষাৎ ঔরঙ্গজেবের মাতুলের ভীরুতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি গ্রহণ করেন। একশত বৎসর পরে আমেদশা ডুরাণী পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়-শক্তি খর্ব করিয়া দেন। পানিপথের যুদ্ধ বহুকাল হইতে ভারত সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্তনের স্থান বলিয়া ইতিহাসে কীর্তিত হইয়া আসিতেছে,

তেমনি কলিকাতা প্রতাপ ও ইংরাজগণের সৌভাগ্যোদয়ের জন্য বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের মুর্শিদকুলি খাঁই বাংলার সুবেদারী করিয়া উত্তরাধিকারী সূত্রে উহা লাভ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া যান, তেমনি ক্লাইভ আরকটে তাঁহার শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়া কলিকাতার উদ্ধার ও পলাশির যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। বাংলার সুখ-দুঃখের কাহিনীর মধ্যে বর্গীয় হাঙ্গামা উপকথার মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য উহার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে গেলে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির অভ্যুদয়াদি কেমন করিয়া হইয়াছিল ও চৌথের সৃষ্টির কথা বলিতে হয়। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইবের কত সমরু নামে আর একজন ভাগ্যান্বেষী ইউরোপবাসী জন্মগ্রহণ করেন ও ইতিহাসে তাঁহার নাম তাঁহার বীর পত্নীর সহিত স্থান পাইয়াছে। ঐরূপ ভাগ্যান্বেষী বহু মুসলমান ক্রীতদাস ও পাঠান যুবক শৌর্যে ও বীর্যে দিল্লির সিংহাসনাধিকার কবিয়াছিল। বাঙলার শেরসাহ রিক্তহস্তে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া দিল্লির সিংহাসনাধিকার করিয়াছিল। বহেলাললোদির ও সমসুদ্দিনের পুত্র যথাক্রমে সেকেন্দর নামে ঐ জন্য সমাদৃত হইয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার গৌড় হইতে রাজধানী আনয়ন, আদিনার মসজিদ নির্মাণ, হিন্দুর তীর্থ যাত্রাদি পর্যটন রহিত করিয়া বহু নিম্ন শ্রেণীর বলবীর্যশালী হিন্দুগণকে মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ দ্বারা বা কামিনীকাঞ্চনের প্রলোভনে কালাপাহাড়ের সৃষ্টি করা বাংলার পাঠান শাসন কর্তাগণের কীর্তি বলিলেই চলে। হায়! আর্যাবর্তের এমন কোন হিন্দু সন্তানের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে না যে, যিনি জননী ও জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য শৌর্যবীর্য ও কীর্তি কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন। যদি সে অধিকার কাহারও থাকে তবে সে ছত্রপতি শিবাজীর। চিতোরের মহারাণারা স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য চিরস্মরণীয়। সংগ্রামসিংহ ষোলবার মুসলমানগণকে পরাস্ত করিয়া মুর্খতাবশতঃই এক জাতীয় মুসলমানের হস্ত হইতে অপর জাতীয় মুসলমানের হস্তে রাজ্য দান করিয়াছিল। কখন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য কেহ কোন চেষ্টাই করেন নাই। সেইজন্যই শিবাজীকে হিন্দুর অবতার বলিয়া পূজা করা হয়। তাঁহার পূর্ব পুরুষ চিতোরের আধিবাসি দাক্ষিণাত্যে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য গিয়াছিলেন ও দেবীর বরে তাঁহাদের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজীর পিতা শাহজী মুসলমান পীরের অনুগ্রহে হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম শাহজী হয় বলিয়া প্রবাদ। যাহাই হউক মারাঠারা ক্ষত্রিয় জাতির চিরন্তন প্রথানুসারে অসিবিদ্যা মসিবিদ্যা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করিতেন ও তাহারই সর্মাধিক অনুশীলন ও অভ্যাস করিতেন। সেইজন্য অসি, ধনু, মল্ল ও অশ্বরোহনাদি যাবতীয় বীরোচিত কার্যে শিবাজীর বাল্যকালে নৈপুণ্যলাভ হইয়াছিল কিন্তু বিদ্যাশিক্ষাদি সেরূপ হয় নাই। তবে তিনি বীরব্যঞ্জক রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। শক্তি সামর্থ্য আহরণ করিয়া রাজ্য স্থাপন করা তাহার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি পার্বত্য প্রদেশের অসভ্যজাতিগণকে দ্রোণাচার্যের ন্যায় শিক্ষাদানে বশীভূত করিয়া উহাদের অধিনায়ক স্বরূপ অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতার জায়গীর মধ্যে বিপদ আপদে রক্ষার জন্য কোন দুর্গাদি না থাকায সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত ও ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে টোর্নার দুর্গাধিকার ও কৌশলে বিজাপুরের সুলতানকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্যান্য দুর্গাদি নির্মাণ করেন। দিন দিন তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধনতৃষ্ণা ও রাজ্যাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া পড়ে। তাঁহার বিজাপুরের রাজকোষাপহরণ অপরাধে বিজাপুরে সুলতান শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন ও ঐরূপ অন্য কোন অন্যায় কর্ম করিলে তাহার প্রাণনাশ

করা হইবে বলিয়া শিবাজীকে ভয় দেখান। শিবাজী পিতৃভক্ত ছিলেন ও উহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন; কিন্তু সংসারের আদ্যাশক্তি ভার্যা সহীবাহই তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া দিল্লির সম্রাট সাজাহানের সাহায্য প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দেন। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী কথাটি সত্য। কারণ সেই ঔষধের ফলে বিজাপুরের সুলতানের হিন্দু মন্ত্রী মুরারীপন্থের পরামর্শে শিবাজীর পিতাকে মুক্ত করিয়া দেন ও যাহাতে তাঁহার পুত্র মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, সেই সৎ পরামর্শ দান ও প্রত্যুপকার স্বরূপ সেই অনুরোধ রক্ষা করিবার কথা বলেন। শেষে সেই অনুরোধ কার্যে পরিণত হয়। শিবাজী মোগল অধিকার হইতে তিন শত তিন লক্ষ টাকার ধনরত্নাপহরণ করিয়া মারাঠা জাতিকে লুঠপাটের পক্ষপাতী করিয়া ফেলেন ও ভবিষ্যত বরগীর হাঙ্গামার ভিত পত্তন করেন। শিবাজীর অর্থে ও বলবীর্যে বশীভূত হইয়া মুসলমানেরাও তাঁহার দলপুষ্ট করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি সমস্ত কঙ্কন প্রদেশ জয় করিয়া ফেলেন। বিজাপুরের সুলতান তাহার প্রতিকার করিবার জন্য তাহার প্রধান পাঠান সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠান। সুচতুর শিবাজী যেন সেই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া শেষে যথোপচারে সেনাপতির অনুচরগণকে বশীভূত করিয়া দুইজনের গোপনে সন্ধির প্রস্তাবাদি আলোচনা স্থির হয়। সেই সময় উপযুক্ত সুযোগে শিবাজী আফজল খাঁকে বধ তাঁহার সৈন্যের উপর অকস্মাৎ আপতিত হইয়া তাহাদিগকে হত্যা ও জয়লাভ করেন। ক্লাইবের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের একশত বর্ষ পূর্বে ঔরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর পুরন্দর নগরের সন্ধি স্থাপন ও তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার ও কতিপয় বাদশাহের সুবার রাজস্বের চতুর্থাংশ চৌথাদি পাইবার স্বত্বলাভ হয়। সেই সন্ধির পরই দাক্ষিণাত্যে মোগল পতাকা শিবাজীর সাহায্যে উড্ডীন হয়। শেষে শিবাজীকে আফজল খাঁর হত্যার বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ মহাপাপের ফলভোগ ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা জয়সিংহ দিল্লির খাঁ প্রমুখ সম্রাটের সেনাপতিগণ তাহার শৌর্যবীর্যের প্রশংসাসূচক সম্রাটের দিল্লির আমন্ত্রণ পত্র আনাইয়া তাঁহাকে কৌশলে বন্দি করান। ঔরঙ্গজেবের শঠতার ঔষধ প্রয়োগ করা শিবাজীর বিদ্যাবুদ্ধির অতীত বিষয় ছিল না। তিনি দ্বিসহস্র পদাতিক ও পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে তাঁহার ও পুত্রের কারামুক্তির ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাদিগকে সম্রাটের অনুমত্যানুসারে সেইখানে হইতে বিদায় করিয়া দিল। সম্রাট উহাতে নিষ্কন্টক মনে করিলেন। শিবাজি কারাগারে রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিয়া রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করেন ও আরোগ্য লাভের দিন হইতে হিন্দু ও মুসলমানগনের উপাসনা স্থানে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করিতে থাকেন। এই মিষ্টান্নাধারের মধ্যে পিতা ও পুত্রের কারামুক্তির ব্যবস্থা হয়। সমস্তর রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিয়া মথুরায় জনৈক পরিচিত ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রকে রাখিয়া স্বয়ং মস্তক মুণ্ডন সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে এক বৎসর মোগল দূতানুসন্ধানকারীর লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া রায়গড়ে উপস্থিত হন। সেই হইতেই মোগল ও রাজপুত বিশ্বাসঘাতকতায় জিঘাংসাবৃত্তি মারাঠা জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদিগের নিকট হইতে তাঁহার হৃত রাজ্য উদ্ধার ও মোগলদিগের বিরুদ্ধে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের রাজাদের সহায়তা করিয়া চৌথাদি লাভের পথ পরিষ্কার করেন। সেই প্রবল প্রতাপ শিবাজীর ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। শেষে সেই বর্গীয় হাঙ্গামা প্রজাবর্গের ও সুবেদারগণের মহা অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে। দুদ্ধর্ষ শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মারাঠা জাতি মোগল গর্ব খর্ব করে ও কিছুদিন ভারতবর্ষের সর্বময় কর্তা হইয়া পড়ে। দিল্লির সিংহাসন তাহাদের ক্রীড়া পুত্তলীর অবস্থান ভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি ক্লাইভ লাভ করেন তখন আজমীর মহারাষ্ট্রীয়গণ অধিকার করেন। ইউরোপে যেমন নেপোলিয়নের নামের সঙ্গে ছেলেদের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইবার গান আছে, তেমনি বাংলায় হাঙ্গামার বর্গীর গান ঃ—

'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে।'

আজও সেই গানে ছেলেদের ঘুম পাড়ানর সময় গীত হয়। ইংরাজেরাই তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কলিকাতার চতুর্দিকে খাত খনন করিয়াছিল। কলিকাতাদি খরিদের সময় ক্লাইবের সমকক্ষ ফরাসি বীর ডুপ্লের জন্ম হয়। ব্যক্তি বিশেষের বলবীর্যে বা বিশ্বাসঘাতকায় রক্ষণশীল জাতির বা দেশের কেহই কিছু করিতে পারে না। সকল দেশে সকল কালে বিভীষণেরা সোনার লঙ্কা ছারখার করিয়া দেশকে ও দেশবাসিকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে বা অত্যাচারীর হাত হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ জাতির রাজ্য লাভ যে কেবল কতকগুলি অর্থলোলুপ রাজ্যলোভী মীরজাফর প্রমুখের ষড়যন্ত্রে বা পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভে হয় নাই। উহা শতবর্ষব্যাপী ঘটনা বৈচিত্র্যেই হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বাবরের ন্যায় কবি ও ভক্তের দ্বারাই হইয়াছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের যেমন হোমারের ইলিয়ড ও অডিসির ভক্ত ছিলেন, বাবরও তেমনি সর্বদাই সাহনামা পড়িতেন। ফরদৌসীর লিখিত সাহনামার সম্বন্ধে গজনীর মহম্মদের আজ্ঞাতেই হইয়াছিল। প্রতি শ্লোকে এক স্বর্ণ ডরহাম দিবার কথা ছিল কিন্তু ষাট হাজার শ্লোক পরিপূর্ণ হওয়ায় মহম্মদ স্বর্ণস্থলে রৌপ্য মুদ্রা দান করিতে গেলে কবি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি মহম্মদকে ব্যঙ্গ করিয়া এক তীব্র কাব্য লিখিয়া উঁহার বিবেক বুদ্ধির উদ্রিক্ত করেন। সেইজন্যই মহম্মদ ফরদৌসীকে ষাট হাজার স্থলে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন কিন্তু যখন উহা ফরদৌসির দেশে পৌঁছে তখন তাঁহার শবদেহ নগরের বাহিরে সমাহিত হইতে যাইতেছিল। সেই অর্থ তাহার একমাত্র কন্যা প্রথমে লইতে অস্বীকার করেন, শেষে নির্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত উহা গ্রহণ ও দানধ্যানাদি সৎকার্যে ব্যয় করেন। মুসলমান জাতির উন্নতির মধ্যে বিদ্যানুশীল ও স্বধর্ম ভক্তির উদাহরণ যে ছিল না, একথা বলা যায় না। শিবাজীর গুরু ও উপদেষ্টা সাধক তুকারাম ও রামদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও ভূষণের কবিত্ব মারাঠা জাতিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল। সেকালে বাংলায় বাঙালীর সেরূপ কোন কিছুই ছিল না যে, যাহাতে বাঙালী জাতি উহার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। সেই মহাপাপে বাঙলার পরাধীনতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু জাতির শাস্ত্র দর্শনকাব্য, ইতিহাস গণিত আকবরের সময় পারস্য ভাষায় তাঁহার দরবারের প্রধান কবি আবুল ফজল অনুবাদ করিয়াছিলেন। দিল্লির আমীর খসরুর পর তাঁহার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পারসিক কবি আর কেহই ছিল না। অতীতের সহিত বর্তমানের ও ভবিষ্যতের যে সম্বন্ধ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে ইউরোপের বণিকগণের অভ্যুদয় ও রাজ্যলাভ কলিকাতায় কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না সেইজন্যই অতীতের সমুদ্র মন্থন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। রত্ন বা বিষ লাভ দেবতা ও অসুরের পরস্পর ভাগ্যের উপর নির্ভব করে।

ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের সময় লাহোর, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতির যেরূপ উন্নতি হইযাছিল, তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত কলিকাতার ব্যবসায় ও জমিদারীতে হইয়াছিল ও মুসলমান রাজত্বেব কলা কৌশল, স্থাপত্য বিদ্যার গৌরব তাজমহল যেমন

পৃথিবীর নয়টি অত্যাশ্চর্য কীর্তির মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তেমনি অধুনা কলিকাতায় ভারতেশ্বরীর শ্বেত মর্মর নির্মিত সমাধি মন্দির প্রজা ও রাজন্যবর্গের অর্থে নির্মিত হইয়া ব্রিটিশ জাতীর গৌরব কীর্তন করিতেছে। সেকালে ভারতে ব্রিটিশ জাতীর সৌভাগ্যোদয়ের পরশ-মণি কলিকাতাকে বলা যায়। পর্তুগীজ বণিকেরা আমেরিকা হইতে তামাকের আমদানি করিয়া দিল্লির সম্রাটের নিবারণ সত্ত্বেও অতি অল্প দিনের মধ্যে ভারতবাসিকে তামাকের ভক্ত করিয়া ফেলে, তেমনি ইংরাজ জাতির বণিকগণের অপূর্ব ব্যবসায় ও জমিদারীতে তাহাদের বিশেষত্ব কলিকাতার নামের সহিত বিজড়িত করিয়া এখনও প্রবাদ বাক্যে বিদ্যমান রহিয়াছে ঃ—

" জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা।"

সেইজন্য কলিকাতার নামের সহিত কলির অবতারগণের পরস্পর সম্বন্ধ ও পরিচয় দিয়া কলির দ্বিতীয় মহাভারতের অবতারণা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানকালে ঘটনাব অব্যবহিত পরেই একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়; তখন অতীতের কথা মুসলমান ও ইউরোপের ঐতিহাসিকগণের দ্বারা সত্যাসত্যের অলৌকিকতা সম্পাদন করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই পাশ্চাত্যনবীশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উহাতে প্রতারিত হইয়া যে কেবল গত ঘটনার দোষাদি কীর্তন করিয়া যশোপার্জন করিবেন উহাও বিচিত্র নয়। তবে কোম্পানীর ধর্মাবতারগণ কলিকাতাদি স্থানে সমাধি মন্দির, গির্জা হাসপাতালাদি নির্মাণ করিয়া তৎকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের পথ পরিষ্কার করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়া আছেন।

রাজসেবা— মুসলমান ও অন্যান্য সম্রাটেরা ঘোর অত্যাচারী ও বিলাসী হইলেও ইস্‌লাম ধর্মের উন্নতির জন্য দান ধ্যান নগর পত্তন ও নাম পরিবর্তন করিতেন। রিয়াজ উস্‌ সালাতিনে তায়ুল, আয়মা ও আলতমগা নামক গ্রন্থে তিন প্রকার জমিদানের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। আলতমগা দানেই উত্তরাধীকারীর দান বিক্রয়ের স্বত্ত্ব থাকিত। কার্যদক্ষতার জন্য "তায়ুল" ও আয়মা আলতমগার বিদ্বান্, ধার্মিক ও দীন-দুঃখীগণের উদরান্নের জন্য ঐরূপ দানের ব্যবস্থা ছিল। বহুকাল হইতে বাংলার মুসলমান শাসন কর্তাদের অধীনে কার্য করিয়া দেশের জমিদার ও সর্বময় কর্তা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরাও যুগমুখী সুতরাং তাহাদের কলঙ্ককে কোথায়? সেকালে কায়স্থগণের নাম ও প্রতিপত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বিহারের কায়স্থেরা মুসলমানী আচার ব্যবহার উপাসনা আদি বহুকাল ধরিয়া করায় উহা ত্যাগ করে নাই। প্রতাপাদিত্য বিহীন কায়স্থ জাতি অসি ত্যাগ করিয়া মসির সেবায় মত্ত হইয়াছিল। হায়! আর্য্য হিন্দুধর্মের সারমর্ম উপলব্ধি করিবার শিক্ষা ও অবসরাভাবে সেকালের কায়স্থ জাতিকে রাজসেবারই পক্ষপাতী করিয়াছিল। শরীরের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া লোক সেবা করা যে হিন্দুর ধর্ম, উহা সেকালে তাহাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। জমিদারেরা অভিমান ও অহঙ্কারবশতঃ কাহাকেও মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করিত না। লোকের প্রতি সহানুভূতি, পরোপকার, প্রিয় সম্ভাষণ ও বিপদ আপদে দেশবাসিকে রক্ষা করা, কি জমিদার, কি রাজকর্মচারীগণ, কেহই উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না। ঈর্ষা, দ্বেষ তখন যেন সকলের অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল। কর্তব্য প্রতিপালন করা যে ধর্ম, রাজার যুদ্ধাদি দ্বারা দেশোদ্ধার, মূর্খকে শিল্প দ্বারা উন্নত করা, অলসকে কর্ম দ্বারা উপার্জনক্ষম ও দেশের বাণিজ্যাদি সংরক্ষণ দ্বারা উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা, তখন যেন রাজা প্রজা বা শাসনকর্তাদি

কাহারও ধ্যান ধারণার বিষয় ছিল না। পান ভোজন গীতবাদ্য, সাজসজ্জা, উদ্যান সমারোহ আদিতে ও বিহার বিলাসে ভারতের রাজন্যবৃন্দের ও সম্রাটের সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হইত। সুজা খাঁর রাজত্বকালে উহা চরম সীমায় গিয়াছিল। ক্লাইব জন্মাইবার পূর্বেই ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সম্রাটের সনন্দ বলে হুগলীর অপরপারে বাঁকি বাজারে অষ্টেণ্ড কোম্পানী নামক দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া ইউরোপের বণিকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ করে। উহার মূল কারণ যে মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বে তাহারা যাহাতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ না করে সে বিষয়ে অন্যান্য ইউরোপের বণিকদের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের উপর আক্রোশ করিয়া অষ্টেণ্ড কোম্পানী ঐরূপ করে। জার্মানাদি জাতির বাণিজ্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত সেই সময় হইতেই হয়।

ভাষা— শাসনকর্তাদের অনেক কথাই বাংলা ভাষায় অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পর্তুগীজ ভাষার গির্জা, পাদরী, চাবি, ফিতা, নিলাম, কপি আদি অনেক কথা আছে ও ফিরিঙ্গি জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সন্নিবিষ্ট। বোধহয়, কলিকাতার সেকালের ফিরিঙ্গি পাড়া বহুবাজারের নামের ও সার্থকতা সেইজন্য হইয়া থাকিবে। কলিকাতার সকল রাস্তাপেক্ষা বহুবাজারের রাস্তায় যত অধিক গির্জা এমন আর কোথাও নাই। সেকালের ফৌজদারগণের শোভাযাত্রা বড় আড়ম্বরের সহিত হইত। ছত্র, আড়ানী বাদ্যযন্ত্রাদির তূর্যনিনাদে তাহাদের গৌরব নিনাদিত করিত। হিন্দুস্থানীরা বাংলাদেশের ঐসব দেখিয়া বলিত যে "**সাজাবাজা কেশ তিম্মে বাংলাদেশ।**"

বর্ধমান— পলাশির যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্বে বর্তমান বর্ধমান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোতোয়াল ও চৌধুরীর কার্য করিয়া এরূপ উন্নতি লাভ করে যে, তাহার পুত্র বাবুরায় জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। বর্ধমানে শের আফগানের হত্যা ও তাঁহার পত্নী মেহেরুন্নিসার জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী হইয়া জগজ্জ্যোতি নামে পরিচিত হন। পূণ্যশ্লোকা কৃষ্ণকুমারীর হস্তে পিতৃহন্তার বিনাশ জন্য সেই বর্ধমান রাজবংশ বাংলায় সমাদৃত হইয়া থাকেন। অপদার্থ কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ধমানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আজও লোকের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। সাহাজাদা আজিম ওশ্মান জুম্মা মসজিদ বাসাটুলিকা বর্ধমানে করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ফরকশিয়ার বায়োজিদ নামক জনৈক বিখ্যাত সুফী সাধু ফকিরের আশীর্বাদে দিল্লির সম্রাট হইয়াছিল। ইহার বিবরণ রিয়াজ উস সালাতিনে ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাংলার ইতিহাসে বিবৃত আছে। এই বর্ধমানেই ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালেস সাহেব ষোল হাজার মুদ্রার বিনিময়ে সাত মাস কাল তোষামোদ করিয়া সাহাজাদা আজিম ওশ্মানের নিকট কলিকাতাদি গ্রামত্রয় খরিদ করিবার অনুমতি লাভ করেন। বর্ধমানের সহিত কলিকাতার খরিদ বিক্রির যে কেবল সম্বন্ধ ছিল উহা নয়, দিল্লির সিংহাসন লাভের বিষয়ও সংশ্লিষ্ট। সাহাজাদা আজিম উশ্মান যথোপচারে পূজা বিনয়াদিতে সন্তুষ্ট ফকিরের বাক্যাশীর্বাদ প্রত্যাহার করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে ফকিরের কথা সত্য হইয়াছিল। শতবর্ষব্যাপী ঘটনাই সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভের মূল কারণ। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যে কেহ অধ্যবসার সহিত কার্য করিত, সেই কৃতকার্য হইত। বিধাতার ভাবিতব্যতা কে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে? বণিকের সেই সৌভাগ্যোদয় জন কয়েক ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ কর্মচারীর দ্বারা মান্দ্রাজে ও কলিকাতায় হইয়াছিল। তাহাদের সেই কার্যের সহায়তার জন্য কালনেমির লঙ্কাভাগের মত মীরজাফর বা মীরকাসেম কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন হয় নাই।

এইরূপে দেখা যায় যে, ইউরোপের বণিকবৃন্দ মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সমস্তই যেন তাহাদের অভ্যুদয়ের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। মুসলমান সাম্রাজ্য মারাঠা ও শিখ শক্তির অভ্যুদয়ে ম্রিয়মান ও দীপ নিবাবার পূর্বে যেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সেই-রূপ মারাঠা শক্তিরও অর্ন্তধ্যান হয়। সেই সুযোগে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নানা সুযোগে উপস্থিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিগণের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ইংরাজ জাতির সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গপুরের ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় যেমন ঔরঙ্গজেব সেই স্থান অধিকার করিয়া লয় ও তাহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে, তেমনি ইংরাজ জাতি ভারতবাসির মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতা বশতঃ "তোর কড়ি মোর বুদ্ধি ফলার করি আয়" এই নীতির বশবর্তী হইয়া বিশাল ভারত সাম্রাজ্যাধিকার জন্য যে বীজ বপন করিয়াছিল, উহা ফলোন্মুখী হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অধিকার করিতে স্বদেশ হইতে অর্থ বা সৈন্য সমাগম যাহা হইযাছিল, উহা ভারতের অধিবাসিগণের সংখ্যা হিসাবে গণনা বা উল্লেখযোগ্য নহে। ইহাই ঘোর কলির অভিনয় যে, দেশের লোক পরস্পর বিবাদ করিয়া ঈর্ষাদেষাদিতে জর্জরিত অস্থিপুঞ্জের জ্বালায় দেশের সর্ব্বস্ব বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল। মূর্খ শাসনকর্তারা বা দেশবাসিরা ইউরোপের বণিকবৃন্দের ধূর্ততায় তাহাদের পরস্পর সহায়তা করিয়া নিজের সর্ব্বস্ব, এমনকি, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া শেষে পথের ভিখারী হইয়াছিল। সেই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুধু বাঙালীর দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ নয়, উহা সমগ্র ভারতবাসিকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। হায়! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, কলির প্রভাবে ভারত সাম্রাজ্য সেরূপ কোন কিছু বীরত্ব দ্বারা ইংরাজ বণিকগণের লাভ হয় নাই। ইতিহাস কি ইহা প্রমাণ করে না যে, রাজার যুদ্ধাদি জয় ও পরাজয়ের সহিত দেশের ও জাতির সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধ। উহা যে দেশবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা ও অধিনায়কত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

রণজিৎ সিংহ— পাঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুদয় উহার সমুজ্জ্বল উদাহরণ। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সর্বপ্রথমে ইউরোপীয় সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাশ্চাত্য কৌশলে সমর শিক্ষাদান করিয়া শিখ সাম্রাজ্য সুদূর ডেরাইসমাইল, ডেরাগজি, পেশওয়ার, কাশ্মীর মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইউরোপবাসির আগমন ও তাহাদের সহিত পাঞ্জাব শিখকেশরী কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিল ও মুসলমান শক্তি নষ্ট করিয়া রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন উহা ইতিহাস কীর্তন করিয়াছে। উন্নতিশীল জাতি বা পুরুষের জন্য ভগবান যেন সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখেন ও ঘটনা সমূহও যেন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য শত সহস্র প্রতিবন্ধক দান করিয়া, শেষে ইষ্টসিদ্ধি দান করে। পাশ্চত্য জাতির মধ্যে আলফ্রেডের নাম সেইজন্যই চিরস্মরণীয় আছে। তাহার কথা আজও বালকগণের শিক্ষাস্বরূপ উপদেশ দান করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সেইজন্যই পুরুষকারের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া শুভাশুভ ফলের দিকে লক্ষ্য করিতে উপদেশ দেন নাই। বিপ্লবগ্রস্থ দেশ অশিক্ষিতাবস্থায় প্রতিকারের কোন উপায় নির্ধারণ না করিতে পারিয়া কেবল ভাগ্যের দিকে তাকাইয়া নানা দুর্বিসহ যাতনা সহ্য করিয়া দেশ ও দশের সর্বনাশ করিয়াছিল। দেশের নবাব বা রাজারা বিদেশী ভাগ্যোম্বেষী পুরুষ বিশেষের পদানত হইয়া একমাত্র ধনাপহরণ ও শক্তি বিস্তার করা লক্ষ্য হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা এমন কোন কিছুই করিতেন না যে, যাহাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হয়। মুসলমান ও মারাঠাজাতির অভ্যুদয়ে ভারতবাসির প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলাপেক্ষা

অমঙ্গলই অধিক হইয়াছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইউরোপবাসির শুভাগমনকে ভগবানের অভিশাপ বলিয়া বলা যায় না। সংসারে সম্মার্জনীয় যেরূপ প্রয়োজনীয়তা হোমাপক্ষীর পর সম্মান চিহ্নও সেইরূপ আবশ্যকীয়।

মুসলমানী স্মৃতিচিহ্ন—সম্রাট হুমায়ুনের একনিষ্ঠা ও অধ্যবসাতেই তাঁহার সিংহাসন লাভ হইয়াছিল। সম্রাট আকবর প্রিয়তম পুত্রের সহিত মেহেরুন্নিসার অনুরাগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই রূপসীব সহিত শের আফগানের পরিণয় ক্রীয়া সম্পাদন ও বর্ধমানের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সেই পূর্বানুরাগের বশবর্তী হইয়া জাহাঙ্গীর কুতবুদ্দিনকে শের আফগানের নিকট সসৈন্যে প্রেরণ করিয়া পত্নী পরিত্যাগের ঘৃণীত প্রস্তাব করান। উহাতেই শের আফগান কুতবুদ্দিনের শিরশ্চেদন ও নিজের প্রাণ বীরের ন্যায় ত্যাগ করেন। সেই মেহেরুন্নিসাই জগজ্জ্যোতি নুরজাঁহা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ও সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ও নূরজাঁহা তাঁহাদের সেনাপতি মহাবত খাঁ কর্তৃক বন্দি হন ও নূরজাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিতে ও কৌশলে আপনাদের মুক্তিলাভ কবেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর লাহোরে সমাহিত হন ও স্বামীর পার্শে নূরজাঁহা ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে কুড়ি বৎসর যাপন করিয়া সমাহিত হইয়াছিলেন। শের আফগানের ঔরসজাত কন্যার সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরেব চতুর্থ পুত্র শেহরিয়ারের বিবাহ ও ভগ্নি মমতাজমহলের সহিত খুরম অর্থাৎ সম্রাট শাহজাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই মমতাজমহলের স্মৃতি মন্দিরই জগদ্বিখ্যাত তাজমহল। নুরজাহান্ বিলাসের সামগ্রীর মধ্যে গোলাপী আতর ও জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য বার্ষিক পঁচিশ লক্ষ টাকা বৃত্তির পরিমাণে সেকালের ভোগ বিলাসের অনুমান করা অসম্ভব নয়। মহম্মদঘোরীই ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লিকে রাজধানী করেন। মোগল সম্রাটের মধ্যে লাহোরের দুর্গ প্রাচীর হর্মাদি আকবরের নামে, খোয়াবাগ, সাহাদারা মতিমসজিদ ও সমাধির জন্য জাহাঙ্গীরের নাম ও সলিমার উদ্যান সাহজাঁহার নামে অলঙ্কৃত। মোগলের বাংলার সহিত স্থাপত্যাদি দ্বারা কোন স্মৃতিই রক্ষা করেন নাই কেবল তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নামে তাঁহাদের সম্বন্ধ ও খোৎবায় নামোল্লেখেই ব্যবস্থা দেখা যায়। পর্তুগীজদের নিকট হইতে চট্টগ্রাম দখল করিয়া ইসলামাবাদ নাম রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার নাম আলিনগর কবেন কিন্তু শেষ উহা পরিবর্তিত হয়। সেই স্মৃতি এখন আলিপুর কেবল রক্ষা করিতেছে।

মুসলমানী বিচার পদ্ধতি—মোগল সম্রাটেরা নিজে অসংযমী হইলেও রাজত্বে সুরাপানাদি নিষেধ করিতেন ও সুবিচারাদির পক্ষপাতী ছিলেন। জাহাঙ্গীর নিজের শয়নকক্ষে এক স্বর্ণ ঘন্টার সহিত নগরের দুর্গ দ্বারে উহার শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; উহা আকর্ষণ করিলেই বিচারপ্রার্থী প্রজারা বিনা অর্থ ব্যয়েই বিচার লাভ করিত। সম্রাট বাংলার শাসনকার্য নির্বাহের জন্য সুবেদারের অধীন দশজন ফৌজদার স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের পদমর্যাদানুসারে তাহাদের অধীন কর্মচাবী ও সৈন্যাদি থাকিত, উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে করিত। কিন্তু মোগল সম্রাটগণেব অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব সুবেদারেরা নিজে ফৌজদার নিযুক্ত করিত ও তাহারা দেশেব সর্বেসর্বা হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর আমল হইতেই উহার সূত্রপাত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁই প্রাচীন বিচার প্রণালীর পরিবর্তন করেন। তিনি নিজামত, দেওয়ানি, ফৌজদারী ও কাজির আদালত পরস্পর বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং একজন অতিরিক্ত ফৌজদার মুর্শিদাবাদে রাখিতেন। সেইরূপ রীতিনীতির বশবর্তী হইয়া

ইংরাজ বণিকেরা জমিদারী বন্দোবস্ত বা আদালতাদি করেন নাই, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সেকালের ইংরাজ কর্মচারী যিনি কলিকাতায় জমিদারী করিতেন, তাঁহার মাসিক বেতন দুই শত টাকা ছিল ও তাঁহার অধীনে একজন বাঙালী মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে কার্য করিত। উহাতেই তখন হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্ব ও জমিদারী **ধলা ও কালার** সম্মিলিত শক্তিতে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। সেইরূপ জমি বিলির লাভ লোকসান তখন মাপকাঠির কৌশলে দাতা-গৃহীতার সঙ্গে বিলক্ষণ সম্বন্ধ ছিল।

মিত্র— গোবিন্দরাম জব চার্ণকের সময়ের লোক ও তিনি পূর্বে বারাকপুরে থাকিতেন। সেকালের কোম্পানীর কর্মচারীরা অল্প বেতন পাইতেন, কিন্তু তাহারা কলিকাতার জমি বিলি অল্প হারে ও মাপে কমি এবং গুপ্ত ব্যবসাদি দ্বারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই বড় মানুষ হইতেন। উহাতেই "গোবিন্দরামের ছড়ী" প্রবাদবাক্য স্বরূপ চলিয়া আসিতেছে ও তিনিই কুমারটুলির মিত্রবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার নবরত্নের মন্দির ও নন্দরাম সেনের শিবালয় চিৎপুর রাস্তায় সেকালের অর্থোপায়ের নিদর্শন স্বরূপ বা প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড বলিয়া এখন গৃহীত হইতে পারে। তখন লোকে অর্থের সদ্ব্যবহার দেবতার মন্দির বা দুর্গোৎসবাদি করিয়া আহার বিহার কীর্তনাদির আড়ম্বরে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য করিত। সেকালের ও একালের মধ্যে এই তারতম্যের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও বিচার প্রণালী সম্পূর্ণ দায়ী। বিদেশী বিজাতীয় মুসলমান ও খ্রীষ্টান জাতীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্তমান, উহার সূচনা কলিকাতার জমিদারী ও বিচার পদ্ধতিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেইজন্যই ইউরোপীয় বণিকগণ প্রথমে কলিকাতায় পাশ্চাত্য মতে মেয়র আদালতাদির স্থাপন করেন ও উহার উপর মুসলমানগণের বিচার পদ্ধতির কোনরূপ হস্ত না থাকে, তন্নিমিত্ত বিলাতের রাজা প্রথম জেমসের অনুমতি লইয়াছিলেন। আরও তাহা না হইলে, পাছে সে দেশের লোকেরা এখানকার আইন যদি অমান্য করে, সেই ভয়ে উহা করিতে হইয়াছিল। তখন কোম্পানীর অধঃস্তন কর্মচারীরা উচ্চ কর্মচারীগণের অবাধ্য ছিল। ব্যবসাদারেরাও স্বদেশবাসির কতৃত্ব মানিয়া চলা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিত না। সেকালের সমস্তই তখন বিশৃঙ্খলাময়। দেশের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও কর্তৃত্ব চলিত না। উহাতেই "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলাকেটে বামুন মরে" এই প্রবাদেই সেকালের ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ বণিকগণের বিশৃঙ্খলার চিত্র অঙ্কিত করে।

ঘটনা বৈচিত্রে মারাঠা ও শিখজাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির ভারতবর্ষে প্রভুত্বের সম্বন্ধ বিলক্ষণ আছে। আমেরিকা স্বাধীন হইলে ইংরাজ জাতির যে ক্ষতি হইয়াছিল উহার পুরণ ভারতে প্রভুত্ব লাভ করিয়া হইয়াছিল। ঔরঙ্গবেজের মৃত্যুর পর হইতে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে পাঁচজন নাম মাত্র সম্রাট ছিল, কিন্তু তখন মারাঠারাই সর্বেসর্বা ছিল। সেইজন্য ভারতের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলাময়। ইংরাজ জাতির প্রভুত্বের ও অভ্যুদয়ের পথ পরিস্কার জন্যই যেন মারাঠা ও শিখ জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। উহার সম্বন্ধে অনারেবেল জন্ ফরটেসকিউ তাঁহার কৃত বর্তমান রাজার ভারত শাসনের পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন উহা উদ্ধৃত করিলাম (পৃষ্ঠা-৪১) ঃ—

"It may be gathered that the position of the British in India at the close of the war of American independence was none of the strongest. but fortunately a new power had arisen in the north to deliver them form their most pressing dangers—This was the Sikhs whose

organisation and enthusiasm had been so far quickened by persecution that they had by 1785 mastered the whole of the Punjab between the Jhelum—and the Sutlej; where they formed at once a barrier against any new invasion from the Northwestern passes and a dam against the flood which was once again rising of the Marathas. It was pretty certain that before long there must be a struggle between British and Marathas for the final mastery of India for Sindia had not only reoccupied Delhi and Agra, but had actually called upon the East India Company to pay tribute for the tenure of Bengal".

এখন কেমন করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর পর বাংলার নবাবী কে কাহার পর লাভ করিল ও তাহার সহিত ইংরাজ কোম্পানীর সৌভাগ্য বা লাভালাভ কি হইয়াছিল, উহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক।

সুজাউদ্দিন— তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে রাজ্য লোভে উড়িষ্যা হইতে আসেন নাই, তবে উহার সুবন্দোবস্ত করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। তিনি উহা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি দাতা ও সুবিচারক ছিলেন। তাঁহার আমলে মুর্শিদকুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্ত পাকা হয় ও বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যা প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের অধীনে শাসিত হইয়াছিল। তিনি খাজনা আদায়ের জন্য কোন জমিদারকে কারারুদ্ধ করিতেন না, বরং যাহারা তজ্জন্য কারারুদ্ধ ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া যাহাতে নিয়মিত খাজনা দিতে পারে উহার সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন। উহাতে জমিদারেরা প্রাণপণে জমি আবাদ করিয়া নির্ধারিত খাজনাদি সরবরাহ করিত, অধিকন্তু উনিশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আবওয়াব বাবদও দিত। তাঁহারই আমলে আবওয়াবের সৃষ্টি হয়। সেজন্য দেওয়ান আলম চাঁদ ও রাজা রাজবল্লভ দায়ী। ইহারা মুর্শিদকুলী খাঁর আমলের দেওয়ান ও মোহরার ছিল। সুজাউদ্দিনের সময় উহাঁরা সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন। সুজাউদ্দিনের সময় ঢাকার বিস্তীর্ণ জনপদ সম্পূর্ণ আবাদ ও শায়েস্তা খাঁর আমলে যেমন টাকায় আট মন চাউল বিক্রি হইত সেইরূপ সস্তা হয়। উহাতেই তিনি শায়েস্তা খাঁর স্পর্ধা খর্ব করেন; অর্থাৎ তিনি যে ঢাকার পশ্চিম পার্শ্বে তোরণ নির্মাণ করাইয়া উপরে লিখিয়াছিলেন যে উহার দ্বার, যখন চাউল তাঁহার সময়ের মত সস্তা হইবে, তখনই উন্মুক্ত হইবে, সে গর্ব চূর্ণ হইয়াছিল। তবে কিন্তু তিনি সেকালের পশ্চিমি, পাঞ্জাবী কতকগুলি বাস্তুঘুঘু ও আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। দেওয়ান আলমচাঁদ আবওয়াবের টাকায় নবাবের বিলাস ফরক্কাবাগে দোলের মজলিসে আবির ও কুমকুমের সহিত নাচ ও গানের উৎসবে ও প্রতি বৎসর তাঁহার জন্ম দিনে তুলটদানে কর্মচারী, অনুচর, কবি ও দরিদ্রগণকে স্বর্ণ রৌপ্য অর্থ বিতরণ করিতেন। উহাতে তাঁহার সুখ্যাতি সর্বত্রই হইত। সেই সময়েই দিল্লীর রাজকর ফতে চাঁদ তাহার হস্তীর দ্বারা সরবরাহ করিয়া সম্রাট কর্তৃক "জগৎশেঠ" উপাধিতে সম্মানিত হন। শেষে ইঁহারাই ভবিষ্যতে বাংলার বিধাতা পুরুষ হইয়াছিলেন। সুজাউদ্দিনের একপুত্র তকি খাঁ উড়িষ্যায় ও সফররাজ বেহারের শাসনকর্তা মনোনীত হন। আলিবর্দির মাতার সহিত সুজাউদ্দিনের সম্পর্ক ছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাজির সহিত সুজাউদ্দিনের অধীনে উড়িষ্যার কার্য করিতেন। শেষে সরফরাজের অধীনে বেহারের শাসনকর্তা হইয়া যান। সরফরাজের মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে নিকটে রাখিতেন, বেহারে বড় যাইতে দিতেন না। উহাতে আলিবর্দিই বেহারে সর্বময় কর্তা

হইয়া পড়েন ও অর্থ দ্বারা দিল্লির দরবার হইতে আপনার নামে বিহারের শাসনকর্তা হইবার সনন্দ সংগ্রহ করেন। উহা অবগত হইয়া সুজাউদ্দিন যেমন সেই কৃতঘ্নের শাস্তি বিধান করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, অমনি তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছিল। ঐতিহাসিক হলওয়েল সাহেব, হাজির ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু ও অভিচার ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার পুত্র তকি খাঁর শেষ হইয়াছিল বলেন। তকি খাঁ বড় অত্যাচারী ছিলেন। সেইজন্য পুরীর জগন্নাথকে চিল্কাহ্রদের নিকট পাহাড়ের উপর স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। পৃথিবীতে দুর্বলচেতা মানবগণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি চক্রান্ত দ্বারাই করিয়া থাকে।

সরফরাজ— সরফরাজ পিতার মৃত্যুর পর ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হইলেন, কিন্তু তিনি আলিবর্দি, হাজি, আলম চাঁদ প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকতায় উহা অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। যে উপায়ে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ হয়, সেইরূপে গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দি সরফরাজকে পরাজিত করিয়া ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে উপবেশন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজ জীবনোৎসর্গ করেন ও জালিম সিং ও ঘৌস খাঁর বিরত্বকাহিনী আজও সেইখানে রাখাল বালকগণ প্রাণের উল্লাসে উহাদের গুণ গান করিয়া থাকে। হতভাগ্য অলমচাঁদ তাহার পত্নীর গঞ্জনায় আহত অবস্থায় প্রত্যাগত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করে। বাংলায় তখনও স্বাধীনতার গৌরব সাধারণে বুঝিত।

বর্গীর হাঙ্গামা ও চৌথ— আলিবর্দি নবাব হইয়া সুস্থির হইতে পারেন নাই, এগার বৎসরকাল মারাঠাগণের উৎপীড়নে ব্যতিবস্ত হইয়া, শেষে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা কর "চৌথ" দিবার অঙ্গিকার করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। মারাঠারা কলিকাতা আক্রমণ করে নাই ও তাহারা উহা কেন যে করে নাই, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। লঙ্ সাহেবের পুস্তকে কোম্পানীর মন্তব্যে ২৫শে এপ্রিল ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় যে, বর্গীরা ইংরাজদের বলবীর্যের কথা অবগত ছিল, সেইজন্য উহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করে নাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ উমি চাঁদের পত্রের প্রত্যুত্তরে বর্গির সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যদি ঐ সকল দ্রব্য ইংরাজদের জানিতেন, তাহা হইলে তিনি উহা কখনই গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু অনারেবেল জন ফরটেস্ কিউ উহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক অরম্ উমিচাঁদকে বর্গীর হাঙ্গামার মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ কোম্পানীকে মারাঠাগণকে চৌথ দিতে হইয়াছিল কিনা, উহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই, তবে উমিচাঁদ যে কোম্পানীর নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা আদায় ভয় দেখাইয়া করিয়াছিল ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি যে ব্যবসাদারদের পাওনা টাকার উপর শতকরা পনের টাকা কমিশন আদায় ও অগ্রিম টাকা না দিলে তাহারা কোম্পানীর ব্যবসা করিবে না বলিয়াছিল, ইহা কোম্পানীর কাগজে উল্লেখ আছে। তিনি ফরাসিরা উক্ত লক্ষ টাকা দাদন বিলি করিতেছে বলিয়া আদায় করে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে Walpole জাহাজে কোম্পানীব যে টাকা আসে উহা হইতেই সেই টাকা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন নবাবের কর্মচারীগণের উদর পূরণের জন্য ত্রিশ হাজার দিতে হইয়াছিল, কারণ তাহারা কোম্পানীর মাল ও তাহাদের রসদ বন্ধ করিয়াছিল। ইহাতেই তখন ইংরাজ কোম্পানীর শক্তি সামর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার পুরাতন দুর্গের সংস্কার ১৭৩২ খ্রীষ্টাদে আরম্ভ হইয়া ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। লালবাজারে তখন যে জেলখানা ছিল, উহার সম্মুখে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কোম্পানীর প্রথম কালেক্টারী গৃহ তৈয়ারী হয়। তখন কলিকাতা হইতে এক কোটি টাকার মাল আমদানী ও রপ্তানি হইত। ১৭৩৭

খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের কর্মচারিগণকে এদেশের লোকের সহিত টাকার লেনদেন করা বন্ধ করিবার হুকুম জারি করেন, কিন্তু উহা কতদূর কার্যে পরিণত হইয়াছিল উহা জানিবার উপায় নাই।

ঝড়— ঐ বৎসর ঝড়ে ও ভূমিকম্পে কলিকাতার বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই অক্টোবর রাত্রে ঐ ঝড় ও ভূমিকম্পে নদীর জল চল্লিশ ফিট উচ্চ ও নৌকা জাহাজ লোকজনাদি নষ্ট হয়, স্থলে গির্জা ঘর বাড়ি গাছপালা জীবজন্তুরও মৃত্যু হয়। উহাতে পর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। চতুর ইংরাজ কোম্পানী সেই সময়ে সকলের দুঃখ দূর করিবার বিধিমত চেষ্টা করিয়া সকলকে বাধ্য করিয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মন্ত্রণা সভার সভ্য সার ফ্রান্সিস রসেলের বর্ণিত **ঝড়ের** বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া গেল ঃ— "আমি কখন সেই ঝড়ের বিষম সন্ সন্ শব্দের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রঘাত আদি ভুলিতে পারিব না। প্রতি মহুর্তেই বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সকলে বাড়ি চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইবে। সকলে সেই ভয়, উদ্বেগ ও মৃত্যুর আশঙ্কায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম। প্রভাতের দৃশ্য অতীব ভয়ঙ্কর, পূর্ব দিনের রাত্রের ঝড়ে ডিউক অফ ডর্সেট নামক জাহাজ ভিন্ন সমস্ত ছোট বড় উনত্রিশ জাহাজাদি, কতকগুলি নদীতে ডুবিয়াছে, তীরে ভাঙিয়া আড় হইয়া পড়িয়াছে ও কতকগুলি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ সমুদায় রাস্তার দুই ধার জুড়িয়া পড়িয়া আছে। সেন্টএন গির্জ্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। আর আর সমস্ত মাটিতে সমভূমি, ইংরাজ ও বাঙলীর বাড়ির মধ্যে দশ বার খানি একেবারে ধুলাশায়ী হইয়াছে। নদীস্রোতে বাঘ, গণ্ডার ও গৃহপালিত পশুপক্ষী মৃতাবস্থায় ভাসিতেছে ও কতক পথিমধ্যে পড়িয়া আছে। ঝড় থামিবার পর জলমগ্ন জাহাজের মধ্য হইতে মাল উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয়। একে একে তিন জন লোক নামিয়া গেল, কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না। শেষে দেখা যায় যে, এক প্রকাণ্ড কুম্ভীর সেই ডেকের মধ্যে উহাদিগকে জলপান করিয়াছে। পরে উহাকে বধ করিলে উহার উদরমধ্য হইতে তাহাদের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁচ ঘন্টার নদীর জল ১৫ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প। ঝড়টি বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ হইয়া ষাট লিগ পর্যন্ত দূরবর্তী স্থানে ব্যাপৃত হয়। উহাতে অনেক ছোট জাহাজ নৌকা দুই শত ফিট দূরবর্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

বর্গীয় হাঙ্গামায় কলিকাতার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজ কোম্পানী কলিকাতার চারিদিকে প্রশস্ত খাত খনন করাইয়াছিল। উহা চিৎপুর হইতে আরম্ভ হইয়া সারকিউলার রোডের ধার দিয়া বরাবর চলিয়া যায়। উহা ছয় মাইল করিবার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু ছয় মাসে তিন মাইল পর্যন্ত হইয়াই বন্ধ হয়। মারাঠারা কলিকাতা আক্রমণ করে নাই। তাহারা উহা করিতে পারিবে না বলিয়া যেন খাত খনিত হইয়াছিল। ইহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতায় বাংলার যাবতীয় ভদ্রলোক পলাইয়া আসে। বর্গীয় হাঙ্গামায় অন্যত্র লোকের দুর্দশার কথা মহারাষ্ট্র পুরাণে এইরূপ আছে ঃ—

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁতির ভার লইয়া
গোঁসাই মোহান্ত যত চোপলায় চড়িয়া।
ক্ষেত্রি রাজপুত্র যত তলয়ারের ধ্বনি
তলয়ার ফেলাইয়া তারা পলায় অমনি।

কায়স্থ বৈদ্য যত যে যে গ্রামে ছিল
বরগির নাম শুনি সে সব পলাইল।
সোনার বেনে পলায় ধনরত্ন লইয়া
বোচকা বুচকি করি বাহুকে করিয়া।
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটুয়াতে
শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে।
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব যে যথা পলাইল।"

ঝড়ে কলিকাতার যে পরিমাণ অনিষ্ট হইয়াছিল, বর্গীয় হাঙ্গামায় উহার চতুর্গুণ লাভ হইয়াছিল। ইংরাজ কোম্পানী ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর কলিকাতার চারিদিকে বড় বড় গাছ ও জঙ্গল কাটিবার ও ড্রেন মেরামত করিবার হুকুম জারি করেন। উহাতে ইট তৈয়ারি ও পোড়াইবার ব্যবস্থা হয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা জোয়া খেলিত। তাহারা বাড়িভাড়ার জন্য মাহিনা বৃদ্ধির আবেদন করে। সেই সময় ইউরোপে ফরাসি ইংরাজ ও ওলন্দাজগণের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল; সেইজন্য ভারত সাগরে ইংরাজদের একখানি রণতরী থাকিত। উহা ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত যাইবার অনুমতি লইয়া কলিকাতায় আসিত। সেইখান হইতে হুগলীর সৈয়দ, মোগল আরমানী ব্যবসায়ীগণের লক্ষ লক্ষ টাকার মাল আত্মসাৎ করায় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। কলিকাতা হইতে আরমানিদিগকে বহির্গত করিবাব ভয় দেখান হয়, কারণ ইংরাজেরা বুঝিয়াছিল, যে তাহারাই নবাবের নিকট আবেদন করিয়াছিল। বিখ্যাত জগৎ শেঠেরাও ইংরাজের সহিত তখন ব্যবসা করিত। কারণ সেরেস্তার কাগজে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা অপর জাতির মারফতে ইংরাজের সহিত দাদনি ব্যবসা করিতে আপত্তি করিয়াছিল। তখন সেই জগৎ শেঠের মারফত ইংরাজেরা এক লাখ বিশ হাজার টাকা দিয়া সেই গোলমাল মিটাইয়া ফেলে। বিলাতের বিবাদের জন্য ফরাসিরা ওলন্দাজগণের চুঁচড়ার বাগান কাড়িয়া লয় ও তাহারা পাছে কলিকাতা আক্রমণ করে সেই ভয়ে ইংরাজেরা আপনার মালপত্র ওলন্দাজগণের সহিত বরানগরে নামাইয়া কলিকাতায় আনিবার বন্দোবস্ত করে।

উপহার— ইংরাজেরা হুগলীর ফৌজদারকে বার্ষিক ২৭৫০ টাকার উপহার দিতেন এবং এতদ্ভিন্ন নবাব আলিবর্দিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার দৌহিত্র যখন হুগলীতে নবাব হইবার পূর্বে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে ফরাসী ওলন্দাজেরা যে উপঢৌকনাদি * দিয়াছিল ইংরাজেরা সর্বাপেক্ষা অধিক দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল ও তাঁহার নিকট হইতে শিরোপা ও হস্তী লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিল। উহাতে ইংরাজের মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর আলিবর্দি খাঁ ইংরাজদিগকে পরওয়ানা দান করেন। তৎপূর্বে

* উপঢৌকনের বিবরণ ঃ— হীরার আংটি মূল্য ১৪৩৬ টাকা।
সোনার মোহর ৩৫ খানা মূল্য ৫৭৭ টাকা নগদ ৫৫০০ টাকা
আলিবর্দি খাঁর বেগমগণকে মোহর ২৫ খানা মূল্য ৪২৯ টাকা নগদ
ফকিরগণকে ১৮৪ টাকা।
হুগলীর ফৌজদারকে ৭৭০ টাকা দিনেমার রক্ষিগণকে ৭৫৬ টাকা ।
মোমবাতি ১১০০ টাকার ঘড়ি ৮৮০ টাকার আয়না ১ জোড়া ৫৫০ টাকা।
দুইটি পিস্তল ১১০ টাকা এক জোড়ামারবেল পাথর ২২০ টাকা।

নবাবকে হাজি সেলিম বেওয়ারিস প্রজার সম্পত্তি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হইয়াছিল ও ঐ সব লইয়া নবাবের সহিত ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীগণের মনোমালিন্য প্রায়ই হইত। বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ ইংরাজদের পরম শত্রু ছিলেন। তিনি তাঁহার এলাকায় ইংরাজের কুঠি কারবারাদি বন্ধ করিয়া দেন। মিঃ উড্ সাহেব উক্ত রাজার গোমস্তা রামজীবন কবিরাজের বিরুদ্ধে ডিক্রি করিয়া কলিকাতায় রাজার ঘর বাড়ি শীল করায় রাজা ইংরাজদের উপর খড়গহস্ত হন। ইংরাজেরা বর্ধমানের রাজার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিল। ইংরাজেরা ফৌজদার ও দেওয়ান নন্দকুমারকে উপহারাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। নবাবকেও বহুমূল্য ঘোটকাদি উপঢৌকন দিতেন। তখন উহারা বাগবাজারে বারুদ তৈয়ারি ও নগর রক্ষার জন্য পাকা বুরুজাদি করিয়াছিল।

ভয়— এগারজন মুসলমান নাবিক একজন ইংরাজ কাপ্তেনকে সমুদ্রে জাহাজে মারিয়া ফেলিয়াছিল, কোম্পানি দোষী মুসলমানগণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারে নাই, কেবল দুইজন খ্রীষ্টানের উপর ঐ আজ্ঞা হইয়াছিল। উকিল গডার্ড ও কেম্পকে কলিকাতার বাসিন্দা ছাড়া আর কাহারও মামলা পেশ করিলে তাহাদিগকে বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন, একথা কোম্পানীর কর্মচারীরা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। কারণ উহাতে মুসলমান বিচারের সহিত বিবাদ হইবার সম্ভাবনা আছে, আরও সেইজন্য এক নোটিশ জারি করা হয় যে, যাহাতে ইউরোপীয়ান, আরমানী, পর্তুগীজ প্রভৃতিতে এদেশী লোকের হ্যাণ্ডনোটে টাকার আদান প্রদান না করে। যদি কেহ সেরূপ করে, তবে তাহাকে কলিকাতার বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। তখন কোম্পানীর মাসিক খরচা কুড়ি হাজার টাকা, কেবল টাকা আদায় খরচাই আড়াই হাজার টাকা ছিল। তখন বেশ্যার সম্পত্তি কোম্পানী লইত।

অপব্যবহার— নবাব কোম্পানীর নিশান ছাড়া অপব্যবহার করার অপরাধে রামকৃষ্ণ শেঠকে মুর্শিদাবাদ পাঠাইবার নিমিত্ত কোম্পানির উপর পরওয়ানা জারি করেন। কোম্পানী উহাকে বাঁচাইবার জন্য কৌশল করিয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর দান করিল যে, উহা পিতামহ পিতা ও সে নিজে কোম্পানীর অনেক টাকা দাদনি হিসাবে ধারে; অতএব কেমন করিয়া উহাকে তাহারা পাঠাইয়া দেন। কারণ বাদশাহি ফারমনে দেনদারকে আটক করিয়া টাকা আদায় করিবার ইংরাজ কোম্পানীর ক্ষমতা ছিল। তখন উক্ত কোম্পানীর কর্মচারিদের সহিত তাহাদের দালালগণের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রত্যেক প্রত্যেকের আপদ-বিপদে সহায়তা করিত ও প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিত। কোম্পানীর কর্মচারী মিঃ বেলীকে আঠার হাজার টাকা ফেরত দিবার হুকুম হইলে, উহা দালালের দালালী লিখিয়া হিসাব শোধ করিয়া লয়। রামকৃষ্ণ প্রমুখ দালালেরা রাত্রে একত্র হইয়া কি দরে কি জিনিস বিক্রয় করিবে উহা স্থির করিয়া যোগসাজগে জিনিস বিক্রি করিত। তখন এইরূপে দালালেরা শক্তিশালী ও ধনবান হইত। কলিকাতার চাউল ও তৈলের দাম অধিক হওয়ায় উহার উপর যে বার্ষিক মাশুল পাঁচ শত টাকা আদায় হইত উহা উঠাইয়া দেওয়ায় হলওয়েল সাহেব প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উহাতে ব্যবসাদারদেরই লাভ হইবে গরীব প্রজার কোন উপকারই হইবে না। শেষে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, আউস ধানের চাউল টাকায় পঁয়ত্রিশ সের ও আমন ধানের চাউল

"সিরাজউদ্দৌলার মুখে ইংরাজদের উপহার ও বন্ধুতার কথা ও প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি যাহাতে তাহাদের ভাল হয় উহা আমি করিব" —ইহা আলিবর্দি খাঁ বলিয়াছিলেন।

টাকায় দশ সের করিয়া বিক্রিত হইবে। কুলীদের রোজ তখন দৈনিক দশ পয়সা মাত্র ছিল। কোন নবাব বা তাঁহার মন্ত্রীর মৃত্যুতে বা বিদ্রোহে সোনার মোহরের চৌদ্দ টাকা ধার্য দামের কম বেশি হইত। কোম্পানি ইট করিবার সেলামী বাবদ বার্ষিক ৩৭৯ টাকা ২ আনা ২ পয়সা পাইতেন ও বাজার হইতে ৪২৯ টাকা মাত্র আদায় করিতেন। সেকালের ইটের হাজার ৩ টাকা ১০ আনা মাত্র ছিল। উহার মাপ ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৩।। ইঞ্চি চওড়া ও ২।। ইঞ্চি পুরু ছিল। এক শত মণ জালানি কাঠের দাম দশ টাকা হইতে কুড়ি টাকা পর্যন্ত ছিল।

জমিবিক্রি— রাজা কিষণচাঁদ জাল দলিল দ্বারা ট্যাংরা দখল করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া যান। প্রকাশ্য নিলামে হলওয়েল সাহেব পেরিনের বাগান সবে মাত্র আড়াই টাকায় খরিদ করেন। উহা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল স্কট ২৫ হাজার টাকার খরিদ করেন; শেষে উহাতে বারুদখানা হয়। কোম্পানী রসিদ মল্লিক ও নারায়াজি মল্লিকের নিকট হইতে সিমুলিয়া পাগলডাঙ্গা ২২৪৫ বিঘা জমি ও ব্রাহ্মোত্তর ১১৬ বিঘা খরিদ করেন। তখন কলিকাতার জমি জায়গার দাম অল্প হইলেও সেকালের লোকের ও কোম্পানীর খরিদ করিবার আগ্রহ হইয়াছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রায়ই উহা খরিদ ও বিক্রি করিত। তখন ছুটি লইতে হইলে কোম্পানীর কর্মচারিকে এক বৎসর আগে নোটিশ দিয়া আপনার হিসাব নিকাশ দিতে হইত। ইংরাজ কোম্পানী ফরাসিগণের সহিত ব্যবসা করিতে ব্যবসাদারগণকে প্রকাশ্যভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। নবাব ফরাসিদের কাশিমবাজারের কুঠি আটক করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। কলিকাতার জমির দাম দিন দিন বাড়িতেছিল।

বাঙালী— মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে হিন্দুর প্রাদুর্ভাব যেমন হইয়াছিল, তেমনি বাংলায় বাঙালীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া গুণবান মুসলমান নবাবেরা প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছিলেন। ইংরাজেরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তাহাদের হস্তে গুরুতর কর্মের ভারার্পণ করিতেন ও সুফল লাভ করিতেন। ইহাতেই অতি অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতায় বাঙালী পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ কর্মচারীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। বাঙালীর কর্মকুশলতায় কলিকাতা তখন নবাব বা তাঁহার উচ্চ কর্মচারীগণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার লাভের স্থান হইয়াছিল। সীতারাম প্রমুখ সকলেই সেইজন্য কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতেই বাঙালীর সহিত ইংরাজের ঘনিষ্ঠতা হয় ও উহারাই ইংরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভের সোপান বলিতে হইবে। বাঙালীর বুদ্ধি ও সাহায্য উহাদের কি ব্যবসা, কি রাজ্যলাভ সমস্তই হইয়াছিল। হোসেন শার আমল হইতে বাঙালী বাংলার হর্তা কর্তা বিধাতার কর্ম করিয়া আসিতেছে। উঁহার প্রধান মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত কর্মচারী পুরন্দর খাঁ, রূপ ও সনাতন ছিলেন। সুলেমান সার শ্রীহরি জানকীবল্লভ, প্রমুখের সাহায্য লইয়া রাজা টোডরমল্ল রাজস্ব বিষয়ক কাগজপত্র বুঝিয়া বন্দোবস্ত করেন। বাংলার অধিকাংশ কানুনগো বাঙালী। রঘুনন্দন প্রমুখ কানুনগো মুর্শিদকুলীর মত কর্মদক্ষ দুর্দান্ত শাসনকর্তাকেও গ্রাহ্য করিত না। প্রতাপাদিত্য প্রমুখ জমিদারগণের বিদ্রোহে দিল্লীর সিংহাসন পর্যন্ত বিব্রত হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়াই চতুর ইংরাজ কোম্পানী বাঙালীকে হস্তগত করা প্রধান কর্তব্য কর্ম মনে করিয়াছিল। উহাতেই ইংরাজ কোম্পানীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় অনেক বাঙালীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী লাভ হয়। শিল্পনৈপুণ্যেও বাঙালী জগদ্বিখ্যাত। জনার্দন কর্মকার ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২১২ মণ ওজনের বার হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া কামান তৈয়ারি করিয়াছিল। উহার নাম জগজ্জয়ী বা 'জাহানকোষা' বলিয়া সম্রাট সাজাহান প্রমুখ প্রশংসা করিয়াছেন।

বাদসাওয়ালী নামে আর একটি কামানও বাঙালীর নির্মিত। উহা মুর্শিদাবাদের প্রদর্শনী গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। সেকালে বাঙালীরা যে অস্ত্রাদি নির্মাণ করিতে নিপুণ ছিল উহাতেই প্রমাণ হয়। বাঙালী স্বাধীন বৃত্তির অনুশীলনাভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া সর্বস্ব হারাইয়াছে। জননী ও জন্মভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিয়াও অন্যান্য জাতির অভ্যুদয়ের সহায়তা প্রাণপণে করিয়াও বাঙালী স্বজাতির দুঃখে অধীনতা দূর করিবার কোন চেষ্টাই কখন করে নাই। সেই মহাপাপে বাঙালীজাতি দাসত্ব মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ কোম্পানীর অভ্যুদয়ের পথ প্রদর্শক স্বরূপ বলিলেই চলে। বাংলায় বাঙালী যে ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়ের সহায় হইয়াছিল উহাতেই শেষে ভারতবর্ষ উহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল।

হায়! বাঙালী পরের অভ্যুদয়ের সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু নিজের উহা করিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও পশুত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? মানবেরা যেমন গৃহপালিত পশুপক্ষী দ্বারা তাহাদের যাবতীয় কর্ম করাইয়া লয়, তেমনি বাঙালীজাতি মুসলমান ও ইংরাজের কর্মচারী স্বরূপ উহাদের প্রভুত্ব ও রাজত্বের সহায়তা করিয়া আসিতেছে!

আলিবর্দি খাঁ যদি বর্গীর হাঙ্গামায় বিব্রত না হইতেন ও সিরাজের কথায় মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, কখনই বিদেশী বণিকেরা বিশেষতঃ ইংরাজেরা কলিকাতায় আট ঘাট বাঁধিয়া দেশের লোকজনকে বাধ্য করিয়া রাজত্ব করিবার অবসর পাইত না। আলিবর্দি নিজের ভাগ্যোন্নতি সিরাজের জন্মের সহিত সম্বন্ধ ছিল মনে করিয়া উহাকে বড়ই ভালবাসিত। রামকৃষ্ণ উমিচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিরা কোম্পানীর কর্মচারিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা দ্বারা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করিত। সেইজন্য উহারা সেকালের ইংরেজিটোলার নিকটে থাকিত। যেখানে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ছিল সেইখানে রামকৃষ্ণ শেঠের বাড়ি ছিল। উমিচাঁদের বাগান বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের নিকট ছিল। নয়ানচাঁদ মল্লিক প্রমুখের ভাড়াটিয়া বাড়িতে ইংরাজেরা থাকিত ও তাহাদের সহিত ব্যবসা করিত। সেকালে লালবাজারে একটি সুন্দর সরাই এপেলো (Appollo) নামে খ্যাত ছিল। সেইখানে নাবিকেরা থাকিত ও মার পিট খুনজখম হাঙ্গামার জন্য কেহ তখন সেখানে যাইত না। হলওয়েল সাহেব কলিকাতার কালেক্টার ও কলিকাতার উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জরীপ করান ও উহার জনসংখ্যা চারি লক্ষ নয় হাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জয়নগর মারাঠা খাতের বাহিরে ছিল। রোটেসন গভর্ণমেন্টের কাল হইতে হলওয়েলের সময় পর্যন্ত কলিকাতার লোকসংখ্যা অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি হইয়াছিল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কলিকাতায় ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটির সূত্রপাত হয়। হলওয়েল সাহেব ঐ সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন। বিলাতী মেয়র ও অলডারম্যানের অনুকরণে উহা গঠিত হইয়াছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর কার্য বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গঙ্গার স্রোতে সুতানটির মাল নামাইবার ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য উহা তৈয়ারি কবিয়া যাহাদের মালপত্র ঐ ঘাটে তুলিত তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাশুল আদায় কারবার আদেশ হইয়াছিল। সেইজন্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা আপন আপন ঘাটে তাহাদের মাল নামাইত ও উহা তাহাদের নামে খ্যাত হইত। নয়ানচাঁদ মল্লিক* প্রভৃতির ঐরূপ ঘাট ছিল। ঐ ঘাটে লোকে গঙ্গাস্নানও করিত ও উহাতে পুণ্যার্জন হয় ইহা সেকালের হিন্দুরা বিশ্বাস করিত।

চাঁদপালঘাট, কাশীনাথ ঘাট, ব্যাবেট্যোর ঘাট, জ্যাকসন, ফোরসানস, ব্রাইথার, রস, হুজরীমল ইত্যাদি।

তখন শোভাবাজার, চার্লস বাজার, বাগবাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা, জানবাজার ও কোমও ঘাসটোলার বাজার গোবিন্দপুরে হইয়াছিল। আজকালের ক্লাইব ষ্ট্রীট যেখানে বর্তমান উহারই দুইধারে সেকালের কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা বাস করিত। সেকালে কলিকাতার ইংরাজ, বাঙালী ও মুসলমান যাবতীয় ব্যবসায়ীরা বাড়ীর চারিদিকে বাগান করিত। সেকালের বিচার ঘরের পুরাতন স্মৃতি ওল্ড কোর্ট হাউস রাস্তা রক্ষা করিতেছে। তখন দিল্লীর সিংহাসন একরূপ শূন্য বলিলেই চলে, দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রবিপ্লব, বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা, এমন সুযোগে ইংরাজেরা যাহা ইচ্ছা আদালতাদি করিয়া দেশের সর্বময় কর্তা হইয়াছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে জানুয়ারি কলিকাতার গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত চব্বিশজন অধিবাসী দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দমার জন্য কোর্ট অফ্ রিকুয়েষ্ট ও সেসন আদালতে বিচার করিতেন। স্বয়ং গভর্ণর ও তাঁহার সদস্যগণ উহার উপর শেষ চূড়ান্ত বিচার করিতেন।

মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর হইতেই কোম্পানীর কর্মচারীরা গোপনে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। উহার কল্যাণে বিলাতের কোম্পানীর লাভের অংশ ক্রমশই হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখান হইতে আর উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাঠান হইত না, উহাতে সেখানকার খরিদ্দারেরা চটিতেছিল। উহাতেই বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারগণের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল।

ঘটনা দ্বারাই গর্দভে সিংহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকে সেকথা ঈশপের কথায় শিশু শিক্ষার উপদেশের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। উহার উদাহরণ যেন বিচিত্র ঘটনায় ভারতবর্ষে সত্য সত্যই অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। উহা না হইলে কি যে সকল কোম্পানীর কর্মচারীরা অন্নদাতার অন্ন হরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না তাহারাই কি এই বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার পথ পরিষ্কার করিতে পারিত? হায়! সেই সকল ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরা রাজ্য লাভ করিয়াছিল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ
নবাব আলিবর্দি ও সিরাজউদ্দৌলা

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা ঘটনায় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় হইয়াছে। সেই সময় হইতেই বিলাতের সন্ধি বিগ্রহের সহিত ভারতের সম্বন্ধ সূত্র আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই ইংরাজ ও ফরাসি কোম্পানীরা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজা নবাবগণের ভাগ্যোদয়ের সহায়তা করিতে আরম্ভ করে ও উহাতে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। উহাতেই ক্লাইব প্রমুখের প্রতিভা ও বীরত্ব প্রকাশ হয়। সেই সময়ই মৃত্যু আদিতে দিল্লীর সিংহাসন, দাক্ষিণ্যাত্যের সুবেদারি ও তাঞ্জোরের রাজত্ব লাভের জন্য উত্তরাধিকারিগণ বিব্রত হইয়া পড়েন ও উহা লইয়া পরস্পর উত্তরাধিকারিগণের বা হৃতাধিকারিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল মহম্মদ শার মৃত্যুতে আহাম্মদ শা দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিল উহা লইয়া কোন বাদানুবাদ হয় নাই সত্য কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম উলমূলুকের মৃত্যুতে উহার মনোনীত. দ্বিতীয় পুত্র নাসিরজঙ্গ উত্তরাধিকারী অনুমোদন করেন উহা রক্ষা করিবার সম্যক ক্ষমতা না থাকায়, সেই পদপ্রার্থী মৃত নিজামের পৌত্র বিজাপুরের অধিপতি মজফরজঙ্গ সাতরায় গিয়া মারাঠাগণের দ্বারা চাঁদ সাহেবকে মুক্ত করাইয়াছিলেন। উহার সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত করেন যে, যুদ্ধ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইবেন ও চাঁদ সাহেবকে কর্ণাটকের নবাব করিবেন। ফরাসিরা চাঁদ সাহেবের যেমন সহায়তা করেন, তেমনি ইংরাজেরা তাঞ্জোরের হৃত রাজার সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথমে ফরাসিরা কৃতকার্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইংরাজেরা চতুরতা করিয়া হৃত রাজার পক্ষত্যাগ করিয়া তাঞ্জোরের রাজার নিকট যুদ্ধযাত্রার সমস্ত খরচ ও দেবীকটের দুর্গ লাভ করেন। সেই সময়েই চতুর মেজর লরেন্স ক্লাইবের বীরত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় পান ও ভবিষ্যতে উঁহার প্রতি সণ্ডাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তাঁহাকে সৈনিক বিভাগের কাপ্তেন করিয়া দেন। উহাতেই আরকটের দুর্গাধিকারে ক্লাইবের যশঃ শৌর্য পৃথিবীব্যাপী হইয়া পড়ে।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টেবর Aix La Chapelle-এর যে সন্ধি হয় উহাতে ইংরাজ ও ফরাসি জাতির মধ্যে স্থির হয় যে, যাহা জয় করিয়াছিল উহা পরস্পর প্রত্যার্পণ করিবে। ঐ শর্ত ভারতে অবগত হইবার পূর্বেই পূর্বোক্ত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আরকটের যুদ্ধ ব্যাপার বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের * অভিমতানুসারে হয় নাই।

---

* রবার্টসনের The Trade of the East Indian Company-র ১৭২ পৃষ্ঠায় ঃ—

"In 1749 the Presidency of Madras entered unwarrantably into the war of Tanjore which was followed by that of Arcot. This was contrary to the wishes of the Directors and should not be taken as evidence of the Military character of the company. The real truth lies in a complete understanding of the general development of the company from a purely commercial enterprise to a sovereign and ruler in India."

ঘটনাচক্রেই বিদেশী বণিকেরা ব্যবসা হইতে রাজত্ব করিবার সুযোগ দেখিয়া সেই বাসনা কার্যে পরিণত করিবার বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিল ও ইংরাজের ভাগ্যেই কেবল উহা ফলবতী হইয়াছিল। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ইংরাজ কোম্পানী এখানে কার্য করে নাই বলিয়াই কৃতকার্য হইয়াছিল ও বিলাতের যুদ্ধে ফরাসীর পরাজয় হওয়াতেই উহারা যে এখানে ইংরাজদের যাহা কিছু জয় করিয়াছিল উহা প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল * কিন্তু হায়! উহারা ইংরাজের করতলগ্রস্ত ব্যবসা ফিরিয়া পান নাই।

মিঃ ষ্টানলিনোপোল ঔরঙ্গজেবের জীবন চরিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, শায়েস্তা খাঁ + জানিতেন না যে তিনি মগের দৌরাত্ম দূর করিয়া ও চাটগাঁর নাম ইসলামাবাদ করিয়া ভবিষ্যতে ইংরাজ কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করিবেন।

কলিকাতার ভিত পত্তন অর্থ সম্বন্ধেই হইয়াছিল উহার মূল ব্যবসা ও উহার উন্নতিতে মাশুল আদায় করা হইত। আর মোগল সাম্রাজ্যের পতনই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যত ক্ষমতা ও উন্নতির মূল কারণ। ++

এইরূপে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইংরাজ কোম্পানী ভারতবর্ষের সর্বত্রই উহাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিস্তার অনুকুল ঘটনাস্রোতে করিয়াছিল **উহা কাহারও বিদ্যা, বুদ্ধি বা কৌশলে হয় নাই**। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই শক্তির বিস্তার কলিকাতা হইতে হইয়াছিল ও **সেইজন্য কলিকাতা ইংরাজ কোম্পানীর পরশমণি** ও ক্লাইব সেই পরশমণি লাভ করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত পত্তন করেন। সেই সূচনার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত সূচনা করিয়া পূর্বে কিরূপে আলিবর্দির সময়ের কথা সংক্ষেপে বলিতে হইবে।

---

* "The English Company was not subjected to the dictation of the home Government, so that, when the French attacked the English settlement, the English attacked the French trade. The English navy defeated France, and the French East India Company stood or fell with the French Nation. Consequently the French East India Copmany was compelled to surrender the English settlements, which it had captured, but could not demand, in return, the restitution of its trade." Robinson's The Trade of the East India Company (Page171). Sir Alfred Lyall has put forward a somewhat different view in his book named Rise and Expansion of the British Dominion in India.

+ 'Shayista then sent and expedition against Arakan and annexed it, changing the name of Chittagong into Islamabad, 'the city of Islam'. He little knew that in suppressing piracy in the gulf of Bengal he was materiallyassisting the rise of that future power, whose coming triumphs could scarcely have been foretold from the humble beginning of the little factory established by the English at the Hugli in 1640. Just twenty years after the suppression of the Portuguese Job Charnock defeated the local forces of the Faujdar, and 1690 received from Aurangjeb, whose revenue was palpably suffering from the loss of trade and customs involved in such hostilities, a grant of land at Sutanuti, which he immediately cleared of jungle and fortified. Such was the modest foundation of Calcutta. (page 117)

++ (Ibid P. 118) -- The growth of the East India Company's power, however, belongs to the period of the decline of the Moghal Empire : whilst Aurangjeb lived, the disputes with the English traders were insignificant."

আলিবর্দি খাঁ— আলিবর্দির ন্যায় মতে বাংলার সিংহাসন লাভ করেন নাই ও তিনি বাংলায় এমন কিছুই করেন নাই যে, যাহার জন্য তাঁহাকে একজন বিখ্যাত নবাব বলা যায়। তবে তিনি যে মারাঠাগণকে চৌথ দিতেন সেজন্য তাঁহার নিন্দা বা দোষ দেওয়া যায় না। কারণ দাক্ষিণাত্যে নিজামের প্রতিষ্ঠাতা আসফজাকেও সেই মারহাট্টা কর দিতে হইয়াছিল। আলিবর্দি খাঁ জীবনে অনেক অন্যায় কার্য করিলেও তাঁহার হৃদয় যে কোমল ও স্নেহশীল ছিল উহার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ বিপর্যস্ত বলিলেই চলে। বিদ্রোহীর হস্তে তাঁহার চক্রীভ্রাতা হাজি ও জামাতা জইনুদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছিল। আমিনা বেগম প্রমুখ পরিবারাদি নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়াছিল। নবাব সরফরাজ খাঁর সহিত হাজি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন উহার প্রতিফল স্বরূপই যেন তিনি নৃশংসরূপে হত ও সত্তর লক্ষ টাকার গুপ্তধন বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল।

আলিবর্দির কেবলমাত্র তিন কন্যা ভিন্ন কোন পুত্র সন্তান ছিল না। উহাদের সহিত আলিবর্দির তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগমের স্বামী নোয়াজিস আহম্মদ, সিরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ সহোদর একরামুদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ও উহার মৃত্যু শোকে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন। তাঁহার অধীনে হোসেনকুলী খাঁ ও রাজা রাজবল্লভ কার্য করিতেন। দ্বিতীয়া কন্যার স্বামী সৈয়দ আহম্মদ পুত্র সওকৎজঙ্গ ও কনিষ্ঠা আমিনা বেগমের স্বামী জইনুদ্দিন, পুত্র সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন। নবাব আলিবর্দির বৈমাত্র ভগিনীপতি মীরজাফর হজরৎ আলির বংশধর ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সাহসী ও বদান্য ছিলেন কিন্তু শেষে বিলাসী ও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিয়া আলিবর্দির বিরাগভাজন হন। শেষে নোয়াজিদ আহম্মদের শরণাপন্ন হন। দৌহিত্রগণের মধ্যে সিরাজউদৌল্লাই নবাবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, কিন্তু তিনিও মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আলিবর্দি তাকে স্নেহময় কথায় বাধ্য করিয়াছিলেন। উহা উল্লেখ করিলেই নবাবের কোমল হৃদয় প্রকাশ হইবে।

সেইজন্য উভয়ের মধ্যে পরস্পর যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল উহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"বালকের ন্যায় আমায় আর ভুলাইতে পারিবেন না। আপনি আমাকে অনেক সময়েই কল্পিত আদর ও স্তোকবাক্যে প্রতারিত করিয়াছেন ও পিতৃব্যদিগকে রাজপদ দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এই বিবাদে হয় আপনার মস্তক আমার কক্ষদেশে, নয় আমার মস্তক আপনার পাদদেশে পতিত হইবে, সেইখানেই শেষ মীমাংসা হইবে। আমার নিজের বলে নিজের ন্যায্য দাবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে আপনার বাধা দেওয়া উচিত নয়।"—সিরাজ।

ইহাতে মাতামহ অতিমাত্র বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, "ধর্মের জন্য যাহার যুদ্ধ করিয়া প্রাণদান করে তাহারা জানে না যে, উহার তুলনায় সংসার সংগ্রামে স্নেহের সহিত যুদ্ধ উহা অপেক্ষা কত গুরুতর। উহাতে যে জয়ী হয় সেই শ্রেষ্ঠতব বীর। নির্বোধ! তুমি ভ্রান্ত, নহিলে তুমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতে যে, যদি আমার ক্ষমতার অধীন হইত তাহা হইলে বিহার কি, সমস্ত ভারতবর্ষের আধিপত্য তোমায় দান করিতাম। তুমি জান না, যে শেষ বিচারের দিন উপরোক্ত বীরগণের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। কারণ একজন শত্রুহস্তে ও অন্যে প্রাণসম বন্ধুহস্তে প্রাণ বিসর্জন করিতে উদ্যত হয়।'

"গাজী কে পায় সাহাদাৎ, অন্দর ভাগো পোস্ত।
গাফেল কে সাহীদে এশক্ ফাজেল্ তার্ আজ্ দোস্ত।
ফারদায় কেয়ামাৎ ইঁ বা আঁ কায়মানাৎ
ইঁ কোস্তা দুষ্‌মানাস্ত ওয়া কোস্তায়ে দোস্ত।"

আলিবর্দি পাটনায় উপনীত হইয়াই সিরাজের সহিত সম্মিলিত হইলেন। অল্পকাল পাটনায় থাকিয়া অশ্রুজলে পরস্পরের মনের মালিন্য দূর হইয়াছিল। তৎপূর্বে নবাবের প্রতিনিধি রাজা জানকীরাম পাটনার দুর্গ ত্যাগ করিয়া সিরাজকে উহাতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, বরং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাদি গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল ও উহাতে সিরাজের পক্ষের সেনাপতি মেহিদীমেলার খাঁ সমরশায়ী হইয়াছিল। তখন অগত্যা সিরাজউদ্দৌলাকে দুর্গবহিস্থ এক ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিতে হইয়াছিল ও রাজা জানকীরাম তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্দেশ করিয়া নবাবের আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হইয়াছিল। আফগান বিদ্রোহকালে যুদ্ধস্থলে সিরাজউদ্দৌলাকে অনেক সময় উপস্থিত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তখন রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা করিবার কোন মুসলমান নবাব পুত্রের সুবিধা বা সুযোগ ছিল না। সেকালে মুসলমান জাতির প্রায় সকলেই ক্ষমতাপ্রিয়, বিলাসী ও অসংযমী ছিল। উহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং নৃশংস অত্যাচারী হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিলেই চলে। মুতাক্ষরীণ প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, "আলিবর্দির পরিবারবর্গ মধ্যে লাম্পট্য ও অনাচার পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।" উহারই মধ্যে সিরাজউদ্দৌলা লালিত পালিত হইয়া যে যৌবন সুলভ চাপল্যে ও নবারের স্নেহ এবং আদরে যে বিলাসী ও অত্যাচারী হইবেন না, ইহা আশা করা যায় না। উক্ত গ্রন্থকর্তা হোসেনকুলীর ভ্রাতা হায়দার ও উহার ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনউদ্দিনের মৃত্যুর দ্বারা নির্দোষীর রক্তপাতে সিরাজের ধ্বংসের মূল কারণ লিখিয়াছেন ও উহা আলিবর্দির ঘোর কলঙ্ক বলিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সিরাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন উহা স্বাভাবিক নহে বলিয়া বোধহয় ও উহার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। হইতে পারে যে, সিরাজউদ্দৌলা বালস্বভাব চপলতায় ও শিক্ষাভাবে ব্যাভিচারী ও অবাধ্য ছিল. কিন্তু বড়বাটির যুদ্ধে তাহার সাহসের গুণকীর্তন আছে। তাহাকে যখন বৃদ্ধ মাতামহ ও মাতামহীর অভিমতানুযায়ী কুলের কলঙ্ক দূর করিবার জন্য পাপিষ্ঠ হোসেনকুলি খাঁর শিরশ্ছেদন করিতে দেখা যায়, তখন কেমন করিয়া বলা যায় যে, সে অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল এবং তাহার দুষ্প্রবৃত্তির উপর ঘৃণা ছিল না? আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পরে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও প্রতিদ্বন্দ্বী শওকতজঙ্গকে পরাজিত করিয়া ঘোর ষড়যন্ত্রের মধ্য হইতে সিরাজউদ্দৌলা যেরূপে রাজ্য লাভ করিয়াছিল, উহাতে যে সে মূর্খ ছিল, ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না; বিশেষতঃ আলিবর্দির মত চতুর ব্যক্তি সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করিয়াছিল। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, তিনি আলিবর্দি খাঁর জীবদ্দশায় রাজকার্য মাতামহের উপদেশমত করিতেন ও তাঁহার অনুরোধমত আলিবর্দি ইংরাজগণের পক্ষে পরওয়ানা জারি করিয়াছিলেন। এইরূপ স্নেহপ্রবণ ব্যবহারে আলিবর্দি যে কেবল দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাধ্য করিয়াছিলেন উহা নয়; মুস্তাফা খাঁর সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবহার উল্লিখিত হইয়া থাকে।

মনসুরগদী — নোয়াজিস মহম্মদ যেমন রাজধানীর দক্ষিণ প্রান্তে মতিঝিলের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদে বাস করিতেন, সেইরূপ নবাব দৌহিত্রের জন্য ভাগীরথির পশ্চিম তীরে

একটি মনোরম স্থান মনোনীত করিয়া এক সুন্দর উদ্যান মধ্যে সরোবরকে বিস্তৃত ও নানা কারুকার্য খচিত গৌড় প্রস্তরাদির দ্বারা এক উত্তম প্রসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহার নাম প্রিয় দৌহিত্রের উপাধি অনুসারে মনসুরগদী রাখিয়াছিলেন ও উহার ব্যয়ভার জন্য নূতন আবওয়াব জমিদার ও প্রজাবর্গের স্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছিল। আরও মন্‌সুর বাজারের আয় হইতে দৌহিত্রের বিলাস ব্যয় সংগৃহীত হইত। ঐ বাজার উক্ত প্রাসাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নবাব এইরূপে সিরাজউদ্দৌলা আর যাহাতে বিদ্রোহী না হয়, উহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন বোধহয়।

যখন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে রাজপরিদর্শন জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই সময়েই ইউরোপীয় বণিকগণের নিকট হইতে নানা পুজোপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা রাজবল্লভ ঢাকার সর্বময় কর্তা। নোয়াজিস মহম্মদ নামে ঢাকার কর্তা, তিনি সেখানে কখন যাইতেন না, বা থাকিতেন না। কোম্পানীর ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারির মন্ত্রণা বিবরণীতে দেখা যায় যে, রাজা রাজবল্লভ সেলামির জন্য জুলুম জবরদস্তী করিয়া ইংরাজের কয়েকজন গোমস্তা ও চালের নৌকা আটক করিয়া এই আদেশ প্রচার করেন যে, যাহাতে কেহ ইংরাজের অধীনে তখন কর্ম না করে। কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি ওলন্দাজ সমস্ত ইউরোপীয় বণিকগণ তখন নবাবের কর্মচারীগণের অত্যাচারে বিব্রত ও সকলে মিলিয়া নবাবের নিকট সুবিচারের জন্য আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন' সেই সময়েই নবাব ও হুগলীর ফৌজদার এবং দেওয়ান নন্দকুমার নানা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সর্বপ্রথম ইংরাজি কাগজ পত্রে নন্দকুমারের নামোল্লেখ দেখা যায়।

টাঁকশাল— কোম্পানী কলিকাতায় টাঁকশাল করিবার জন্য ওয়াট্‌স সাহেবকে বিশেষ সতর্ক করিয়াছিলেন যে, যাহাতে জগৎশেঠ উহার কোন সংবাদ না পান এবং সেজন্য দিল্লিতে ও মুর্শিদাবাদে প্রায় এক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বে ষড়যন্ত্রই সকলের সর্বনাশ হইত। ঢাকার দেওয়ান গোকুলচাঁদের পদচ্যুতিতে রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আবার রাজবল্লভকে হিসাব-নিকাশ দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে আসিলে ঢাকায় উহার প্রভুত্ব লোপ হইয়াছিল। নোয়াজিস ও সইদ আহম্মদ দুইজনেই ঐ সময় ইহলীলা সম্বরণ করেন। নবাবও মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সিরাজউদ্দৌলাব প্রতিদ্বন্দ্বিকে সিংহাসনে বসাইবার চক্রান্ত করায় রাজবল্লভ সিরাজউদ্দৌলার চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। সেইজন্য রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাসকে ঢাকা হইতে সপরিবারে জগন্নাথ যাত্রার অছিলায় কলিকাতায় আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। উহা কার্যে পরিণত হইলে সিরাজউদ্দৌলা আলিবর্দি খাঁর কর্ণগোচর করান। নবাবের সহিত দৌহিত্রের ঐ সংক্রান্ত কথোপকথনের সময় ইংরাজ ডাক্তার ফোর্থ সাহেব উপস্থিত ছিলেন বলিয়া হলওয়েল লিখিয়াছেন। নবাব উঁহাকে তৎকালীন ইংরাজদিগের সৈন্যবল ও জাহাজাদির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ওয়াটস্ সাহেব সংবাদ করিলেন যে, নবাব দরবার হইতে উহার সঠিক তথ্য অবগত হইবার জন্য গুপ্তচর প্রেরিত হইয়াছে, কারণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনুযোগ বিশ্বাস করেন নাই যে, চতুর ইংরাজেরা পলায়িত রাজবল্লভকে স্থান দান করিয়া নবাবের বিরাগভাজন হইবে। ঐরূপ করিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যদি বস্তুতঃ সিরাজউদ্দৌলা বিলাসি ও অকর্মণ্য হইত, তাহা হইলে কি এইসব গুরুতর বিষয় তাহার লক্ষ্যের মধ্যে আসিতে পারিত। অতীত ঘটনা দ্বারা নিরপেক্ষভাবে আলিবর্দি ও সিরাজউদ্দৌলার পরস্পর যোগ্যতার বিচার করিতে

গেলে আলিবর্দিকে কখনই সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা যোগ্যতর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আলিবর্দি সিরাজউদ্দৌলার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সিরাজউদ্দৌলা পণ্ডিত না হইলেও আলিবর্দির মত কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্যলাভ করে নাই। উহার বরং দূরদর্শিতা বা স্বাভাবিক শত্রু, মিত্র জ্ঞান করিবার শক্তি মাতামহাপেক্ষা অধিক ছিল। ইংরাজ যে তাহার ভবিষ্যত শত্রু ইহা সে রাজ্যলাভ করিবার পূর্বেই স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রবীন মাতামহ সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যলাভের কোন বন্দোবস্তই ঠিক করিয়া যাইতে পারেন নাই। নবীন বালক আপনার বুদ্ধি, বিবেচনা ও যুদ্ধ দ্বারা উহা লাভ করিয়াছিল। উহার তখন ঘরে ও বাহিরে শত্রু বিলক্ষণ ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আলিবর্দি খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু উহার সমর্থন করা যায় না। আলিবর্দি সরফরাজের নিকট হইতে গিরিয়ার যুদ্ধে রাজ্যলাভ সদুপায়ে করেন নাই। আলিবর্দির পারিবারিক জীবনও সুখময় ছিল না কারণ, তিনি কন্যা বা দৌহিত্র কাহাকেও সংযমী হইবার উপদেশ দান করেন নাই বা সেদিকে কোন দৃষ্টিপাত করেন নাই। বরং উহারা যথেচ্ছাচারী তাঁহারই দোষে হইয়াছিল। তাঁহারই অকর্মণ্যতায় বর্গীর হাঙ্গামায় হৃতসর্বস্ব দরিদ্র ধনী প্রজামণ্ডলী ইউরোপের বণিকগণের পক্ষপাতী হইয়াছিল ও তাঁহারই দোষে উমিচাঁদ ও তাঁহার কন্যারা ইংরাজাদি বণিকগণের সহিত ব্যবসাদি আরম্ভ করিয়াছিল। জামাতারা ঢাকাদির কর্তৃত্ব না করিয়া রাজধানীতে বিলাসাদিতে মুগ্ধ হওয়ায় উহাদের নিম্ন কর্মচারীরা সেই সকল স্থানের সর্বেসর্বা হইয়া ষড়যন্ত্রপ্রিয় ও অত্যাচারী হইয়াছিল। ইহাতেই রাজা রাজবল্লভ তাঁহার পুত্রকে কলিকাতায় আশ্রয় লাভ করিবার জন্য হলওয়েল ও মামিংহাম সাহেবকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা উপঢৌকন দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এমনকি, হলওয়েল ঘসেটি বেগমকে রাজবল্লভের উপপত্নী বলিতে ও উক্ত উপঢৌকন গ্রহণের কথা অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, এই সকল বিশৃঙ্খলার জন্য নবাব আলিবর্দিই সম্পূর্ণ দায়ী ও দোষী। যিনি আপনার পরিবারবর্গের উপর কর্তৃত্ব করিয়া তাহাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিতে পারেন নাই ও অধীনস্ত কর্মচারীরা যখন তাঁহার কুলে কলঙ্ক দান করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এমনকি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সেই সকল কুৎসিত কথা প্রকাশ করিয়াছে তখন তাঁহার প্রজাবর্গকে শাসন করিবার ক্ষমতা কোথায়? তাঁহার পরিবারবর্গের কুৎসিত আদর্শ উহারা যে অনুসরণ করে নাই ইহা কে বলিতে পারে? রাজার আদর্শ প্রজা অনুসরণ করিয়া থাকে ইহা সর্ববাদি সম্মত। সরফরাজের হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া দেশের ও দশের তিনি কি হিতসাধন করিয়াছেন উহা কোন ঐতিহাসিক কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। আলিবর্দি খাঁর সময়েই ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজশক্তি লাভের চেষ্টা জাগরুক হইয়াছিল। বুদ্ধিমান সিরাজউদ্দৌলা উহা দমন করিতে গিয়া ঘরের শত্রু বিভীষণের হস্তে প্রাণ ও রাজত্ব হারাইয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতায় গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দি খাঁর উত্থান ও পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হইয়াছিল। দোস্ত মহম্মদ ও রহিম খাঁকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া নজর আলি নামক বেগমের প্রিয়পাত্র ও পরামর্শদাতা হইয়া ১২/১৩ লক্ষ টাকার মণি-মুক্তাদি লইয়া পলায়ন করে ইহা মুস্তাফা বলিয়াছিলেন। ঘসেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ দুইজন সিরাজউদ্দৌলার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কলিকাতার কোম্পানীর কর্মচারীরা যে পক্ষের জয় হইবে সেই পক্ষকে উপযুক্ত পুজোপহার দ্বারা বশীভূত করিবেন স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। দু একদিন পরেই সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার

ইংরাজ প্রেসিডেন্টের নিকট মেদিনীপুরের ফৌজদারের ভ্রাতা নারায়ণ সিংহকে পাঠাইয়া কৃষ্ণবল্লভকে পাঠাইবার পত্র প্রেরণ করেন। সে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করিয়া উঁমিচাঁদের গৃহে উপস্থিত হয় ও শেষে উহার সঙ্গে যথাস্থানে পত্র দান করে। কলিকাতা কাউন্সিল প্রেরিত পত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উহা গ্রহণ করা উচিত নয় স্থির করেন। যথাসময়ে সেই অপমান বার্তা সিরাজউদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তিনি তখন নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আপনার সিংহাসন প্রথমে যাহাতে নিষ্কণ্টক হয়, উহারই চেষ্টায় মনোযোগ করিলেন। ইহা কি মূর্খ বালসুলভ উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কার্য? যদি তিনি তাঁহার হিতকাম উপদেষ্টাগণের সৎপরামর্শানুসারে ঐরূপ করিয়া থাকেন, তবে তিনি যে উচ্ছৃঙ্খল একথা 'ত প্রমাণ হয় না। তিনি সৎপরামর্শের বশীভূত হইয়া কার্য করিতেন ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সিরাজ প্রথমেই মতিঝিল হইতে ঘসেটি বেগমকে আনাইয়া অন্যত্র তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি ঘসেটি বিবিকে উত্তেজিত করিয়া তাহার অর্থে উদর পূরণ করিতেছিল, তাহারা কার্যকালে সকলে পলাইয়া যায়। সে সকল লোক আর মুর্শিদাবাদে থাকিতে সাহস করিল না। বেগমের দল এইরূপে একেবারে ভাঙিয়া গেল ও রাজবল্লভের জারিজুরি শেষ হইল। ইহা নিশ্চয়ই সিরাজউদ্দৌলার গৌরব ও ক্ষমতার পরিচয় দান করে।

ফরাসীগণ .... ত আবার ইংরাজের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ এদেশের কর্মচারীগণকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ এ জানুয়ারির পত্রে বিশেষ সাবধান হইয়া আত্মরক্ষার ও সুবেদারের অনুগ্রহ পাত্র হইবার বিধিমত উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে তিন চারিজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইবার অনুরোধ হইয়াছিল যে, যাহাতে তাহারা আসিয়া যথারীতি কলিকাতার দুর্গ সংস্কার বা দৃঢ় করে। প্রাচীন দুর্গ ভাঙিয়া গড়িতে অনেক অর্থ ব্যয়, সেইজন্যই দুর্গ সংস্কার ও নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। ইহাও নবীন নবাবের কর্ণগত হইয়াছিল ও তিনি উহা বন্ধ ও ভাঙিয়া ফেলিবার পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন। উহা তিনি পূর্ণিয়া যাত্রার দিন করিয়াছিলেন।

পাঠানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম বিচার না করিয়া কিসে আপনার উন্নতি হয় সেই দৃষ্টান্ত সর্বত্রই আদর্শ করিয়াছিল, সেইজন্য আলিবার্দি খাঁকে বার্হশক্রর বিদ্রোহাদিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তদপেক্ষা সিরাজউদ্দৌলাকে আত্মীয়স্বজনের ও তদধীন কর্মচারীগণের গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতায় উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। তখন সকলেই আলিবর্দি যে উপায়ে সরফরাজের নিকট হইতে রাজত্ব লইয়াছিল উহারই অনুসরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। মিঃ সিডনে ওয়েল সাহেব তাঁহার মোগল সাম্রাজ্যের পতন নামক পুস্তকে এইরূপই বলিয়াছেন। উহা সন্নিবেশিত কবান হইল ঃ—

(Page 228) "The Afghan soldiery whom Nadir had repelled from Persia and their own country, and whose settlement in India had been the original pretend of his invasion. These men, arrogant, brutal, treacherous, and insubordinate, could only be kept in good temper by lavish indulgence of their greedy disposition. They resented Aliverdhi's strict discipline. They had no sympathy with his desire to husband the resources of the country, and to improve its civil administration. Bent upon this and cramped by constant military requirements. Aliverdhi was

unable to gratify their insatible appetites or even to fulfil the expectations which he had led them to entertain as the reward of their services in the field. Hence they were ever ready to join in disturbances, to break out into rebellion against him, and to become tools of leaders as unprincipled as themselves, and ambitious to repeat the subversive part which Aliverdhi had played against Serfaraj."

নবীন সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফর আত্মীয় হইলেও শত্রু বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অবসর পাইলে সে রাজ্যলাভের জন্য সরফরাজের মত তাঁহাকে বলি প্রদান করিবে। তিনি মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু কর্মচারীগণকে অধিক বিশ্বাস করিতেন ও সেইজন্য মোহনলাল ও মীরমদন প্রভৃতি অনেকে প্রধানমন্ত্রী আদি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইহাতে পুরাতন প্রবীন মুসলমানগণ ও হিন্দু কর্মচারীরা আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিল।

রিয়াজ উস সালাতিনে উল্লিখিত আছে যে, সকলেই সিরাজউদ্দৌলার দরবারে যাইতে শঙ্কিত হইত, কারণ তিনি বড়ই আত্মাভিমানী ও স্পষ্ট রূঢ়ভাষী লোক ছিলেন। যাবতীয় প্রধান সদস্যকে মোহনলালের নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে অনুমতি দান করিলে মীরজাফর উহা করিতে অসম্মত হইলেন ও দরবারে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। আলিবর্দি খাঁর নিজামতী দারোগা ও আরজবেগী নবাব গোলাম হোসেনকে, হয় মাসিক দুই শত টাকা বেতন স্বীকার, নয় দেশত্যাগের আদেশ দেন। সে মক্কা যাত্রার ছল করিয়া হুগলী প্রস্থান করে। ইহা বলিলেই চলিবে যে, তখন মুসলমান উচ্চ কর্মচারীরা সিরাজউদ্দৌলার কঠোর আচরণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল উহাতেই তাহাদের মুখপত্র মুতাক্ষরীণ মোহনলালের উন্নতির কারণ উহার ভগিনীদানই উল্লেখ করিয়াছেন ও নবীন নবাবের নানা দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারের কথাও বলিয়াছেন। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, মইনুদ্দীন প্রমুখের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরে আফগান বিদ্রোহীরা পর্যদস্ত হইলে সৈয়দ আহম্মদকে পাটনার নায়েবী পদ আলিবর্দি দিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু নবাব বেগমের কৌশলে উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। সিরাজউদ্দৌলা পৈত্রিক পদ প্রাপ্ত না হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন এই ভয় দেখাইয়া আলিবর্দির সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। নবাবের নবাবের মৃত্যুর পূর্বে উহার সুবেদারী দিল্লির দরবারে উৎকোচাদি দ্বারা সৈযদ আহম্মদ আপনার নামে আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহাতেই সিরাজউদ্দৌলা পূর্ণিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মনোভিষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। রাজমহলে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর পক্ষ হইতে ড্রেক সাহেবের উত্তর পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহার প্রতিকার করা প্রথম কার্য মনে করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। গোলাম হোসেন বলিয়াছেন যে, শওকৎজঙ্গ সাধু ফকিরের আশ্রয় লওয়ায় উহাদের তপজপের বলেই সিরাজউদ্দৌলা অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

সিরাজউদ্দৌলা প্রথমেই কাশিম বাজারের ইংরাজ কুঠি অবরোধ করিলেন। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, ড্রেক সাহেব পরামর্শ না করিয়াই এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন যে, নদীর ধারে পোস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহাই মেরামত করা হইতেছে, কোন নূতন প্রাকার প্রস্তুত করা হয় নাই, মারহাট্টা বিপ্লবের সময় কেবল যে খাত করা হইয়াছে উহা ভিন্ন আর কিছুই নূতন করিয়া করা হয় নাই। সম্প্রতি ফরাসিদের সহিত যুদ্ধাশঙ্কা রহিয়াছে গত যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়া যাহাতে তাহারা মাদ্রাজের মত কলিকাতা আক্রমণ করিতে না পারে

তজ্জন্য যে কিছু করা আবশ্যক উহাই করা হইতেছে মাত্র বলেন। ঐতিহাসিক অর্ম সাহেব ড্রেকের উত্তর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ওয়াটর্স সাহেবের ড্রেক সাহেবকে সিরাজউদ্দৌলার মূল উদ্দেশ্যের কথা জানান উচিত ছিল, কারণ তিনি চিরাগত কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণের জন্য ঐরূপ পরোয়ানা জারি হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া ঐ রূপ সরল উত্তর দিয়াছিলেন। দেওয়ান দুর্লভরাম ডাক্তার ফোর্থের মারফত বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাগবাজারে পেরিন্ পয়েন্টে যে দুর্গপ্রাকার ও কেলশাল সাহেবের বাগানে যে গড়বন্দী করা হইয়াছে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই নবাবকে নিরস্ত করা যাইতে পারে। ওয়াটস্ সাহেব দুর্লভরামের দ্বারা অর্থ প্রয়োগে নবাবকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফলোদয় হয় না। তখন তিনি অগত্যা শেষে নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মর্মে একখানি মুচলকাপত্র স্বাক্ষর করেন যে, যদি কেহ নবাবের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় পলায়ন করে, তবে উহাকে নবাবের আজ্ঞা মাত্রেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। গত কয়েক বৎসরের বাণিজ্যের দস্তকের হিসাব ও উহার অপব্যবহারের জন্য যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে উহা পূরণ করিতে হইবে। পেরিণ্ পয়েন্টের দুর্গ প্রাকার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কলিকাতায় হলওয়েল সাহেবের ক্ষমতা হ্রাস করিতে হইবে যাহাতে প্রজাগণের কোনরূপ ক্ষতি না হয় উহা করিবেন। কলেট ও ব্যাটসন উহাতে স্বাক্ষর করিলেন ও তিনজনে নজর বন্দী হইলেন। ঐতিহাসিক অর্ম বলেন যে, নবাবের আদেশ মত তাঁহার কর্মচারীরা কোম্পানীর দ্রব্যাদি তালাবদ্ধ না করিয়া লুঠ করে ও তৎকর্তৃক অপমানিত হইয়া লেফটেনান্ট ইলিয়ট অভিমানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক মুতাক্ষরিণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিবাদ সামান্য কর্মচারিগণের দ্বারা দু এক কথায় মীমাংসিত হইতে পারিত উহার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া আলিবর্দি খাঁর পাপের অর্জিত সোনার রাজ্য তাঁহার দুইজন মূর্খ বংশধর সিরাজউদ্দৌলা ও শওকৎজঙ্গের হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছিল। হলওয়েল সাহেব সিরাজউদ্দৌলার ইংরাজ বিদ্বেষ আলিবর্দি খাঁর অন্তিম উপদেশের ফলে হইয়াছিল বলিয়াছেন। উহার সার মর্ম এই যে, আলিবর্দির চিরজীবন যুদ্ধ ও কৌশলে অতিবাহিত করিয়াও শেষে শান্তিলাভ হইল না। তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে নিরুদ্বেগে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সকল কন্টকোন্মোচন করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। হোসেনকুলী, নোয়াজেস মহম্মদ গিয়াছে, দেওয়ান মাণিকচাঁদকে রাজপ্রসাদে তুষ্ট হইলেও তিনি ইউরোপীয়গণের দিন দিন যেরূপ শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে উহাই বড় আশঙ্কার বিষয় ও উহার প্রতিবিধান সিরাজউদ্দৌলাকে করিতে হইবে বলিয়াছিলেন। ভগবান যদি তাঁহার জীবন দীর্ঘ করিতেন, তবে তিনিই উহা করিতেন। অনেকেই ইহা হলওয়েলের কবি কল্পনা বলিয়া থাকেন, কারণ গোলাম হোসেনের কথার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। আলিবর্দির সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ইংরাজগণকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের বারম্বার নির্বন্ধাতিশয়ে উত্যক্ত হইয়া নির্জনে বলিয়াছিলেন যে, এখন স্থলে যে অগ্নি মারহাট্টারা জ্বালাইয়াছে উহা নির্বাণ করিতে পারিতেছ না, আবার জলে উহা জ্বালাইতে চাও। তোমরা যুদ্ধ করিতে ভালবাস কিন্তু ভবিষ্যত পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে জান না। যাহাই হউক, কি সূত্রে বিধাতার ভবিতব্যতা হইয়া থাকে উহার কারণ নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। সিরাজউদ্দৌলা সর্ব প্রথমে মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন আলিবর্দিও উহাকে ঐরূপ করিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে মোগল সাম্রাজ্যের পতন লেখক এইরূপ উল্লেখ

করিয়াছেন ঃ—

"Aliverdi in vain tried to expel the enemy from Calcutta; and in the course of these operations was obliged to cashier two officers who had shown symptoms of treachery. One of them, Meer Jaffir, was afterwards. the English Nawab of the Bengal Provinces."

কলিকাতা হইতে উঁমিচাঁদের সম্পত্তি লইয়া সে যাহাতে অন্য স্থানে যাইতে না পারে, তজ্জন্য কুড়িজন প্রহরী ইংরাজেরা নিযুক্ত করিয়াছিল। ঐ সময় উঁমিচাদের আত্মীয় হুজরীমলকে ধরিতে গিয়া বেশ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল। উহার জমাদার জগবন্ত সিংহ স্বয়ং তেরজনকে মারিয়া ফেলে ও ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। নবাবের চরাধিপতি রাজারাম সিংহের পত্রে উঁমিচাঁদকে কলিকাতা ত্যাগ করিবার উপদেশ ছিল বলিয়া কোম্পানী ঐরূপ করিয়াছিল।

যিনি সিরাজউদ্দৌলার কথা লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তিনি এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উহা উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। যথা ঃ—

* " ইংরাজেরা যে মুচলিকা পালন করিবেন না সেকথা অল্পদিনের মধ্যেই সিরাজউদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল। তিনি ইংরাজদের কুটিল কৌশলের পরিচয় পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ইহাঁরাই না বলিয়াছিলেন যে, নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা অবগত হইতে যাহা কিছু অপেক্ষা? ইহাঁরাই মুচলিকা পালন করিবেন বলিয়া বিবি ওয়াটসনের নয়নকজ্জলে ইংরাজ বন্দীর মুক্তিপত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা অনেক সহ্য করিয়াছেন; আর সহ্য করিতে পারিলেন না— ইহাই তাঁহার সর্ব প্রধান অপরাধ।" " সিরাজউদ্দৌলা পদে পদে অপমানিত হইয়া যেরূপ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, কলিকাতা আক্রমণের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা যায় না।"

+ " ইংরাজেরা পদাশ্রিত বণিক হইয়াও নবাবের বিনা অনুমতিতে যে দুর্গ প্রাকার রচনা করিয়াছিলেন কোন্ স্বাধীন নরপতি তাহা চূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন না করিতেন? ইহাতে সিরাজউদ্দৌলার প্রবল প্রতাপ ও শাসনাঢ্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজেরা পলায়িত কর্মচারীদিগকে নির্বিবাদে কলিকাতায় আশ্রয় দিবার অবসর পাইলে, নবাবের রাজশক্তিকে আর কেহ মুহূর্তের জন্যও সম্মান করিত না, আবশ্যক হইলেই কলিকাতায় পলায়ন করিত। শাসন সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই তাহার গতিরোধ করা আবশ্যক। কোম্পানীর নামের দোহাই দিয়া ইংরাজগণ যাহাকে তাহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া আত্মোদর পরিপূর্ণ করিতেন, তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্য অবসন্ন হইত, রাজকোষ শুল্ক গ্রহণে অযথা বঞ্চিত হইত। এরূপ স্বেচ্ছাচার নিবারণ না করিলে কোন নরপতি সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া গর্ব করিতে পারিতেন? হলওয়েলের অত্যাচারে কালো বাঙালী জর্জরিত হইতেছিল; তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিলে, কোন্ নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখক সিরাজউদ্দৌলাকে আশীর্বাদ করিতে সম্মত হইতেন? এই মুচলিকা পত্রে সিরাজউদ্দৌলার যেরূপ চরিত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, কয়জন সৌভাগ্যশালী স্বাধীন নরপতি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিয়া সেরূপ চরিত্রবল, সেরূপ শাসন কৌশল, সেরূপ প্রজাহিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? তথাপি সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজের ইতিহাসে

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সিরাজউদ্দৌলা, পৃষ্ঠা ১৫৭।

+ ১৫৪ পৃষ্ঠা

ইহার জন্যও শত ধিক্কারে সম্বোধিত হইয়াছেন। সিরাজ অন্যের পরামর্শ গ্রহণের পাত্র ছিলেন না, তাহা পুনঃপুনঃ লিখিয়াও বিনা রক্তপাতে কাশিমবাজার অবরোধ সম্বন্ধে সিরাজকে তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য প্রশংসা প্রদত্ত হয় নাই।"

কলিকাতার কাউন্সিল যদি কাশিম বাজারের কুঠিয়ালগণের প্রদত্ত মুচলিকা স্বীকার কবিয়া কার্য করিতেন ও তখন যদি সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষী বলা যাইতে পারে কিন্তু বিবি ওয়াটসের ক্রন্দনে সিরাজউদ্দৌলা জননীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই ও ইংরাজ কুঠিয়ালগণকে মুক্তি দান করেন। অনেকের বিশ্বাস যে, হেষ্টিংস সাহেব ঐ সময় কান্তবাবুর আশ্রয়ে গিয়া বাঁচিয়া যান কিন্তু উহা * সত্য নহে, কারণ সে সময়ে তিনি আড়ঙ্গে গিয়াছিলেন। যখন হুগলীতে ইংরাজ কোম্পানী সিরাজউদ্দৌলাকে উপহারাদি দান করে তখন উহাদের উপর তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষানল ছিল না, কারণ তাঁহারই কথায় মুগ্ধ হইয়া মাতামহ আলিবর্দি ইংরাজগণের পক্ষে পরোয়ানা জারি করিয়াছিলেন।

"যে কেহ সমুন্নত রাজশক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহাকেই পদানত করিবার জন্য রাজকোষ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। ইহাই সকল দেশের **রাজধর্ম**। সিরাজউদ্দৌলা সেই রাজধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থ পদাশ্রিত ইংরাজ বণিকের ধৃষ্ঠতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান জন্য তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।"

ইহাতেই দেখা যায় যে, সিরাজউদ্দৌলা রাজধর্ম প্রতিপালন করিবার জন্য সরল মনে যাহা করিয়াছিল উহা বিধি বিড়ম্বনায় ও চক্রান্তকারীগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল। জগৎ শেঠের বংশধর মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ উমিচাঁদ হুগলীর প্রধান সওদাগর খোজা বজিদ প্রমুখ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে কলিকাতা আক্রমণ হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। এইরূপে ঐতিহাসিকগণের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সিরাজউদ্দৌলার মূর্খতা বা কর্তব্যনিষ্ঠা প্রমাণিত হইয়া থাকে। বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষার গুণে ও দোষে বানর মানুষ ও মানুষ বানর হইয়া থাকে। সিরাজ যে মূর্খ ছিল না, ইহা উহার রাজ্যলাভের কার্যকৌশলে পরিষ্কার প্রমাণ হয়। তিনি মুসলমান দরবারের মন্ত্রীবর্গের ক্রীড়াপুত্তলী ছিলেন না বলিয়াই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অযথা কলঙ্কদান করিয়াছেন। তিনি যদি গুণের আদর করিয়া মোহনলাল মীরমদন প্রমুখ হিন্দুগণের পক্ষপাতী না হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, তাঁহার কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অন্যরূপ লিখিতেন। কালে ভস্মাচ্ছাদিত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেহই সিরাজউদ্দৌলার নৃশংসতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচবৃত্তির উদাহরণ, কি মুর্শিদাবাদ অবরোধ, কলিকাতাধিকার বা সিংহাসনারোহণের কথায় দেখাইতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা যে একজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন, ইহা মোহনলালের সামান্যাবস্থা হইতে প্রধান মন্ত্রীত্বে উন্নীত হওয়ায় প্রমাণিত হয়। সেইজন্য মীরমদনাদি অন্যান্য হিন্দু কর্মচারীগণেরও সেইরূপ উন্নতি হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া প্রিয় মাতামহ আলিবর্দিরও বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেইরূপ রাজ্যলাভ করিয়া ইংরাজ বণিকগণকে শাসন করিবার জন্য কলিকাতা আক্রমণ করা স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে শৌর্য্য ও বীর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন ইহাই প্রমাণিত হয়।

Hastings Mrs. সিরাজউদ্দৌলা পৃষ্ঠা ১৪৮

তিনি নীচ কৌশলের দ্বারা মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিবার লোক ছিলেন না। মুসলমান নরাধিপের কলঙ্ক সিরাজউদ্দৌলায় ছিল না বলিয়া তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি মনে করিলে অনায়াসে অর্থবলে বা কৌশলে ইউরোপের বণিকগণ দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি করিতে পারিতেন কিন্তু হলওয়েলের পত্রে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, ইংরাজগণকে তাঁহার রাজত্ব হইতে দূর করিয়া উহাদের অর্থলাভ ও ষড়যন্ত্রের দৌরাত্ম্য শেষ করা। তিনি সেইজন্যই কলিকাতা আক্রমণের সময় সকলের কথা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। হায়! তিনি কৃতকার্য হইয়াও বিশ্বাসঘাতকতায় উহার শেষরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি জুজুর ভয়ে ভীত হইয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, উহা নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা। তিনি নিশ্চয়ই জব চার্ণকাদির কথা অবগত ছিলেন ও দাক্ষিণাত্যের জয় বার্তার কথা অজ্ঞাত ছিলেন না। তিনি আরও ফরাসি ও ওলন্দাজগণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, উহারা এদেশের শাসনকর্তাদের জন্য স্বধর্মী ইউরোপবাসীর সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত নয়। সেইজন্য ইহারা ইউরোপের সন্ধির কথা উল্লেখ করিয়া নবাবের সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। কন্টকের দ্বারা কন্টক উৎকীর্ণ করিবার রাজনীতির কথা সিরাজউদ্দৌলা অবগত ছিলেন উহাই প্রমাণিত হয়। অর্থ লোভে তিনি যে কলিকাতা আক্রমণ বা কাশিমবাজার অবরোধ করেন নাই ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ হলওয়েল সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সে কৌশল দ্বারা ইংরাজ কোম্পানী কৃতকার্য হন নাই। থরনটন সাহেবও ঐ কথা বলিয়াছেন ঃ— " The usual method of continuing the angry feelings of Eastern princes was resorted to. A sum of money was tendered in purchase of the subader's absence but refused."

ফরাসিরা সিরাজউদ্দৌলাকে কেবলমাত্র বারুদ দিয়া সহায়তা করিয়াছিল। উমিচাঁদ কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ পূর্বেই পাইয়াছিল ও ইংরাজেরাও উহা জানিতে পারিয়াছিল। সেই সংবাদে শ্রদ্ধের অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতার অবস্থা যেরূপ লিখিয়াছেন উহাই উদ্ধৃত করিলাম ঃ— "কলিকাতার লোকে সংবাদ পাইয়া একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল; এত কলা-কৌশল, এত সগর্ব আস্ফালন, এত রণকৌশল শিক্ষা প্রণালী সকলই যেন সিরাজউদ্দৌলার নামে সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িল। নগরের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ইংরাজ অধিবাসিগণ যিনি যেখানে ছিলেন, মুহূর্তের মধ্যে আপন আপন সুসজ্জিত বাসভবনের দিকে অশ্রুনয়নে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষপ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে পলায়ন করিতে লাগিলেন; দেশীয় বণিকগণ যিনি যে পথে সুবিধা পাইলেন নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; পথে ঘাটে নদী সৈকতে, বনান্তরালে সকল স্থানেই মহা কলরবে নরনারী বালক-বালিকা, শত্রু-মিত্র কাতারে কাতারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই পলায়ন করিল, কিন্তু হায়! ফিরিঙ্গীদল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া সাহেব সাজিয়া দেশের লোকের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদিন ফিরিঙ্গীদিগকে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ বিপদের দিনে তাহাদের মসী-মলিন মূর্তির উপর তুষার ধবল সাহেবী পরিচ্ছদ বড়ই বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠিল।" ইহার মধ্যে যে কোন কথা অতিরঞ্জিত নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না; কারণ তখন ইংরাজেরা সাহেবী পোষাক ত্যাগ ও এদেশী সাজসজ্জা আহার বিহারে মত্ত ইহা সেকালের বিবরণে উল্লেখ

আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঐ কলিকাতার অবস্থার কথা যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহার মধ্যে কলিকাতার দেশী বণিক বাসিন্দারা পলাইয়া কোথায় গিয়াছিল উহার কোন উল্লেখ নাই। আরও যখন কলিকাতা জয়ের পর যাহারা উহা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই, তাহারাই ক্ষতিপূরণের অর্থ লাভ করিয়াছিল, তখন সকলেই যে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল একথা স্বীকার করা যায় না। যাহাই হউক, সিরাজের আক্রমণের পূর্বে কলিকাতার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল উহার কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই বলিলেই চলে। অতএব পূর্বোক্ত বিবরণের অধিকাংশ কল্পনাপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ যে দুর্গে কলিকাতার অধিবাসীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল উহার চিহ্নমাত্রও এখন দৃষ্ট হয় না। আর সেই দুর্গের অবস্থা সম্বন্ধে Early Records of British India of First Report of the Committee of the House of Commons 1772 এ যাহা আছে তাহা অতি শোচনীয়। উহার সারমর্ম এই যে, দুর্গের প্রাচীর এরূপ জীর্ণ ছিল যে, উহার মধ্যে বাস করা যায় না, তদ্ভিন্ন কামানাদি চক্রহীন, গতিহীন অবস্থায় বরুজের উপর সন্নিবেশিত, গোলা বারুদাদি ও রসদ যাহা ছিল উহাতে তিন দিনের অধিক আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে না। ইহাতেই মনে হয় যে, ইংরাজ বণিকেরা মনে করিয়াছিলেন যে, নবাবকে তাহারা যে কোন উপায়ে প্রতারিত করিতে পারিবেন কিন্তু শেষে উহা কার্যে ফলবতী হয় নাই।

* কিন্তু শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে "সমসাময়িক ইংরাজ এবং বাঙালী মিলিয়া যাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, পরবর্তী ইংরাজ এবং বাঙালীর নিকটেও তিনি সুবিচার লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙালী সিরাজউদ্দৌলাকে কি জন্য সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, এ পর্যন্ত তাহার বিচার হয় নাই; কিন্তু এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, রাজবিদ্রোহীদিগের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, ইংরাজগণ কি জন্য সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের লোক উহার বিচার করিয়াছিল। সেই বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ইংরাজগণ সিরাজউদ্দৌলার যে সকল অপবাদ রটনা করিয়াছিলেন তাহাই এখন ইতিহাসে **বাস্তব ঘটনা** বলিয়া সমাদরে স্থান লাভ করিয়াছে।"

সেকালে বাদশা নবাব বা রাজাদের ইন্দ্রিয় সেবা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া সমাজে আদৃত হইত, তখন উহা বড় দোষাবহ ছিল না। উহারা গোপনে অন্তঃপুরে কে কি করিত, উহার সন্ধান পাওয়া কাহারও সুবিধা ছিল না। আলোচনা করার সুযোগ'ত দূরের কথা বলিলেই চলে, তখন ঐ সকল কথা কেমন করিয়া পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। কেহই কখন উহাঁদের নিকট ধর্ম জীবনের আদর্শ প্রত্যাশা করে নাই।

বাংলার শেষ নবাব—প্রাচীন আর্য হিন্দু রাজারা ভিন্ন অন্য কেহই নৈতিক জীবনের আদর্শ হইতে পারেন নাই। প্রায় সকল ঐতিহাসিকই শাসনকর্তা হিসাবে আকবরের সুখ্যাতি করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারও ধর্ম, কর্ম ও চরিত্র কলঙ্কহীন ছিল না বলিলেই যথেষ্ট হইবে। পৃথিবীতে নৈতিক জীবনের বিচার ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম ও আচার ব্যবহারানুসারে হইয়া থাকে। মুসলমান নরপতিরা প্রায় অধিকাংশই অত্যাচারী ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ছিল। নৃশংসতা উহাদের অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই সকল সম্রাট ও নরপতির প্রশংসা যে সকল মুসলমান ঐতিহাসিকগণ করিয়াছেন উহাঁদের পদাঙ্কানুসারিগণ কেন যে

* ৬৫ পৃষ্ঠা সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলার উপর তদ্বিপরীত সম্পূর্ণ অবিচার করিয়াছিলেন উহার মূল কারণ নির্ধারণ করা যায় না। আলিবর্দির চরিত্রগত কোন দোষের উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার এক বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা দোষে অন্যান্য যে কিছু গুণ ছিল, উহা নষ্ট করিয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলার সেই মারাত্মক দোষ সকল না থাকায় ও অতি অল্প বয়সে অশিক্ষিত হইলেও তিনি যে কাপুরুষ ছিলেন না এবং সূক্ষ্ম রাজনীতির মর্মভেদ করিতে পারিতেন ইহাই অতি গৌরবের কথা। তিনি যদি ভীরু কাপুরুষ হইতেন তাহা হইলে কখনই স্বয়ং ইংরাজের বিপক্ষে কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিতেন না, কারণ তদ্বিরুদ্ধে রাজত্বের প্রধান প্রধান কর্মচারীরা বিরোধী। তিনি শওকতজঙ্গকে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন। মাতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া অনেকের মতে তিনি ভাল বুদ্ধিমানের কার্য করেন নাই, কিন্তু উহার সমর্থন করা যায় না। কারণ যাহার পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়া কার্য করিতে পারিবেন না, তেমন ব্যক্তিকে রাজ্যের প্রধান স্বরূপ কার্য করিতে দেওয়া মঙ্গলের কথা নয়। যে ইংরাজের বিরুদ্ধে দিল্লির সম্রাট ও মারাঠারা দণ্ডায়মান হয় নাই, উহাদের উচ্ছেদ সাধন করিবার যে মুসলমান নবীন নরপতির সংকল্পও কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছিল তাহার সাহস ও বিক্রমের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়াই ইংরাজ জাতির গৌরব ব্যপ্ত হইয়াছিল উহাও কি সিরাজউদ্দৌলার গৌরবের কথা নয়? ডিউক অফ ওয়েলিংটন মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়াই চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। আরও ন্যায় যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন নাই, উহা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সেই নবাব জীবিত থাকিলে পাছে, উহার পক্ষ হইয়া দেশের লোক যুদ্ধ করে, সেই ভয়ে বিনা বিচারে যাহার কোন ক্ষমতা নাই সেই মূর্খ মীরণের আজ্ঞায় নবাবকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেই বিভীৎস মৃতদেহ শহরের চারিদিকে হস্তীপৃষ্ঠে প্রত্যক্ষ করান হইয়াছিল। উহা দ্বারা সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করা ও যুদ্ধের ফল ঘোষণা মূল উদ্দেশ্য ছিল। সিরাজউদ্দৌলার যত কিছু কলঙ্কের কথা থাকুক না, উহার মধ্যে যে তাঁহার গৌরবের কথা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলার শেষ নবাব, যিনি আপনার আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি ওলন্দাজ, কি মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী শওকৎজঙ্গ কাহাকেও দৃকপাত করেন নাই। তিনি তখনকার মুসলমান নবাবগণের ন্যায় দরবারের চক্রান্তের বশবর্তী হইয়া কোন মন্ত্রী বা সেনাপতির আজ্ঞাবহ হইয়া রাজ্য করা অপেক্ষা নিজের বল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অধিপত্য করা কিংবা জীবন উৎসর্গ করা শ্রেয়ঃ স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতেই চতুর ইউরোপের সকল বণিকেরা ত্রাস্ত হইয়াছিল। সেইজন্যই উহাদের মধ্যে আন্তরিক শত্রুতা থাকিলেও কেহই নবাবের সহায়তা করিতে চাহে নাই। ফরাসি ওলন্দাজেরা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে, নবাব ইংরাজকে তাহাদের সাহায্যে পরাজিত করিয়া কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিলে, একদিন উহাদেরও সেই অবস্থা হইবে। দূরদর্শী ইউরোপের বণিকগণ সকলেই চতুর ও কর্মতৎপর ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে কৃতঘ্ন কর্মচারী ও বন্ধুবর্গে পরিবেষ্ঠিত নবাব যতই চতুর হউক না কেন, উহার যে সিরাজউদ্দৌলার মত পরিণাম হইবে না ইহার প্রমাণ কি? হইতে পারে যে, সিরাজউদ্দৌলা যথা সময়ে আট-ঘাট চতুর্দিকে বাঁধিয়া কার্য করেন নাই বলিয়া তাঁহার পতন হইয়াছিল কিন্তু যেখানে স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বীকে বিশ্বাস করা যায় না, বরং বিজাতি বিধর্মকে উহা করিতে হয়, সেখানে

সময়াসময়ের জন্য শত্রুগণকে অবসর দান করা কি মূর্খতার পরিচয় নয়? ঘটনাচক্রে ভগবান ভূত হইয়া থাকেন, সিরাজউদ্দৌলার সম্বন্ধে উহা যে হয় নাই, ইহা কে বলিতে পারে? সত্যের অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষের উপর অবিচার হইলে সকল বিষয়ের দুই দিক দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা কোন পক্ষপাতীত্ব নহে। ক্লাইবের জীবন চরিত লেখক কর্ণেল মালিসন সিরাজউদ্দৌলাও তাঁহার মাতামহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উহা নিম্নে দেওয়া গেল।

লেখক সিরাজউদ্দৌলার স্বদেশ-প্রেম, স্বাধীনতা ও সততার সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিয়াছেন ও আলিবর্দি যে উৎকোচাদি অর্থের অপব্যবহার করিয়া বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব হইয়াছিলেন স্পষ্ট বলিয়াছিলেন।

হিল সাহেবের বেঙ্গল রেকর্ডে দেখা যায় যে, আলিবর্দি ৯ই এপ্রিল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা মহম্মদের নাম সিরাজউদ্দৌলা রাখিয়া আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের মসনদ লেখক সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যে পদ্য লিখিত হইয়াছে উহা উদ্ধৃত হইল।

"The desolator desolate,
The Victor, the Arbiter of others wishes,
Now a supplicant for his own overthrown!"

আরও উল্লেখ আছে যে, যখন হস্তীপৃষ্ঠ হইতে সিরাজউদ্দৌলার রক্তাক্ত অস্থিকঙ্কাল কবরস্থ করা হয়, তখন আলিবর্দির কবর দ্বিধা হইয়া তাহার হৃদয় হইতে রক্ত বহির্গত হইয়াছিল।

হায়! বাংলার সিংহাসনাধিপতির দুর্দশা দেখিয়া আর কেহই উহা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা ও সাহস করে নাই। যে করিয়াছে, তাহারও ভাগ্যে সেই শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল।

"Whatever may have been his faults, Serajuddullah had neither betrayed his master nor sold his country Nay more, no unbiassed Englishman, sitting in judgement on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Serajuddaulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!" "Ali-vardi khan, who had risen from the position of a menial servant to be Governor of Behar, rose in revolts, defeated and slew the representative of the family nominated by the Moghals in a battle at Gheria in January 1741 and proclaimed himself subadar. Ali-Vardi khan was a very able man Having bribed the shadow sitting on the throne of Akbar and Aurangeb to recognise him as subadar of Bengal, Bihar, Orissa, he ruled wisely and well"

নবম পরিচ্ছেদ

কলিকাতাধিকার ও নাম পরিবর্তন

মন্ত্রনাগার— সেকালের জমিদারগণের মধ্যে সখ্যতা বা স্বার্থরক্ষার জন্য পরস্পর সম্মিলিত হইবার কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। উহাদের খাজনা আদায় দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করিতে হইত। নবাবের প্রিয়পাত্রগণের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করা সেইজন্য বড়ই আবশ্যক হইত। আলিবর্দি খাঁ জগৎ শেঠাদির সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। উহারাই অর্থশালী ও নবাবের অর্থ সরবরাহ ও হুণ্ডীতে খাজনা দিল্লির দরবারে পেশ করিতেন। জমিদারেরাও উঁহাদের নিকট হইতে অর্থাদি কর্জ করিয়া নবাবের খাজনা দিতেন। ক্রমে ক্রমে সেই শেঠভবনে জমিদারগণ একত্রিত হইত ও পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইতেছিল। ঋণদাতার কথা তাহাদের সকলেকেই অবনত মস্তকে পালন করিতে হইত। ইহাতেই সেকালে জগৎশেঠের বংশধরেরা নবাব অপেক্ষা বলবান হইয়া পড়েন। তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে নবাবের মুদ্রাদি টাঁকশালে মুদ্রিত হইত। তাহাদের সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষ বাসস্থানের নিকট টাঁকশালের বনিয়াদ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জমিদারগণের উপর জগৎশেঠের ক্ষমতা বিস্তার বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা সিরাজউদ্দৌলা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেইজন্য নবীন নবাবের উপর উঁহার মাতামহের মত তাঁহাদের সৌখ্যতা ও প্রভুত্ব ছিল না। যাহা তাহারা এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহা হারাইয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। উঁহাদের সহিত মুসলমান পুরাতন রাজকর্মচারীগণ যাহারা নবাবের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল তাহারা সম্মিলিত হয়। ইহাতেই ইংরাজেরা ভাবিয়াছিল সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ কার্যে পরিণত হইবে না। যখন তাহাদের সেই ভুল ধারণা দূর হইল, তখনই তাহারা লালদীঘির ধারে কতকগুলি বাড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া যুদ্ধের জন্য কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্বে ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার পত্র উমিচাঁদের টাকা আদায়ের কৌশল ভাবিয়াছিল, শেষে যখন তাহা নয় তখনই অগত্যা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিক হিল সাহেব বলিয়াছেন যে, সিরাজউদ্দৌলা মনে করিতেন ও বলিতেন যে ইউরোপবাসিগণকে শাসন করিতে গেলে **যেমন কুকুর তেমন মুগুরের ব্যবস্থা না করিলে করা যায় না**। উহা এখন বাংলার প্রবাদ বাক্যের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে।

সিরাজউদ্দৌলা আলিবর্দি খাঁব সময়েও সেনাপতি মুস্তফা খাঁ যে ইংরাজগণকে তাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন উহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন। সিরাজউদ্দৌলার শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে স্বাভাবিক দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পরিণত বয়স্ক না হওয়ায় অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব স্বাভাবিক। উহার জন্যই কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকারের সময় ভুল ভ্রান্তি ও ক্রুটী হইয়াছিল; তবে যাহা শাসনকর্তার করা কর্তব্য, তাহা তিনি করিয়াছিলেন।

তিনি যুদ্ধযাত্রায় ভীত হইতেন না, কিন্তু যখন আপনার কর্মচারীগণকে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে মনে করিতেন, তখনই মাতামহের কৌশলানুসরণ করিয়া শরণাপন্ন হইতেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে ফল বিপরীত হইয়াছিল।

আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পরে সিরাজউদ্দৌলা নবাবের ধনভাণ্ডার শূন্য ছিল, তিনি ঘসেটি বেগমাদির নিকট হইতে যাহা কিছু পাইয়াছিলেন উহা কলিকাতার আক্রমণাদিতে নষ্ট করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন যে, কলিকাতা অধিকার করিয়া সে দুঃখ দূর হইবে কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইয়াছিল।

কলিকাতাধিকার— নবাব সিরাজউদ্দৌলা কেমন করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়াছিলেন উহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ পক্ষ হইতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে উহার বিরুদ্ধে নবাব পক্ষের কোন কথাই নাই। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল স্বল্প, কোন মুসলমান ঐতিহাসিক উহার পক্ষের সত্য কথা সরলভাবে বলেন নাই। যৎকিঞ্চিৎ হলওয়েলের ট্রাকটস হইতে দেখা যায় যে, তিনি নবাবের সেনানায়ক মানিক চাঁদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া শাস্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। উহার সারমর্ম এই হয় যে, "যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, আব কখন ইংরাজেরা নবাবের কথা অমান্য করিবে না, সর্বদাই উহা শিরোধার্য করিবে।" বোধহয়, গভর্নর ড্রেক কাপ্টেন গ্রান্ট, সেনাপতি মিনাচন প্রমুখ সাহসী ইংরাজ বীরগণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার জন্য প্রাণরক্ষা করা কর্তব্য মনে করিয়া দুর্গ ত্যাগ পূর্বক নদীবক্ষস্থ জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় রমণীগণ জাহাজে পলায়ন করিয়াছিল। মিঃ জন কুক সাহেব তাঁহার এজাহারে বলিয়াছিলেন যে, গভর্নরাদি অকস্মাৎ কেন যে পলায়ন করিলেন এবং দুর্গ হইতে অনবরত সঙ্কেত সত্ত্বেও জাহাজ দুর্গের নিকটবর্তী না হইয়া দুর্গস্থ ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিল না তিনি উহা বুঝিতে পারেন নাই। আর ঘোর মাতাল ইংরাজ সৈন্যগণ সহসা দুর্গের পশ্চিম দ্বার উন্মোচন করিয়া নবাবের সৈন্যগণের প্রবেশের পথ বিনা যুদ্ধে পরিষ্কার করিয়াছিল। ২০এ জুন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় ইংরাজ দুর্গে নবাব দরবারে বসিয়া প্রথমেই উমি চাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ও উহারা যখন উপস্থিত হইয়াছিল, তখন উহাদিগকে কোনরূপ তিরস্কারাদি না করিয়া সাদরে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। উহার কারণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজবল্লভের সহিত সন্ধি করিয়া কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। উহাতেই তিনি কৃষ্ণবল্লভের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেইজন্যই কৃষ্ণবল্লভ ও উমিচাঁদ ইংরাজগণ কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব উহাদিগকে মুক্ত করা নবাবের সর্ব প্রথম ও প্রধান কর্তব্য কর্ম, তিনি উহা পালন করিয়াছিলেন। হলওয়েলের বন্ধন মোচন ও অভযদান নবাবের অনুমতিক্রমেই হইয়াছিল।

অন্ধকূপহত্যা— অন্ধকূপ হত্যার সত্যাসত্য সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করা অপেক্ষা ইহা

"The Nawab spoke kindly to them, and ordered that they should be guarded for the night, having no intention whatever, there is the strongest reason to believe, that any harm should befall them But owing to the natural cruelty or indifference of their guards, they were thrust after the departure of the Nawab into a small room." Page 79

লালদিঘী

বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহার জন্য নবাব কোনরূপে দায়ী নহেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে মূর্খ সৈন্য সামন্ত প্রহরীর অনবধানতার ওরূপ হত্যা সর্বত্র হইয়া থাকে, উহাতে দোষ নাই। নবাব যে বন্দী ইংরাজগণের প্রতি সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন একথা ক্লাইবের ইংরাজী জীবন চরিত লেখক কর্ণেল মালিসন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য যদি কেহ সর্বপ্রথমে দায়ী হইতে পারে, তবে গভর্নর ড্রেক ও তাঁহার পূর্বোক্ত সহচরগণ যাঁহাদের হস্তে উহাদের রক্ষনাবেক্ষণের ভার ছিল। আরও তাঁহারা নিজের প্রাণরক্ষা করা প্রথম কার্য মনে করিয়া শত সঙ্কেতেও দুর্গ সমীপে জাহাজ লইয়া গিয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন নাই। ঘটনার কি বৈচিত্র সম্মিলন যে, যেদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করেন, সেই দিনই ক্লাইব ফোর্ট সেন্ট ডেভিডে শুভাগমন করেন। আবার ক্লাইব ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় মনোনীত হইয়াছিলেন বিলাতের দলাদলির স্বার্থ সম্বন্ধের জন্য তাঁহার সেই পার্লামেন্টের মনোনয়ন সিদ্ধ হয় নাই। উহাতেই ভারতে ক্লাইবের পুনরাগমণ হইয়াছিল। বিধাতার ভবিতব্যতা যে, বলবান ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। ক্লাইব নীচান্তঃকরণের লোক ছিলেন না, কারণ যখন বিলাতে তাঁহাকে হীরক মণ্ডিত তরবারি তাঁহার বীরত্বের চিহ্ন স্বরূপ দিতে চাহিয়াছিল, তখন তিনি মেজর ষ্ট্রীঙ্গার লরেন্সকে, যাঁহার অধীনে তিনি কার্য করিয়াছিলেন, উহা না দিলে উক্ত উপহার গ্রহণ করিবেন না বলিয়াছিলেন। ভারতে তিনি যে অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি বিলাতে সুখে জীবন যাপন অনায়াসে করিতে পারিতেন বলিয়াই পার্লামেন্টে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলেন। এইরূপে মনোনয়নে বিপুল অর্থ ব্যয় ও সিদ্ধ হইয়াও ক্লাইব যখন অন্যায়রূপে পরাস্ত হইলেন, তখনই অগত্যা শেষে কোম্পানীর মাদ্রাজের গভর্নরী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্র এমনই বলবান যে উহাকে ভগবানের পরমাস্ত্র বলা যায়, মানব কেবল ক্রীড়াপুত্তলীবৎ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নবাবের মহত্ত্ব — ২১এ জুন প্রাতঃকালে নবাব যখন প্রহরীগণের মুখে সেই দুর্ঘটনার কথা শুনিলেন তখনই সমস্ত বন্দিকেই মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং হলওয়েলকে দরবারে ডাকাইয়া আসন ও জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করাইয়াছিলেন, একথা স্বয়ং হলওয়েল বলিয়াছেন। কেবল রাজা মানিকচাঁদ উমিচাঁদের কারাবাসের প্রতিহিংসা বাসনায় অনুরুদ্ধ হইয়া হলওয়েল ও তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে বন্দি করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজগণ কর্তৃক উমিচাঁদ যে অন্যায়রূপে উৎপীড়িত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন একথা হলওয়েল স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে নবাবের চরিত্র ও সহানুভূতি পরিস্কার হইয়া পড়ে। যে সকল মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সিরাজউদ্দৌলার নামে নানা দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও কেহ যে অন্ধকূপহত্যার কথা উল্লেখ করেন নাই। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক ফরাসি পণ্ডিত হাজি মুস্তাফা উহার টীকায় বলিয়াছেন যে, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সমসাময়িক কলিকাতার বাঙালী অধিবাসিগণের নিকটও ঐ অন্ধকূপ হত্যার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় মৈত্র, জে, এইচ, লিটল প্রমুখ সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণ অন্ধকূপহত্যাকে আকাশকুসুমবৎ প্রহেলিকাময় প্রমাণ করিয়াছেন। উহাতেই লর্ড কার্জন তাঁহার শাসনকালে লুপ্ত অন্ধকূপহত্যার স্মৃতি স্থাপিত করেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উইলসন প্রমুখ সাহেব দ্বারা পুস্তকাদি প্রনয়ণ

ও সেকালের পুরাতন জায়গার চিহ্ন সরকারের ব্যয়ে পিত্তলাদি ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া সন্নিবেশিত করান। সিরাজউদ্দৌলা যে কলিকাতার নাম পরিবর্তন করিয়া আলিনগর রাখিয়াছিলেন উহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিখ্যাত উক্ত রাজপ্রতিনিধি কিছুই করেন নাই। সিরাজউদ্দৌলার ইসলাম ধর্মের ধর্মকর্তার উপর যে প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল উহা উক্ত নাম পরিবর্তনে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সেই ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষী স্বরূপ মদিনা নগরের পবিত্র মৃত্তিকা হরণ করিয়া উহার উপরে তিনি যে মসজিদ করিয়াছিলেন, উহা এখনও ভাগীরথির তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি মাতামহের উপদেশ মতে ধর্মবিশ্বাসে দুরূহ সুরাসক্তি একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। উহা নিশ্চয়ই তাঁহার মানসিক বল ও সংযমের উদাহরণ। তিনি যে মূর্খ ছিলেন না ইহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতা আক্রমণ করিবার পূর্বে যেমন ফরাসি ওলন্দাজাদি বণিকগণ তাঁহার কোন সাহায্য করে নাই, তেমনি তিনি প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদের নিকট যথাক্রমে সাড়ে তিন ও সাড়ে চার লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। যে তিন জন ইংরাজ তাঁহার সঙ্গে বন্দি ছিল, উহাদের মধ্যে তিনি হলওয়েলকে মুক্ত করিয়া ওয়াটস ও কলেটকে ওলন্দাজগণের নিকট রাখিয়া যান। একজন মাতাল ইংরাজ একজন মুসলমানকে হত্যা করায় তিনি মুর্শিদাবাদ যাইবার দুই তিন দিন পূর্বে ইংরাজদের কলিকাতা প্রবেশের যে অনুমতি দান করিয়াছিলেন, উহা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। উহাতেই ইংরাজেরা ফলতায় পলাইয়া জাহাজে থাকিত ও তখন অন্যান ইউরোপীয় জাতিরা তাহাদের সহায়তা করিয়াছিল। ১১ই জুলাই নবাব মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইংরাজের যে কিছু সম্পত্তি আদি ছিল উহা বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। তিনি পূর্ণিয়ার শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে গমন করিবার পূর্বে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন কলিকাতাধিকার দ্বারা উহা নিরাপদ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ উহার জন্য যে দোষ দিয়া থাকেন, উহা ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত নয়। লুট বা হত্যা যুদ্ধের শেষে চিরকালই হইয়া থাকে এবং সকল দেশেই উহার উদাহরণ আছে। গ্রেনকোর হত্যা ও বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ-এ শতবর্ষ পরে অমৃতশহরের হত্যাকাণ্ড অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষা সর্বাংশে ভীষণতর নৃশংস সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ কর্মচারীর আদেশে এক কারাগৃহে বহু সংখ্যক সিপাহিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় ও এক একটি করিয়া ২৩৭ জনকে গুলি করিয়া মারিবার পর ঐ গৃহ হইতে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন বাহির হইতে চাহিল না, তখন তাহাদিগকে সেইখানে দ্বার রুদ্ধ করা হয় ও যখন উহা খোলা হয় তখন অবশিষ্ট ৪৫ জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। অন্ধকূপহত্যার জন্য ইংরাজ কোম্পানী ভবিষ্যতে কোন ক্ষতিপূরণের দাবী করেন নাই অথচ কলিকাতা দগ্ধ করিবার জন্য অনেক টাকা আদায় করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তখন কলিকাতা দগ্ধ করা যে অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষা অধিক গুরুতর অপরাধ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ও যেজন্য ভগবান নবাবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কি মাদ্রাজের পিগট সাহেব, কি ক্লাইব, কাহারও পত্রে সেই অন্ধকূপহত্যার কথা নাই। এমন কি, তাঁহারা সিরাজউদ্দৌলার নিকট কলিকাতা অধিকার বা নবাবের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল উহাতেও উহার উল্লেখ করেন নাই। কলিকাতার নাম আলিনগরে পরিবর্তিত হইয়া সেখানে পরে যে সন্ধি হইয়াছিল, উহাতে সেই অন্ধকূপহত্যার জন্য কোন ক্ষতিপূরণের

কথা না থাকায় ঐতিহাসিক থরনটন সেই মারাত্মক দোষের জন্য বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন উহা উল্লেখযোগ্য। *

আরও ক্লাইব বিলাতের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরগণের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুতাদির জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতেও সেই নৃশংস অন্ধকূপহত্যার কোন কথাই নাই, বা হলওয়েল যে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা আগষ্ট তারিখের (Select Committee-র) বিশেষ অধিবেশনের নিকট ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিপি পাঠ করেন উহাতেও যে সেই অতীত অন্ধকূপ হত্যার কথা নাই। পরবর্তীকালেই ইংরাজগণ উহা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। উহাই সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অমানষিক হত্যার কলঙ্ক দূর করিবার অমোঘাস্ত্র হইয়াছিল, ইহাই অনেকের ধারণা। কলিকাতায় ঐ নৃশংস ঘটনা হইয়াছিল কিনা, উহা রহস্যময় ও অনেকে তদ্বিষয়ে সন্দিহান ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। এই সূত্রে মৈত্রেয় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন যাহার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক প্রতিবাদ বহির্গত হয় নাই, উহার কিংদংশ তন্নিমিত্ত উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

"মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজেরা প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষতিপূরণের জন্য কড়ায় গণ্ডায় অঙ্কপাত করাইয়া লইয়াছিলেন। (অথচ) যাহারা নিদারুণ মর্মযাতনায় অন্ধকূপে জীবন বিসর্জন করিয়াছিল, সন্ধি সর্তে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের জন্য কপর্দকও লিখিত হয় নাই কেন? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, অন্ধকূপহত্যা কাহিনী নিতান্তই কাহারও রচা কথা। অন্ধকূপহত্যা কাহিনী করে, কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, সে ইতিহাসও সবিশেষ রহস্য পরিপূর্ণ। হলওয়েল সাহেব তাহার প্রধান প্রচারক। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে হলওয়েল তাঁহার প্রিয়বন্ধু উইলিয়ম ডেভিসকে যে পত্র লিখেন তাহাতেই অন্ধকূপহত্যার প্রথম এবং শেষ বিস্তৃত পরিচয়। হলওয়েল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সাইরেন' নামক পোতারোহণে বিলাত যাত্রাকালে অনন্যকর্মা হইয়া এই **বিষাদ কাহিনীর রচনা** করিয়াছিলেন, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইহা যে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পলাশীর যুদ্ধাবসানে ভারত প্রবাসী ইংরাজ বণিকের অপকীর্তির উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের নরনারী যখন তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল, সেই সময়ে (তৎপূর্বে নহে) এই পত্রখানি জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইল! ইংলণ্ডের নরনারী নরপিশাচ সিরাজউদ্দৌলার নামে শিহরিয়া উঠিল; **ইংরাজের কুকীর্তির কথা বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হইয়া গেল,** সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ককাহিনীতে সভ্য জগৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল!" +

পুরাণাদিতে যেমন দক্ষযজ্ঞের কথা বিবৃত হইয়াছে, সেইরূপ কলিকাতার কথায় অন্ধকূপহত্যাকে স্থান দান করা উচিত উহারই জন্য উহার সমালোচনা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা

* "No satisfaction was obtained for the atrocities of any provision for this purpose is the greatest scandal attached to the treaty. For this no sufficient apology can be found. Peace was desirable, but even peace is bought too dearly when the sacrifice of National honour is the price " (Thorton's History of the British Empire Vol 1, 213)

+ সিরাজউদ্দৌলা পৃষ্ঠা ২০৩/৪

হইল। দৈব বিড়ম্বনায় যুদ্ধে অন্ধকূপহত্যাদির ন্যায় শত শত নৃশংস ব্যাপার প্রায়ই হইয়া থাকে, উহা যে নবাবের কৃত অপরাধ বলিয়া স্থির করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা; কারণ উহা যদি যথার্থই হইয়া থাকে, তবে উহাতে যে, নবাবের দোষ নাই ইহা ত প্রধান প্রচারক হলওয়েল তাঁহার বৃত্তান্তে স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন।

যাহাই হউক, ২রা জুলাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজা মাণিকচাঁদের অধীনে তিন সহস্র লোক কলিকাতায় নিযুক্ত করিয়া সেইখান হইতে মহাসমারোহে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন ও ১১ই জুন মহানন্দে স্বীয় রাজধানীতে পৌঁছিয়াছিলেন। মীরজাফর রাজা মানিক চাঁদের উপর কলিকাতা রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হওয়ায় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। রাজা দুর্লভরাম জগৎশেঠ প্রভৃতি যাঁহারা আলিবর্দির সময়ে মহা সম্মানিত হইতেন তাঁহারা নবীন নবাব কর্তৃক সেরূপ না হওয়ায় শওকৎজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। এমন কি, সেই সকল লোকের মন্ত্রণায় মীরজাফর শওকৎজঙ্গকে এক সুদীর্ঘ পত্রাদি লিখিয়াছিলেন ও পরস্পবের মধ্যে অঙ্গীকারাদি স্থির হইয়াছিল একথা মুতাক্ষরীণে উল্লেখ আছে। এদিকে লালু হাজারী নামক শওকতের একজন প্রবীণ তোপাধ্যাক্ষ একারণে নির্বাসিত হইয়া মুর্শিদাবাদে সিরাজউদ্দৌলার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। উহাতে নবীন নবাবের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল উহা অনুমান করা অসম্ভব নয়। ঘরের ও বাহিরের শত্রু দমন করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার বিষয় তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। কলিকাতাধিকার করিয়া নবাব যাহা লাভ করিয়াছিলেন, উহাতে যে তাঁহার আশানুরূপ ধনলাভ হয় নাই ইহা অনেকেই বলিয়াছেন। ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবের * মতে তিনি কোম্পানীর দুর্গ হইতে সবেমাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। বেভারিজ সাহেব + বলেন যে, নবাব অসময়ে দুর্গাধিকার করিয়া আশানুরূপ অর্থ লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ গত বৎসরের যাহা কিছু ছিল তৎসমস্তই এপ্রিল মাসে বর্ষার পূর্বেই চলিয়া যাইত। এখান হইতে বর্ষার সময় কেবল পত্রাদিই যাইত, এবং বিলাতের কোন কিছু তখন এখানে আসিত না। ইহাতেও কোম্পানীর অন্যূন দুই লক্ষ পাউণ্ডের ক্ষতি হইয়াছিল। নবাব উর্মিচাঁদের সংগৃহীত ++ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নগদ ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য পাইয়াছিলেন।

কলিকাতাভিযান— ৫ই আগষ্ট ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাধিকারের কথা মাদ্রাজে পৌঁছে। কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ স্ব স্ব দোষাপরাধ ক্ষালন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পত্র মাদ্রাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহারা যে অকর্মণ্য মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষগণের সেকথা বুঝিবার সময় লাগে নাই। অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনার পর রবার্ট ক্লাইবই কলিকাতা উদ্ধার করিবার

* The Indian Empire V.I Page 273.

+ History of India V III, Page 545

++ "As soon as an expedition was resolved upon I offered my service, which was at last accepted and I am now upon the point of embarking on board His Majestry's squadron with a five body of Europeans full of spirit and resentment for the insults and barbarities inflicted on so many British subjects. I flatter myself that this expedition will not end with the taking of Calcutta only. and that the company's estate in those parts will be settled in a better and ever lasting condition than ever I hope we shall be able to disposess the French of Chandernagore and leave Calcutta in a state of defence "

জন্য মনোনীত হইলেন। ইহাতেই দুই মাস কাল অতিবাহিত হয়। ১৩ই অক্টোবর এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে কেন্ট, পিককের কম্বরল্যাণ্ড, টাইগর, সলস্‌বেরী, ব্রিজওয়াটর ইত্যাদি যুদ্ধ জাহাজ কোম্পানীর অন্যান্য তিনখানি জাহাজ ও ক্ষুদ্র তরীর সহিত যাত্রা করিয়াছিল। কর্ণেল ক্লাইবের অধীনে নয় শত ইংরাজ ও পনের শত সিপাহী ছিল। যাত্রা করিয়া সমুদ্রে নানা বাধা বিপত্তিতে গন্তব্যস্থানে যাইবার বিলম্ব হইয়াছিল। ১১ই অক্টোবর কর্ণেল ক্লাইব যিনি কেবলমাত্র ফোর্ট সেন্ট ডেভিডের গবর্ণরী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তিনিই ঐ যুদ্ধযাত্রার নেতা মনোনীত হইয়া যাত্রা করিবার অগ্রে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে যে পত্র প্রেরণ করেন উহাতে তাঁহার কলিকাতাধিকারের দৃঢ় বিশ্বাস ও ফরাসিগণকে পরাজিত করিবার উল্লেখ ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক এই সকল সংবাদ সংগৃহীত হয় নাই; উহাই তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ ও পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। তখন তিনি এমনই গৃহ বিবাদে বিব্রত যে, উহা করিবার তাঁহার সময় ছিল না। তখন জগৎশেঠগণের সাহায্যেই বাদশাহী সনন্দ সংগৃহীত হইত, কারণ উহা অর্থ ভিন্ন হইত না। উহার সহায়তা না করায় নবাব কর্তৃক জগৎশেঠ প্রকাশ্য সভায় অত্যন্ত অপমানিত ও কারারুদ্ধ হন। মীরজাফর উঁহাকে কারামুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নবাব উহাতে কর্ণপাত করিলেন না। শেষে মাতামহীর মধ্যস্থতায় জগৎশেঠ মুক্ত ও মীরজাফর তুষ্ট হইলেন। শওকৎজঙ্গকে পত্রাদি দ্বারা বশীভূত করিতে না পারিয়া, অবশেষে নবাব তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত ও নিহত করেন, সেই সময় নবাবের অধিকাংশ সৈন্যগণ কলিকাতার রক্ষাবন্ধনীর কেন্দ্রস্থল বজবজ হইতে সেইখানে চলিয়া যায়। যদিও তখন প্রতিকূল ঝঞ্ঝাদিতে নিয়মিত কালে কোম্পানীর মারলবরাদি জাহাজ আসে নাই, তথাপি ২৭শে ডিসেম্বর ক্লাইব কলিকাতার আটক্রোশ দূরে বজবজে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া স্থলপথে যাত্রা করেন। চতুর কোম্পানীর কর্মচারিরা কেমন করিয়া সেকালের নবাবগণেব সেনাপতি ও কর্মবীরগণকে বাধ্য করিতে হয়, সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিল।

যুদ্ধ— বজবজের দুর্গ হইতে শত্রুগণের বিপক্ষে কিছুই করা হইল না। রাজা মাণিক চাঁদ প্রভুর লবণের মর্যাদা রক্ষা করিবার ভাণ করিয়া ইংরাজগণের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পরাস্ত হইলেন। + লঙ্‌ সাহেবের পুস্তকে উঁহার সেই কার্য্যের পুরস্কারের কথা আছে। মানিকচাঁদের পুত্রকে তাহার পিতার কোম্পানীর সাপক্ষে ত্রিশ বৎসর পূর্বের কার্যাবলীর পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানীর অধীনে কোন কার্য দেওয়া উচিত। সে ইংরাজের বিরুদ্ধে বজবজে যুদ্ধ যে করিয়াছিল উহাতে কিছু আসে যায় না। মানিকচাঁদের কোম্পানীকে সহায়তা করিবার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার জন্য ক্লাইবের * চিঠি • প্রকাশ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বজবজের দুর্গাধিকার করা ইংরাজের পক্ষে কঠিন বিষয় হয় নাই। কিন্তু হায়। ভ্রমক্রমে ঐ যুদ্ধে ইংরাজ কাপ্তেন কাম্বেল সাহেবকে স্বপক্ষের লোকগণ শত্রুজ্ঞানে নিহত করিয়াছিল।

+ The Government agreed to entertain at the company's pay the son of the deceased Manickchand who was useful to them in various ways during the preceding thirty years. though he led the Nabobo troops against them at the battle of "Bugebuge"

* ক্লাইব চরিত ৪৩ পৃষ্ঠা।

কলিকাতাধিকার—কর্তব্যপরায়ণ মাণিকচাঁদ কলিকাতার দুর্গের পাঁচশত সিপাহীর উপর উহার রক্ষা ভার দিয়া স্বয়ং মুর্শিদাবাদে পরাজয় বার্তা দিতে গেলেন। কলিকাতা হইতে পঞ্চাশটি কামান টানা দুর্গে সাজাইবার পূর্বেই উহা ইংরাজেরা জানিতে পারিয়া ১লা জানুয়ারি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অধিকার করে, উহাদিগকে কেহ কোন বাধা দান করে নাই। ২রা জানুয়ারি ক্লাইব কলিকাতায় আসিলেন। দুই একবার দুর্গ হইতে ইংরাজের জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ হইয়াছিল। প্রতিকূল বায়ুর জন্য জাহাজ যথারীতি ফিরাইতে না পারায় ইংরাজের ১৬ জন লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে যখন ঐ জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল, তখন দুর্গস্থ সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছিল। এইরূপে ক্লাইব ও ওয়াটসন কলিকাতার দুর্গাধিকার ও তাহাতে কোম্পানীর মালপত্র যাহা ছিল, সমস্তই তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। শেষে ক্লাইব ও ওয়াটসনের মধ্যে কাহার প্রতিনিধি স্বরূপ সেই দুর্গ জয় করা হইল, ইহা লইয়া ঘোর বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছিল। ওলন্দাজেরা হুগলীর বণিকগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল ইংরাজেরা দেড় লক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য লুঠ করিতে পারিল না বলিয়া বড়ই দুঃখ করিয়াছিল। ঐরূপ ঔপনাসিক অধিকারের পূর্বে ক্লাইব নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে মাদ্রাজের ইংরাজ অধ্যক্ষ পিগটের, নিজাম সলাবৎজঙ্গের ও আরকটের নবাব মহম্মদ আলির নিকট হইতে যে পত্র আনেন, উহা মানিকচাঁদ, ক্লাইব ও ওয়াটসনের পত্রের সঙ্গে নবাবকে দিতে অস্বীকৃত হইলে ইংরাজেরা এইরূপে বাহুবলে নবাবের অধিকৃত কলিকাতাদি উদ্ধার করিলেন। ইহাতে ঐরূপ অধিকারের পূর্বে মানিকচাঁদের সঙ্গে ক্লাইব ও ওয়াটসনের পরস্পর কথাবার্তা চর মারফৎ পত্র দ্বারা হইয়াছিল। উর্মিচাঁদই উহার সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিল, কারণ নবাব তাহার যে সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, সে উহা উদ্ধার করা আবশ্যক মনে করিয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ যখন নবাব কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ফলতায় জাহাজে বাস করিত, তখন উহাদের আহার্য বস্তু আদি জীবনধারণের যাবতীয় সামগ্রী উমিচাঁদই সরবরাহ করিত। নবকৃষ্ণও উহা করিয়া ইংরাজদের প্রিয়পাত্র ও অর্থশালী হইয়াছিল। ইহাতেই বোধহয় যে, সেই সময়েই উমিচাঁদের মন্ত্রৌষধিতে বশীভূত হইয়া রাজা মাণিকচাঁদ ক্লাইবের হস্তগত হন।

দূত—যাহাই হউক, কলিকাতা উদ্ধারের কথা বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে জানাইবার জন্য কাপ্তেন কিং প্রেরিত হইয়াছিলেন ও ক্লাইব আপনার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু করিতে হয় উহার কোন ত্রুটি হয় নাই। ওয়াটসনাদি সাহেবের সহিত নবাবের পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল। + ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বীরপ্রবর ক্লাইব মুষ্ঠিমেয় সৈন্য লইয়া সেই নবাবের সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইতে সম্মত হন নাই। পত্রে কোন ফলোদয় হয় নাই। ৩০শে জানুয়ারি হুগলী হইতে গঙ্গাপার হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য গমন করেন। বাগবাজারের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে একটি স্থানে ছাউনী করিয়া ক্লাইব নবাবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নের সময় উভয়পক্ষের মধ্যে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হয়, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ায় কোন পক্ষই অধিক অগ্রসর হইল না। নবাবের ভয়ে পার্শ্ববর্তী লোকেরা ইংরাজগণকে আহার্য খাদ্যাদি বন্ধ করিয়াছিল। নবাব সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন, সেইজন্য তিনি নবাবগঞ্জ হইতে ইংরাজগণকে দূত প্রেরণ করিতে বলেন। ওয়ালস ও স্ক্রাফ্টন দূতস্বরূপ উমিচাঁদের হালসী

+ Orme II. P. 125-126

বাগানে নবাবের ছাউনিতে উপস্থিত হইয়াছিল, চতুর মন্ত্রী দুর্লভরাম পাছে তাহারা নবাবকে হত্যা করে এই আশঙ্কা করিয়া উহাদের নিকট পিস্তল আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বলবান ভীষণাকৃতি কতকগুলি লোক যাইতেছিল ও উহাতে তাহারা ভীত হইয়াছিল। নবাবের মূল উদ্দেশ্যই যদি সন্ধি করা, তবে কেন তিনি কলিকাতা পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন ইহার মর্ম তাহারা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা শেষে উমিচাঁদের নিকট নবাবের গুপ্ত সংবাদ অবগত হইয়া সত্বর ক্লাইবকে গিয়া উহা বলেন যে, নবাবের কামানগুলি এখনও পৌঁছে নাই বলিয়াই নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কেবলমাত্র কালহরণ করিতেছেন। ক্লাইব সেই সুযোগে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রাত্রির শেষে ইংরাজেরা দূতগণের পরিচিত পথে গিয়া নবাব শিবির একেবারে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের সৌভাগ্যবলেই নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি দোস্ত মহম্মদ খাঁ আহত হওয়ায় নবাব আপনার শ্বশুরের পরামর্শে ক্লাইবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রাতে সেই অল্প সৈন্য লইয়া সম্মুখ সমরে নবাবকে পরাজয় করা অসম্ভব তবে হঠাৎ আক্রমণে সৈন্যগণকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করিলে ভয়ে তাহারা পলায়ন করিবে ও উহাতে সন্ধি হইবে, ক্লাইবের সেই উদেশ্য সিদ্ধ হইল।

প্রথম সন্ধি—৯ই ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে **রণজিৎ রায়ের** উদ্যোগে নিম্নলিখিত সর্তে সন্ধিপত্র কলিকাতা বা আলিনগরে হয় ঃ—কোম্পানীর বাণিজ্য সম্বন্ধে সমস্তাধিকার রহিল, যে সমস্ত স্থান নবাব দখল ও বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি উহা প্রত্যার্পণ করিবেন, লুণ্ঠিত দ্রব্যের জন্য নবাবের বিচারানুসারে ক্ষতিপূরণ ও কলিকাতায় টাঁকশাল ও কোম্পানীর মুদ্রা প্রচলন জন্য তাহাদিগকে বাটা দিতে হইবে না, স্থির হইল। কিন্তু অত্যাশ্চর্যের বিষয় তখন ইংরাজেরা সেই সন্ধিপত্রে মীরজাফর ও দেওয়ান দুর্লভরামের স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ করিয়া উহা করাইয়া লয়। উল্লিখিত রণজিৎ রায়ের পরিচয় দেওয়া উচিত। তিনি জগৎশেঠের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী দক্ষ কর্মচারী। উহারা যখন বিধিমত চেষ্টা করিয়া নবাবের সহিত ইংরাজ কোম্পানীর সন্ধি কোন মতে করাইতে পারিলেন, তখন উহাকে নবাবের সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জগৎশেঠের সাহায্যেই ও চক্রান্তে এই সন্ধি হইয়াছিল, ইংরাজেরা ইহার জন্য উহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। উমিচাঁদও উহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। উমিচাঁদ ভাল জিনিসের পরিবর্তে খারাপ জিনিস দেওয়ায় উহার সহিত ইংরাজ কোম্পানীর যে কারবার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল উহা ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। কোম্পানী যাহারা মাল তৈয়ারি করিত, তাহাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে আরম্ভ করে। তজ্জন্য ইংরাজেরা অনুমান করে যে উমিচাঁদ তাহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া নবাব দ্বারা আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছে, সেইজন্য তাহারা উহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল। কলিকাতা অধিকারে সকলের সম্পত্তি সমূহ আগুনে ও অন্য রকমে নষ্ট হইয়াছিল। উহার ক্ষতিপূরণের বিষয় এই সন্ধিতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজের সাপক্ষে সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিল। নবাব কখনই উহাতে সম্মত হইতেন না, তবে কেবল তিনি তাঁহার কর্মচারিগণকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই উহা করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা মুর্খের মত কার্য করেন নাই। * ক্লাইবও জয়াশা নিতান্ত

* ক্লাইবের চিঠি যাহা মোহনলাল পাইয়াছিল ঃ— কলিকাতার আক্রমণকালে এখানকার মত আমার সৈন্যবল ছিল না। এখন যদি যুদ্ধ হয়, তবে এক পক্ষ নির্মূল হইবে জানিবেন, সন্ধি হইবে না। আপনার মতেই নবাব কার্য করেন, সেইজন্যই আমার মত জানাইলাম। (ক্লাইব চরিত পৃ. ১০৬)

অসম্ভব ভাবিয়া সন্ধি দ্বারা আপনার ও ইংরাজ কোম্পানীর মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ক্রম লিখিয়াছেন যে, ক্লাইবের রাত্রের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল তিনি দিবাভাগে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না ইহা বুঝিয়াছিলেন। + ঐ সন্ধিতে এডমিরাল ওয়াটসন প্রমুখ অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষকে ক্লাইব সন্ধির সাপক্ষে বিশেষ কারণ দেখাইতে হইয়াছিল। ফরাসিরা নবাবকে সাহায্য করিত। উহাতে যুদ্ধ বহু কালব্যাপী হইত, তদ্দারা ইংরাজ কোম্পানীর পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক খরচ হইত। এতদ্ভিন্ন বাংলাদেশের বড় লোকদের কথার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ তাহারা কখন কোন এক পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকে না। ++ তজ্জন্য বেভারিজ সাহেব ক্লাইবকে যোদ্ধা ও রাজনীতি বিশারদ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

চন্দননগরাধিকার — ১৮ই ফেব্রুয়ারি ক্লাইভ সৈন্য সামন্ত লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চন্দননগর দখল করিতে গেলেন। নবীন নবাব তখনও মুর্শিদাবাদে পৌছান নাই, অগ্রদ্বীপে ছিলেন, সেইখানে নবাবকে দিয়া ফরাসি দূতেরা ইংরাজ কোম্পানীকে উহা করিতে নিষেধ করান। যদি তাঁহারা উঁহার কথা আমান্য করে, তাহা হইলে হুগলীর অধ্যক্ষ নন্দকুমারকে ফরাসিগণেব সহায়তা করিবে ও মীরজাফরকে অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া চন্দননগরের নিকট উপস্থিত থাকিতে আজ্ঞা করেন ও তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লক্ষ টাকা দান করেন। ইহাতে ক্লাইভ বিচলিত হইয়া নবাবের নিষেধাজ্ঞা মান্য করিবেন স্বীকার করিলেন ও ফরাসি কোম্পানীর সহিত প্রথম সন্ধি প্রস্তাব করিলেন যে, ভবিষ্যতে কোম্পানীর সহিত যদি কাহারও কোন যুদ্ধ বিবাদ হয়, তবে তাহারা কোন পক্ষে যোগদান করিবে না। কিন্তু পণ্ডীচারীর কর্তৃপক্ষগণের অভিমত ভিন্ন ঐরূপ কোন সন্ধি করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। তখন ক্লাইব অন্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজগণের সততায় সন্ধিহান হন ধূর্ত উমিচাঁদ ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া তাঁহার সে সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবাব চারিদিকের ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। তখনই আহম্মদ শা আবদালি দিল্লির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইজন্য নবাব ইংরাজগণের বন্ধুত্বের দ্বারা স্বীয় রাজ্য রক্ষা করা কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন। এডমিরাল ওয়াট্‌সন ও নবাবকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, উহাতেও সেই সঙ্কেত স্পষ্ট ছিল ও সেইজন্য চন্দননগর অধিকার করা যে আবশ্যক উহা লিখিতেও ভুলেন নাই। সেই কৌশলে নবাব তাঁহার নিষেধ বাক্যের উপর আর অধিক বল না দিয়া, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরব রহিলেন। উহাতেই বোম্বাই হইতে কোম্পানীর সৈন্যগণ আসিলেই ১৪ই মার্চ ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ২৪শে মার্চ জলপথে যুদ্ধ জাহাজ সকল চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেওয়ান রায়দুর্লভ ফরাসিগণের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন, কিন্তু উমিচাঁদের কৌশলে নন্দকুমার বশীভূত হওয়ায় তিনি উহা করিতে পারেন নাই। বোধহয়, ইহারই জন্য ভগবান নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চন্দননগর ইংরাজেরা অধিকার করিলে, নবাব সিরাজদ্দৌলা সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি তখন আফগানেরা তাঁহার রাজ্যাপহরণ করিবে এই জুজুর

+ ক্লাইবকে ওয়াটসন লিখিয়াছিলেন ঃ— নবাব কেবল ভবিষ্যত বল সঞ্চয়ের জন্য সন্ধি করিতেছেন উহার চতুরতায ভুলিও না, পরিমাণ বিষময় হইবে। Ivis Narrative

++ Beveridge's History of India Bk III page 557.

ভয়ে এতই ভীত ও কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি চন্দননগর অধিকারের পরে ইংরাজগণকে প্রশংসা করিয়া সেই স্থানে যে শর্তে ফরাসিরা ব্যবসা করিত তদনুরূপ করিবার প্রস্তাব পর্যন্তও করেন। ইংরাজেরা তখন তিনি যে, মুর্শিদাবাদে পলাতক ফরাসি সৈন্যগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ও ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষ বুসির সহিত পত্র বিনিময় করিতেছিলেন ইত্যাদি বলিয়া উহার উত্তর দিয়াছিলেন। * ঐতিহাসিক বেভারিজ তাঁহার পুস্তকে নবাবের পত্র হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহাই হউক, এই সকল ব্যাপারে স্পষ্টই দেখা যায় যে, যদি নবাব তখন বালকের মত কার্য করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা কখনই তাঁহাকে এমন করিয়া ভয় দেখাইত না ও তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য কর্মচারিগণকে উৎকোচ দান করিত না। ইংরাজেরা তখন বেশ বুঝিয়াছিল যে, নবীন নবাব যে কোন প্রকারেই হউক প্রতিশোধের জন্য উপযুক্ত অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। অতএব তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে না পারিলে ইংরাজের মঙ্গল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেইজন্যই মুর্শিদাবাদে ওয়াট, উমিচাঁদ, জগৎশেঠাদিকে নানা রকমে ইংরাজদিগের পক্ষে কার্য করিবার ও গুপ্ত সন্ধানাদি লইবার কোনরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নাই। ক্লাইব নবাবকে সেই সকল ফরাসি সৈন্যগণকে দূর করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ ও যদি তিনি উহা না করেন, তবে তিনি তাঁহার সৈন্যগণ দ্বারা সেই কার্য করিবেন বলিয়াছিলেন। ফরাসিরা নবাবকে সাবধান করেন যে, তিনি যেন ইংরাজগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া তাঁহাদের মত বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট হইতে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হন না। সেই সুযোগেই নবাবের বিরুদ্ধে মীরজাফররাদির ইংরাজগণের সহিত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। সেই সময়ে বাজীরাও পেশওয়া ক্লাইভকে উত্তেজিত করিয়া এক পত্র লেখেন যে, যদি তিনি তাহাকে সাহায্য করেন, তবে নবীন নবাবের আক্রমণে তাঁহাদের যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে উহার দ্বিগুণার্থ দান করিবেন। ক্লাইব মারাঠাগণকে বিলক্ষণ চিনিতেন, সেইজন্যই সেই পত্র তিনি নবাবকে পাঠাইয়া তাহাকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত ও ত্রাস্ত করিলেন। কেহ কেহ উহাকে জাল বলিয়া থাকেন ঐরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল; ক্লাইব নবাবের পাত্রমিত্র সকলের সহিত প্রায়ই নানারূপ চাতুরী ও কৌশলে বশীভূত করিতেন। এমন কি, জগৎশেঠের ধনাদি রক্ষা করিবার জন্য এবং আবশ্যক হইলে নবাবের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে দুই হাজার সৈন্য ইয়ার লতিফ খাঁর অধীনে ছিল তাহাদিগকেও হস্তগত করেন। সেই ইয়ার লতিফ ও মীরজাফর দুইজনেই মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত ও প্রার্থী। উমিচাঁদ ইয়ার লতিফের পক্ষেও খোজা পিট্রুস মীরজাফরের জন্য ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মীরজাফরের ভাগ্যেই ক্লাইবের সোনার কাঠি স্পর্শ করিয়াছিল। কারণ ইংরাজি ঐতিহাসিক বেভারিজ বলেন যে, যে স্ত্রীলোক অন্ধকূপহত্যায় বাঁচিয়াছিল তাহাকে মীরজাফর অন্দরে প্রবেশ করাইয়াছিলেন ও ঐ নৃসংশ ব্যাপারের জন্য যদি কাহাকেও দায়ী বা দোষী স্থির করিতে হয় তবে সে দোষ তাঁহারই উপরে পড়ে।

ষড়যন্ত্র— ১০ই জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার কলিকাতায় একখানি অঙ্গীকার পত্র মীরজাফরের সহিত ক্লাইব ওয়াটসন, ড্রেক, মেজর

* History of India Bk III Page 572 & 574.

কিলপেট্রিক ও বিচার প্রভৃতি কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণ স্বাক্ষরিত করেন। সেই কথা তখন উমিচাঁদ নবাবের কর্ণগোচর করাইবে এই ভয় দেখাইয়া নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ও তিনি মীরজাফরকে ধৃত করিবার জন্য তাহার বাড়ির চতুর্দিকে সিপাহি দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। উহাতেই মিঃ ওয়াটসন মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন। ভাগ্যদোষে উহাতেই মুর্খ নবাব ভীত হইয়া মাতামহ যে পথাবলম্বন করিয়া মুস্তাফাদিকে বাধ্য করিয়াছিলেন সেইরূপে সেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে বশীভূত করিতে গিয়াছিলেন। ধূর্ত মীরজাফর তখন কোরাণ স্পর্শ করিয়া নবাবের সহায়তা ভিন্ন ইংরাজের পক্ষে গমন করিবেন না স্বীকার করেন। উহাতেই নবাব সিরাজদ্দৌলা কৃতকার্য হইলেন মনে করিয়া ক্লাইবকে ১৫ই জুন যে এক পত্র প্রেরণ করেন উহাতে ওয়াট সাহেবের পলায়নাদি বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করিলেন।

তখন নবাব ফরাসি সেনাপতি লাকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য পত্র লেখেন ও তাঁহাকে রাজমহলে উপস্থিত থাকিতে বলেন। ১৭ই জুন ক্লাইব কাপ্তেন কুট কাটোয়ার দুর্গ অধিকার করিলেন। সেইখানে মীরজাফর অঙ্গীকারানুযায়ী ক্লাইবের সঙ্গে যোগদান করেন নাই। মীরজাফর আলিবর্দির ভগ্নীপতি ও তাঁহার অন্নে বহুকাল প্রতিপালিত, বিশেষতঃ মাতামহীর অনুরোধ বশতঃ নবাব স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেইজনই তিনি তাঁহার চরণতলে উষ্ণীষ ত্যাগ করিয়া আপনার পূর্বকৃত সমস্ত দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মীরজাফর কোরাণ স্পর্শে নবাবের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন ও মীরজাফর সেই অঙ্গীকার মত কাটোয়ায় ক্লাইবের সাহায্য করেন নাই। ক্লাইব শেষে একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা মীরজাফরকে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিবার অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য হন। ইহা ক্লাইব তাঁহার প্রেরিত গুপ্ত সভার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

গূঢ় উদ্দেশ্য — যাহাই হউক, নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া উহার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন, উহার নাম পুনরায় কলিকাতা করার বিষয় নবাবের মুসলমানী ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বলিয়া ক্লাইব নবাবের সহিত কলিকাতার প্রথম সন্ধিতে উহার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পূর্বে মীরজাফরের সঙ্গে যে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র সন্ধি উভয় পক্ষে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল উহাতে সেকথা পরিষ্কার ছিল। ইংরাজের সৌভাগ্যবলে ও পাকে চক্রে তখন নবীন নবাব মুর্খ হইয়া পড়েন কিন্তু বস্তুতঃ তাহার কার্যকলাপ দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না। মাতামহের অবলম্বিত পথানুসরণ করিয়া মীরজাফরকে বিশ্বাস করাই তাঁহার সর্বনাশের মূল কারণ হইয়াছিল। শেষে তিনি যে ইংরাজের চক্রে ব্রাহ্মণের কৌশলে মীরজাফর ধর্মে কর্মে জলাঞ্জলি দিয়া নবাবের সর্বনাশ করিবেন ইহার সন্ধান রাখেন নাই। কলিকাতায় বাংলার শেষ নবাবের রঙ্গস্থল ও সমাধির আয়োজন তাঁহার একজন পরম বিশ্বাসী আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের অঙ্গীকারপত্র দ্বারা কলিকাতায় হইয়াছিল। মীরজাফর কৃত কলিকাতার নাম আলিনগর হইতে পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের মূলোৎপাটন হইয়াছিল। কলিকাতার সহিতই ইংরাজের অভ্যুদয়ের প্রধান সম্বন্ধ বর্তমান ও ক্লাইব যেন

সেই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ক্লাইব কাহারও কোন ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত বা বিবেচনা করিয়া কার্য করেন নাই, এমন কি, তিনি সময়ে সময়ে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের অভিমতের বিরুদ্ধে কার্য করিতেন ও সেই সকল ক্রটিতে ইংরাজের মঙ্গল ও নবাবের সর্বনাশ হওয়া বিধাতার লিপি ভিন্ন আর কিছুই নয়। যথা সময়ে ফরাসিরা নবাবের সাহায্যে আগমন করিতে না পারায় নবাবের সর্বনাশ মীরজাফর স্বার্থোন্নতির বশবর্তী হইয়া করিয়াছিল। ঐরূপ বিধাতার শাঁপেই ওয়েলিংটন মহাবীর ও নেপোলিয়নের সর্বনাশ হইয়াছিল। তাঁহার তুলনায় ক্লাইব অতি সামান্য সৈনিকমাত্র; সৌভাগ্যক্রমেই ইতিহাসে সেইরূপ তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল।

কলিকাতা ব্রিটিশ জাতির উন্নতির পরশমণি স্বরূপ, সেইজন্যই উহা ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়াছিল ও সেইখান হইতেই তাহাদের শক্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতাধিকার করিয়া সেইখানের নগরবাসিগণের গৃহাট্টলিকা ধ্বংস করিল, কিন্তু কোম্পানীর দুর্গাদি সম্বন্ধে সেরূপ কোন কিছুই করেন নাই, উহার সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলেন নাই। যদি দুর্গাদি দৃঢ় করিবার অপরাধে কলিকাতা গ্রহণ করাই নবাবের মূল উদ্দেশ্য হইত, তবে উহা তিনি প্রথমেই নষ্ট করিতেন। বাংলায় ইউরোপের যে সকল কোম্পানীরা ব্যবসা করিত, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। ইংরাজ ভিন্ন আর কেহই আড়তদারী ও কারখানা খুলিয়া শিল্পীগণকে অর্থ দ্বারা বশীভূতপূর্বক কাপড়াদি বয়ন ও ছিট তৈয়ারি ব্যবসার কেন্দ্রস্থল বাংলায় করে নাই। আলিবর্দি মুর্শিদাবাদে মুনসরগঞ্জ স্বীয় প্রিয় দৌহিত্রের আয়ের নিমিত্ত করিয়াছিলেন। উহাতেই নবীন নবাবের ব্যবসাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। উহাতেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। বাংলার সেকালের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজগণের উৎসাহে ও বিপদাপদে রক্ষা পাইবার জন্য বসবাস আরম্ভ করে। উহাতে মুর্শিদাবাদ হুগলী আদি স্থানের ক্ষতি হইতেছিল। সেই সকল ব্যবসায়ীরা যাহাতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সেই সকল স্থানে গমন করে, উহাই নবাবের বা অর্থগৃধ্নু তৎকর্মচারীগণের কলিকাতার নিরীহ ব্যবসায়ীগণের গৃহাদি ধ্বংস করিবার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

সেই সকল অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের গোলাগুলি দ্বারা হয় নাই। সেই মহাপাপে সিরাজদ্দৌলার পতন ও নাশ হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেকালের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণকে ক্ষতিপূরণের টাকা বন্টন করিবার ভার অর্পণ ও তাঁহারা যাহাতে কলিকাতা ত্যাগ করেন না সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ও যাহারা সেই সময় কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা ঐ টাকা পাইবে না বলেন। আরও যাহাতে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন আদি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করে, সেইজন্য তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ ঐ অর্থ লাভ করে। পুরাতন কলিকাতার ধ্বংস ও উহাতে নূতন ঘর বাড়ির পত্তনের জন্য সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতাধিকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী। মুর্খ নবাব কলিকাতা অধিকার সম্পূর্ণভাবে যাহাতে স্থায়ী থাকে সে বিষয়ে যথারীতি ব্যবস্থা না করিয়া নিজের পতনের জন্য কতকাংশে দায়ী ও দোষী।

ক্ষতি বৃদ্ধি— যাহাই হউক, কলিকাতার ধ্বংসে পুরাতন বাসিন্দাগণের যে সর্বনাশ

হইয়াছিল উহার শতাংশের একাংশও ক্ষতিপূরণের অর্থে হয় নাই কিন্তু উহাতে ভবিষ্যতে ইংরাজ কোম্পানীর সম্পূর্ণ লাভ হইয়াছিল। কারণ সেকালের নবাবী আমলে বাদসাহী ও নবাবী সনন্দ উপাধি দলিল আদি রক্ষা করিবার উপযুক্ত সিন্ধুক আদি যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না সেরূপ বর্তমান কালের ন্যায় কোন কিছু ছিল না। সেই সকল অমূল্য বস্তু কলিকাতায় সেই অগ্নিসৎকারে নষ্ট হইয়াছিল। উহাতে অনেক জায়গা জমি কোম্পানী লাভ করে। তখন মল্লিক উপাধি দানের সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর দেওয়া হইত। নয়নচাঁদের পূর্ব পুরুষেরা মল্লিক উপাধি লাভ করিবার সময় হালি শহরে জায়গীর পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সেইখানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া খাল কাটাইয়াছিলেন ও কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় জীউর অতি সুন্দর বৃহৎ মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ঐ খালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের যাবতীয় মালের নৌকা যাতায়াত করিত, উহার সুবিধার জন্যই ঐরূপ করিয়াছিল। প্রথমে তাঁহারা সপ্তগ্রাম ও পরে ত্রিবেণীতে বাণিজ্য ও বাস করিত। শেষে কলিকাতার সেই অগ্নিতে তাঁহাদের সেই সকল অমূল্য বাদসাহি পাঞ্জাদিসহ জায়গীর ও উপাধির সনন্দ ও প্রাচীন হর্ষবর্ধনের আমলের নানা রাজনিদর্শন ও বংশতালিকা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। পরবর্তীকালে তাহারা সেইরূপ জায়গীরের কায়েমী স্বত্ব নষ্ট দলিলাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারায় কোম্পানী উহা আত্মসাৎ করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধি করেন। আজও ঐ খাল মজিয়া গেলেও উহা মল্লিকের খাল বলিয়া বিদিত হইয়া থাকে। তবে এই পর্যন্ত স্থির যে, যাহারা ক্ষতিপূরণের টাকা বন্টন করিবার ভার পাইয়াছিল ও করিয়াছিল তাহারা প্রায় অধিকাংশই সেকালের শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যবসায়ী ও যাহাদের সততার উপর কোম্পানীর ও সর্বসাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। আরও তাহারা যাহাতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন না করে উহাও কোম্পানীর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। উহাদেরই উপর কলিকাতার অতীত উন্নতি যেমন নির্ভর করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ করিবে ইহা ইংরাজেরা বুঝিতে পারিয়াছিল। নবাবের কলিকাতা অধিকার ও ইংরাজ কোম্পানী উহার উদ্ধারাদি করায় স্বদেশী ব্যবসায়ীগণের ব্যবসার মঙ্গল ও উন্নতি হয় নাই। সেকালে কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর কোন গৌরবান্বিত ব্যবসার কেন্দ্র ছিল না। ইতিহাসে যে দাস ব্যবসা রহিত করার জন্য বিলাতের ইংরাজগণের নাম স্বর্ণাক্ষরে উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই হেয় ব্যবসা ইংরাজ কোম্পানী তখন কলিকাতায় করিত। তদ্ভিন্ন দাদন ও গছান প্রথায় দেশী তাঁতীরা তাহাদের স্বজাতীগণের মোড়লীতে দাসত্ব করিত। শেঠেরা বা বসাকেরা সেইজন্য সম্পূর্ণ দায়ী ও তাহারাই কোম্পানীর নামজাদা দালাল ও সেই ব্যবসার মোড়ল ছিল। তাহাদের সেই স্মৃতি আজও কলিকাতার রাস্তায় রক্ষিত হইতেছে। উহারা সেই সময়ের পর হইতে ইংরাজ টোলার নিকট না থাকিয়া বাঙালীর টোলার নিকট বাস করা মঙ্গলের বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য তাহাদের আবাস গৃহাদিতে ইংরাজ কর্মচারীরা ভাড়া করিয়া বাস করিত, উহা সেকালের পুরাতন নকসায় আছে। সেকালে গঙ্গার ঘাট ধর্মার্থে যেমন নির্মিত হইত, তেমনি ব্যবসায়ীরা উহা আপনাদের মাল তুলিবার ও বোঝাই দিবার জন্য করিত। সেইজন্য তখন অনেক ঘাট ইংরাজের ও নবাবের নামে ছিল। ব্যবসায়ীরা নবাবের ঘাটে মাল তুলিলে ঐ ঘাট ব্যবহারের মাশুল

তাহাদিগকে দিতে হইত।

কলঙ্ক— কলিকাতার নাম নবাব সিরাজউদ্দৌলার দৌলতে মুসলমানী আলিনগর হইয়াছিল। নবাবের সহিত কলিকাতার যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল উহাও দেখান যাইতেছে। রামায়ণে যেমন শ্রীরামচন্দ্র সপ্ততাল বিদ্ধ করিলে তিনি যে বালিকে বধ করিতে পারিবেন সুগ্রীবের এই বিশ্বাস হইয়াছিল ও তিনি বালিকে সম্মুখ সমরে বধ না করায় তাঁহার যেমন দুরপনেয় কলঙ্ক বর্তমান, তেমনি ক্লাইবের ভাগ্যেও সেইরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বের সমস্ত বীরত্ব কাহিনী কলিকাতার সন্ধি ও পালশি যুদ্ধে কলঙ্কিত হইয়াছিল। মুর্খ মীরজাফর ক্লাইবকে কলিকাতা উদ্ধার একপ্রকার বিনাস্ত্রপাতে করিতে দেখিয়া উহার সহিত ষড়যন্ত্র ও সন্ধি করে ও বিশ্বাস বিমুগ্ধ নবাবের মস্তক গর্বিত বংশধর মীরণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার ইহলোকের ও পরলোকের সকল জ্বালাযন্ত্রণার দুঃখ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই মীরজাফর ও মীরণ বীর মুসলমান জাতির কলঙ্ক ও সেইরূপ লোকেরাই উঁহাদের পতনের মূল কারণ ও ইংরাজ কোম্পানীর উন্নতির সহায় হইয়াছিল।

হায়! ঘটনাচক্র, চক্রান্ত, মূর্খতা ও বিশ্বাসঘাতকতাতেই বাংলার সেকালের অধিপতিগণের ও দেশের সর্বনাশ হইয়াছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতাধিকার করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাদন ও আড়তদারী ব্যবসা নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের শাঁপে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার যে কিছু কলঙ্ক সম্ভব হইতে পারে। তিনি দেশের ও দশের উন্নতির চেষ্টা করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্যোদয়ের কারণানুসন্ধান

"ঐ দেখরে দেখ, পলাশি ময়দানে ওড়ে, কোম্পানী নিশান!
মলে মোহন, জাফর ছলে লড়াই সঁপে নবাব পলান,
করলে কি তার দশা শেষে, সেই ঐ, মীরজাফরের ছেলে,
রাজ্য নিয়েও, মিটল না সাধ, কাটে নবাবকে ধরে ফেলে,
ঐ তার ধড় গর্দান, কাটা মুণ্ড, হাতির পরে লয়ে ফেরে
যেই দেখে, সেই কেঁদে মরে, ভয়ে সবাই সহর ছাড়ে।"

অভ্যুদয় — বহুকাল হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যক্তি বিশেষের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতিবিশেষের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে ও উহা প্রায়ই শত বৎসর অন্তরই হইতেছিল দেখিতে পাওয়া যায়। শতবর্ষান্তর ৫৭ এর অঙ্কে সেইরূপ পরিবর্তন হইতেছে,—১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হিমুর সর্বনাশ ও চতুর্দশ বয়স্ক বালক আকবরেব অভ্যুদয়, সেইরূপ ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, শিবাজীর বিজাপুর লাভ ও ঔরংজেবের সিংহাসনারোহণ ও পুনরায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইবের পলাশীযুদ্ধের জয়লাভ ও সিরাজউদ্দৌলার নৃশংস হত্যা সংসাধিত হইয়াছিল। আবার সেইরূপ শতবর্ষ পরেও ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ করিয়াছিলেন। উহাতেই ইংরাজ জাতির অভ্যুদয় ও মুসলমানের পতন হইয়াছিল। উহার কলঙ্কভার ইতিহাসে মীরজাফর, মীরকাশিম, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও কৃষ্ণচন্দ্রাদিকে বহন করিতে হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলা আকবরের ন্যায় বৈরামের ক্রীড়াপুত্তলী ছিলেন না, বরং গৃহশত্রু মীরজাফরকে হস্তগত করিয়া বহিঃশত্রু দমন করিতে গিয়াই তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছিল। তিনি পাপিষ্ঠের চক্রান্ত জানিতে পারিয়া উহাকে বন্দি করিয়া ও শেষে ভাগ্যদোষে বৃদ্ধা মাতামহীর অনুরোধে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের শপথে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার জীবন ও রাজ্য সমস্তই হারাইয়াছিলেন। শেষে সেই শতবর্ষান্তর অঙ্ক ফলে বাংলায় ইংরাজের রাজ্য হইয়াছিল।

হায়! কি কুক্ষণে, নবাব বালস্বভাব-চপলতার বশবর্তী হইয়া শেঠ দুহিতার রূপলাবণ্য দর্শন করিবার জন্য শেঠ ভবনে বেগমের বেশে প্রবেশ করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ও উহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা শেঠ জামাতার গুপ্ত হত্যা দ্বারা করিয়াছিলেন! হায়! কি কুক্ষণে, তিনি জগৎ শেঠের ঔদ্ধত্বের শাস্তি স্বহস্তে চপেটাঘাত দ্বারা করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ ও মাতামহীর কথায় মুক্ত করিয়াছিলেন! হায়! কি কুক্ষণে, তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ইংরাজ জাতিকে পরাস্ত না করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন! হায়! কিক্ষণে তিনি মাণিক চাঁদকে অধিকৃত কলিকাতার অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছিলেন! হায়! কি কুক্ষণে, তিনি

নন্দকুমারকে হুগলীতে ফরাসিগণের সাহায্য করিবার জন্য ভার দিয়াছিলেন! হায়! কি কুক্ষণে, তিনি উমিচাঁদের কথায় মুগ্ধ হইয়া ইংরাজগণকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। হায়! কি কুক্ষণে, তিনি ক্লাইব ও ওয়াটসনের চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ তাহাকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে এই বিশ্বাসে প্রতারিত হইয়াছিলেন! হায়! কি কুক্ষণে সেই মোহে তিনি ফরাসির সাহায্য করেন নাই। হায়! কেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফরের সৈন্যগণের ব্যবহার অনুসন্ধান না করিয়া উহার কথায় যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন! হায়! এই সমস্তই তাঁহার অপরিণামদর্শিতা বা হঠকারিতার ফল, বরং তাঁহার সৌভাগ্যহীনতার নিদর্শনস্বরূপ। তিনি যে উমিচাঁদ প্রভৃতির শপথাদি বঞ্চিত হইয়া ফরাসি ও ইংরাজের যুদ্ধকালীন আপনার রাজশক্তির মান্য রক্ষা করেন নাই এ সকল ঘোরতর অপরাধে তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছিল। শত্রুকে বর্ধিত হইতে দেওয়া রাজার অমার্জনীয় দোষ ও উহাই পতনের মূল কারণ। এইজন্য উমিচাঁদ, নন্দকুমার ও জগৎ শেঠের দোষ মীরজাফর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কোন শৌর্য বীর্য পরাক্রমশালী মহাবীরের যুদ্ধ কৌশলে বা বলাধিক্যে যে পলাশীর যুদ্ধ জয় করা হয় নাই ইহা বলা অনাবশ্যক। কলিকাতার মন্ত্রণাগার ও কতিপয় যড়যন্ত্রকারীই সেজন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাঁহাদিগকেই প্রকৃতপক্ষে পলাশি যুদ্ধের প্রধান অভিনেতার দোষ, গুণ, গৌরব বা কলঙ্কভার বহন করিতে হইবে, সিরাজউদ্দৌলা কেবল উপলক্ষ মাত্র।

পলাশীর জয় ও ফলাফল উহা হইবার পূর্বেই মীরজাফরের কলিকাতার গুপ্তসন্ধি পত্রেই হইয়াছিল, কেবল সেই জয় ঘোষণার জন্য পলাশীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রচলিত গ্রাম্য গীতিতে ইংরাজ গৌরব ও রাজ্যে সকলের মনে ভয় ও ক্রন্দনের রোলই লক্ষ্য করা যায়। এইজন্যই কলিকাতার গুপ্তসন্ধির মাহাত্ম্য যে নাই এ বলা যায় না। সেইখানেই ক্লাইবের বত্রিশ সিংহাসনে তাঁহার বিক্রমাদিত্য নামের ঘোষণা হইয়াছিল। সেই মাহাত্ম্যেই একদিন উমিচাঁদের সঙ্কেতে সিরাজউদ্দৌলার এখনও কামান আসে নাই জানিয়া উপযুক্ত অবসরে ক্লাইবের আক্রমণ দ্বারা ভীতি উৎপাদনে নবাব সন্ধি করিয়াছিলেন, আবার উপযুক্ত সময়ে উহা অমান্য করিয়া ক্লাইব মীরজাফরের সহিত গুপ্ত সন্ধি দ্বারা সিরাজউদ্দৌলার সেই দুর্বুদ্ধিতার উপযুক্ত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে উহা যেন উপন্যাসের মত বোধহয়, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কলিকাতার অধিবাসী উমিচাঁদকে মহাভারতের শকুনির সহিত তুলনা করিলে, বোধহয়, কোনই দোষ হয় না। হায়! সপ্তরথী দ্বারা পরিবেষ্ঠিত নিরস্ত্র অভিমন্যুর ন্যায় সিরাজউদ্দৌলারও সর্বনাশ হইয়াছিল।

সূক্ষ্ম বিচার — ঐতিহাসিকগণের মতের অনৈক্য হইতে পারে কিন্তু ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার যে ঘটনাস্রোতেই লক্ষিত হয়। মৃত্যুর সময়ই মানবের ধর্ম-কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, চলিত কথাও উহার সমর্থন করে; "তপ জপ করলে কি হয়, মরতে জানলে ধন্য হয়।" মীরজাফরের, রোগে, শোকে, অপমানে, পাপিষ্ঠ মীরণের বজ্রাঘাতে, ক্লাইবের স্বহস্তে, উমিচাঁদের ক্ষিপ্তাবস্থায়, চক্রী ও পাষণ্ড জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের, রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস প্রমুখ পলাশি যুদ্ধ উপন্যাসের প্রধান প্রধান অভিনেতৃগণের কি ভীষণ মত্যুই হইয়াছিল! সিরাজউদ্দৌলা ঘটনাস্রোতে উপযুক্ত অবসরকে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিতে পারেন নাই, মীরমদনাদির শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ বাক্যাবহেলন ও পাপিষ্ঠ মীরজাফরের দুরভিসন্ধি ভেদ করিতে না পারাই তাঁহার সর্বনাশের মূল কারণ। ব্রুটাসের অস্ত্রাঘাতে যেমন জুলিয়াস সিজার মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, উহার প্রতিরোধ বা প্রতিহিংসা করেন নাই,

তেমনি সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরের দুর্ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। বাংলার শস্য শ্যামল প্রান্তর হইতে মুসলমান শক্তি পলাশীর রণক্ষেত্রে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। প্রদীপ যেরূপ নির্বাণের অগ্রে একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া নবাবীর পদমর্যাদাদি রক্ষা করিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা উদ্ধার করিয়া এড্‌মিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব দুইজনই পলাশী যুদ্ধের মহাবীর হইলেন। একজন উমিচাঁদকে ফাঁকি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আর যিনি ঐরূপ কুৎসিত কার্যে যোগাদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, হায়! সেই ওয়াটসনকেই কলিকাতার সেন্টজন গির্জার প্রাঙ্গণে সমাধি লাভ করিতে হইয়াছিল। ক্লাইব তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিলাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে একটি সার সত্য কথা আছে, উহা উল্লেখ করা আবশ্যক ঃ—"হায়! ওয়াটসনকে তাঁহার গৌরবময় বিজয়কাহিনী সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হইল না, ইহাতেই সকলের মনে নশ্বর মনুষ্য জীবনের স্মৃতি জাগরুক করে।" একদিন ক্লাইবের সঙ্গে ওয়াটসনের কলিকাতার অধিকার লইয়া বিবাদ ও বাক বিতণ্ডা হইয়াছিল, পরে তিনিই আবার তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কালের কি অপার মহিমা! মৃত্যু ওয়াটসনকে অপসারিত ও কলিকাতায় প্রোথিত করিল, আর ক্লাইব বাংলায় ব্রিটিশ কেতন উড্ডীন করিয়া প্রশংসার সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যথার্থই যেন মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, কারণ তিনিই ইংরাজের রাজত্ব লাভের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে বহুতর প্রশংশা করিয়া সেকালের মহাত্মাগণকে ইংরাজের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে সম্মত করান। বুদ্ধিমতী রাণী ভবানীই ভাবী ভবিষ্যত অনিষ্ট দেখিয়া অসম্মতা হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল কলিকাতার উন্নতি ও স্বদেশী ব্যবসার অবনতির কারণ হইয়াছিল।

নূতন বাণিজ্য — পলাশীর যুদ্ধের পর লুটপাটে সৈন্যসামন্তেরা বিশেষ কিছুই পায় নাই। নবাবের রাজকোষে দুই কোটি টাকা মাত্র ছিল, উহা ক্লাইব প্রমুখ কয়জনের উদর পূরণেই শেষ হইয়াছিল। তাঁহারা গুপ্ত ধনাগারের কথা জানিতেন না ও উহা যাহাতে তাঁহারা জানিতে না পারেন, সেইজন্য মীরজাফর, আমীর বেগম খাঁ, দেওয়ান রামচাঁদ রায় ও নবকৃষ্ণ মুন্সী প্রমুখ জনকয়েককে উহার কিঞ্চিদাংশ দান করিয়াছিলেন। উহাতেই কলিকাতায় শোভাবাজারে ও আন্দুলে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ করিয়াছিলেন। রামচাঁদ সর্ব প্রথমে কলিকাতায় থাকিতেন ও তাঁহার তথায় সম্পত্তি ছিল। নবকৃষ্ণই কলিকাতার পোস্তার রাজবাড়ির মাতামহ লক্ষ্মীকান্ত ধরের নিকট সামান্য কর্মচারী ছিলেন। উক্ত ধর মহাশয় ও বড়বাজারের মল্লিকেরা সুবর্ণ বণিক, ইঁহারা সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একরকম অর্থ সরবরাহকার সওদাগর ছিলেন। পলাশি যুদ্ধের পর ক্লাইব তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থ লওয়া বন্ধ করিয়া নবাবদেব নিকট হইতে উক্ত কোম্পানীর অভাব দূর করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই ক্লাইবের কলিকাতায় নূতন বাণিজ্যারম্ভ। নবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণের সৌভাগ্য পলাশীর যুদ্ধের পরই উদয় হয় ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় উহার চূড়ান্ত হয়। নবকৃষ্ণ তাঁহারই কৃপায় সুতানটির জমিদারী ও মহারাজ পদবী লাভ করেন। রামচাঁদের ভাগ্যে তত্দূর কিছুই হয় নাই বটে, তবে ইঁহারা দুইজনেই কলিকাতায় থাকিতেন ও উহারা উভয়ে উহার উন্নতি করিয়াছিলেন। পলাশি যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর প্রধান কুঠি ও দপ্তর কলিকাতায় হইয়াছিল। কলিকাতাই তাঁহাদের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর পরশমাণি বলিয়া স্বীকার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র — রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতার সর্বনাশ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করেন নাই, তথাপি তাঁহার জীবন চরিত লেখকেরা কেহ কেহ উহাকে তাঁহার জমিদারী ভুক্ত বলিয়া * পদ্য উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু উহার ঐতিহাসিক কোন প্রমাণই নাই। তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙালীর হিন্দুধর্মের ও সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার প্রাদুর্ভাব ততদূর হয় নাই। কলিকাতাধিকার কালে সিরাজউদ্দৌলার মূর্খ অনুচরেরা উহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া যে ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছিল উহার ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় হইয়াছিল উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছিল। তাঁহারা পুনরায় ঐ অর্থ দ্বারা বসবাসভূমি সংস্কৃত করিয়া কলিকাতার শোভা সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে এক কপর্দকও লাভ করেন নাই, উহাতে তিনি যে সেই স্থানের জমিদার বা তাঁহার কোন সম্পত্তি সেইখানে ছিল না ইহাই প্রমাণ হয়। ক্লাইব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অতি সমাদরের সহিত কলিকাতায় আহ্বান করিয়া তাঁহার করভার প্রত্যুপকারের চিহ্ন স্বরূপ অর্ধেক করিয়া দেন ও পলাশী যুদ্ধের পাঁচটি কামান উপহার দান করেন। তদ্ব্যতীত দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনে যে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল ইহা প্রমাণিত হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কলিকাতার জমিদার বলিয়া স্বীকার না করিলেও, তিনি যে ষড়যন্ত্রের সহায়তায় গৌণভাবে কলিকাতার উন্নতি ও বর্তমান পরিণতি করেন ইহা বলিতে পারা যায়। পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভ সমস্তই কলিকাতার ষড়যন্ত্রে হইয়াছিল ও উহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যস্থতার পরিণাম। অনেকের মতে জব চার্ণকই কলিকাতায় বাণিজ্য কুঠি করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার কি গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গেলে অতীত ইতিহাসের কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ সমালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

বাণিজ্য— মুসলমানজাতির এদেশে অভ্যুদয় হইবার বহুপূর্বে ফিনিসীয় বণিকগণ ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। বাণিজ্যে ভারতবর্ষের ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্বন্ধ একথা এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বপ্রথমে মিশর দেশেই ভারতের পণ্যদ্রব্যের প্রধান পণ্যশালা ছিল। সেই মিশর হইতেই ভারতের ঐশ্বর্য খ্যাতি পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ও ভারত বাণিজ্যে মিশর রাজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ভূমধ্যসাগর দিয়া ইসলাম শক্তি যখন ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে, তখনই উহাদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্য উদ্ধার করা বীরের কার্য বলিয়া সকলের লক্ষ্য হয়। ধর্মযাজকগণ যিশুর জন্মস্থান উদ্ধার করিবার জন্য কত শত খ্রীষ্টান বীরপুরুষকে উৎসাহিত করিয়াছিল ও তাহারা জীবন পণ করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দেশ ধর্মাদি কলহ কোলাহলের মধ্যেই ইউরোপবাসীগণের ইসলাম জাতির সৌভাগ্যদয়ের কারণান্বেষণে বিব্রত থাকিয়া ভারতের বাণিজ্য ও রাজ্যের প্রতি তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময় হইতেই ভারত জয়ের চেষ্টা চলিতেছিল। যতদিন পর্যন্ত তাহারা ভারতে বাণিজ্য করিতে পারে নাই, ততদিন তাহাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই। সেকালে ভারতের উপর যাহারা অধিপত্য করিত, তাহারা মাশুল ও পণ্য বিনিময়ে অর্থ লাভ করিবার জন্য ইউরোপবাসীগণের সহিত বাণিজ্য

* 'অধিকার বাজার চৌরাশী পরগণা, গাড়ি জুড়ি আদি করি দপ্তরে গণনা রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ, দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার, পূর্বসীমা ধূলাপুর বুড়োগঙ্গা পার।'

করিতে আপত্তি করিত না। ভারতের কালিকট কোচিন প্রভৃতি স্থান যেমন ঐ জন্য প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বাংলায় তমলুক ও সপ্তগ্রাম ছিল। ভারতের সত্যপ্রতিষ্ঠায় ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, উহার কেন্দ্রস্থল ফিরিঙ্গি ও মগের দৌরাত্ম্যে স্থানান্তরিত হইতেছিল।

সপ্তগ্রাম — সপ্তগ্রামই তখন বাংলার প্রধান বন্দর ছিল। উহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া যায়, উহাতে সূর্যের সপ্তসপ্তি বা সপ্তাশ্ব নাম হইতে সপ্তগ্রামের নাম হইয়াছিল। * এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, উহাতে সেইখানে সূর্যের প্রতিমূর্তি আবিষ্কারের কথা এবং সপ্তাশ্বাদির উল্লেখ আছে। তিনি ত্রিবেণীর মন্দিরকে বিষ্ণুদেবতার মন্দির ও স্থানে স্থানে ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তির নিম্নাংশ বিদ্যমান, তিনি আরও বলেন যে, ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রতিমূর্তির অপর পার্শ্বে রুকনুদ্দিন বারবক শার কথা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তিনি মালিক উপাধি মণ্ডিত ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা প্রদর্শনীতে + গ্রন্থকারের পুত্র অভিরাম একখানি রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ের রূপা ও তামার থালা যাহার মধ্যে সূর্যের সপ্তাশরথ সমন্বিত মূর্তি ও উহার চতুর্দিকে গ্রহতারার মূর্তি পরিবেষ্টিত দেখাইয়াছিল ও উহাতে সংস্কৃতাক্ষরে গ্রহতারার বিবরণ লিখিত। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্ভূক্ত ছিল উহা কোনরূপ পৃথক নহে। সেখানে মুসলমানগণের টাঁকশাল ও সেনাপতি শাসনকর্তা থাকিতেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ বণিকেরা বাংলায় যাতায়াত ও ব্যবসা আরম্ভ করে ও সম্রাট আকবর কাপ্তেন টবরেজকে হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি আদি করিবার অনুমতি দান করিয়া সপ্তগ্রামের সর্বনাশ করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী নদী মজিতে আরম্ভ করায় জাহাজাদি যাতায়াতের জন্য পূর্ব প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করিয়া বেতোড় ও কলিকাতার সম্মুখ দিয়া জাহাজাদি গমনাগমন করিত। সেইজন্যই জব চার্ণক সপ্তগ্রামবাসী ++ সুবর্ণ বণিক রাজারাম মল্লিকের উপদেশ মতই কলিকাতায় কুঠি করিয়া হুগলীর কুঠি উঠাইয়া দেওয়া ভাল বুঝিয়াছিলেন। সাজাহান কর্তৃক হুগলিতে পর্তুগীজেরা শাসিত হইলে কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। উহার পূর্বে পর্তুগীজেরা ব্যবসায়ীগণের মালপত্রাদি লুটপাট করিত ও উহাতেই সপ্তগ্রামের বন্দর কতকাংশে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আরও হুগলীতে সেই সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে সরকারী দপ্তর উঠিয়া আসে। জব চার্ণকের সহিত মুসলমান কর্তৃপক্ষের বেশ সংঘর্ষও হইয়াছিল। উহাতেই তিনি কলিকাতায় আসেন।

ব্যবসায়ীরা— এইরূপে দেখা যায় যে, নদীর জলের জন্য বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াতের প্রতিবন্ধক হওয়াতেই কলিকাতার প্রাধান্য ও উহার ভবিষ্যত বিখ্যাত বন্দর হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। উহা কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের চেষ্টায় হয় নাই। পূর্বে কলিকাতা সরকার

* Vol V No 7 1909 July + Exhibition

++ " The Bengalee families which have been so closely associated with British Rule in India-the setts, the Bysacks the Mullicks, whose ancestor Rajaram of Triveni advised Chornock to transfer the company's factory from Hooghly to Sutanati " Sir Evan Cotton's some glimpses into forgotten India Bengal Part and Present XXIV

সাতগাঁর অধীন মহাল মাত্র ছিল ইহাই আইনি আকবরীতে আছে। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য হুগলী, চুচূড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, কলিকাতাদি বিদেশী বণিকগণের কুঠিতে আসিয়া পড়ে। তখন বিদেশীরা বাংলার বণিকগণের নিকট এদেশের ব্যবসা শিখিয়া তাহাদের জামিনে ও সর্বপ্রকার সাহায্যে ঐ সকল কুঠিতে ব্যবসা করিত। তখন এদেশের বণিকেরা উহাদের প্রতিদ্বন্দ্বি না হইয়া কেবল অর্থ সরবরাহকার ও বেণিয়ান স্বরূপ মধ্যস্থতায় কার্য করিতে আরম্ভ করে। সেই সূত্রেই খোজা সরহদ, পাঞ্জাবী হুজরীমল ও তাহার নিকট আত্মীয় উমিচাঁদ, সুবর্ণবণিক, তন্তুবায়গণ, ইংরাজ ও মুসলমান দরবারে প্রিয় হইয়াছিল। সেকালে ইউরোপের বণিকগণকে ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করিতেন, উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান পর্যন্ত করিতেন, সুতরাং যাহারা তাহাদের সহিত ব্যবসা কবিত ও সর্বদা যাতায়াত, একসঙ্গে বসিত, তাহারা তাহাদিগকেও ভাল বলিত না। উহাতেই সমাজে তাহাদের স্থান নিম্ন করিয়াছিল। ব্যবসায়ীরাও তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হয় নাই, কারণ তাহারা আপনার কর্মে ব্যতিব্যস্ত, তাহারা অলস ব্যক্তির ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিবার অবসর পাইত না। আরও ব্যবসায়ীরা তখন হয় জৈন, নয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। উহাতেও ব্রাহ্মণের বড়ই বিরক্ত; কারণ উহারা তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু অন্যান্য সকল জাতিই তখন তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও প্রভূত অর্থদান করিত। উহাতেই সুবর্ণ বণিকজাতির প্রতি ব্রাহ্মণগণের আক্রোশ পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিবাও উহাদের উপর সুবিচার করেন নাই। তখন সপ্তগ্রামেই বাণিজ্য ও সুবর্ণ বণিকগণের বাস ছিল। তাহাদিগকে অধম মুর্খ ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত এবং নিত্যানন্দ প্রভু যে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। + গৌড়ের ইতিহাসকার বলিয়াছেন যে শ্রীমন্নিত্যানন্দের বিবাহে উদ্ধাবণ দত্ত দশ সহস্র মুদ্রা দান দ্বারা বিবাহদি সম্পন্ন করান। সে সময়ে উদাসী নিত্যানন্দকে কেহই কন্যা দান করিতে প্রস্তুত হন নাই, কেবল সূর্যদাস সরখেল সেই অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া দুই কন্যা দান করিয়া সমাজের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এক কন্যা দান করিলে দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইবে। তখন ঘটকেরা সমাজের কর্তা। শ্রীমন্নিত্যানন্দের বংশধরেরা বীরভদ্রী দোষের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তখন নিত্যানন্দ সমাজকর্তা ছিলেন না। বণিকেরা তখন যে মূর্খ অধম ছিল না, উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উমাপতি ধর, উদ্ধারণাদি। বৈষ্ণব কবিরা ঐতিহাসিক ছিলেন না যে, তাঁহারা যাহা বলিবেন উহাই ধ্রুব সত্য। আর সেকালের কলিকাতার আদিম অধিবাসিরা প্রায় সকলেই সপ্তগ্রামবাসী ছিল, যেমন শেঠ, বসাক ও মল্লিকেরা। মল্লিকদের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা বাণিজ্য সূত্রে অধিক ঘনিষ্টতা থাকিলেও দেশের স্বাধীনতা লোপাদি সংক্রান্ত কোন সংস্রব নবকৃষ্ণাদির ন্যায় ছিল না। হুজরীমলের সম্পত্তির একজিকিউটার পূর্বোক্ত রাজারাম মল্লিকের প্রপৌত্র নিমাইচরণ মল্লিকের পুত্রেরা ছিলেন। তখন সেকালের নামজাদা বিদেশী পাঞ্জাবী বণিকগণের সহিত তাহাদের সৌহার্দ্য ছিল, অধিকন্তু তাঁহাদের উপর অন্যান্য বণিকগণেব কিরূপ বিশ্বাস ছিল উহাও ইহাতে সবিশেষ প্রমাণিত হয়। "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদবাক্য যাহার নামে গ্রথিত তিনিও সুবর্ণবণিক ও লক্ষ্মীকান্ত ধর যিনি ক্লাইবের অর্থ সরবরাহকার ও

+ বাংলার ইতিহাসেও সেই কথা। (২য় ভাগ ৩১২ পৃষ্ঠা)

নবকৃষ্ণের প্রভু ছিলেন। তিনিও উক্ত মল্লিকদের কুটুম্ব। উক্ত ধর মহাশয়ও কলিকাতার একজন আদিম অধিবাসী ও তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা শুকময়ই পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা হইতে পুরীধাম পর্যন্ত রাস্তা ও দুই ধারে আম্রবৃক্ষ জলাশয়াদি করিয়া শ্রীশ্রীঁজগন্নাথদেবের তীর্থযাত্রীগণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা করিয়াছিলেন। মাহেশ ও বল্লভপুরের জগন্নাথ ও বল্লভজীউর মন্দির কুঞ্জবাটী আদি ও কাঁচড়াপাড়ার মন্দির ও চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যার মন্দিরাদি সমস্তই উক্ত কলিকাতার সুবর্ণ বণিক মল্লিকদের স্থাপিত; এতদ্ভিন্ন সেই মল্লিকেরা পুরীর পূর্বোক্ত জগন্নাথের ভোজন ঘর নির্মাণ প্রস্তুতের মন্দির সংস্কারাদি সৎকর্ম করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালের নিয়মানুসারে তাহারা মল্লিক উপাধি ও জায়গীর লাভ করিয়া সেই দেব উপাধি ত্যাগ ও সেইরূপ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পূর্বপুরুষ শীল উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন। উঁহারা রাঢ়ী, শেষে সপ্তগ্রামে বাস করিয়া রাঢ়ী হইতে সপ্তগ্রামী হন। ইঁহারা পূর্বোক্ত মল্লিকগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ। তাঁহার কলিকাতার মার্বেল প্রসাদ বিখ্যাত। সুবর্ণবণিক মল্লিকদের অট্টালিকায় কলিকাতা পরিপূর্ণ ও সুন্দর হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরা ঐ সকল মুসলমান উপাধি মণ্ডিত হইলে মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। সেইজন্যই তখন জাতিগত উপাধি ত্যাগ করিয়া উহাতেই পরিচিত হইত।

চীন পরিব্রাজকের সময় সপ্তগ্রাম বন্দর ছিল না, বা উহার উন্নতির কোন কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই, কেবল তাম্রলিপ্তের কথাই বলিয়াছিলেন। * ইংরাজ বণিকেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার পূর্বেই উড়িষ্যায় আসিয়াছিল। উড়িষ্যার সহিত বাংলার সম্বন্ধ বহুদিন হইতে বর্তমান। রাজা মুকুন্দদেব মুসলমানগণের নিকট হইতে সপ্তগ্রাম উদ্ধার করিয়া ত্রিবেণীতে ঘাট মন্দির ও পোস্তা এবং মগরা হইতে ত্রিবেণী পর্যন্ত রাস্তা করিয়াছিলেন। ষড়ঙ্গদেব ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি আপনাকে গাঙ্গ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য ঐ বংশের সকলেই ঐ বিশেষণ দ্বারা পরিচিত। রাজা রাজ্যবর্ধনকে কর্ণ সুবর্ণের রাজা চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিলে রাজা হর্ষবর্ধন কান্যকুব্জে শিলাদিত্য নামে সিংহাসনারোহণ ও ভ্রাতৃহন্তাকে পরাজিত করিয়া + উহার রাজ্যাধিকার করেন। উহাদের উপাধি দেব ও উহারা শৈব ++ ও শাক্ত ছিলেন; ইহা তাঁহার তাম্রশাসন ও হর্যচরিত হইতে জানিতে পারা যায়। উহাতে আরও আছে যে, হর্ষবর্ধনের মাতা পুত্রের অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া সহমৃতা হন ও তাঁহার ভগ্নী ঐরূপ চিতারোহণ করিবার সময় তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পক্ষপাতী হন। প্রবাদ যে, রাজ্যবর্ধনের স্ত্রী ত্রিবেণীতে সহমৃতা হইয়া বংশমর্যাদা রক্ষা করেন ও সেই সময় তাঁহার পুত্র ও কুলদেবী শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। উহারাই সপ্তগ্রামের উন্নতি করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে পৌণ্ড্রবাসের কথা আছে।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে রোমবাসিরা বাঙালীকে ''গাঙ্গে রাইডিস'' ও সপ্তগ্রামকে ''গাঙ্গেস রিজিয়া'' বলিয়া আসিতেছেন ও ষ্টারলিং সাহেবের উড়িষ্যার ইতিহাসে ১১৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা উড়িষ্যা জয় করেন নাই

গ ক্রোড়পত্রে উহার বিবরণ দেওয়া হইল।

গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠা। ++ গৌড় রাজলেখমালা।

এবং গঙ্গেশ্বর দেব ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনারোহণ করেন। তিনিই শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দির পুরীতে নির্মাণ ও তাঁহার বংশধর অনঙ্গ ভীমদেব উহার সৌন্দর্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করেন। ১৫৫০ হইতে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন ও অনঙ্গ ভীমদেবের গৌড়েশ্বর উপাধি তাঁহার মুদ্রা ও মোহরে ছিল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকার ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ম খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় খজুবহো তাম্রলিপি (৪নং) হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ধনদেব নামে এক রাজা রাজত্ব করিত। ইহাতেই অনুমান হয় যে, উহারা রাজ্যবর্ধনের কোন এক বংশধর উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেন, কারণ গৌড়ের ইতিহাসকার বলিয়াছেন, যে, শৈলবংশতিলক শ্রীবর্ধন নামক নরপতির সৌবর্ধন নামক পুত্রের তিন পুত্র ছিল। উহাদের মধ্যে এক শৌর্যান্বিত পুত্র পৌণ্ড্রাধিপকে নিহত করিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যাধিকার করেন। সুবর্ণরেখা নদীতে সুবর্ণ লাভ হইত ও উহা লইয়া যাহারা বাণিজ্য করিত তাহাদিগকে সুবর্ণ বণিক ও বাংলার নাম সোনার বাংলা করা হইয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, বৈশ্য রাজার রাজত্ব নষ্ট হইলে তাহাদের বংশধরগণ বাংলায় বাণিজ্যারম্ভ করিয়াছিল ও সেইজন্য ভূরিশ্রেষ্ঠিক নগরের উল্লেখ প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে ২য় অধ্যায় ২৮এর পৃষ্ঠায় আছে। উহা বুন্দেলখণ্ডের রাজা কৃর্তিবর্ধনের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণ মিশ্রের প্রণীত। গৌড়ের ইতিহাসকার ঐ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন * —" ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম ভূরিশ্রেষ্ঠি রাজত্বের অন্তর্গত ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। অনেক ধনশালী বণিক ঐ রাজ্যে বাস করিত বলিয়া সেই রাজ্যের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠি হয়।"

"বর্তমান হুগলী জেলার আমতা গ্রামের নিকট পেঁড়ো বসন্তপুর হইতে ঐ জেলার আমতা পেঁড়ো পর্যন্ত ভূরিশ্রেষ্ঠি রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। উহা বৌদ্ধ রাজত্বকালে স্থাপিত।"

গৌড়— ইহাতেই স্পষ্টই দেখা যায় যে, বাণিজ্যের জন্যই বাংলার বন্দরগুলি ব্যবসায়ীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে একজন কর্নাটের সামন্ত রাজা কর্ণাটাধিপতির কোপে পতিত হইয়া নবদ্বীপে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনিই বাঙালীর সেনবংশীয় বাজাগণের আদিপুরুষ ছিলেন। প্রাচীন পুরাণাদিতে গৌড়ের নামোৎপত্তি মান্ধাতাব দৌহিত্র গৌড় হইতে হইয়াছিল উল্লিখিত আছে। যাহাই হউক হর্ষচরিতে আছে যে, রাজা গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্ধনকে বলিতেছেন মহাদেবীর গৃহের গূঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া মহাদেবীর ভ্রাতা + বীরসেন স্ত্রী বিশ্বাসী কলিঙ্গ রাজ্যের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। বীরসেনের বংশজাত সামন্ত সেন; তিনি তখন অর্ন্তবিদ্রোহে উত্যক্ত হইয়া কর্ণাট ত্যাগ করিয়াছিলেন। উমাপতি ধরের প্রশস্তিতে সামন্তসেন গঙ্গাপুলিনে পুণ্যস্রোতে বাস করেন ও তিনিই নবদ্বীপের পত্তন করেন। হেমন্ত সেন তাঁহার পুত্র সুবর্ণরেখা তীরে কাশী, পুরীতে রাজত্ব করিতেন ইহা কুলজী গ্রন্থকার বলিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায় যে, পলাতক রাজপুত্রগণ দ্বারা বাংলার বন্দর ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইত, বিদেশী বণিকগণের শুভাগমনে সেই সকল স্থানের প্রাধান্য হ্রাস হইয়া শ্রীরামপুর, হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও কলিকাতা আদি ক্রমে ক্রমে প্রতিপত্তিশালী বন্দর বলিয়া ইউরোপবাসিরা পরিচিত করিয়াছিল।

হুগলী — ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজেরা হুগলীতে আগমন ও ঐখানে কুঠি আদি প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট আকবর উহা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ডাক্তার বৌটন সাহ সুজা, সম্রাট

* ১ম খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠা। ঐ ১৫৬ পৃষ্ঠা।

সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্রের কন্যার রোগ শান্তি করিয়া ইংরাজের ঐখানে ও বাংলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঐখানে ইংরাজেরা কুঠি করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। ইহার পূর্বেই ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের আধিপত্য শেষ হইয়া সেইখানে মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাব হয়। সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় মুসলমান রাজত্বের সরকারী দপ্তর হুগলীতে উঠিয়া আসে। জব চার্ণকই ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমণ করেন।

চুঁচুড়া — ওলন্দাজগণের কুঠি চুঁচুড়ায় ছিল, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা চুঁচুড়ার সহিত সুমাত্রা দ্বীপের বিনিময় করেন। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐখানে কুঠি করিয়া ওলন্দাজগণ ব্যবসা করিত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উহা ইংরাজের দখলে আসে ও ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা উহা তাহাদিগকে সন্ধিশর্তে প্রত্যার্পণ করেন।

শ্রীরামপুর— দিনেমারেরা ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে কুঠি করিয়াছিল ও উহার নাম ফেডারিক নগর দিয়াছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা দিনেমারগণের নিকট শ্রীরামপুরাদি তাহাদের যাবতীয় এতদ্দেশীয় অধিকার সাড়ে বার লক্ষ টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন।

চন্দননগর— ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিরা ঐ স্থানে আসে ও ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃত প্রস্তাবে সেইখানে বাণিজ্যারম্ভ করে। উহার প্রকৃত উন্নতি ডুপ্লের শাসনকালে ১৭৩১-৪১ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। এডমিরাল ওয়াটসন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর আক্রমণ করিয়া উহার দুর্গাদি ও দুই সহস্র অট্টালিকা ভূষিত নগর একেবারে ধূলিসাৎ করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে উহা ফরাসিরা পুনরায় লাভ করেন। পুনরায় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ পর্যন্ত এবং ১৮০২ হইতে ১৮১৫ পর্যন্ত উহা ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সন্ধির শর্তানুসারে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এখন পর্যন্ত উহা ফরাসির অধিকারভুক্ত আছে।

দিল্লির মনোনয়ন —১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘলক যখন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখনই বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শেরসাহ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রথম বাংলার স্বাধীনতা লোপ করেন। শেষে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণরেখার নিকট মোগলমারীর যুদ্ধে দাউদ পরাস্ত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করে। সেই সময় হইতে দিল্লীর সম্রাট বাংলার শাসনকর্তা মনোনীত করিতেন। উহা আলিবর্দি খাঁ পর্যন্ত একরকম হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলার নামে দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে বাংলার নবাবী সনন্দ আসে নাই। ইহার জন্যই সিরাজউদ্দৌলা জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। সেকালে জগৎশেঠেরাই অর্থ দ্বারা বাংলার নবাবী সনন্দ আনাইত। সিরাজউদ্দৌলা গুপ্তচরগণ দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন যে, জগৎশেঠেরা ঐ সনন্দ শওকতজঙ্গের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে ইংরাজের সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করিতেছিলেন। উহাতেই নবাব ক্রোধে স্বহস্তে তাহাকে শাস্তিদান করিয়াছিলেন। আলিবর্দি-পত্নীর অনুগ্রহে জগৎশেঠ কারাগার হইতে মুক্ত হইযা সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত দিবারাত্র নানার্থ ব্যয় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া, শেষে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। সরফরাজখাঁর সময় হইতে জগৎশেঠেরা এইরূপ ব্যবসায় বাংলার নবাব আলিবর্দিকে করিয়াছিল, উহা শেষে কলিকাতার সন্ধিপত্রে ও ষড়যন্ত্রে হইয়াছিল। অতএব ইংরাজের কলিকাতার দরবার

দিল্লীর দরবার অপেক্ষা কোনাংশে ন্যূন নহে, বরং উচ্চ হইয়াছিল। পলাশী যুদ্ধের এই পরিণাম হইয়াছিল। ইংরাজেরা মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাইল ও মীরণ সিরাজউদ্দৌলাকে পশুর ন্যায় অন্যায়রূপে হত্যা করিল। উহার জন্য কোথাও কোন বাক-বিতণ্ডা পর্যন্তও হইল না। ইহাতে তখন দিল্লীর সিংহাসন শূন্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেকালের বাংলায় যত কিছু ব্যবসা ছিল উহার মধ্যে এই এক নূতন প্রধান ব্যবসার সৃষ্টিকর্তা জগৎশেঠ। উহা তাহাদের নিকট হইতে ইংরাজেরা শিক্ষা করে। বাংলায় বহুকাল হইতে ক্রীতদাসের ব্যবসা চলিতেছিল, উহাতেই বোধহয়, দেশবাসিরা দাসত্বের পক্ষপাতী হইয়াছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য! যাহারা দাসত্ব করিত, তাহারা স্বাধীন নবাব জমিদার হইবার জন্য ব্যস্ত হইত। কারণ মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরস্তা, গোলাম হোসেন প্রমুখ সকলেই বলিয়াছেন যে, বাংলায় পিতার সিংহাসন পুত্রের হইত না, যেই প্রভু হত্যা করিত, সেই উহা লাভ করিত। যে কেহ হউক বিশ্বাসঘাতকতায় সিংহাসনাধিকার করিলে তখন কেহ উহার কোন প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। ফারিয়া ইসুজা পর্তুগীজ ইতিহাসকার সেই কথাই বলিয়াছেন।

বহুকাল হইতে বাংলার এইরূপ দুরবস্থায় বিদেশী ইউরোপীয় বণিকগণ বিশেষ কোন যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়াই বাংলার নদীতীরের স্থান সকল দখল করিয়াছিল। বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়, আর ক্লাইবের পলাশী যুদ্ধ জয়, উভয়ের মধ্যে বিশেষ তারতম্য বর্তমান আছে। **বাণিজ্য দ্বারা বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ও শেষে সর্বনাশ হইয়াছিল**। ক্রমে ক্রমে বাংলায় সাধারণ বাণিজ্য ব্যবসা অপেক্ষা অর্থ দান দ্বারা রাজ্যলাভ ও বিনিময় ব্যবসা ইংরাজ বণিকগণ আরম্ভ করিয়াছিল। শেষে যখন অর্থলাভ হইবার উপায় ছিল না, তখনই ঈশপের গল্পে বানর যেরূপ বিড়ালের বিবাদভঞ্জন ছলে ননীর ভাগ স্বরূপ এদেশের রাজ্য অর্থাদি সমস্তই ইংরাজ বণিকগণ উদরস্থ করিয়াছিল। মূর্খ ক্ষুধার্ত বিড়ালের ন্যায় এদেশের নবাব রাজারা সর্বশান্ত হইয়াছিল। জগৎশেঠ ও উমিচাঁদের সংক্ষেপ পরিচয় আবশ্যক, কারণ উহা না করিলে বাংলার অধোগতি কিরূপ হইয়াছিল, উহা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে না।

জগৎশেঠ — তখন দেশবাসির এমন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না যে, তাহারা দেশাধিপতির গুণাগুণ বিচার চিন্তা বা দেশের ও দশের মঙ্গলাদির জন্য প্রকাশ্যে একত্রিত হইতে পারিত, বা তাহার বাদানুবাদ করিয়া কাহারও পক্ষপাতী হইত। উহাতেই জগৎশেঠ ক্রমে ক্রমে বাংলার নবাবের পদচ্যুতি ও মুকুটদানের সর্বময় কর্তা হইয়াছিল। ইহারা মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই প্রবল হইয়া উঠে ও সম্রাট মহম্মদ বা ফতেচাঁদকে মুর্শিদকুলীর স্থলে বাংলার শাসনকর্তার পদ প্রদান করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি উহা লইতে অস্বীকৃত হন। তখন ধূর্ত সম্রাট প্রীত হইয়া তাঁহাকে জগৎশেঠ নামাঙ্কিত উজ্জ্বলরত্ন প্রদান করেন। সেই হইতেই উহারা সর্বত্র ঐ উপাধিতে পরিচিত। সরফরাজ ইঁহার দুহিতাকে প্রাসাদে আনাইয়া উহার অসামান্য রূপের লাবণ্য ও সৌন্দর্য দর্শন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহাতেই ফতেচাঁদ আলিবর্দির সহিত চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বাংলার নবাব করিয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ইংরাজদের কুঠি আক্রমণ করিলে, উহারা জগৎশেঠের নিকট হইতে বার লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই নবাবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সেই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ

করিয়াছিলেন। তখন হইতে জগৎশেঠের সহিত ইংরাজদের ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত ইহাদের বাড়ি লুঠ ও উহাদিগকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া আড়াই কোটি টাকার সম্পত্তি অপহরণ করিলে নবাব উহা রক্ষা বা উদ্ধার করিতে না পারায়, এদেশের অধিপতি ইংরাজেরা হইলে তাহাদের উপর ঐরূপ অত্যাচার হইবে না এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া জগৎশেঠেরা উহাদের পক্ষপাতী হইয়াছিল। মীরজাফর ক্লাইবের অনুগত ভক্ত, **আর জগৎশেঠ বাংলার কামধেনু**। ক্লাইব সেইজন্যই মীরজাফরকে নবাবের সিংহাসনে বসাইয়াই সার উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যেন তিনি কোন মতে জগৎশেঠের বন্ধুত্ব লাভ হইতে বঞ্চিত হন না।

* পলাশী যুদ্ধের পূর্বে ক্লাইব বর্দ্ধমানের জমিদার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা করিতে সম্মত হন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পলাশী যুদ্ধের উদ্যোগ পর্বের প্রধান নেতা বলিলে দোষ হয় না। তিনি যখন কলিকাতায় শ্রীশ্রী ঁ কালীমাতাকে দর্শন করিতে আসিতেন তখন সেখানকার ইংরাজ উচ্চ কর্মচারিগণের সহিত সদালাপ ও সৌজন্য বিনিময় করিতেন। সেইজন্য সেকালের জমিদারের মর্যদানুযায়ী আশা, শোটা, হাতি, ঘোড়া, পাল্কী, সিপাহী আদি সঙ্গে করিয়া আসিতেন। তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য যে, দেবী দর্শন নয়, একথা বড়িষার জমিদার সন্তোষ রায় উপহাসচ্ছলে ইঙ্গিত করিতে ছাড়িতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে দেবী আর তোমার ও বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিবেন না। ইনি যে বিশেষ কিছু উপকার, কি কলিকাতাধিকার, বা কি পলাশী যুদ্ধের সময় করিয়াছিলেন ইহাতে আজ পর্যন্ত সেকালের কোম্পানীর পুরাতন কাগজে প্রকাশ হয় নাই; তবে তিনি যে একজন কোম্পানীর রাজত্বের পক্ষপাতী ও উত্তরসাধক মহাপুরুষ ছিলেন, ইহাই পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইবের পুরস্কারে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। উহার জীবন চরিত লেখকেরা অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু উহার উপর ততদূর নির্ভর করা যায় না। এইরূপ নবকৃষ্ণের বংশধর মহামান্য রাজা বাধাকান্ত দেবও কলিকাতাধিকারে হিন্দুগণ ইংরাজের পক্ষপাতী ও নবকৃষ্ণ তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন কলিকাতায় তাঁহার এক সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন। উহা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্টের ইংলিশম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে উঁহার উক্তির সমর্থনের কাগজ পত্র তাঁহার নিকট আছে, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় ঐ বংশের রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতা বিষয়ক যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন উহাতে সেই পৈত্রিক কাগজপত্রের কোন সন্ধানই নাই। যাহাই হউক, নবকৃষ্ণের বংশধর শব্দকল্পদ্রুম অভিধানকার রাজার কথা ঐতিহাসিক হিসাবে উহার কোন মূল্য না থাকিলেও তাঁহার পূর্ব পুরুষের উন্নতি কিসে হইয়াছিল যাহা শুনিয়াছেন বা জানিয়াছেন উহার সারমর্ম প্রকাশ করা কর্তব্য ঃ—১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে বাংলা ও বিহার প্রদেশের সমূদয় সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেকালের একজন বৈদ্যকুলোদ্ভব বিশিষ্ট ব্যক্তি বাজা রাজবল্লভ + নবাবের

রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকেই পাঠাইবার কথা ইতিহাসে আছে। নবকৃষ্ণের এই মুন্সিগিবির কথা কোথাও নাই। অন্ধকূপ হত্যার কথা আছে অথচ কলিকাতা দগ্ধ ও উহা অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কিছুই নাই। এই অপ্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করিবার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য যে ছিল না ইহা বলা যায় না।

অত্যাচারে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসেন। নবাব কলিকাতার তৎকালীন গভর্নর ড্রেক সাহেবকে উক্ত রাজাকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার জন্য আজ্ঞাপত্র পরোয়ানা দ্বারা জারি করান। তিনি উহা অমান্য করিলে পূর্বে যেরূপ ইংরাজদিগকে কলিকাতা হইতে বহিস্কৃত ও উহা লুঠ করা হইয়াছিল, সেইরূপ করা হইবে উহাও স্মরণ করাইয়া এক দ্বিতীয় পরোয়ানা জারি করা হয়। সেই পরোয়ানা প্রাপ্ত হইয়া ড্রেক সাহেব অত্যন্ত ভীত হইলে, উক্ত রাজা রাজবল্লভ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, নবাবের উপর সর্দারগণ এরূপ অসন্তুষ্ট যে তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্রধারণ করিবে না। তাহার সেই কথায় ড্রেক সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রাজা রাজবল্লভ নবাবের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্মচারীগণের দ্বারা ড্রেক সাহেবের নামে একখানি গুপ্ত পত্র পার্শিতে যাহাতে আসে, উহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং উহার মর্ম অবগত হইয়া যাহাতে তাঁহারা উত্তর দেন এরূপ মুন্সির আবশ্যক হয়। তিনি যাহাতে মুসলমান মুন্সী কাজিউদ্দিনের সাহায্য গ্রহণ না করেন তজ্জন্যও বিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ কার্য সুচারুরূপে হিন্দু মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল ও তিনি সেইজন্যই সমসাময়িক ইতিহাসে মুন্সী নবকৃষ্ণ নামে পরিচিত। পরে তিনি কোম্পানীর স্বপক্ষে একাধিক দৌত্য ও অন্যান্য রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ প্রতিভার পরিচয় দান ও কোম্পানীর বিশেষ বিশ্বাস ভাজন হইয়া পড়েন। উহার অনতিকাল মধ্যেই সিরাজউদ্দৌলা যখন বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া কলিকাতাক্রমণ করেন তখন ড্রেক তাহার কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত মাদ্রাজে পলায়ন করেন। অন্ধকূপ হত্যার নাটক সমাপনান্তে সিরাজউদ্দৌলা রাজ মানিকচাঁদকে কলিকাতার গভর্নর করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। উহার কয়েক মাস পরেই ক্লাইবের অধীনে ড্রেক এক বিশাল বাহিনী সমভিব্যাহারে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। সিরাজের সৈন্যগণ সর্দারগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ায় উহারা ক্লাইবের নিকট পরাজিত হয়। এইরূপে বজবজের দুর্গ ইংরাজেরা হস্তগত করিয়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে কলিকাতাধিকার করে। উহাতে হিন্দু জনসাধারণ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল।

পলাশি যুদ্ধ— রবার্ট ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধ বৃত্তান্ত মাদ্রাজে যে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন সেই মূল পত্রখানি 'খ' ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত করা হইল। উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজ বণিকাভ্যুদয়ের কথা শেষ করা উচিত।

ফরাসি সেনাগণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে মাসিক দশ হাজার বেতনে কার্য করিত ও বুসিকে পাটনা হইতে আগমণ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল। নবাবের মূল উদ্দেশ্য ইংরাজের মুলোৎপাটন করা ও সেইজন্যই তিনি সন্ধির শর্তানুসারে কার্য করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। বিশ্বাসযোগ্য চিঠির নকল দেখিয়া এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছি। আরও মীরজাফর প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ যাহারা রাজ্য মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রস্তাব পরামর্শাদি চলিতেছিল। এক গুপ্ত সন্ধি দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে প্রধানকে নবাব কবিব স্থির করিয়া এক হাজার ইংরাজ সৈন্য ও দুই হাজার সিপাই আটটি কামান লইয়া ১৩ই জুন চন্দননগর হইতে যাত্রা করে ও যথা সময়ে উহারা পাটনা ২২এ বিনা বাধায়

অধিকার করে। উহারা রাত্রে নদী পার হইয়া পলাশীতে একটার সময় পৌঁছে প্রাতঃকালে দেখিতে পায় যে, নবাবের পনর শত অশ্বারোহী, পঁয়ত্রিশ হাজার সিপাই, চল্লিশের অধিক কামান লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আগমন করিতেছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই ছটার সময় হইতে তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ অতি গুরুতরভাবে করিতে আরম্ভ হইলে, উহাতে কয়েক ঘন্টা ধরিয়া উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে থাকে। তাহারা স্থানের মাহাত্ম্যে রক্ষা পাইয়াছিল তখন মাটির টিপির আড়ালে বসিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন উপায় ছিল না, কারণ তখন গোলাগুলি ছুড়িয়া উহা জয় করিবার অবসর হয় নাই। উহারা রাত্রে অবসরক্রমে আক্রমণ করিবে এই স্থির করিয়া বসিয়াছিল। বেলা দুই প্রহরের সময় নবাবের গোলন্দাজেরা সরিয়া গেলে তাহারা যেমন পুষ্করিণীর উপরস্থ উচ্চ স্থান দিয়া গিয়া উপস্থিত হয় অমনি তখনই ফরাসিগণ তাহাদের উপর আবার গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে কিন্তু যখন উহা কার্যকরী হইতেছে না দেখে তখনই তাহারা আর দুই একটি উচ্চস্থান অধিকার করে ও সেইখান হইতে তাহাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ করিয়া দিবার সুযোগ হয়। তাহাদের কামান আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, তখন কেবল তাহারা বন্দুক ছুড়িতে ছিল মাত্র। অনন্তর ইংরাজের কামানের গোলায় তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেছিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ সেই সময় অগ্রসর হইতে গিয়া নষ্ট হইয়া যায় সেই সঙ্গে চার পাঁচজন সৈন্যাধ্যক্ষ মারা যাওয়ায় সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়ে ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অমনি সেই সময় তাহাদের উচ্চস্থান দখল করা হয়। ঐ সময় ঐ স্থান চল্লিশ জন ফরাসি দুইটি কামান দ্বারা সৈন্য সামন্ত লইয়া রক্ষা করিয়াছিল। ঐ স্থান দখলের সময় ইংরাজ পক্ষের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। সেই সময়েই সৈন্যগণ পলায়ন করে ও ইংরাজ সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ ছয় মাইল পর্যন্ত গিয়া চল্লিশের অধিক পরিত্যক্ত কামান ও রাস্তার ধারে ত্যক্ত সর্বপ্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম লাভ করে। বিপক্ষ পক্ষের ৫০০ জন ব্যক্তি মারা যায় অনুমান করি ও ইংরাজ পক্ষে কুড়িজন হত ও পঞ্চাশ জন আহত ও উহাদের মধ্যে অধিকাংশই কালা ব্যক্তি ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরাজের দক্ষিণ দিকের সৈন্যগণ কেবলমাত্র দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা ইংবাজের বন্ধু স্বরূপ অবস্থিত কিন্তু তাহারা সেইরূপ কোন সঙ্কেত না করায় ইংরাজেরা তাহাদিগকে গোলাবর্ষণ করিয়া সরাইয়া দিয়াছিল। যুদ্ধের শেষে তাহারা ইংরাজদিগকে প্রশংসাভিবাদন করিয়াছিল ও তাহাদের পাশেই রাত্রি যাপন করে। সিরাজউদ্দৌলা উষ্ট্রপৃষ্ঠে পলায়ন করে ও প্রাতঃকালে মধ্যরাত্রে নগরে পৌঁছিয়া সেখান হইতে সুবিধামত ধন রত্নাদি চার পাঁচজন লোকের দ্বারা লইয়া যান। জাফর আলি খাঁ ইংরাজদের নিকট আসিয়া স্তুতিবাদ ও সন্ধি সর্ত রক্ষা করিবে বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি নবাবের পলায়ন করিবার ঘন্টা কয়েক অগ্রে শহরে পৌঁছিয়া ছিলেন। নবাবের পলায়নের পর জাফর আলি নির্বিবাদে প্রাসাদ ও নগর অধিকার করে। ক্লাইব গোলমাল দূর করিবার জন্য প্রথমে মণ্ডিপুরে ও পরে সৈয়াবাদে যেখানে ফরাসিদের কুঠি ছিল সেইখানে গিয়াছিল। ক্লাইব ২৯এ জুন শহরে দুই শত ইংরাজ ও তিন শত সিপাই লইয়া প্রবেশ করেন এবং প্রাসাদের নিকট একটি বিস্তৃত বাগান বাড়িতে থাকেন। সেইদিনই তিনি জাফর আলির সহিত দেখা করেন। জাফর নবাবের সিংহাসনে উপবেশন কবিতে অসম্মত হইলে, ক্লাইবই তাহাকে

সেইখানে বসাইলেন তখন সকলে তাহাকে যথারীতি নবাব বলিয়া অভিবাদনাদি করে। পরদিন প্রাতে তিনি ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন ক্লাইব তাঁহাকে জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কার্য করিতে অনুরোধ করেন; কারণ তাঁহারই সর্বাপেক্ষা রাজ্যের মধ্যে অধিক সম্পত্তি, তাঁহার ন্যায় শান্তি ও নির্বিঘ্নতার পক্ষপাতী তখন আর কেহই হইতে পারে না। তদনন্তর ক্লাইব ও জাফরের সম্মতিক্রমে উভয়েই জগৎশেঠের সহিত দেখা ও তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুতাবন্ধন ও জগৎশেঠ নবাবের সনন্দ দিল্লি হইতে আনয়ন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিবেন স্বীকার করেন। সেই সম্মিলনে বাংলার নবাবী পদ অভ্যুদয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হইয়াছিল প্রকাশ হয়।

জগৎশেঠের সহিত ক্লাইবের বন্ধুত্বের ও সম্মিলনের উদ্দেশ্যও সেই পত্রে এইরূপ আছে ঃ— নবাবের সিপাইগণের বেতন পুরস্কারাদি দিবার মত ধনই নবাবের ধনাগার হইতে পাওয়া যাইবে ও উহা সর্ব প্রথমেই দেওয়া উচিত। আর ইংরাজগণের কি পাওয়া উচিত উহা স্থির করিবার ভার জগৎশেঠের উপর অর্পণ করা হয়। তিনি উভয় পক্ষের পরম বন্ধু। তাঁহার মীমাংসানুসারে ইংরাজদের যাহা প্রাপ্য ধার্য হইবে উহার অর্ধাংশ তখনই দশ আনা নগদ টাকায় ও ছয় আনা জহরত সোনাদি নানা প্রকারে দেওয়া হইবে, আর অপর অর্ধাংশ তিন বৎসরে বার্ষিক সমানাংশে দেওয়া হইবে স্থির হয়। ইহাতেই জগৎশেঠের সহিত ক্লাইবের ও মীরজাফরের সম্মিলন কিসের জন্য পলাশী যুদ্ধের পরই আবশ্যক হয় উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ন্যায়পরায়ণ পারকার সাহেব ভারতবর্ষের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, **ইংরাজেরা ন্যায়ের জন্য কোন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কেবল অর্থই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল**। তখন প্রাচ্য জগতের কার্যে ধর্মানুশাসন রক্ষা করা হয় নাই, বরং রাজ্যলাভেচ্ছায় উহার প্রতি কেহ কোন ভ্রূক্ষেপ করে নাই। ঐ পত্রের শেষে সিরাজউদ্দৌলাকে যেরূপ দুর্দশাগ্রস্থাবস্থায় ধৃত ও কেন হত্যা করা হয় উহার উল্লেখ আছে।

২রা জুলাই রাত্রে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নগরে আনয়ন করিয়া তাহাকে সত্বর যমসদনে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কারণ উহাকে যখন ধৃত করা হয়, তখন ফরাসি সেনাপতি লা তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া তিন ঘন্টার দূর পথে ব্যবস্থিত এবং সেই ধৃত নবাব আগমন করিলে তাঁহার সৈন্যাধাক্ষগণ তাঁহার পত্রে উৎসাহিত হইযা গোলমাল আরম্ভ করে; উহাতেই তখন উহাকে হত্যা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

রিয়াজ গ্রন্থে জগৎশেঠ ও ইংরাজদের উত্তেজনায় সিরাজের হত্যা হইয়াছিল উল্লেখ আছে। তখনকার ইংরাজ কর্মচারিগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও হিসাব জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তাহাদের সৌভাগ্যোদয়ের কথা শেষ কারা উচিত। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারির মন্তব্যে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের দুঃখ উল্লেখ আছে যে, হিসাবের ভুলে ও জঘন্য লেখায়, কি বড়, কি ছোট, সকল কর্মচারীর কর্মের গাফিলতিতে তাঁহাবা বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন। হলওয়েল ও মানিংহাম সাহেবের বিরুদ্ধে কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রায় দান করিয়া পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা লাভ করার অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাজা রাধাকান্ত দেব যে রাজা রাজবল্লভ কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি পূর্বোক্ত যাহা বলিয়াছিলেন উহা সত্য হইতে

পারে না।

মুসলমান ইতিহাসকার রিয়াজ উক্ত রাজার কথার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, মীরমদন প্রভৃতি সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসী হিন্দু কর্মচারীরা মীরজাফরের জীবননাশ করিবার সৎপরামর্শদান করিয়াছিল, কিন্তু মীরজাফরের চক্রান্তে নবাব তদনুসারে কার্য না করিয়াই রাজ্য ও প্রাণ উভয়ই হারাইয়াছিলেন। তাঁহার হত্যা ব্যতিরেকে মীরজাফরের সিংহাসন নিরাপদ নয় বলিয়াই উহা তখন করা হইয়াছিল, উহাই ক্লাইবের পত্রে পরিষ্কার রহিয়াছে। এরূপ প্রমাণ সত্ত্বে কেমন করিয়া সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যাচারী ও তাহার উপর হিন্দু বা অন্যান্য সকলেই বিরক্ত ছিল একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায়। তাহার পলায়নের পর তাঁহাকে যখন রাত্রে রাজধানীতে বন্দি করিয়া আনয়ন করা হয়, তখন ও যে সৈন্যাধিপতিগণের মধ্যে বিলক্ষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল উহা কি তাঁহার অধীন সৈন্যাধিপতিগণের রাজভক্তির চিহ্ন স্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে না? যাহাই হউক, বাংলায় সে সময় বিলাতের ইংরাজবণিকগণ ব্যবসা করিয়া বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারে নাই, তবে কলে-কৌশলে তাহাদের কর্মচারীরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই এদেশের কতকগুলি অকর্মণ্য উচ্চাভিলাষী লোকদিগকে নবাব বাদশা করিয়া প্রভূতার্থ লাভ ও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছিলেন। ক্লাইব প্রমুখ ইংরাজ কর্মচারী ও যোদ্ধৃগণ উহা ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই। সেই পূর্বাপর অনুসৃত পথাবলম্বন করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর সৌভাগ্যোদয় ও সকলের নিকট আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করিতেছিল। সেই রহস্য ইতিহাসকারগণ প্রহেলিকাময় করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সত্য আবিষ্কার হইয়া থাকে। তখন বিলাতের স্বত্বাধিকারীরা তাহাদের টাকার উপর শতকরা বার্ষিক আট দশ টাকার হারে সুদ ভোগ করিয়া নীরব ও সন্তুষ্ট ছিল উহাও নিশ্চয়ই কৌতুকাবহ ব্যাপার বলিতে হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পলাশী যুদ্ধের ফল

অভিশাপ — প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তনশীল, কিন্তু হায়! ভারতবর্ষের ভাগ্যে যে সকল পরিবর্তন মুসলমান রাজত্বের পূর্বে বা পর হইতে হইতেছিল, উহাতে ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভ হইল না; উহাতেই উহাকে বিধাতার অভিশাপ বলিতে হয়। যাঁহারা উহার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই নিগৃহীত ভিন্ন, কেহই কৃতকার্য হন নাই। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিদেশী বিধর্মীর অত্যাচারে হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ— দিল্লীতে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ আটান্ন দিন রাজত্ব করিয়া অসংখ্য নর-নারী হত্যা ও নূন্যকল্পে চারি কোটি টাকার ধন রত্নাপহরণ লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। তখন হত্যা, লুণ্ঠন, পলায়ন ও বিদ্রোহ এদেশের সর্বত্রই হইতেছিল। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে মহীশূরের রাজার অবস্থা অতীব শোচনীয় উহাতেই হায়দার আলির অভ্যুদয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিল। সেই দেশের রাজার শ্বশুর প্রকাশ্য সভায় জামাতার বন্ধুবর্গের নাসিকা কর্ণ ছেদন করিয়াছিল এবং আর পলাশী যুদ্ধের পরিণামে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল। জগতে মানবের ভাগ্য পরিবর্তনশীল; কিন্তু বাংলার রাজ্য সম্পদ বা সৌভাগ্য যেন বার বিলাসিনী নর্তকীর ন্যায় কাহারও নিকট কখন চিরস্থায়ী হয় নাই। উহাই সেকালের বাংলার রাজত্বে বিধাতার অভিশাপ, বা মুসলমান রাজত্বের বিষময় ফল। প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই কোম্পানীর অভ্যুদয়ের মূল কারণ হইয়াছিল।

বিজয়য়োৎসব— শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বিভীষণের সাহায্যে দশাননের বধ ও বংশলোপ করিয়া দগ্ধ সোনার লঙ্কা বিভীষণের হস্তে সমর্পন পূর্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্লাইবাদি মহাত্মারা মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় এক বিচিত্র শোভাযাত্রা করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। পলাশী যুদ্ধের ব্রিটিশ বিজয় দুন্দুভি ভাগীরথী তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া কলিকাতা মুখরিত করিয়াছিল। ৬ই জুলাই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শতাধিক নৌকা ভাগীরথী বক্ষে সগর্ব মহোল্লাসে ইংরাজ মহাপুরুষেরা বাদ্য ঝঙ্কারে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত পূর্বক ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করিয়া ক্রোরাধিক অর্থাদি সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়াছিল। ইংরাজেরা কলিকাতায় পলাশী যুদ্ধের পরই সেই অলৌকিক বিজয়োৎসব করিতে কোনরূপ কুণ্ঠিত হন নাই। পলাশী যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতায় কলিকায় সেই সময়ে একজন কেবল বসিয়া কাঁদিতেছিল প্রকাশ আছে ঃ—

"**কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটি**" যে সময় সিরাজউদ্দৌলা ধৃত হন, সেই সময়েই মোহনলাল ভগবান গোলায় ধৃত হইয়াছিলেন। গোলামহোসেন তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যিনি সিরাজউদ্দৌলার হিত চিন্তায় উন্নত হইয়াছিলেন, তাঁহার পতন সিরাজের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল। হায়! তাঁহার শোচনীয় হত্যাও প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল।

তাঁহার পুত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিল তিনিও সেই সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। রাজা দুর্লভরাম প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত ও তাঁহার জীবননাশ করেন। সেইজন্যই সুবিচার প্রার্থনার জন্য তাহার কন্যা তখন ক্রন্দন করিতেছিল। তখন কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদে যেন কি এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তখনই মুর্শিদাবাদ যেন কলিকাতার অধীনতা স্বীকার করে। ক্লাইব ও ওয়াটসন পলাশি যুদ্ধের যেন রামায়ণে রাম ও লক্ষ্মণ, মীরজাফর বিভীষণ, আর রায়বল্লভ ও দুর্লভরাম যেন হনুমান ও সুগ্রীব হইয়াছিলেন।

জঙ্গের দল— মুর্শিদাবাদের দরবারে মীরজাফরের পদবী সুজাউমুল্লক, হিসামউদ্দৌলা, মীরজাফর, আলিখাঁ, বাহাদুর 'মহবৎজঙ্গ' উপাধি হইল, পুত্র মীরণের 'সাহামৎজঙ্গ' ও ভ্রাতা কাজেম খাঁর 'হায়বৎজঙ্গ' হইয়াছিল। ২৬শে জুলাই মুর্শিদাবাদ দরবারে, সর্বপ্রথম খেলাৎ লাভ বিতরণ করা হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাৎ ক্লাইব ও ওয়াটসন পাইয়াছিলেন, একটি সুসজ্জিত হস্তী, দুইটি উৎকৃষ্ট ঘোটক, সুবর্ণখচিত পরিচ্ছদ, মণিমণ্ডিত চূড়াদি শিরোভূষণ তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাহাদের রণতরীতে কামান গর্জনের সহিত নিশান তুলিয়া নব নবাবের সম্মান দান ও তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এতদ্ভিন্ন যথাসময়ে ক্লাইব দরবারে গিয়া ও ওয়াটসন সাহেব পত্র দ্বারা ধন্যবাদ জানাইতে বিস্মৃত হন নাই, ক্লাইবেরও শালাবৎজঙ্গ উপাধি হইয়াছিল।

বিদ্রোহ — মীরজাফরের সিংহাসন প্রাপ্তির পর দুর্লভরাম দেখিলেন যে তাঁহার কোন বিশেষ কিছু লাভ হইল না। তিনি মন্ত্রী হইলেন ও তাঁহার সহোদর ও পুত্রগণ উচ্চ কর্মচারীর পদ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ববৎ প্রভুত্ব রহিল না। তিনি সেই প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানা কৌশলাবম্বন করিতেছিলেন ও বেহারের রাজা রামনারায়ণ নূতন অধিপতির বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। মেদনিপুরের ফৌজদার সিরাজের অনুগত ছিলেন, তিনিই চারাধিপতি রাজরামসিংহ যাঁহাকে মুর্শিদাবাদে হিসাব নিকাশ দিবার জন্য আগমনাদেশ দান করা হয়। উহার সহিত দুর্লভরামের বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল; উহার জন্য তিনি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া দুইজন আত্মীয়কে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়াছিলেন। উহাদের সকলকে যখন নজরবন্দি রাখা হয়, তখন রাজারাম সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া ক্লাইবকে মধ্যস্থতা অনুরোধ করিলেন। উহাতে ক্লাইব রাজারামের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যাদিকে বর্ধমানে থাকিতে আদেশ করিলেন ও সেনাপতি খাজা হাদি তদানুসারে কার্য করিলেন। নবাব খাদেম হোসেন খাঁকে ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিবার যে আদেশ করিয়াছিলেন উহা অমান্য করা হইল। কয়েকজন সেনানীর চক্রান্তে সৈন্যগণ বাকি বেতন না পাইলে উহা করিবে না বলিয়া পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিল। হুলস্থুল গণ্ডগোল চলিতেছিল। নবাব সর্বত্রই তখন হিন্দুর অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া দুর্লভরামের সর্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজা দুর্লভরামও নিজ সৈন্যদল সমবেত করিয়া দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। ইতিমধ্যে ক্লাইব ইংরাজ পক্ষের গুপ্তচরের নিকট প্রাপ্ত ছাপাড়ার ইংরাজ রেসিডেন্টের প্রেরিত সংবাদ মীরজাফরকে অবগত করাইলেন। ঐ পত্রে আলিবর্দির বেগম রামনারায়ণকে বলিতেছেন যে, তুমি অযোধ্যার নবাবের সহিত সম্মিলতি হইয়া মীরজাফরকে সিংহাসনাচ্যুত কর। দুর্লভরাম তখনও সিরাজের মাতামহীর নিকট যাতায়াত ও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত, উহাতে তিনিই যে সেই সকল চক্রান্তের মূল; উহা নবাবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এদিকে ঢাকার কয়েকজন লোক সরফরাজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমানী খাঁকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করে।

ক্লাইবের কৌশলে ইংরাজ কুঠির সাহায্যে ঢাকার নায়েব নবাব সেই বিদ্রোহ দমন করিলেন ও ওয়াটসের মধ্যস্থতায় দুর্লভরামের সহিত নবাবের মৌখিক মিলন সম্পন্ন করা হইল। ৭ই নভেম্বর সৈন্যদলের বাকি বেতনের কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া নবাব স্বয়ং গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিলেন ও ক্লাইবকে তাঁহার সহিত যোগ দিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। মীরণ পিতার অনুপস্থিতিতে শহরে রাষ্ট্র করে যে, দিল্লির দরবারে মীরজাফরের সুবেদারী গ্রাহ্য হয় নাই, মির্জামেহেদীকেই ঐ পদ দান করা হইবে ও রাজা দুর্লভরাম ইংরাজগণের সহায়তায় উহাকেই নবাব করিবে। আরও পাটনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, অযোধ্যার নবাব রামনারায়ণ ফরাসি লার সহিত একযোগে বাংলা অধিকার করিতে আসিয়াছেন।*

হত্যা ও শাস্তি— উহাতে ১০ই নভেম্বর মুর্শিদাবাদে ভয়ানক গোলমাল। গত রাত্রের বীভৎস হত্যাকাহিনীতে সকলের মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ, নিরপরাধি মির্জামেহেদীর হত্যা ও আলিবর্দির বেগম ও সিরাজ জননীব নিরুদ্দেশে সকলে তাঁহাদের হত্যাও স্থির সিদ্ধান্ত করে। সেই অমানুষিক হত্যায় সকলেই তখন স্তম্ভিত, দুঃখিত ও কাতর হইয়া পড়ে। গোলাম হোসেন বলিয়াছেন যে, সেই ব্যাপারে মীরজাফর লিপ্ত ছিলেন। হায়! মীরণের আদেশ ঢাকায় রক্ষিত হয়, সেইখানে সিরাজের মাতা ও মাতামহীকে জলমগ্ন করা হয়। তাঁহাদের মৃত্যুকালের অভিশম্পাত ব্যর্থ হয় নাই। গোলাম হোসেন মীরণের মৃত্যু বজ্রাঘাতে হইয়াছিল বলেন। উহাতে মীরণের মস্তক উদর পৃষ্ঠ, এমনকি, উপাধানের পার্শ্বের অস্ত্রখানি পর্যন্তও ছিন্ন বিছিন্ন ও দ্রবীভূত হইয়াছিল। ২রা জুলাই দর্পহারী ভগবানের দণ্ডে মীরণের দেহ ছিন্ন ভিন্ন ও দুর্গন্ধময় হইয়াছিল ও রাজমহলে সেই পাষণ্ডকে সমাহিত করা হয়।

তন্‌খা— ক্লাইব উপযুক্ত অবসরে পূর্ব প্রতিশ্রুত টাকার পরিশোধ না করিলে, তিনি কেমন করিয়া মীরজাফরের সহিত পাটনায় যাইবেন ও দুর্লভরাম না হইলেই বা উহার সুব্যবস্থা বা মীমাংসা কেমন করিয়া হইতে পারে, অনুযোগ করিলে, নবাবকে দুর্লভরামের সহিত সদ্ভাব করিতে বাধ্য হন। ইংরাজপক্ষেব প্রাপ্য ২৩ লক্ষ টাকার অর্ধাংশ রাজকোষ হইতে দান ও বাকি টাকার জন্য বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, হুগলীর রাজকর হইতে দিবার চিঠি দেওয়া হইল, পরবর্তী কিস্তির ১৯ লক্ষ টাকার জমাও সেইরূপ তনখার বন্দোবস্ত করা হইল। কোম্পানী সৈন্য সাহায্য করার জন্য তনখা লাভের এক নূতন সৃষ্টি করিল। উহার জন্য সৈন্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা লাভের বিষয় হইয়াছিল। তখনই কলিকাতার দক্ষিণে কোম্পানীর জমিদারীর জন্য বিনাবাধায় ফরমান প্রদত্ত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তখন মীরজাফর নামে মাত্র নবাব, ক্লাইবই সর্বেসর্বা ছিলেন।

চব্বিশ পরগণা— উহাতে কোম্পানীর রাজত্ব কলিকাতার দক্ষিণ কূলপী পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। পলাশি যুদ্ধের পরিণামে ইংরাজেরা কলিকাতার মার্হাটা খাত বেষ্টিত স্থানের বাহিরে ছয়শত গজ পরিমাণ জমির অধিপতি হইল ও সন্ধির শর্তানুসারে কোম্পানীকে সরকারি বার্ষিক রাজস্ব দুই লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত আটান্ন টাকা দিতে হইত। উহাতেই চব্বিশ পরগণার সৃষ্টির সূত্রপাত হয়।

* বৈদ রাজা রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান; আর কায়স্থ রাজবল্লভ ও তাহার পিতা রাজা দুর্লভরাম মীরজাফরের সর্বনাশ করিতে না পরিয়া ক্লাইবের কৃপায় কলিকাতাশ্রয় শ্রেয় স্থির করিয়া প্রাণরক্ষা করে।

স্বত্বলাভ— পাটনার দরবারে ক্লাইবের কৌশলে বিনাযুদ্ধে মীরজাফরের নিকট রামনারায়ণ অবনত মস্তকে তাঁহাকে নবাব স্বীকার ও বাকি টাকার জন্য সাত লক্ষ টাকা দিয়াছিল। মীরজাফর রামনারায়ণ প্রমুখকে বহুমূল্য খিলাৎ আদি উপহার দিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব ঐসব কিছু না লইয়া এক সোরার ব্যবসার একাধিকার স্বত্ব লাভ করিলেন। উহাতে তখন কোম্পানীর বিলক্ষণ লাভ ছিল ও নূতন স্বত্ব দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর লাভ হইবে বলিয়া চতুর ক্লাইব উহাই চাহিয়াছিলেন।

নবাবের নিমন্ত্রণ রক্ষা— মীরজাফর নবাব হইয়া কলিকাতায় ক্লাইবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। সেইজন্য ঢাকা হইতে রাজকীয় নাওয়ারা আনয়ন করা হয়। ৬ই জুলাই নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করেন এবং সেই নাওয়ারায় অগ্রদ্বীপ হইতে উঠিবার ব্যবস্থা করা হয়। ক্লাইব প্রমুখ উচ্চ ইংরাজ কর্মচারিগণ হুগলী পর্যন্ত প্রত্যুদগমণ করিয়া মীরজাফরকে সসম্মানে কলিকাতায় আনয়ন করেন। হায়! মীরজাফর একদিন মাণিকচাঁদকে কলিকাতার গভর্নর মনোনীত করায় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিল, আর কিছুদিন পরে তিনিই নবাব হইয়া মহাড়ম্বরে কয়েক দিবস কলিকাতায় ইংরাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরজাফরের নগর ত্যাগের দুই দিন পরে দুর্লভরামের ... বে .... সৈন্যগণ বেতনের দাবী করিয়াছিল। মীরজাফরের চক্রান্তে মীরণই উহা করাইয়াছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি স্ক্রাফটনের চেষ্টায় সৈন্যদল নিবৃত্ত হইয়াছিল। রাজা দুর্লভরাম নৌকাযোগে ইংরাজের লোকজন সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। উহার পরিবারবর্গ মীরণের নিযুক্ত রক্ষিগণ দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিল। ক্লাইবের অনুরোধে তাহারাও ১৭৫৮ সেপ্টেম্বের কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনের পরে সৈন্যদলের বেতন দিবার জন্য ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে নবাবকে দুইলক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মহরমের সময় মীরজাফরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র সেনাপতি খাজাহাদী করিয়াছিল। মীরণের চক্রান্তে রাজমহলের ফৌজদার ও তৈলিয়াজাতীয় পথ রক্ষক সমস্ত দলবল একত্রিত হইয়া সেই হাদীর প্রাণনাশ করে। বিদ্রোহীদলের অনেকেই রাজা দুর্লভরামের অনুগত, ইহা তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দগণ হেষ্টিংসের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন ও উহা দুর্লভরামের লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল।

এইরূপে দেখা যায় যে, তখন বিদ্রোহ অরাজকতা বাংলার চতুর্দিকে বিদ্যমান ছিল। তখন কেহই মীরজাফরের নবাবিতে সন্তুষ্ট হয় নাই। সেকালের লোকেরা মীরজাফর সম্বন্ধে যাহা বলিত উহা এখন প্রবাদ বাক্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে "সকল কর্মের ওস্তাদ আমি, সাঁকরেত কারও নই। নিত্য টাকার তাগাদায় ভাই, কচি খোকা সাজতে হয়।"

যাহাই হউক, পলাশীযুদ্ধের পরিণাম শুভ হয় নাই, উহাতে বাংলার বিদ্রোহ দমন হয় নাই বরং উহার বৃদ্ধি হইয়াছিল। মুর্খ মীরজাফর ভাবিয়াছিল যে, ক্লাইব প্রমুখ ইংরাজগণের উচ্চ কর্মচারির মনস্তুষ্টি করিলেই, আর সন্ধির শর্তানুসারে অর্থদান বা অন্য কোন কার্য করিতে হইবে না; কিন্তু পরিণাম বিপরীত হইল। ক্রম সাহেব অতি সুন্দরভাবে ইংরাজ উচ্চ কর্মচারিগণের সততার প্রশংসা করিয়াছেন। ক্লাইবাদি সকলে যে সকল উপহারাদি লাভ করিয়াছিলেন উহা প্রত্যুপকারের নিদর্শন স্বরূপ গণ্য করা উচিত। উহা কেহই উৎকোচ স্বরূপ লন নাই। সেইজন্যই ক্লাইবের কোম্পানীর পক্ষে টাকার তাগাদা করা, সততার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু হায়! ক্লাইবের প্রেরিত পত্র যে, উহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান

করে। সেই পত্রে ওয়াটস্ সাহেবকে ক্লাইব উপদেশ দিতেছেন যে, যদি নবাব নিতান্তই অত অধিক টাকা দিতে অস্বীকার অক্ষম হন, তবে কোটির অর্দ্ধেক পঞ্চাশ লক্ষে নামিতে পার। আরও সাধু ওয়াটসন সাহেব পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে মীরজাফরের নিকট হইতে কোন অর্থাদি লাভের কথা ছিল ইহা তিনি জানিতেন না। তিনি গুপ্ত সন্ধির শর্তের মধ্যে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়া উল্লিখিত দাবীর অংশ পান নাই। কিন্তু হায়! তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ঐ উপহারাদির ন্যায্য অংশ লাভ করিবার জন্য বিলাতে অভিযোগ মামলাদি পর্যন্ত করিয়াও যে কতকার্য হন নাই; ইহা নিশ্চয়ই সততার উজ্জ্বল প্রমাণ! তখন কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ ও বিলাতের সহিত পরস্পর কি সম্বন্ধ হইয়াছিল ইহাতেই স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে।

নব কলেবর— তখন বাংলায় অন্য কাহারও সমৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধি হউক, আর নাই হউক, কলিকাতার ইংরাজগণের উহা যে হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়। কলিকাতাধিকারের সময় মুসলমান সৈন্যগণের অত্যাচারে, কি ইংরাজি টোলা, কি বাঙ্গালী টোলা, সকল স্থানের বাড়িই অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। তখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলার সন্ধিতে উহার ক্ষতি পূরণের জন্য টাকা দিবার সর্ত ছিল ও উহাতেই কলিকাতার পুর্নগঠনে বা নবকলেবর হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, সৌভাগ্যদয় কালে মানুষের মাথায় হিংস্র সর্পে ফণাদ্বারা সূর্য কিরণ আবরণ করে। ওয়াটসনের ভাগ্যে মৃত্যু ও সমাধি কলিকাতায় হইয়াছিল, আর ক্লাইবের সেইখানে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিলেন। ক্লাইবের স্মৃতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, কলিকাতার পথে ও প্রতিকৃতিতে বর্তমান, আর ভাগ্যহীন ওয়াটসনের সে সব কিছুই নাই কেবল তাঁহার সমাধিই বর্তমান। ক্লাইবের অন্যান্য সহচরগণ তাঁহার সহিত আশাতীত অর্থ লাভ করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের রাজকোষে যেন তাঁহাদেরই জন্য অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, ক্লাইব কুড়ি লক্ষ আশি হাজার, উহার অর্দ্ধেকও ওয়াটসন ও পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার মেজর কিলপাট্রীক, পাঁচ লক্ষ ওয়ালস, মানিংহাম বীচার প্রত্যেকে দুই লক্ষ আশি হাজার, স্ক্রাফটন দুই লক্ষ, কাউন্সিলের ছয়জন সভ্য প্রত্যেককে লক্ষ টাকা ও লসিংটন সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের পার্লামেন্টের সভা তদন্তের ফলে প্রকাশ হইয়াছিল। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক মুস্তাফা বলিয়াছেন যে, তিনি পরবর্ষে ক্লাইবের দোভাষীরূপে কার্য করিবার সময় ক্লাইবের সেক্রেটারী ওয়ালসের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি ওয়াটস, লসিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদের ধনাগারে গিয়াছিলেন। বেগম মহলের কোষাগারের আট কোটি টাকা ছিল, উক্ত বাঙালীদের কৌশলে ইংরেজরা উহার সন্ধান পান নাই। মীরজাফর তখন উমর বেগ, রামচরণ ও নবকৃষ্ণকে উহার কিঞ্চিৎ দান করিয়া সমস্ত লইয়াছিলেন। তখন রামচরণ বা নবকৃষ্ণ ৬০ টাকা মাত্র মাসিক বেতনে কর্ম করিতেন, ঐ বিপ্লবের সময় তাহারা কিরূপ অর্থলাভ করিয়াছিল উহা তাঁহাদের ত্যক্তধন সম্পত্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। রামচরণ কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় ও নবকৃষ্ণ শোভাবাজারে থাকিতেন। তাঁহারা সে সময় গণ্যমান্য কলিকাতা অধিবাসিগণের মধ্যে উল্লিখিত হইতেন না। তখন লোকে বংশ মর্যাদায় সদ্‌গুণ সৎকর্ম ও সম্মান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। সে সময়ের গণ্যমান্য বিশ্বাসভাজন কলিকাতাবাসিরাই কলিকাতা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণের টাকা যথারীতি বিচার করিয়া বিতরণ করিবার ভার পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম নয়ানচাঁদ ও শুকদেব মল্লিক, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত, দয়ারাম বসু, নীলমণি মিত্র, রাম সন্তোষ, রতন সবকাব, শোভারাম বসাক, গোবিন্দরাম মিত্র,

আলিজান ভাই, মহম্মদ সাদেক ও আইনুদ্দিন ছিল। একজন কলিকাতার ইতিবৃত্তকার কোম্পানীর বাদ দেওয়া টাকাকে মঞ্জুর বলিয়া তালিকাভুক্ত ও অযথা তীব্র সমালোচনা করিয়া অক্ষমনীয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই সেকালের নামজাদা ছিলেন, তবে সেই সময় তাহাদের মধ্যে জন কয়েক ব্যক্তি লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আশ্রিত অনুগতগণের ঐ অর্থে সাহায্য দান ও স্বয়ং নিজের উদর পূরণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য উহাদের বিপক্ষে তদন্ত প্রার্থনা হইয়াছিল, উহাদের নাম ও কার্য জানিতে পারা যায়। ঐ সূত্রে প্রকাশ হয় শোভারাম বসাক হিসাব না দিয়া, জাল নাম দিয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কমিশনেরা গরীবগণের দাবীর টাকা সমস্ত দিতে চাহিলে, কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন "তবে আমাদেব মত বড় মানুষের জন্য কি আর থাকিবে"। কলিকাতার বিখ্যাত পূর্বোক্ত বড়বাজারে মল্লিক বংশের দুইজন ঐ সভার তের জন সভ্যের মধ্যে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই গোবিন্দরাম মিত্র বা শোভারাম বসাকের মত কোন অন্যায় মিথ্যা দাবী করেন নাই, বা তাঁহাদের কোন আশ্রিত ব্যক্তি তাঁহাদের কৃপায় এক কপর্দক ও লাভ করে নাই। উহার সংক্ষেপ বিবরণ 'ক' ক্রোড়পত্রে দেওয়া হইল। কলিকাতার ক্ষতি পূরণের টাকার ৫০ লক্ষ ইংরাজেরা ২০ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ও ৭ লক্ষ আরমেনিয়ানেরা পাইয়াছিল। উহাতেই কলিকাতার পুনর্গঠন কার্যারম্ভ হইয়াছিল।

কলিকাতার ধনাগম— প্রথমে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতার সিন্ধুকে নগদ রৌপ্যমুদ্রা বাহাত্তর লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত ছেষট্টি, ৯ই আগষ্ট ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত আটান্ন টাকা ও ৩-রা আগষ্ট পনের লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাঁইত্রিশ টাকা জহরাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় আসিয়াছিল। এই অর্থ সম্পত্তি কলিকাতায় পহুঁছিবার পূর্বে মানিংহাম সাহেব বিজয় সংবাদ লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। উহাতে ক্লাইবের নাম ও যশ বিলাতে ও ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তাঁহারাই কৌশলে দিল্লি দরবার হইতে ক্লাইবের ওমরা পদবী ও ছয় হাজারী মনসব দারী শলাবৎজঙ্গ উপাধির সঙ্গে মীরজাফরের নামে সুবাদারী সনন্দ আসে। তখন ক্লাইব কলিকাতা কাউন্সিলের মত উপেক্ষা করিয়া কার্য করিতেন। যখন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, ফরাসিরা সেন্ট ডেভিড দুর্গজয় ও তাঞ্জোর অবরোধ করিয়াছে শীঘ্রই ফরাসি সেনাপতি লালী ও বুসী মাদ্রাজ আক্রমণ কবিবে, তখন ক্লাইব সেখানে গিয়া কাহারও অধীনে কার্য করিতে চাহেন নাই। সেখানে অধিক সৈন্য পাঠাইবার তিনি বিরোধী, তিনি কেবলমাত্র দুই হাজার সিপাই ও পাঁচ শত গোরা পাঠাইলেন। কলিকাতায় ১ম সংখ্যক লাল পল্টন ক্লাইবের সৃষ্টি; উহাতে দেশীয় সৈন্যগণকে গোরা সৈন্যেব ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র বেশভূষা দিয়া রীতিমত ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষিত করা হয়। ঐরূপ ২য় দল ভোজপুরী সিপাই লইয়া করা হয়। এইরূপে সিপাই সৈন্যদ্বারা কোম্পানীর আয় ও বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়। আরও গোবিন্দপুরে তিনি কলিকাতার বর্তমান দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতায় কোম্পানীর কর্মচারীগণের পাকাবাড়ী ও ইংরাজ প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় জ্বরে একশত গোরা মারা যায় ও সাতশত জন হাসপাতালে ছিল। তখন এক অভিনব উপায়ে কলিকাতার চাবিধারের জঙ্গল কাটাইবার ব্যবস্থা করিবার হুকুম জারি হইয়াছিল যে, যে কেহ আপনার খরচায় ফলের গাছ না কাটিয়া জঙ্গল পরিষ্কার ও চাষ বাস বা গৃহাদি কবিবে, সেইই তাহারা মালিক হইবে। সেকালে ইংরাজ কর্মচারীরা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহ নিজ নামে বা বেনামিতে বন্দোবস্ত করিয়া উন্নতি করিত ও পরে উহা

বিক্রি করিয়া লাভ করিত। ১০ই জানুয়ারী ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে হুকুম হয় যে, কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিরা চব্বিশ পরগণার জমি খরিদ বা আবাদ করিতে পারিবে না ও উহা তাহাদিগকে যেন কোনমতে বিলি করা হয় না।

কলেক্টরী— সেকালের সমস্ত কলিকাতা সম্পত্তির মালিকানী স্বত্ত্ব কোম্পানীর কলেক্টারগণের পাট্টা ও কবুলতি দ্বারা সিদ্ধ ও স্বীকৃত হইত। তখন লালবাজারে কলিকাতার কালেক্টরী আফিস ছিল। ষ্টারগেল সাহেব কলিকাতার পুরাতন কাগজের মধ্যে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেক্টার জ্যাকসন সাহেবের সহি দেখিয়াছেন বলিয়াছেন। ১৭৫২ হইতে ১৭৫৬ পর্যন্ত হলওয়েল, ১৭৫৮ পর্যন্ত কলেট ও তাঁহার পরে উইলিয়ম ফ্রঙ্কালাণ্ড কলিকাতার কালেক্টর জেনারেল হন।

নবাব কর্তৃক কলিকাতাক্রমনের কাপুরুষের ন্যায় ডোভালি জাহাজে পলায়নের পুরস্কার স্বরূপ ফ্রাঙ্কালাণ্ড সাহেব ঐপদ বোধহয় পাইয়াছিলেন এবং ফিরিঙ্গি এই নামোৎপত্তি তাঁহারই নাম হইতে হইয়াছিল। উহাই তাঁহার সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় ও কীর্তি বলিতে হইবে।

উপাধি— তখন দেশবাসিগণ জন্মভূমির অধীনতাকারকগণের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করিতেন। বাদশাহি উপাধি আদি দ্বারা তাহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য কোম্পানী তাহাদের মনস্তুষ্টিকারক ও সাহায্যকারীগণের সমাজে পদবৃদ্ধির উপায় করিলেন। নবাবী রীতি অনুসারে কোম্পানী ও খেলাৎ দিতে আরম্ভ করেন ও ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুলাই লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধরকে খেলাৎ দান করেন। তাঁহারই অধীনে নবকৃষ্ণ পূর্বে কার্য্য করিতেন। নবকৃষ্ণ তাঁহার উন্নতাবস্থায় প্রভুর সম্মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি কখন লক্ষ্মীকান্তের বাড়িতে জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন না। উক্ত ধর মহাশয় আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না, ক্লাইব তাঁহার দৌহিত্রকে মহারাজা উপাধি আনাইয়া দেন, তিনিই বিখ্যাত সুখময় রায়। কলিকাতায় ইহাদের পোস্তার বাড়িতে দূর্গাপূজার সময় সর্বপ্রথম টানা পাখা ও ইংরাজগণের মনস্তুষ্টির জন্য ইংরাজির সহিত হিন্দুস্থানী গৎ মিলাইয়া গান নাচ আরম্ভ হয়। নবকৃষ্ণ উহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন যে সাত্ত্বিকভাবে দুর্গোৎসব হইত না উহা নয়। বড়বাজারের নয়ান চাঁদ মল্লিকের বাড়িতে নবম্যাদি বোধনের দিন হইতে পক্ষাধিক দীন-দরিদ্রের সেবা ও তাহাদিগকে ধন বস্ত্রাদি দান উৎসবাদিতে এক অপূর্ব ব্যাপার হইত। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সেইসময়েই ঋণমুক্ত হইত। সেই প্রথানুসারে উক্ত বংশধরগণ ও বহুকাল ঐরূপ পূজা ও উৎসব করিয়া আসিতেছে।

পঞ্চপাণ্ডব— নবকৃষ্ণের জন্ম ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট গোবিন্দপুরে হইয়াছিল। সৌভাগ্যবলে তিনি শেষে সুতানটির জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। সেই সুতানটিতেই জব চার্ণক সর্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ মুন্সী নামেই পরিচিত, কেহ তাঁহাকে বাবু পর্যন্ত বলিত না। * বাবু তখনকার সম্মানসূচক উচ্চকর্মচারী পদবী ছিল। চুঁচুড়ার ডচ কোম্পানীর দেওয়ান শ্যামরাম সোম সেই বাবু উপাধি লাভ করিয়াছিল। নবকৃষ্ণ

* Babbo, an appellation, given to a rich native or to any one whom we wish to show respect. It is the peculiar title of that nefarious class of natives who lend money to the young writers (Glossary in Alexander Fraser Tylers considerations on the present political state of India 1815)

বাঙালীর মধ্যে সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। সেকালে তাঁহার মত কোন বাঙালীই ইংরাজ কোম্পানীর প্রিয়পাত্র ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি রাজা মহারাজা উপাধি, উৎকৃষ্ট জমিদারী লাভ ও অদ্বিতীয় ক্ষমতায় কলিকাতার সেকালের অনেক সম্পত্তিশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তির চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার ন্যায় আরও চারজন ব্যক্তি কোম্পানীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহাদের নাম কৃষ্ণকান্ত বাবু, কাশিনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবী সিং এই পঞ্চপাণ্ডবই সেকালের বাংলার পাণ্ডববর্জিত দেশের সকল কলঙ্কমোচন করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই পলাশি যুদ্ধের দু এক বৎসর পরেও কলিকাতায় জ্ঞাতনামা ব্যক্তি ছিলেন না। শেষে সৌভাগ্যবলে ও ইংরাজ কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের অনুগ্রহে তাঁহারা সকলেই বাংলার প্রধান জমিদার ও উচ্চ পদবীশালী ব্যক্তি এবং কলিকাতায় সম্পত্তি ঐশ্বর্য লাভ করেন। কাশিনাথ বড়বাজারে, কৃষ্ণকান্তবাবু শ্যামবাজারে, নবকৃষ্ণ শোভাবাজারে, গঙ্গাগোবিন্দ পাইকপাড়া ও দেবি সিং ক্লাইব ষ্ট্রীটের নিকট প্রভৃতি স্থানের উন্নতি করেন। ইঁহাদিগকে তখনকার বাংলার প্রাচীন জমিদারেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পোষ্যপুত্র বলিতেন ও তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। নসীপুরের রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেবী সিং ও কলিকাতার যেখানে থাকিতেন সেইখানে উঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা উদমণ্ড সিংহের নামে রাস্তা হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত মুর্শিদাবাদ রাজবংশের আদি পুরুষ কান্তবাবু। ইঁহাদের সকলেরই অভ্যুদয় ঐশ্বর্য কলিকাতার উচ্চ কর্মচারীগণের অন্যায়াচরণে ও অথবা পৃষ্ঠপোষকতায় হইয়াছিল। ঐ সকল ব্যাপারে হেষ্টিংসকে বিলাতে কৈফিয়ত দিয়া অপামানিত ও সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহারাই সেকালের কলিকাতার নাম ও খ্যাতি নিম্নলিখিত প্রবাদে বিখ্যাত করিয়াছিলেন ঃ—

"জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যাকথা, এই তিন নিয়ে কলকাতা।"

স্পষ্ট কথা বলিতে হইল উক্ত পাণ্ডবেরাই বংশাবলীক্রমে পলাশী যুদ্ধের পরিণাম উপভোগ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখ আবশ্যক। সিরাজউদ্দৌলা জয় করিলে অগ্নিতে যাহাদের বাড়িঘর মূল্যবান ধনরত্ন পুরাতন কাগজ দলিলাদি নষ্ট হইয়াছিল তাহারা কোম্পানীর নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি পুরণের টাকায় কলিকাতা পুনর্নির্মাণের সহায়তা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা তখন পূর্বোক্ত পাণ্ডবগণের ন্যায় কোনরূপ জমিদারি বা উপাধিপ্রাপ্ত হন নাই; ইহা নিশ্চয়ই প্রহেলিকাময়। কলিকাতা ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের পৃষ্ঠপোষক বা প্রিয়পাত্রগণের আবাস ও লীলাস্থল হইয়াছিল। এইখানেই কলিকাতার মাহাত্ম্য শেষ হয় নাই।

আলিপুর— ক্লাইব সিরাজউদ্দৌলার কৃত কলিকাতার আলিনগর নাম পরিবর্তিত করিলেও উহার স্মৃতি লোপ করিতে পারেন নাই। উহা আলিপুর রক্ষা করিতেছে ও সেইখানেই কোম্পানীর প্রতিনিধিগণের বিখ্যাত নন্দনকানন আবাস ভূমি বেলভিডিয়ার বর্তমান রহিয়াছে। যখন ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর ভান্সিটার্ট কর্তৃক মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইলেন, তখন তিনি মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করা মঙ্গলের কথা স্থির করেন ও উহাতেই ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় নবাবী পদ লাভ করেন। তাঁহার নির্মিত আলিপুরের অধিকাংশ সম্পত্তি তিনি মণি বেগমকে দান ও পরে উহা হেষ্টিংস লাভ করেন। এখন সেইখানে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান হইয়াছে ও কলিকাতার বিশিষ্ট ইউরোপবাসীগণ বাস করেন। সেই হেষ্টিংস হাউস এখনও বর্তমান, হেষ্টিংসের চেষ্টায় কালিঘাটের গঙ্গার

উপর সেতু নির্মাণ হইয়াছিল।

লাটপ্রাসাদ— পুরাতন দুর্গের মধ্যে কোম্পানীর গভর্নরের আবাস ভবনটির পরিবর্তে অন্য এক প্রাসাদ 'বাকিংহাম হাউস' বিলাতি নূতন নাম দিয়া গভর্নরের জন্য হইয়াছিল, সেইখানে সর্বপ্রথম গভর্ণর জেনারেলের সময় হইতে বাসারাম্ভ হয়। হেষ্টিংস ঐ বাড়ীতে অধিক সময় থাকিতেন না। তিনি কখন উহার নিকট হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের বাড়িতে, কখন কাশীপুর বা রিষড়ার বাগানে। কখন হেষ্টিংস হাউসে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন হিষ্টিংসের নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্যালয় বর্তমান এসপ্লানেড ম্যানসন যেখানে হইয়াছে, সেইখানে ছিল। হেষ্টিংস বড়ই আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন। সেই গভর্নরের বাড়ি তাঁহার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় নাই, সেইজন্য অধিকাংশ সময় তিনি হেষ্টিংস হাউসে বা বাগানে কাটাইতেন। বিশেষ কোন কাজ পড়িলেই কলিকাতায় আসিতেন। সেই কলিকাতার লাট প্রাসাদ সম্বন্ধে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ড প্রে সাহেবও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলির সহিত লাটসাহেবের দোতলা বাড়ির তুলনা করিলে উহাকে ভাল বলিতে পারা যায় না। পণ্ডিচেরীর গভর্নরের বাড়ি কলিকাতার গভর্নরের বাড়ি অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর। তখনকারের লাটের বাড়িতে বিশেষ কোনরূপ বাহ্য সৌন্দর্যের বা আড়ম্বরের পরিচয় লক্ষ্য হইত না। পলাশী যুদ্ধের বীর ক্লাইব কলিকাতায় যে বাড়িতে থাকিতেন, এখন সেইখানে রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রস্তুত হইয়াছে। দমদমায় তাঁহার একখানি বাগান ছিল উহাকে * ক্লাইব হাউস বলে। তখন কলিকাতায় কোম্পানির উচ্চ কর্মচারীরা থাকিত না। বারওয়েল খিদিরপুরে ও গার্ডেনরীচের + পাঁচকুঠিতে থাকিতেন। এখন সেখানে বেঙ্গল নাগপুরের অফিসারগণ থাকে। তখন কলিকাতার স্বাস্থ্য অতি মন্দ ছিল ও আমোদ-প্রমোদ আহার-বিহারের সুবিধার জন্য কলিকাতার বাহিরে কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারিরা থাকিতে ভালবাসিতেন। চৌরঙ্গিতে তখন দু একজন মাত্র সাহেব থাকিত রাত্রে ঐ রাস্তায় কেহ যাতায়াত করিত না। বর্তমান মিডলটন রোর নিকট হরিণেরা দৌড়াদৌড়ি করিত বলিয়া উহার নাম ডিয়ার পার্ক ছিল; সেই পার্ক নামের স্মৃতি পার্ক ষ্ট্রীটে বর্তমান রহিয়াছে।

ইংরাজের নবাবী— সেকালের কোম্পানীর উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীরা ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ। তাহাদের চাল চলন সমস্তই নবাবদের মত ছিল। তাঁহারা বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিলে ঐ নামে সেখানে পরিচিত হইতেন। চাকর ভিন্ন তাঁহাদের দুইদণ্ড চলিবার উপায় ছিল না। তখন কাফ্রি ক্রীতদাস দাসী চার পাঁচশ টাকায় বিক্রি হইত এবং গান বাজনায় দক্ষ হইলে, উহাদের মূল্য অধিক হইত। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে ঐ ব্যবসা অবাধে চলিয়াছিল। কলিকাতায় আরমানিদের কৃপায় মদ ও নটীর অভাব ছিল না। নবাবদের ন্যায় কোম্পানীর কর্মচারীদের মদ্যপান ও বেশ্যাগমন প্রায়ই অভ্যাস হইয়াছিল। তাহারা অলবোলা ফরসীতে তামাক ও পান খাইত, অগ্রপশ্চাৎ রূপার আশাশোটাধারী চোপদার মশালচি সঙ্গে করিযা পাল্কিতে বেড়াইত। কোম্পানীর মন্ত্রণা সভার কাগজে প্রকাশ হয় যে, তখন চাকরদের মাসিক চার পাঁচ টাকার অধিক বেতন ছিল না। শেষে উহারা অধিক বেতন দাবী করিলে এক নির্ধারিত বেতন ধার্য

* মতিলাল শীলের সম্পত্তি।

+ যদুলাল মল্লিকের নিকট হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী খরিদ করিয়াছে।

করিয়া হুকুম দেওয়া হয় যে, যে উহাতে কার্য করিবে না তাহার জরিমানা, বাসোচ্ছেদ বা কারাদণ্ড ব্যবস্থা করা হইবে। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতাধিকারের সময় ইংরাজদের সেন্ট এন নামে গির্জা নষ্ট হইয়াছিল। লালদিঘির স্কট গির্জার উত্তর পশ্চিম দিকে চাঁদা করিয়া একটি থিয়েটার গৃহ করিয়াছিল, উহাতেই তখন উপাসনা কার্য সম্পন্ন হইত। পলাশি যুদ্ধের জয়লাভের পরে থিয়েটার বন্ধ রাখা অনুচিত বলিয়া গভর্নরাদির মতানুসারে বলপূর্বক অন্যের গির্জা অধিকার করা উচিত স্থির হয়, তদানুসারে ইংরাজ কর্মচারীরা "One lady of the rosary" নামক পর্তুগীজগণের গির্জায় উপাসনা কার্য করিত। কলিকাতায় ক্লাইব নূতন গির্জা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সারমন সাহেব খিদিরপুরের বাগানে ডক তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ক্লাইব গোবিন্দপুরে বর্তমান কেল্লা তৈয়ারীর ব্যবস্থা করায় চৌরঙ্গির উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল।

কাশিনাথ— ফ্রাঙ্ক লাণ্ড সাহেব কলিকাতার জরিপ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কার্য একমাত্র কাশীনাথ টণ্ডমেনবর তত্ত্বাবধানে করাইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠিতে উহার কারণ উল্লেখ ছিল, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, কিছুদিন পূর্বে সেই ব্যক্তিই মাণিকচাঁদের সাহায্য করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর পরম শত্রুতা করিয়াছিল। বিলাত হইতে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল উহার আপত্তির সম্পূর্ণ অনুমোদন পত্র আসিয়াছিল, কিন্তু কাশিনাথ পাকে প্রকারে কলিকাতার যত ভাল ভাল বাজার উপযোগী জায়গা সমস্তই হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রমারা খেলায় বর্ধমানের রাজার নিকট হইতে মূল্যবান চক বাজার জিতিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, উক্ত রাজা কৌশল করিয়া পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হন নাই।

দুর্ভিক্ষ— তখন কলিকাতার জিনিসের দাম ও মজুরী অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। কোম্পানি মফঃস্বল হইতে শস্য সস্তায় খরিদ করিয়া কলিকাতায় সেই দামে বিক্রি করিবেন স্থির করেন। সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকার শস্য খরিদ করা হইবে স্থির হয় ও হুজরীমল ঐ টাকার সিকি স্বয়ং সরবরাহ করিয়া ঐ কার্যের ভার লইয়াছিলেন। এখন যেমন এক্সচেঞ্জের খেলায় ব্যবসাদারদের সর্বনাশ হয়, সেকালে তেমনি টাকার বাজারের হর্তাকর্তা * জগৎশেঠ ছিল; তাহাদের যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। তখন উহারই উপর ব্যবসায়ীর ক্ষতি বৃদ্ধি নির্ভর করিত। ইংরাজ কোম্পানী জগৎশেঠের পরম বন্ধু। সুতরাং তাহাদের দৌর্দণ্ড প্রতাপ, জিনিসের দুর্মল্যতায় ও টাকার বাজারের অনিশ্চিত দামের উত্থান ও পতনে স্বদেশী ব্যবসায়িগণ ব্যবসা বন্ধ করিয়াছিল; অগত্যা ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। খাদ্য সামগ্রীর দাম অত্যন্ত অধিক হওয়ায় উহার যে মাশুল আদায় করা হইত, উহা গ্রাণ্ড জুরি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। সেকালের ব্যবসার দুর্দশার কথা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

অপমান ও পলায়ন — ক্লাইব কলিকাতায় কোম্পানীর কর্মচারীগণের আচার, ব্যবহার, চরিত্র ও ব্যবসা দেখিয়া উহার প্রতিকার করিবার জন্য অনেক পুরাতন কর্মচারিগণকে পদচ্যুত

* Bills are never discounted but the house of Jagat Sett occasionally lend money in advance to landholders who are in arrear of revenue one per cent a month as legal interest but exact as much more under the name of Munafa deducted from the principal at the time of advance Martin Vol II p 1006

করেন। উহাতে কর্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়া ভান্সিটার্ট সাহেবের বাগানবাড়িতে এক প্রকাশ্য সভা করে ও উহাতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, তাহাদের মধ্যে কেহই ক্লাইবের সহিত পানাহার আদি কোন সামাজিক ক্রিয়া করিবেন না ও যে কেহ উহার সহিত উহা করিবে তাহার সহিত তাহারা ঐরূপ সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে। অধিকন্তু যাহাতে সকলে ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎকালে অসম্মান প্রকাশ করে, সে প্রস্তাবও তখন গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতেই কাপ্তেন ডোর হুকুম জারি হইয়াছিল যে, যে কেহ কোম্পনীর খাতাপত্র গোলমাল বা তহবিল আত্মসাৎ করিবে, তাহার নাক কান কটিয়া দিবে, যে কেহ জমি জায়গার বিবাদ লইয়া কাহাকেও যদি আঘাত করে, তবে তাহার একদিন হাত পা বদ্ধ করিয়া ষ্টকে সাজা দিবে ও হত্যাপরাধীকে চাবুক মারিয়া জেলে মারিয়া না ফেলিয়া তোপে উড়াইয়া দিবে। তখন ক্লাইবের চৈতন্যোদয় হয় ও পূর্বমত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল; কারণ তিনি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতাধিকারের সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে উহা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন, আর ওয়াটসন সাহেব ইংলণ্ডের রাজার পক্ষে উহা করিবেন বলিয়াছিলেন ও সেইজন্য উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল। অবশেষে সেই ক্লাইবই ৭ই জানুয়ারী ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের পত্রে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট সাহেবকে ইংলণ্ডাধিপতির নামে জয়লাভ ঘোষণা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কালের কি অপার মহিমা! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বত্ব শেষ হইবার কুড়ি বৎসর বাকি ছিল বলিয়া উহা করিবার মন্ত্রীপ্রবরের তখন সুবিধা বা সুযোগ হয় নাই। সেই ক্লাইবই অথচ দাদপুর হইতে পলাশীর যুদ্ধের বিজয়বার্তা ২৪এ জুন আহ্লাদ সহকারে মীরজাফরকে লিখিয়াছিলেন **"এ জয়লাভ আপনার— আমার নহে।" বলিহারি!!!** পলাশী যুদ্ধে ক্লাইব তাঁহার পিতাকে আপনার লাভালাভের কথা এইরূপ লিখিয়াছিলেন "যাহা কখন স্বপ্নে ভাবি নাই, তাহা নবাবের কৃপায় হইয়াছে। আমার এখন দেশে গিয়া উত্তমরূপে বাস করিবার উপায় হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়েই বোধহয়, তিনি পলাশিযুদ্ধের পর চারিদিকের ব্যবস্থা করিয়া ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন।

মীরকাশিম— ক্লাইবের আমল হইতে কলিকাতার দরবারে বাংলার নবাব ষড়যন্ত্রের নির্বাচন দ্বারা হইতেছিল। ক্লাইব যাইবার সময় মাদ্রাজ হইতে তাঁহার বন্ধু ভান্সিটার্টকে তাঁহার পদে মনোনীত করিবার জন্য বিলাতের ডিরেক্টরগণকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কি আশ্চর্য! তাঁহার সেই অনুরোধ মঞ্জুর হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই হলওয়েের পরামর্শে ও চক্রান্তে গভর্নর ভান্সিটার্ট বশীভূত হইয়া মীরজাফরকে নবাবি পদচ্যুত করেন ও তাঁহারই জামাতা মীরকাশিমকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের গুপ্ত দরবারের সন্ধিপত্রে সেই কার্য সমাধা হয়। মীরকাশিম খোজাপিক্রর মধ্যস্থতায় হলওয়েল ও ভান্সিটার্টকে অর্থ দ্বারা বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাতেই বলিতে হয় কলিকাতার মাটির নীচে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত বত্রিশ সিংহাসন ছিল। পলাশিযুদ্ধের পর কলিকাতার দরবারের সন্ধিতে মীরকাশিমের কি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল উহা প্রকাশ হয় না; তবে সেই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেই সূত্রে কেহ নবাব মীরজাফরকে ক্লাইবের গর্দভ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ও মীরণের মৃত্যু বাংলার ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়াছেন। যাঁহারা মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন পুত্রশোকে মীরজাফর অকর্মণ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজের সন্ধির প্রাপ্য অর্থ প্রদত্ত হয় নাই, ঢাকা প্রদেশের রাজকর সংগৃহীত হয় নাই। ইংরাজ বাণিজ্যের অত্যাচারে

শুল্ক বিভাগের আয় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে; বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল দুর্দশায় নিপতিত হইয়া বৃদ্ধ নবাব জামাতার উপরেই সর্বস্ব নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মীরকাশিম উপযুক্ত সময় বুঝিয়া হলওয়েলকে উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। হলওয়েল সামরিক পরামর্শের ছলে পত্র লিখিয়া মীরকাশিমকে আনাইয়াছিলেন ইত্যাদি অনেক কথা আছে, তবে সার কথা অর্থলাভ করিয়া সিংহাসন বিক্রয় করা হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইতিহাস বিখ্যাত কলিকাতার গুপ্ত দরবারের অধিবেশনে ভান্সিটার্ট সভাপতি ছিলেন। তিনি মীরকাশিমকে ইংরাজের ন্যায় তাঁহারও বন্ধুবর্গের অর্থাভাবের কথা জানাইলেন ও মীরকাশিম যাঁহাকে যাহা পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ 'গ' ক্রোড়পত্রে সন্নিবেশিত করা হইল। তখন কোম্পানীর কর্মচারীরা সকলেই ক্লাইবের ন্যায় অর্থলাভ লালসায় দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল। এই উপায়ে কোম্পানীর অর্থাভাব দূর হইতেছিল বলিয়াই খতে টাকা লওয়া বন্ধ ১লা অক্টোবর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের হুকুম জারি হইয়াছিল। কলিকাতার পূর্ব দরবারের মন্ত্রণা অর্থেই পরিবর্তিত হইয়াছিল। উহাতেই পলাশি যুদ্ধের অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় অভিনয় মুর্শিদাবাদেই হইয়াছিল। গভর্নর ভাসিন্টার্ট সেনাপতি কেলড্ কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠিতে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। নূতন গভর্নরের সম্মান রক্ষার্থ নবাব মীরজাফর কাশিমবাজারে প্রথমেই উপস্থিত হইলেন ও পরস্পরের মধ্যে শিষ্টাচার ও ঘনিষ্ঠতার অভাব হইল না। দ্বিতীয় সম্মিলনে তাঁহাদের শুভাগমনের কারণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার যথারীতি শাসনাভাবে রাজস্ব উৎসন্ন যাইতেছে যাহাতে উহার সুবন্দোবস্ত হয়, উহারই জন্য তাঁহারা সেইখানে আসিয়াছিলেন।

কীস্তিমাৎ— পরদিন প্রাতঃকালেই মীরজাফরের প্রাসাদ লালপল্টনে অবরুদ্ধ রহিয়াছে উহা তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন। অধিকন্তু তিনি উহার মধ্যে প্রিয় জামাতা মীরকাশিমের রণ পতাকা উড্ডীন হইতেছে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তখন অকস্মাৎ সেই বিসদৃশ ব্যাপারের সঙ্ঘটনের কারণ উপলব্ধি করাইবার জন্য সিংহদ্বারেই সেনাপতি কর্ণেল কেলড্ গভর্ণরের পত্র লইয়া সশস্ত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখনই মুহূর্তের মধ্যে অতীত ঘটনা সকল মুর্খেব স্মৃতিপটে জাগরুক হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি বুদ্ধিমানের ন্যায় পত্রের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ইংরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন একেই বলে কিস্তিমাৎ। আবার কলিকাতায় তাহার পক্ষে ইংরাজ সভার সভ্যেরা ইহা যে অতি গর্হিত ও অন্যায় কার্য করা হইয়াছে সে কথা পত্রস্থ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই ও আর একদল উপযুক্তই হইয়াছে বলিয়া বিবেক বুদ্ধির চরিতার্থ করিয়াছিলেন। উহা লইয়া সেখানে পরস্পর দলাদলি আরম্ভ হইল। ইহাই সেকালের কোম্পানীর গূঢ় রাজনীতি। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্র মীরকাশিমের নবাবী পদ লাভ সম্বন্ধে যে কয়টি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন উহার সারাংশ সংক্ষেপে উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ ইতিহাসের সহিত সমালোচনা না করিলে কলিকাতার উন্নতি ও পলাশির যুদ্ধের ফল সম্যক উপলব্ধি হইবে না।

সমালোচনা — মীরকাশিম উপযুক্ত অবসরজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা অনতিবিলম্বে অকর্মণ্য মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া শাহাজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহার ফারমানের দোহাই দিয়া অন্য কাহাকেও নামমাত্র নবাব নিয়োগ করিবে ও নিজেরাই বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার নবাবী করিবেন। পূর্বে তিনি পাটনার নবাবি পদ প্রার্থী হইয়া

হলওয়ের শরণাপন্ন ও তাঁহার মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট যখন শেষে এইকথা শুনিলেন যে, তাহার শ্বশুরকে পদচ্যুত করিবে তখন তিনিই সেই পদ লাভের জন্য উদগ্রীব ও প্রার্থী হইলেন। মৈত্রেয় মহাশয় বলেন যে, ক্লাইবই মীরকাশিমের পদোন্নতির কারণ— তিনিই স্বদেশে যাত্রার সময় মীরকাশিমের উন্নতির জন্য অনুরোধ পত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, আর হলওয়েলের সহিত মীরকাসিমের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি মেদিনীপুরের দিকে মহারাষ্ট্র সৈন্যের গতিরোধ করিতে গিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি তাঁহার সহিত কথোপকথনে ইংরাজগণের গূঢ় অভিসন্ধি ভেদ করিয়া আপনার ভবিষ্যত উন্নতির পথ উদ্ভাবন করেন। মীরজাফর ও মীরকাসিম উভয়ের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যের মধ্যে বিলক্ষণ তারতম্য ছিল। মীবকাশিম মীরজাফরের ন্যায় নিজের স্বার্থের জন্য ইংরাজ বণিকগণবে অর্থপাশে বদ্ধ করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার ভিতরে মীরকাসিমের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। দিল্লীতে মোগল রাজশক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া মুসলমান রাজত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য ও রাজশক্তি রক্ষা করিবার তখন ইংরাজগণের মধ্যে গৃহবিবাদ ও কলহেই মীরকাসিমের সিংহাসন প্রাপ্তির পথ সরল করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন যাহা ভাবিয়া ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার পতন ও মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল উহার পরিণাম সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছিল। মৈত্রেয় মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন যে * "ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন,— রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপিত হইবে, ইংরাজ শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইংরাজের পদোন্নতির সূত্রপাত হইবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত হইবে। মীরজাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না করিতে সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইংরাজেরা সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন নিয়ত সমর কোলাহল লিপ্ত হইয়া, ইংরাজের বাণিজ্য বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে, ইংরাজ শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অর্থাভাবে ইংরাজ কুঠি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, ইংরাজের পদন্নোতির সূত্রপাত না হইয়া সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত না হইয়া, অহিফেনাসক্ত বৃদ্ধ মীরজাফর ও তাহার কুক্রিয়াসক্ত অশান্ত পুত্র মীরণেব শাসন কৌশলে দেশের মধ্যে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। তখন আত্মকার্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া, অনেকেই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন; যে কোন ছল ছুতোয় ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি ক্লাইব নিজেও উহা আকার ইঙ্গিতে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করাইয়াছিলেন। মীরজাফরের উপর অসন্তোষ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল মীরজাফরের অযোগ্যতাই অনর্থের মূল; তাঁহাকে তাড়াইতে পারিলেই, শান্তি ও কল্যাণ আসিয়াই যুগপৎ ইংরাজ বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবে।" "ইংরাজেরা একটি ভ্রম অপনোদন করিবার আশায়, আর একটি ভ্রমে নিপতিত হইলেন। মোগল শাসন শক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই রাষ্ট্রবিপ্লবের অভ্যুদয় হইয়াছে! দিল্লিশ্বরের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! দাক্ষিণাত্যে, অযোধ্যায়, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, সর্বত্র বাহুবল ও ছল কৌশলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এসময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা হইতে ইউরোপীয় শক্তি নির্মূল করিতে পারিলে, এদেশে যে মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইতে পারে, আলিবর্দি উহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেকথা সিরাজউদ্দৌলাকে

মীরকাশিম ৬৩ পৃষ্ঠায়

উত্তেজিত ও ইংরাজের সহিত কলহে লিপ্ত করিয়া সিংহাসন চ্যুত করিয়াছিল। পাত্র মিত্র অনুকূল থাকিলে, আলিবর্দির আশা সফল করা যে অসম্ভব নহে এই বিশ্বাস মীরকাশিমকেও বিচলিত করিয়া তুলিল।" যাহা হউক, মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারা যায় না। কারণ মীরকাশিম বা তাহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের কি মূল উদ্দেশ্য ছিল উহা তিনি একমাত্র কল্পনার চক্ষে দেখিয়াই নানা অলঙ্কারে উহা ভূষিত করিয়াছেন যে, তবে মূল সত্যকথা এই যে, কলিকাতার গুপ্ত সন্ধিতে কি মীরজাফর, কি মীরকাশিম, উভয়েই বাংলার নবাব হইয়াছিল এবং উহার জন্য ইংরাজ কর্মচারিগণ তখন যাহারা কলিকাতার কর্তৃপক্ষ ছিলেন, তাহারা সকলেই আশাতীত অর্থলাভ করিয়াছিল। কোম্পানীর তখন অর্থাভাব ছিল না ও তখনকার বিলাতের কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যে কেহই উহার জন্য এক কপর্দকও লাভ করে নাই। উহাতে কেমন করিয়া শিক্ষিত ইংরাজ জাতিকে বা সেকালের ইংরাজ স্বত্ত্বাধিকারিগণকে দোষী করা যাইতে পারে? অথচ মৈত্রেয় মহাশয় বিলাতের কোম্পানীয়ান অফ্ ইণ্ডিয়া উপাধি অলঙ্কারে ভূষিত!!! সেইখানেই কলিকাতার মাহাত্ম্য! মীরজাফরের কলিকাতার বনবাস ও মুর্শিদাবাদে মীরকাশিমের সিংহাসন লাভ প্রহসন উপন্যাসের মত হইয়াছিল!!! কলিকাতা মুর্শিদাবাদের পরস্পর সম্বন্ধ সেইখানে বিরাজমান। মীরকাশিম আলির সিংহাসন প্রাপ্তির পর কলিকাতার দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রথমে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু অর্থের মোহিনী শক্তিতে ভান্সিটার্টের বিচারে মীরকাশিমের রাজশক্তি অব্যাহত হইল। কলিকাতা কাউন্সিলের উহা বিচার করিবার ক্ষমতা আর রহিল না। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ ও আয় বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজের ঋণ পরিশোধের জন্য তৎপর হইলেন। সুশাসন দ্বারা দেশ ও দশকে করায়ত্ত করা তাহার লক্ষ্য হইয়াছিল। সেইজন্য নিজের ভোগবিলাসিতা বিসর্জন করিয়া ইংরাজের ঋণ পরিশোধ নগদ ও বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজগণকে ইজারাদি দিয়া মীমাংসা করিলেন। তখন আর ইংরাজেরা তাঁহাকে, যাহাতে অধমর্ণের চক্ষে না দেখেন, তাহারই ব্যবস্থা করিলেন উহাতেই নবাবের পদমর্যাদি গৌরব রক্ষা করিলেন।

বিষময় ফল— মীরজাফরের সন্ধিতে চব্বিশ পরগণা ও মীরকাশিমের সন্ধিতে বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজদের হইল। ইহাতেই বোধহয় কি মোগল সম্রাটের শক্তি সঞ্চয় করা হইয়াছিল? বলিহারি! উহাতেই বলিতে হয় যে, কলিকাতার সন্ধির জয় জয় কার!!! বিনাযুদ্ধে অর্থলাভ ও দেশের পরগণা সকল একে একে ইংরাজের হইতেছিল। চট্টগ্রাম একটি উত্তম বন্দর ছিল পর্তুগীজেরা উহাকে প্রধান বন্দর বলিত। এমন করিয়া ব্যবসা করা পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন জাতি কখনও কোথাও করিতে পারে নাই। সেইখানেই বাংলার বিশেষত্ব, সেইখানেই মুসলমানী রাষ্ট্রনীতি কৌশলের পরীক্ষা, ঐতিহাসিক মৈত্রেয় মহাশয় উহার সহিত মীরকাসিমের প্রসংশা করিতে পারেন, কিন্তু উহা করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

ঐ সকল অকর্মণ্য নবাবেরা ইংরাজ বণিকগণের কর্মচারীদিগকে উৎকোচ অপরিমিত অর্থদান ও পরগণাদি দিয়া তাহাদিগকেই সর্বতোভাবে বলবান করিয়া বাংলার ও বাঙালীর অস্থিরপঞ্জর চিরদিনের জন্য একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল ও নিজেব সর্বনাশ করিয়াছিল। তখন তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না বলিয়াই উহা হইয়াছিল ও ইংরাজগণ যাহারা এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহাদেরও উহার সম্পূর্ণাভাব ছিল। তখন উহারা সকলে ধর্মনীতি বিবেক বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। বর্তমান যুগে কোন যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তিই ঐ সকল ব্যক্তির পৌরুষ ও বীরত্বের বা কৌশলের প্রশংসা করিতে পারেন না।

তখনও কলিকাতা ও বিলাতের সভায় উহা লইয়া দুই পক্ষের লোকের মধ্যে তমুল বাকবিতণ্ডা চলিত। এবং পরেও বিলাতের প্রসিদ্ধ পার্লিয়ামেন্ট সভায় মহামতি বার্ক শেরিডনকে প্রমুখ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন।

হায়! বিধাতার শাঁপেই কলিকাতা বাংলার ও বাঙালীর দুর্দশার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল এবং বাঙালীরা সেই ইংরাজ বণিকগণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া সর্বত্রই উহাদের আন্তরিক সাহায্য করিত। মুসলমান নবাবগণ অকর্মণ্য স্বার্থপর ও অশিক্ষিত ছিল, আর বাংলার হিন্দু জমিদারগণও তদ্রুপ। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে বাংলার ও বাঙালীর শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, কার্যতৎপর ইউরোপের বণিকবৃন্দের কর্মচারিগণ স্ব স্ব স্বার্থোন্নতির বশীভূত হইয়া স্বত্তাধিকারীগণের নিকট কৈফিয়তের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তৎকালীন বিদ্রোহী একপক্ষের সহায়তা করিয়া এদেশে তাহাদের ব্যবসার সুবিধা ও রাজ্যলাভ করিতেছিল। উহারই প্রধান অভিনয় স্থল কলিকাতা ও ইংরাজ কোম্পানীর কর্মকর্তারাই উহার প্রধান নায়কের স্বরূপ ছিলেন।

অযথা কোন জাতির নিন্দা বা কোন মুসলমান নবাবের গুণগান করা গৌরবের কথা নয়। সত্য অতীত ঘটনা কতকাংশ অনুমান করিয়া লইতে হয় বটে, কিন্তু উহা পক্ষপাতশূন্য হইলেই ভাল হয়। কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা অন্য কোম্পানীর কর্মচারীদের চরিত্র ও কীর্তি লইয়া ইউরোপের জাতি বিশেষের উপর কোন কটাক্ষপাত করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান করিবার জন্য যতদূর ন্যায্য সমালোচনা করা আবশ্যক উহাই করা কর্তব্য। কলিকাতা ও সেখানকার অধিবাসিগণের অভ্যুদয়াদি বৃত্তান্ত যাহা ঐতিহাসিক ঘটনায় বিবৃত উহা দ্বারা অনেক কথা প্রকাশ হয়।

মীরকাশিমের দ্বারা কলিকাতার আয়তন বৃদ্ধি ও ইংরাজের চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বর্ধমানাদি লাভ হইয়াছিল। তিনি কোম্পানীর দাবি প্রতিশোধ করিয়াছিলেন সেইজন্য যদি কোন ঐতিহাসিক ধন্যবাদ দান করেন তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু তিনি যখন শ্বশুরের সিংহাসন উত্তরাধিকারীসূত্রে লাভ করিবার অবসর থাকিতেও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কলিকাতার ইংরাজ কর্মচারীগণের পাপ উৎকোচ গ্রহণ প্রবৃত্তির অযথা প্রশ্রয় দিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যত গুণই থাক, সমস্তই নরকের অতল গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। প্রচলিত ঈশপের ভল্লুক ও পথিকের কথা বা কালিদাসের সসেমিরার গল্পের কথা মনে পড়ে।

স — "স'দ্ভাব প্রতিপান্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা অঙ্কমারুহ্য সুপ্তস্য হত্বা কিং নাম পৌরুষঃ।"

সে — "সে'তুবন্ধ সমুদ্রেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপী মিত্রদোহী ন মুঞ্চতি।"

মি — "মি'ত্র দ্রোহি কৃতঘ্নশ্চ যে নরা বিশ্বাসঘাতকা তে নরা নরকে যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।"

রা — 'রা'জহসি রাজপুত্রোহসি, যদি কল্যাণ মিচ্ছসি, দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যা দেবতারাধনং কুরু।

প্রাচীন আর্য পণ্ডিতেরগণের মতে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বা মীরকাসিমের চিরন্তন নরকে ব্যবস্থাই হয়। তাহারা স্বর্গে বা মর্তের নবাব ছিলেন না, নরকের উপর কর্তৃত্ব করিয়া নবাবী করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে ইংরাজেরা পলাশি আদি যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া তাহাদিগকে নবাব করিয়া পাপের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ইহার জন্য ধর্মত কি মীরজাফর, কি মীরকাশিম কি ইংবাজ, কাহাকেও ধর্ম পক্ষে প্রশংসা করা যায় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লর্ড ক্লাইব

ক্লাইব ইংলণ্ডে উপনীত হইলে পলাশী যুদ্ধের ফল লাভ তাঁহার অভূতপূর্ব সম্বর্ধনায় ও লর্ড উপাধিতে হইয়াছিল। তিনি যদি তখন অবিবাহিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে লর্ডের কন্যা লাভও অসম্ভব হইত না। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজেই এক বন্ধুর ভগ্নিকে বিবাহ করিয়াছিলেন ও কলিকাতায় পলাশীযুদ্ধের পর পুত্রের মুখদর্শন করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ক্লাইবের যথার্থ ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। পাদরী কায়ারানাণ্ডরকে তিনি কলকাতার পাদরী মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন ও তিনিই ১১ই নভেম্বর ১৭৫৯ সেই পুত্রকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। নবাব মীরজাফর উহার হিন্দুস্থানি মুসলমানি ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মিস্ ব্লিচিনডেন সেই শিশুর নিদ্রাকর্ষণের জন্য ধাত্রীরা যেরূপ গান গাহিত উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে তখন যে, কোম্পানীর নিশানের মর্যাদা ছত্রে ছত্রে কীর্তিত হয়। বাংলায় ব্রিটিশ কেতন পলাশিযুদ্ধের ফলে উড্ডীন হইয়াছিল, উহাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ ইহা সামান্য ধাত্রীও হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই শিশুর কর্ণে উহার মর্ম দ্বারা সুধাবর্ষণ করিত। সেইজন্য ব্রিটিশ রমণী সেই গীতির স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন ঃ—

"দেখোমেরি জান, কোম্পানী নিশান, বিবি গিয়ে দমদমা, উড়িছে নিশান
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব, বঙ্কাকাপ্তেন, দেখোমেরি জান লিয়াহৈ নিশান!"

ইহাতেই বোধহয় যে, তখন কলিকাতার ক্লাইবের বাড়িতে কোম্পানীর নিশান উড়িত। শিক্ষিত ইংরাজগণ উহার মর্ম সর্বাপেক্ষা অধিক উপলব্ধি করিয়াছিল। পলাশীযুদ্ধের গ্রাম্যগীতিতে উহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে উহাতেও এদেশী গ্রাম্যলোকেরা কোম্পানীর নিশান পলাশির ময়দানে উড়িবার মর্ম বুঝিয়াছিল। কলিকাতায় ক্লাইবের সম্বর্ধনার যে কিছু ত্রুটি হইয়াছিল, উহার সুদের সুদ সহিত ইংলণ্ডে আদায় হইয়াছিল। কোম্পানীর অংশীদারগণ মহাসভা ভোজ দ্বারা তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের ভূয়সী প্রংশসা ও ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে 'লর্ড' উপাধি ও মন্ত্রীবর পিট তাঁহাকে সগর্বে 'স্বর্গসম্ভূত যোদ্ধা' বলিয়া গুণগান কীর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাহাতেও তাহার দুঃখ হইয়াছিল যে, তিনি গরীবের সন্তান সামান্য কেরানিগিরির জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, সেইজন্য নৃত্যাদি শিক্ষা করিবার অবসর বা সুযোগ হয় নাই। যদিও সে দুঃখ ভবিষ্যতে দূর হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন তাঁহার আর এক দুঃখ হইয়াছিল যে, তিনি ইংলণ্ডের অভিজাত্য গৌরব লর্ড উপাধি লাভ করিতে পারিলেন না, তিনি আইরিস লর্ডই হইয়াছিলেন। তিনি বেশাভূষার আড়ম্বর প্রিয় ছিলেন ও তখন তাঁহাব পারিপাট্যের প্রতি বিলাতের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়াছিল। তখন তিনি একজন বিলাতের ধনীগণের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন। বিলাতেও পলাশীযুদ্ধের বিজয়োৎসব হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ কিম্বা

লর্ড ক্লাইব

কলিকাতার সহিত উহার তুলনা নাই। ক্লাইব ২৪এ জুন যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া তখনই প্রাণের ভয়েই রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমন করিতে পারেন নাই। ২৬এ জুন সৈয়দাবাদে তাঁবু ফেলিয়া মুর্শিদাবাদে ধনভাণ্ডার রক্ষার জন্য আয়োজন করিবার সময় যাহাতে তিনি ২৭এ জুন পূর্বকথানুসারে তথায় আগমন করেন সেইজন্য এক পত্র গিয়াছিল। নবাবের ধনরত্ন সমস্তই গুপ্তভাবে গরুর গাড়িতে প্রেরিত হইয়াছে ও আপনি যখন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তখন আপনাকে হত্যা করা হইবে গত রাত্রে মীরণ, মীরকাশিম ও রায়দুর্লভ এইরূপ চক্রান্ত করিয়াছে। ইহাতেই ক্লাইব ভীত হইয়া সেই সংকল্প ত্যাগ করেন ও মুর্শিদাবাদে সে দিবস গমন করেন নাই। সেই সুযোগে তখন ধনভাণ্ডারের অধিকাংশ বহু মূল্য ধনরত্নাদি নবাব ও মণিবেগম হস্তগত করেন এবং রায়দুর্লভই উহার সহায়তা করেন। উহার সার মর্ম স্বয়ং ক্লাইব শেষে বুঝিয়া লিখিয়াছিলেন। কথাইত আছে "চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে" ক্লাইবের তাহাই হয়। মুর্শিদাবাদের কোষাগারে কত টাকা থাকিতে পারে আনুমানিক সিদ্ধান্ত পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে হইতেই ইংরাজেরা অনুসন্ধান করিতেছিল ও ঐ সম্বন্ধে ডাক্তার ভোর্থ ১১ই ডিসেম্বর ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ফলতার কর্তৃপক্ষগণকে যাট ক্রোর, পরে ওয়াট সাহেব ক্লাইবকে চল্লিশ ক্রোর জানাইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই শেষে এক ক্রোর চল্লিশ লক্ষে পরিণত হইয়াছিল।*

পলাশি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মীরজাফর ও তাঁহার পুত্র মুর্শিদাবাদের ধনভাণ্ডার যাহাতে পলাতক নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্তগত না হয়, সেইজন্য তাহারা দুই প্রাসাদ মুনসরগঞ্জ ও জাফরগঞ্জ অধিকার করিয়াছিল। সেই নবাবেব ধনরত্ন মীরজাফর হস্তগত করিয়া রক্ষা করিবার জন্য চতুর ক্লাইব ও তাহার সহচরগণকে পূর্বোক্ত প্রভূতার্থ উৎকোচদান করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা আর উত্তোলন করিবার উপযুক্ত অবসর প্রদান করেন নাই অর্থাৎ তদ্বারা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। পলাশি যুদ্ধের সময় ক্লাইবের বিদ্যাবুদ্ধি ও বীরত্বের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়। উহার সহিত তাঁহার কলিকাতার সন্ধির তুলনা করিলে কলিকাতার স্থান মাহাত্ম্যই সর্বাপেক্ষা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ক্লাইব সাক্ষ্যদান কালে ২৯শে জুন প্রাতঃকালে দুইশত গোরা ও তিনশত সিপাই লইয়া কিরূপ মনের অবস্থায় মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ যে ভয়ে কাঁপিতেছিল বলিয়া বোধহয়। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমরা যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করি তখন আমাদের চারিদিকে যে লক্ষ লক্ষ দর্শকবৃন্দ উপস্থিত তাহারা মনে করিলে লাটি ও ঢিল দিয়া সমস্ত ইউরোপবাসিকে মারিয়া ফেলিতে পারিত। পলাশি ক্ষেত্রের ইংরাজ মহাবীর কিরূপ সাহসী ও কিভাবে মুসলমান রাজধানীতে প্রবেশ ও দর্শকবৃন্দের ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহার মনে যে আশঙ্কা হয় ও উহা কিরূপ বর্ধিত হইয়াছিল উহাতে স্পষ্টই অনুমান হয়। যাহাই হউক, ক্লাইবের ইংলণ্ডের সম্বর্ধনার সহিত মুর্শিদাবদের জয়যাত্রার বিবরণের সমালোচনা অতিশয় কৌতুকাবহ।

এইরূপে কলিকাতার উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীগণ যোদ্ধা ও ধনশালী হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরাজ জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন ও এদেশে দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা উপস্থিত

* ক্লাইবের ১৭৫৬ ও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পত্র যাহা তিনি সিলেক্ট অর্থাৎ নির্বাচিত সভাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছিল। সেই ক্লাইবের উদাহরণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণকে বিপথগামী করে ও উহাতেই মীরজাফর রাজ্যচ্যুত ও মীরকাশিম নবাব হইয়াছিল। কলিকাতা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অল্প বেতনভোগী উচ্চ কর্মচারীগণের লীলাক্ষেত্র ক্রমশঃ উহাতেই উহার উন্নতি হইতেছিল। সেইজন্য ইংরাজ কর্মচারীরা সকলেই প্রাণপণে অর্থ লাভের জন্য ব্যস্ত। তখনকার ইংরাজ কর্মচারীরা হিন্দুর দেবদেবীর পূজা অতি সমারোহে আপনাদের অধীন কর্মচারীগণ দ্বারা সম্পন্ন করাইত ও উহাতেই দেশী সিপাইরা আনন্দে যোগদান করিত। সেই হইতে 'বোম কালী কলকত্তা ওয়ালী' বলিয়া বোম আতস বাজী ছোড়া হইত। উহাতে খড়ো ঘরাদি জ্বলিয়া যাওয়ায় বাজি ছোঁড়া সেই সময় হইতে বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতায় শোভাযাত্রা শুভাগমনকালে কালীঘাটে অতি সমারোহে মহামায়ির পূজা বলিদানাদি হইয়াছিল এবং মীরজাফরও সিংহাসনচ্যুত হইলে আলিপুরে থাকিয়া সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য কালিমাতার পূজা ও বলিদান করিয়াছিলেন, শোনা যায়। সেকালে এদেশের কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে কথা কহিবার লোক এক মহারাজ নন্দকুমার ভিন্ন আর কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল উচ্চ কর্মচারীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইলেই বিলাতের কর্তৃপক্ষ দু একটি বিষয় জানিতে পারিতেন ও উহার প্রতিকারের নিমিত্ত যত্নবান হইতেন। তখনই এখানকার কর্মচারিরা পূর্ব বৈরকৃত অপরাধের পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিয়া শেষে পরস্পর এক হইয়া যাইত। উহাতেই শেষে বিলাতের প্রতিকারের হুকুম কার্যকরী হইত না এবং এদেশের অসহায় প্রজারা উৎপীড়িত হইত। তাহাদের প্রতিকারের উপায় নাই বলিয়া ভগবানের মুখপানে চাহিয়া নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হইত।

রাজমহল — তখন মীরকাশিম যে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মহাপ্রভুগণের উদর পূরণ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে নিরাপদ স্থানে সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন।* হুসেন সার আমলে মুঙ্গেরের দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল ও মোগলেরা বাংলা জয়লাভ করিলে রাজা মানসিংহ রাজমহলে থাকিবার জন্য এক যে প্রাসাদ করেন, উহা হইতেই উহার নাম রাজমহল হইয়াছিল। পরে ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা সুজা শাহের সময় তিনি ঐ স্থানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া উহার নাম আকবর নগর করিয়াছিলেন। সেইখানে মীরকাশিমের একটি প্রাসাদ ও উধূর নালা পর্যন্ত দুর্গাদি প্রস্তুত এবং উধূর নালা ও পীর পাহাড়ে দুই ইষ্টকসেতুও নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাকে আর উহা ভোগ করিতে হয় নাই। যে বিষবৃক্ষ মীরজাফর বর্ধিত করিয়াছিলেন মীরকাশিম উহারই মূলে জলসেচন করিয়া শ্বশুরের ন্যায় সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি নিজের ক্ষমতার বলাবল বিবেচনা না করিয়া অসময়ে মুর্খের মতন ইংরাজগণের বিরুদ্ধে গমন করিয়া পথের ভিখারি হইয়াছিলেন। মীরকাশিমই ইংরাজের রাজত্ব ও ব্যবসা করিবার পথ সরল করিয়াছিলেন।

মীরকাশিম প্রদত্ত অর্থে হলওয়েল কোম্পানীর কর্মত্যাগ করিয়া কলিকাতার অধিবাসি হইযাছিলেন। মীরকাশিম কলিকাতাব উচ্চ কর্মচারিগণের উদব পূরণ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন বলেন যে, মীরকাশিম কবি সাদির উপদেশানুবর্তী সকলের নিকট কিঞ্চিৎ লইয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। মৈত্রের মহাশয় বলেন যে, "অর্থসংগ্রহের জন্য কাশিম আলি যে সকল নূতন উপায় অবলম্বন

* Martin's Eastern India Vol. II Page. 25-47

করিলেন, তাহা কাহারও বিস্ময়োৎপাদন করিল না। নূতন নবাবের আদেশে মোগল রাজ প্রাসাদের ইতিহাস বিশ্রুত বিলাস তরঙ্গ সহসা তিরোহিত হইয়া গেল নৃত্য গীত অর্ধপথে স্তম্ভিত পদে অবসন্ন হইয়া পড়িল, হাস্যকৌতুক রাজপ্রসাদ হইতে সসম্ভ্রমে বহু দূরে দণ্ডায়মান হইল। ঐশ্বর্যছটা অপসারিত হইয়া গেল; অমনি ও দাস-দাসীর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল, যাহা না থাকিলে সংসারে চলে না, কেবল তাহাই রহিল। অন্যান্য সকল বিষয়েই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া গেল।" * কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে নবাবী আমলের ইতিহাসকার লিখিয়াছেন যে "নবাব সরকারের ভূতপূর্ব কর্মচারিগণের আর্থিক অবস্থা ও তাঁহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। যথেষ্ট উৎপীড়ন করিয়া এইরূপ অনেকের নিকট অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। পূর্বতন নবাবগণের দাস-দাসীবর্গও নবাবের অশ্রুত পূর্ব অর্থদোহনের যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইল না। নবাব নাগরিকগণের সম্পত্তি যথেচ্ছ আত্মসাৎ করিলেন। নগরে হাহাকার উঠিল। বলবতী অর্থ পিপাসা ক্রমে তাঁহাকে বিপথগামী করিয়া তুলিয়াছিল। যাহা হইক, এইরূপে এবং জমিদারবর্গের নিকট নজর প্রভৃতিতে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করিয়া মীরকাশেম সত্বরই মুর্শিদাবাদস্থ সেনাদলের বাকী বেতনের অধিকাংশ শোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন।" অর্থ সঞ্চয় উদ্দেশ্যে তাঁহার উৎপীড়নে বঙ্গ, বিহারের বহুতর সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল।" মোগল আমলে তোডর মল্লের কৃপায় বঙ্গের রাজস্বাদায় এক কোটি সাত লক্ষ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এক কোটি পয়তাল্লিস লক্ষ ছিল। মীরকাশিমের সময় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুই কোটি ছাপান্ন লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব ধার্য হইয়াছিল। সুতরাং কেমন করিয়া মীরকাশিম লেখকের কথা অনুমোদন করা যায়। বাংলার বেগম লেখক মীরকাশিমের চরিত্র ও অর্থ লাভের সম্বন্ধে আরও যাহা বলিয়াছেন উহা তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর; মীরকাশিম ভয় প্রদর্শন করিয়া লুৎফুন্নিসার বহু মূল্য অলঙ্কার ও যাবতীয় ধনরত্নাদি কাড়িয়া লইলেন। মীরকাশিমের এই লুণ্ঠন কলঙ্ক তাঁহার জীবনকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবে।"

সতী — সেই সিরাজ প্রণয়িনী লুৎফুন্নিসা জীবনের অবশিষ্টাংশ স্বামীর সমাধি প্রতিদিন কুসুমদামের সহিত অশ্রু বিসর্জনে সিক্ত ও সন্ধ্যায় দীপমালায় উজ্জ্বল করিতেন। সিরাজের হত্যার পর অন্যান্য বেগমের ন্যায় তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রস্তাবে মীরকাশিমকে সগর্বে তিনি প্রত্যাখান করায় তাঁহাকে ঢাকায় নির্বাসিত হইতে হয় ও পরে কলিকাতার কর্মচারীগণের দয়ায় মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া উক্ত স্বামীর সমাধিতে চিরাভ্যস্ত আত্ম নিবেদন করিবার সময় তাহার দেহ শৃঙ্খল হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া স্বামীর অন্তরাত্মা আলিঙ্গন করে। তাঁহার সেই সগর্ব প্রত্যাখ্যান ইতিহাসের অঙ্কে স্থান পাইয়াছে, যে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহন করিয়াছে সে কি কখন গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহন করিতে চায়? সত্য সত্যই সিরাজউদ্দৌলা যদি উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হইতেন তবে কি কখন তাঁহার প্রেমে লুৎফুন্নিসা মুগ্ধ হইত, না, তাঁহার অবর্তমানে জীবনোৎসর্গ করিয়া স্বামীর সমাধি পূজা ইহজীবনের সুখ ও ঐশ্বর্য মনে করিত? + ধন্য সেই রমণি। ধন্য তাঁহার পতি!

---

* মীরকাশিম

+ ৩৪৫-৩৫৫ পৃষ্ঠা। * ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।

* "Reflection of the enternal moon of love under whose motions life's dull billows move."

মীরকাশিম কখন মুঙ্গের, কখন রাজমহলে, কখন মুর্শিদাবাদে থাকিয়া সৈন্য সামন্তকে সমরু মারকার প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে শিক্ষা দান করিতেছিলেন। ক্লাইব যেমন কলিকাতায় সৈন্যদল প্রস্তুত করেন তদনুকরণে মীরকাশিম আপনার সিংহাসন নিরাপদ নয় এই ভাবিয়াই সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মীরকাশিমের অন্যায় রাজস্ববৃদ্ধির জন্য বাংলায় চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। মীরকাশিমই বাংলার জমিদারগণের আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই নিঃস্ব জমিদারগণের শাঁপে মীরকাশিমকে রাজত্ব হারাইয়া ফকির হইয়া ভিক্ষা পর্যন্ত করিয়া গোপনে জীবন যাবন করিতে হইয়াছিল। সেই ব্যক্তির সুখ্যাতি করিবার কি আছে? বিদ্রোহ জন্য অর্থের আবশ্যক রাজস্ব বৃদ্ধি করিবাব পর শুল্কদায়ে বণিকের সর্বনাশ করিবার মনস্থ করিয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারিদণের বিষ নয়নে পড়িলেন। পূর্বে কলিকাতার সভায় নবাবের বিরুদ্ধে অভিযোগের অভাব হয় নাই, কিন্তু ভাসিটার্টের কৃপায় তখনই উহার কিছুই হয় নাই। উহাতেই মূর্খ মীরকাশিম যেমন মাত্রা বাড়াইয়া কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি তাঁহার সুর বদলাইলেন।

লবণ— মোগল সম্রাটগণের আমল হইতেই বাংলায় লবণের ব্যবসারম্ভ হইয়াছিল ও উহা বড়ই লাভের ব্যবসা ছিল। মীরকাশিম ভাবিয়াছিলেন যে, কলিকাতার উচ্চ কর্মচারীগণের মুখ অর্থ দ্বারা বন্ধ করিয়া রাজত্বের আয়ে স্বয়ং রাজত্ব ও সুখ সম্ভোগ করিবেন। প্রসিদ্ধ তত্ত্বানুসন্ধানকারক মার্টিন সাহেব রাজমহলের মীরকাশিম নির্মিত গৃহাট্টলিকা দেখিয়া সেই উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল .... অনুভব করা অযৌক্তিক নয় বলিয়াছেন। মীরকাশিম কলিকাতার ইংরাজী দপ্তরে কোম্পানীর কর্মচারীগণের অত্যাচার রহিত করিবার জন্য যথারীতি আবেদন ও যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারা নিয়োগ কর্তাদের স্বার্থের জন্য যদি ঐরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কিছু দোষ হইত না, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব উদর পূরণ করিবার নিমিত্ত এদেশের সমুদায় অন্তর্বাণিজ্য করায়ত্ত করিয়া লন ও দেশীয় বণিকগণের যাবতীয় পণ্য দ্রব্য অধিক মূল্যে ক্রয় ও অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন; এতদ্ভিন্ন লবণের কারবার একচেটিয়া করিয়া লন। উহাতে রাজ্যে প্রজার সর্বনাশ হইতেছিল। দস্তক ছাড়ের অপব্যবহারে ক্রমশই নবাবের শুল্ক হ্রাস হইতেছিল। এইরূপে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মীরকাশিম শেষে অগত্যা বাংলার কাহারও নিকট শুল্ক গ্রহণ করিবেন না হুকুম জারি করেন ও উহাতেই ইংরাজ বণিকগণ বিচলিত হইলেন, কলিকাতার মন্ত্রনাগারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল ও যুদ্ধ ভিন্ন মীরকাশিমকে বশীভূত করা যাইবে না। কলিকাতায় ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মহামারিতে পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যায়।সেই উদাহরণাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে * প্রাণ বিসর্জন করা শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প করেন ২৫এ জুন ১৭৬৩ এলিস + নামে কলিকাতাধিকারের সময়ের একজন নামজাদা যোদ্ধা হঠাৎ পাটনার দুর্গাধিকার ও লুটপাট আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাতেই মীরকাশিমের চৈতন্যোদয় হইবে বা জব চার্ণকের পদানুসরণের পক্ষপাতী বা যশ লুব্ধ হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। অন্য কর্মচারীরা তখন নবাবের সহিত মীমাংসা করিতে গিয়াছিল

* এই এলিসের সহিত ক্লাইবের সিয়ালদহে বন্দুক লইয়া ডুয়েল যুদ্ধে খোড়া হইয়াছিলেন।

+ " The fly that sips treacle is lost in the sweets

উহা শেষ না হইতে হইতে ঐরূপ কার্য করিতে কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নাই। এলিসই যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

যুদ্ধ— তখন ইংরাজদের বিখ্যাত সেনাপতি ক্লাইব বা তাঁহার সহচরগণ সকলেই বিলাতে ছিলেন, অতএব ইংরাজগণকে পরাজিত করা সহজ মনে করিয়া নবাব অথবা তাহার সেনাপতি মার্কারকে পাটনায় পাঠাইলেন ও সমরুকে বক্সারে থাকিয়া ইংরাজের সর্বতভাবে সর্বনাশ করিতে বলিলেন। যুদ্ধ করিলে পলাশি যুদ্ধের ফল কি হইত ইহাই যেন মীরকাশিম ইংরাজগণকে পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিলেন ২৯শে জুন ইংরাজগণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলেন। এবং ইংরাজগণকে ইতস্ততঃ পলায়ন কবিতে হইল। সেই যুদ্ধে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল; এলিসকে সকলের সঙ্গে উহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা ইংরাজের রাজত্বের পক্ষপাতী; সেই যুদ্ধেব পর ১৯এ জুলাই ঘেরিয়ার যুদ্ধে মেজর জন আডমস্ ইংরাজের রণ নৈপুণ্য দেখাইয়া মীরকাশিমের সৈন্যসামন্ত দুর্গ বিধ্বস্ত করিলেন। নবাব ৬ই নভেম্বর উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন। হায়! আডমসের ভাগ্যে ক্লাইবের মত পুরস্কার লাভ হইল না। ২৩এ অক্টোবর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজের চূড়ান্ত জয়লাভ হইল।

বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই সকল সংবাদে বিচলিত হইয়া ক্লাইবকে কলিকাতার গভর্নর মনোনীত করিয়া পাঠান ও তিনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হন। তখন ইংরাজেরা ফায়জাবাদ লক্ষ্ণৌ আদি অধিকার করিয়া যথার্থই রাজ্যারম্ভ করিয়াছেন। এই সকল ঘটনাতেই ক্লাইবের কলিকাতার গভর্নর হইয়া আসিতে হইয়াছিল। সেই সময়ের কিঞ্চিৎ ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিতে হইল ও উহার অভিনেতৃগণের কিঞ্চিৎ পরিচয়ের সহিত সমালোচনা না করিলে উহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

কলিকাতার ইংরাজ কর্মচারীরা ক্লাইবের শুভাগমনে সন্তুষ্ট হন নাই ও তাহার শুভাগমন ও ভাগ্যোন্নতির জন্য কলিকাতায় তাঁহাকে বিশেষ কোন রূপ সম্মান প্রদর্শন কবেন নাই। তিনি যে তখন একজন বিলাতের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পারিসে নৃত্যকলা বিলাস বিভব ভোগ করিয়া আসিযাছেন কেহই তাঁহার অভ্যর্থনাদি দ্বারা নয়নগোচর করেন নাই, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

পরশমণি— ক্লাইবের সহিত কলিকাতার যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল না একথা বলিতে পারা যায়; কারণ তাঁহার সময় হইতে কলিকাতার সন্ধিতেই মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার আরম্ভ হইযাছিল। তাহার অবর্তমানে মীরকাশিম ও মীরজাফর সেই রূপে সিংহাসন লাভ করিয়াছিল। সেই কলিকাতার দ্বিতীয় সন্ধি যাহা দ্বারা মীরজাফর তাহার হৃত রাজ্য জামাতার করকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল উহার মধ্যে এমন কিছু বিশেষ শর্ত ছিল যে, যাহার জন্য ক্লাইবের শুভাগমন কলিকাতায় আবশ্যক হইয়া পড়ে। ১০ই জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত দ্বিতীয় সন্ধিপত্র যাহা উভয় পক্ষের স্বাক্ষর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে হইয়াছিল উহার মুখবন্ধেই বৃদ্ধ মীরজাফরের যে মৃদু গম্ভীর ন্যায্য তিরস্কারানুরোধ ছিল, উহাতেই ক্লাইবের কলিকাতা গমনের মূল কারণ বলিলেও বলা যায়। উহার সারমর্ম এই যে, সন্ধির অনুমোদন বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও রাজার নিকট হইতে আনাইয়া দিতে হইবে কারণ আর যাহাতে ভবিষ্যতে সন্ধি ভঙ্গ না হয় উহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইংরাজ কোম্পানী সেই সন্ধি অনুসারে মীরজাফরকে বাধ্য করিয়া তাঁহাব সহিত মীরকাশিমের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে

যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। পলাশি যুদ্ধের জগৎশেঠাদি সকলেই মীরকাশিমের অনুগ্রহে ইহজগৎ হইতে তখন অবসর গ্রহণ করিয়াছিল বা কারারুদ্ধ ছিল। তখন "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন", নবাব মীরজাফরের পশ্চাৎ গমন অর্থাৎ সেই যুদ্ধের অর্থ সরবরাহ করিয়াছিল। আরও খোজা পিদ্রু, দুর্লভরাম ও নন্দকুমার সঙ্গে ছিল বর্ধমানের জমিদার রাজা মীরজাফরের বন্ধু ছিলেন ও সেইখান হইতে অর্থ খাদ্যরসদাদি লইয়া একদল ইংরাজ সেনা লেফ্‌টেনেন্ট গ্লেনের অধীনে নবাবের সৈন্যের বাধা অতিক্রম করিয়া মেজর আডামসের যুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিল। মীরজাফরই মীরকাসিমের পতনের মূল কারণ। তাঁহার পক্ষে মুসলমান ও জমিদারগণ সানন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। কারণ তাহারা সকলেই মীরকাশিমের অর্থ শোষণে উদ্বাস্তু হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর মুর্শিদাবাদের সকলকেই আলিবর্দির স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন। তখন মীরকাসিম সকলের ধনাপহরণ করিয়াছিল। খোজা পিদ্রুর জন্য গুর্গিন খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন নাই ও মীরজাফরের অধীনস্থ সৈন্যগণ মীরকাশিমের অধীনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা মীরজাফরের লবণ মর্যাদা ও মীরকাশিম অপেক্ষা তাঁহার অধীনে কর্ম অধিকতর সুখের ছিল উহা বিস্মৃত হয় নাই *। উহাতেই মীরজাফর ২৩এ জুলাই দ্বিতীয় বার ইংরাজ কর্তৃক মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি তখন আর অশুভ সিরাজের মন্‌সুরগঞ্জ প্রাসাদে বাস করেন নাই, আলিবর্দির ভবনেই বাস করা মঙ্গলকর স্থির করিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রথম সন্ধিতে সিরাজউদ্দৌলার বলিদান, দ্বিতীয়ে মীরজাফরের সিংহাসনচ্যুতি ও তৃতীয়ে জামাতা মীরকাশিমের সর্বনাশ সাধিত হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ভারতবর্ষে দৃঢ়তর হইয়াছিল। সেইজন্য বলিতে হয় কলিকাতাই ব্রিটিশ জাতির অর্থ সাম্রাজ্য লাভের পরশমণি। বৃদ্ধ মীরজাফরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত ক্লাইবের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি ক্লাইবের কলিকাতা গমনের কয়েক মাস পূর্বেই ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের সৎ পরামর্শে হিন্দুর আরাধ্যাদেবী কিরীটেশ্বরীর চরণোদক পান করিয়া ঋণ জাল ক্লীষ্ট মুকুট ও রাজ্য দায় মুক্ত হইয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। উধয়নালার যুদ্ধে জয়লাভ যে পলাশি যুদ্ধাপেক্ষা গৌরবের ছিল, অনেকেই উল্লেখ করিতে পারেন, তবে খোজা পিদ্রু ঐ যুদ্ধের কি সহায়তা করিয়াছিল উহা তাহার আবেদন + কলিকাতার দপ্তরের কাগজে প্রকাশ হয়। তিনি মেজর আডামের অনুরোধে মীরকাশিমের মার্কান ও বীর আরাটুন প্রমুখ দুই আরমেনিয়ান সেনাপতিকে স্বজাতির উপকারের নিমিত্ত তাহারা যাহাতে ইংরাজের বিরুদ্ধে কিছু না করেন, সেজন্য কর্তব্য বৃদ্ধি ও বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। গুর্গিন খা পিদ্রুর ভ্রাতা তাঁহাকেও তিনি পত্র দান করিয়াছিলেন ও উহাতেই সেই গুর্গিন খাঁর শবদেহ নিশাযোগে নবাবের আদেশে সমাহিত হইবার কথা মুতাক্ষরীণকার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মুস্তাকা উহার টীকায় হত্যাই সম্ভব বলিয়াছেন।

নৃশংস হত্যা— পাটনার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। উহাতে কলিকাতায় * হুলুস্থূল পড়িয়াছিল। সেখানে ইংরাজ রীত্যানুসারে এক মিনিটান্তর তোপধ্বনি উপবাস প্রার্থনাদি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই।

* মুতাক্ষরীণ ২য় খণ্ড মীবকাসেমেব মুসলমান সেনানীগণ মীরজাফরের শরণাপন্ন হইয়াছিল।

+ Long's Records P 335-36 * Transactions in India 1756-1783. Broom's Bengal Army V I 390.

যিনি মীরকাশিমকে ধৃত করিয়া দিবেন তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক ও তাহার প্রতি যথাসাধ্য অনুগ্রহ দর্শন করা হইবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বোধহয়, কোম্পানী উমিচাঁদের সহিত দুর্ব্যবহারের কথা লোকে তখনও বিস্মৃত হয় নাই, তজ্জন্য উহা কেহই করে নাই। ইংরাজেরা মীরকাশেমকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি ধৃত হইবার ভয়েই যান নাই। অথবা মুসলমান সেনানায়কগণ তাঁহাকে যে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে না এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। কলিকাতার দপ্তরের কাগজ পত্রের মধ্যে মেজর আদাম সাহেবের পত্র দ্বারা লেখক গুর্গিন খাঁ ওরফে খোজাগ্রেগরী সত্য সত্যই ইংরাজের সহায়তা করিয়াছেন। কলিকাতার সন্ধিতে যেমন সেকালের নবাবী লাভ হইত তেমনি উহার দপ্তরের কাগজপত্রের বিচার করিয়া অনেকেই ইতিহাসের অনেকের কলঙ্ক মোচন ও যশঃ কীর্তন করিতেছেন। উহাতে কোন কোন সর্বোচ্চ রাজপ্রতিনিধি পর্যন্তও বিব্রত হন। সেই লেখক পাটনার লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার ফুলার্টনের নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়া ইংরাজের কলিকাতার দরবার কি করিয়াছিল উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল § ঃ—রাজারামনায়ন, জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রাজনগর নিবাসি বৈদ্যরাজ রাজবল্লভ প্রভৃতি গণ্যমান্য ইংরাজ হিতৈষী পাত্র মিত্রগণ পূর্বেই নিহত হইয়াছিলেন। গর্গিন খাঁ পট মণ্ডপের মধ্যে স্বকীয় শরীর রক্ষকদিগের অস্ত্রাঘাতে পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন। সেনানায়কদিগের মধ্যে বহুলোক এইরূপে নিধন প্রাপ্ত হইলে, ইংরাজ বন্দিদিগের মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ হইল। সমরু ভিন্ন কেহ তাহাতে অগ্রসর হইল না। সমরু খৃষ্টিয়ান, যে নরাধম দস্যুতস্করগাও বর্বরতায় পরাজিত করিয়া নির্মম হৃদয়ে বন্দিদিগের হত্যাকাণ্ডে অগ্রসর হইল।" "সমরুর সেনাদল যখন পাটনার কারাকক্ষের নিকট এই অমানুষিক কার্য সম্পাদনের জন্য সমবেত হইল, তখন প্রভাতের তরুণ তপন পূর্বগগনে লোহিতবর্ণে সমুদিত হইয়াছে; সাহেবরা কেবল চা পান করিয়াছেন। সেই সময়ে সমরু আসিয়া ইলিজ, হে, লসিংটন সাহেবকে আহ্বান করিল। যিনি বাহিরে আসিতেছেন তিনিই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা অভ্যন্তরে ব্যপ্ত হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তখন যাহা নিকটে পাইলেন, শিশি, বোতল, কোচ, ছুরি, কাঁটা কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, তদ্দ্বারা যথা সম্ভব আত্মরক্ষার আয়োজন করিলেন। তখন সেনাদলের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল। তাহারা আদেশ পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু তাহারও শিহরিয়া উঠিল, তাহারও নিরস্ত্র দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"একি বীরোচিত ব্যবহার, এ যে কেবল কসাইখানার হত্যাকাণ্ড, বন্দিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান কর, যুদ্ধ না করিলে কাহারও অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না।" এ ধিক্কারেও নরাধম সমরুর হৃদয় বিচলিত হইল না। সে রোষ কষায়িত লোচনে গর্জন করিয়া উঠিল। যে সৈনিক ধিক্কার দিয়াছিল তাহাকে মুষ্ঠাঘাতে ভূপাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাপূর্ণ বচনে আদেশ প্রদান করিতে লাগিল। "এই হত্যাকাহিনী যখন কলিকাতার ইংরাজ দরবারের কর্ণ গোচর হইল, তখন সমস্ত কলিকাতা যেন গভীর বিবাদচ্ছায়ায় আছন্ন ইংরাজ দরবারের অধিবেশনে কেহ সহসা হৃদয়বেগ প্রকাশ করিতে পারিলেন না; রুদ্ধকণ্ঠে বাষ্পাকুল লোচনে, হৃদয় নিহিত প্রতি হিংসাসাধনেচ্ছায় সকলেই কিয়ৎকাল হাহাকার করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন,— সে মধ্যাহ্নে কেহ জল-বিন্দুও স্পর্শ করিবেন না। সকলে সায়ং

§ ১৮২, ১৮৩, ও ১৭৮ পৃষ্ঠা। মীরকাশেম 'ঘ' ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য

কালে ধর্ম মন্দিরে সমবেত হইবেন'' দুর্গ প্রকারে, রণতরীতে, ভাগীরথি তীরে সর্বত্র শোকসূচক কামানধ্বনি হইবে, চতুর্দশ দিবস ইংরাজ মাত্রেই শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন, এবং যে কেহ মীরকাশিমকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা হইবে।''

নবাবী ও দেওয়ানি— লর্ড ক্লাইব ঐতিহাসিক ক্রম বা কলিকাতার ইংরাজ দরবারের সভ্যগণের ন্যায় সেই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া অতিমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কেরাণিগিরি হইতে সৈন্যনায়ক রাজশাসন সকল বিদ্যাই হাতে কলমে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণের সভার মন্তব্যের মধ্যে দেখিলেন যে, মীরকাশিম সিংহাসনচ্যুত হইয়া মুসলমান নবাবাদি দ্বারা ইংরাজের সর্বনাশের জন্য বদ্ধ পরিকর। সেইজন্য অযোধ্যার নবাবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইয়াছিল ও দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম বন্দি। তিনি ইংরাজগণের বিজয় লাভে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ দিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লাভ করিলে আনন্দিত হইবে বলিয়া এক পত্র বক্সারের যুদ্ধের পরদিবসই ইংরাজ সেনাপতি মেজর মনরোকে পাঠান ও ১৯এ নভেম্বর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা দরবারের অভিমতানুসারে ২৪এ তারিখে দিল্লীর বাদশাহের সহিত নজর দিয়া দেখা করিয়াছিলেন। তখনও নবাব মীরজাফর জীবিত ও তাঁহার নিকট অর্থ আদায় হয় নাই তজ্জন্য উহার সহিত সন্ধিভঙ্গের ভয়ে কোনরূপ কার্য অগ্রসর হইতে পারে নাই। উহার মৃত্যুর পর যে উপায়ে মীরণের শিশু পুত্র মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ না করিয়া মীরজাফরের প্রণয়িনী মণিবাই-এর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান নিজামুদ্দৌলা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মীরজাফরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন ও সিরাজের হিরাঝিলের প্রাসাদ হইতে যে সমস্ত ধনরত্ন মীরজাফর লাভ করিয়াছিলেন উহা দ্বারা প্রেয়সির মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি মুর্শিদাবাদে তখন প্রভূত ধনশালিনী হন। মিল সাহেব সিংহাসন প্রাপ্তির কারণ এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, মীরণের যে কিছু সম্পত্তি ছিল উহার আয় ব্যয়ের হিসাব তখন কোম্পানীকে দিতে হইত, সুতরাং মীরণের শিশুপুত্রের নবাবি প্রাপ্তির জন্য যে কিছু উপহার দান আবশ্যক, উহা করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। * মণিবেগমের উত্তরাধিকারী বার লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উহা লাভ করিয়াছিলেন। ক্লাইবের পূর্ববর্তী গভর্নব ও তাঁহার সহকারিগণ এমন মুর্শিদাবাদের নবাবি পদ দান করিয়া অর্থ লাভের উপায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানি লাভ করার পক্ষপাতী হইতে পারেন নাই। লর্ড ক্লাইব সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের যথার্থ সূত্রাপাত করেন ও মূর্খ মীবকাশিমকে ফকিরি গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন এবং সেই অবস্থায় তাহাকে দিল্লীতে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে সমাধিস্থ হইতে হয়। এক সময়ে উহাকে ধৃত করিয়া দিতে হইবে এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে না চাওয়ায় সুজাউদ্দৌলার ইংরাজের সন্ধি স্থাপন হয় নাই। ইহা নিশ্চয়ই মীরকাশিমের ও মুসলমান জাতির গৌরব ও মহিমা। ১২ই আগষ্ট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব সম্রাট সা অলমের নিকট দেওয়ানি লাভ করেন ও উহার অব্যবহিত পরেই মণিবাই-এর পুত্র লোকান্তরিত হইলে অন্য পুত্র সৈয়ফুদ্দৌলা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে সিংহাসনে উপবেশন কবেন। মণিবাই-এর নৃত্যগীতে মুগ্ধ হইয়া মীরজাফর তাঁহার সহিত

* Miles History of British India V. III P. 358. Secand Reveet P. 21.

পরিণয় ক্রিয়া করা দোষের মনে করেন নাই ও তাহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার উপযুক্ত অনুরোধও করিয়াছিলেন। মণিবাই-এর দানশীলতায় কোম্পানীর কর্মচারীরা মাতৃবৎ মান্য করিত ও সেই নামেই তিনি আখ্যাতা হইয়াছিলেন। সেইজন্যই মীরজাফরের প্রধান মহিষী গদিনাসীন বেগমের বংশধরেরা নবাবীপদ লাভ করিতে পারেন নাই। ক্লাইবই মুসলমানগণের চক্ষে ধূলি দান করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব ও বেগমগণের বার্ষিক বৃত্তি দান ও উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানীর প্রাপ্য ধার্য করেন। মণিবাই নন্দকুমারকে দেওয়ান করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সেই পদে কলিকাতার মহাপ্রভুদের কৃপায় রেজা খাঁ-ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ক্লাইব সেজন্য দায়ি ছিলেন। তিনি দিল্লীর নর্তকী মণিবাই ও বাবু বাই-এর সন্তানেরাই মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে লালিত পালিত ও নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। হায়। ইহা মীরকাশিমকে দিল্লিতে বসিয়া শুনিতে হইয়াছিল। তদপেক্ষা উহার অধিকতর শাস্তি আর কি হইতে পারে? সেই হইতেই ইংরাজের সৌভাগ্যোদয় আরম্ভ হয়। কলিকাতাতেই ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের দেওয়ানি লাভের সূত্রপাত ও শেষে উহাই ইংরাজের রাজধানী হইয়াছিল। ক্লাইবই এলাহাবাদে কোম্পানীর পক্ষে দেওয়ানি সম্রাটের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কাহিনী ও বিলাস বিভবের জন্য কলিকাতা বিখ্যাত।

বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেকটর সভার অধ্যক্ষ সলিভান সাহেবের সহিত যে বিবাদ ছিল উহা মিটাইয়া সশুার্স সাইকস্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া ৪ঠা জুন ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে অপবিসীম ক্ষমতা লাভ করেন। কলিকাতার গত বিপ্লব বাণিজ্য ও যুদ্ধ ব্যাপারের আমূল তদন্ত ও উহার যথারীতি ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ক্লাইব জুন মাসের শেষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাদশাহ ও সুজাউদ্দৌলার সহিত দেওয়ানি ও সন্ধিবন্ধনের যাত্রা কালে রেজা খাঁর উৎকোচ গ্রহণ ও জুলুম জবরদস্তির অভিযোগাদি সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানে ক্লাইব সাইকস সাহেবকে কোম্পানীর পক্ষে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মনোনীত করিয়াছিলেন। ও সকল কার্য এক মন্ত্রীসভার পরামর্শানুসারে করিতে হইবে, রেজা খাঁ স্বয়ং কিছুই করিতে পারিবেন না স্থির করেন। ক্লাইব ঐ সভার সভ্য রেজা খাঁ, দুর্লভরাম ও জগৎশেঠ খেসাল চাঁদকে মনোনীত করিয়াছিলেন। আরও তিনি নন্দকুমারকে জামাতাসহ মুক্ত করিয়া রাজকার্যের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব থাকিবে না স্থির করিয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত ক্লাইবের নিযুক্ত কমিটি দেওয়ানী লাভান্তে মুর্শিদাবাদের নিজামতি ব্যয়ের জন্যে ৫৩৮৬১৩১।।/০ তিপান্ন লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত একত্রিশ টাকা নয় আনা বঙ্গ বেহারের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে তদধিক যাহা আদায় হইবে উহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাইবেন স্থির করেন। * মণিবাই বা তাহার অকর্মণ্য পুত্রের ক্লাইবের হুকুমের বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি করিবার সাহস ছিল না, কারণ তাহাদের কাহারও সিংহাসন অধিকার করিবার কোন ন্যায্য দাবী ছিল না। হায়। গোলাম হোসেন অতি

* Munny Begum declared before Mr Gorang "Every Governor coming to Murshidabad received Rs. 2000/- a day in sica for provisions" XXXVI Forrest's State Paper selections

"Your Lordships are to suppose the lowest degree of ignomy and occupation and situation when I tell you that Munny Begum was a slave and dancing girl." Burke's Impendment on Waren Hastings V 1 265

দুঃখে বলেন যে, বাদশাহের সহিত সন্ধি ও দেওয়ানি লাভের কথা এত অল্প সময়ের মধ্যে হইয়াছিল যে, সেই সময়ের মধ্যে একটি গর্দভ বিক্রয়ও হয় না। সত্যসত্যই মণিবাই তখন কোম্পানীর মাতা উপাধি লাভের যোগ্যা হইয়াছিলেন, কারণ তখন তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে মুর্শিদাবাদের প্রধানা বেগমের বৃত্তি লাভ ও বেগম পদবীতে মণ্ডিত হইয়াছিলেন। ক্লাইব প্রমুখ কলিকাতার গভর্নরগণের মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি কালে দৈনিক দুই সহস্র মুদ্রালাভ হইত। ইহা ভবিষ্যতে প্রকাশ হইয়া পড়ে ও মণিবাই সম্বন্ধে মহামতি বার্ক তীব্র মধুর কটাক্ষ পাত করিয়াছিলেন।

একচেটিয়া ব্যবসা— ক্লাইব বিলাতের ডিরেক্টারগণের পরামর্শানুযায়ী ঐ সকল কার্য করেন নাই। তাহাদের মতে বাণিজ্য রক্ষা করিতে গেলে যে, রাজত্ব করা আবশ্যক একথা ক্লাইব স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন ও বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে উহা হাতে কলমে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া ক্লাইব করিতেন না, আবশ্যক হইলে তাঁহার নিজের মতও পরিবর্তন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, যাহাতে এদেশের বণিকগণের অত্যন্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কোম্পানীর সে ব্যবসা করা উচিত নয়। কিন্তু হায়! কলিকাতার স্থান মাহাত্ম্যে ও কোম্পানীর অর্থলোভী কর্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া উহা করাই উচিত শেষে স্থির করিয়াছিলেন। তিনিই এদেশবাসি ব্যবসায়ীর দিকে না তাকাইয়া লবণ, তামাক, সুপারির একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ ও উহার সমস্তই লাভ কোম্পানীর কর্মচারীরা পাইবে হুকুম জারি করিলেন। তদ্বিরুদ্ধে তখন তিনি বিলাতের আদেশ গ্রাহ্য করিলেন না। উহাতেই তিনি এদেশের অন্তর্বাণিজ্যের সর্বনাশ করিলেন। উহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিকতর কলঙ্কের বিষয়। ক্লাইব সৈন্যগণের ব্যয়ভার সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন উহাতে সেনাপতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে; কিন্তু তিনি উহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইয়া বিদ্রোহী সেনানীগণের পদচ্যুতি ও তৎপদে নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে দমন করিয়া ফেলেন। ক্লাইবই যুদ্ধকালে ডবল ভাতা দেওয়ার রীতি পরিবর্তন করেন। সেই সময় হইতে সৈন্যগণ নবাবি আমলের সহিত বর্তমানের তারতম্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিল।

কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ— ক্লাইব দেওয়ানি লাভ করিয়া উহার কার্য করিতে মুহূর্তকাল বিলম্ব করেন নাই। মীরজাফরের ভ্রাতা কাজেম খাঁকে পাটনায় নায়েব কাজিম করিলেন ও ঢাকায় জসরৎ খাঁকে বাহাল রাখিলেন। মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রচলিত প্রথানুসারে ক্লাইব মহাসমারোহে কোম্পানীর দেওয়ানির প্রথম শুভ পুণ্যাহ কার্য করিলেন। সেখানে কেবল অকর্মণ্য নজমুদ্দৌলা ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ মসনদে উপবিষ্ট ছিল। সেই পুণ্যাহে বাংলার যাবতীয় জমিদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইবকে তাহাদের যথার্থ জমিদার স্বরূপ দর্শন ও অভিনন্দন করিল। তখন বহু টাকা রাজস্ব স্বীকৃত হইল ও এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বিলাতে পত্র প্রেরিত হইল। লর্ড ক্লাইবই বাংলাদি দেশের যথার্থ নবাব হইলেন। কৈশোরোন্মুখ নজমুদ্দৌলা ক্লাইবের সেই অঙ্গীকারপত্র শিরোধার্য করিয়া মাতার প্রবৃত্তি অনুযায়ী নৃত্যগীতাদি দ্বারা সময় ক্ষেপণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, ইহাই ইংরাজ লেখকগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহার ফলে উক্ত পুণ্যাহের পরই সেই হতভাগ্যের ভবলীলা শেষ হইল। উহার সহোদর সইফউদ্দৌলা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লাইবের কীর্তি — ক্লাইব সইফউদ্দৌলার নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়েন ও মীরজাফরের নিকট অন্তিমকালে পাঁচ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এই দুই টাকা একত্র করিয়া সর্বসমেত আট লক্ষ টাকায় আহত ইংরাজ সৈন্যগণের সাহাযার্থে বিলাতে এক দাতব্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং উহা লন নাই; নবাবের অর্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী আহত সৈনিকগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক্লাইবের সর্বপ্রধান কীর্তি। আরও কলিকাতায় ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে জন জ্যাকেরিয়া কায়ারণাণ্ডার নামক একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরীকে আনাইয়া উহার বাড়ি ঘরাদির যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম প্রোটেষ্ট্যান্ট পাদরী, উহার পূর্বে কলিকাতায় ফরাসি, পর্তুগীজ, রোমন কাথলিক পাদরীরাই গির্জায় মূর্তি পূজা করিত। ক্লাইব উহার পক্ষপাতী ছিলেন না। সেকালে এক বৎসরের মধ্যে পাদ্রীগণকে দেশী ও পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। কোম্পানীর কাছারিতে পর্তুগীজ আমলার অভাব ছিল না তজ্জন্য বাংলা ভাষায় অনেক পর্তুগীজ কথা স্থান পাইয়াছে। উহার পূর্বে কোন এক ব্যবসায়ী বার্ষিক পঞ্চাশ পাউণ্ড বেতন লইয়া পাদরীর কার্য করিত। তৎকালে জল কষ্ট দূর করিবার জন্য কলিকাতায় পুষ্করণী কাটাইবার নিমিত্ত জমি দান করিবার ব্যবস্থা হয়। ক্লাইব নটীগণের নিকট হইতে কর আদায় করা বন্ধ করিয়া দেন। কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে চিঠি পত্রাদি যাইবার ডাক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তখন চিঠি পৌঁছিতে ৩০ ঘন্টা লাগিত। সেকালে মগেরা জলপথে দস্যুগিরি করিত, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কাগজে উহাদিগকে দমন করিবার জন্য ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ক্লাইবের আমলে কলিকাতায় ইংরাজের দৌর্দণ্ড প্রতাপে লোকে স্পর্ধা করিয়া বলিতে আরম্ভ করে 'একি মগের মুল্লুক নাকি?'

নাচ তামাসা— তখনকার কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারিগণ কলিকাতার বিশিষ্ট হিন্দু অধিবাসিগণের সহিত সময়ে সময়ে উৎসবে নাচ তামাসায় একত্র বসিয়া প্রকাশ্যে আনন্দ উপভোগ করিতেন। শোভাবাজারের রাজবাড়ি, পোস্তার নকুধরের বাড়ি ও বড়বাজারের নয়ানচাঁদ মল্লিকের বাড়িতে প্রায়ই ক্লাইবাদি তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবগণসহ ঐরূপ উৎসবে যোগদান করিতেন। কলিকাতার রাস্তায় তখন বড় বড় ষাঁড়ের উৎপাত ছিল। ক্লাইবের পশ্চাৎ একটি ষাঁড় তাড়া করিয়াছিল, উহাতে তিনি উহাদিগকে কলিকাতার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার হুকুম জারি করেন।

কোম্পানীর নামজাদা বেণিয়াণ— কোম্পানী গৌরী সেনের অর্থবলে মীরকাশিমকে যুদ্ধে পরাজয় করে সেই হইতে "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। সুবর্ণ-বণিক গৌরী সেন কর্তৃক বিপুল অর্থ সরবরাহ করায় মীরজাফরের রাজ্যলাভ হইল কিন্তু তাঁহার সেই অর্থ আদায় হইল না। উহাতেই তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছিল, কিন্তু উহার ফলভোগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী করিল কিন্তু নবকৃষ্ণের ভাগ্য উহাতেই প্রসন্ন হইল। প্রবাদ হইয়াছে— **ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বন। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।*** কিন্তু নবকৃষ্ণ সেই যুদ্ধের সময় আডসের বেণিয়াণি করিয়া এবং মীরজাফরের নবাবী পুনরাধিকারের সময়ও সহায়তা করিয়া অতুল অর্থ লাভ করে।

নজরবন্দি— কলিকাতায় জমিদারীর খাজনার জন্য জমিদারগণের নজরবন্দি হইতে হইত।

* উহারই বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র সেন খ্যাতনামা মতিলাল শীলের শ্যালক ছিলেন। উহাদের বাড়ি কলুটোলা ও কিরাম লেনের গলির মোড়ে ছিল।

নন্দকুমারই উহার পথ প্রদর্শক, তিনি খাজনা আদায়ের জন্য কৃষ্ণনগর হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রকে কলিকাতায় নজরবন্দি করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মীরকাশিমের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া নিগৃহীত হইলেন। কলিকাতার ডেপুটি ফৌজদার গোবিন্দরাম মিত্রের লাঠির ভয়ে কলিকাতার চোর ডাকাত ভীত ছিল ও সেই হইতে গোবিন্দরামের ছড়ি প্রবাদ বাক্য হইয়াছে। মালিসন ক্রম প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ মহাবীর আডমসের সহিত পৃথিবীর যে কোন যোদ্ধার তুলনা হইতে পারে বলিয়াছেন, সেই বীর কলিকাতার স্বাস্থ্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়াবী সেইখানে বীরের সমাধি হইয়াছিল। এড্‌মিরাল ওয়াটসন ও আডামান খ্যাতনামা প্রভৃতি ইংরাজ বীববৃন্দের সমাধিস্থান বলিয়া কলিকাতার নামোল্লেখ ইংলণ্ডের ইতিহাসে আজ পর্যন্তও হয় নাই, বা কোন গৌরবের স্থান লাভ করে নাই, ইহাই বড়ই দুঃখের বিষয়।

বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ কলিকাতার গভর্ণর ভান্সিটার্টের সুখ্যাতি মীরকাশিমের নিকট হইতে বর্ধমানাদি গ্রহণের ও অর্থ লাভাদির জন্য না করিয়া থাকিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা উহার পরিণাম দেখিয়া আর রাজত্ব বৃদ্ধির বিরোধী হন। ক্লাইব দেওয়ানি লাভের পর স্বদেশে যাত্রা করিলেন, ভাবিয়াছিলেন যে, সেখানে শুভ পুণ্যাহে রাজস্ব নির্ধারণ ও বাংলা বেহারাদির সমস্ত অন্তর্বাণিজ্যের উপস্বত্বে কোম্পানীর কর্মচারিগণের উদর পূরণের ব্যবস্থা করিয়া স্বজাতির প্রেম ও প্রভুভক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ দ্বারা স্বদেশবাসির বিশেষ প্রশংসাভাজন হইবেন। বোধহয়, মুর্শিদাবাদের শুভ পুণ্যাহে সিংহাসনের নিকটে বসিয়াই কাল হইয়াছিল, কারণ উহার পরই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ক্লাইবেব এরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল যে, তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা ছিল না। যে সকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণকে তিনি দূর করিয়া দিয়াছিলেন তাহারা ও এদেশে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যাহারা আগমন করিত কিন্তু শেষে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে বিমুখ হওয়ায়, তাহাদের শক্তিশালি বিশিষ্ট আত্মীয় বা পৃষ্ঠপোষকগণ সকলে এক হইয়া ক্লাইবের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেন্ট সভায় যাহাতে তাঁহারা বিচার হয় উহার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলিকাতার গভর্নর লর্ড ক্লাইবের বিচারের কথা উহার অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলিতে হইবে; কারণ উহাতে তখনকার অনেক গূঢ় সত্য কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের মুর্শিদাবাদের নবাবেরা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেবলমাত্র অর্থ সরবরাহকার ছিল, একথা ক্লাইব তাঁহার বিচারকালে মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ক্লাইবের জীবন চরিত লেখক মালিসন সাহেব সেই বিচারের মূল কারণগুলির উল্লেখও ক্লাইবের সাপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। সেই চর্বিত চর্বণ করিয়া কোন ফলোদয় নাই, তবে ইহা একরূপ সর্ববাদিসম্মত যে, ক্লাইবের কলিকাতার প্রথম সন্ধিপত্রের সময় উমিচাঁদের জাল প্রতারণা ও মিথ্যা কথায় কলিকাতার নাম নিম্নলিখিত ছড়ায় কলঙ্কিত হইয়াছিল ঃ— **"জাল জুয়াচুরি মিথ্যা কথা এই তিন নিয়ে কলিকাতা"**।

ক্লাইব সেই সময়ে দেশেব ও দশের সম্বন্ধে তাঁহার বিচারের সময় বা তৎপূর্বে যাহা বলিয়াছেন উহাও উল্লেখযোগ্য। উহা করিবার পূর্বে ইহা বলা উচিত যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারগণের বাৎসরিক সভায় প্রস্তাব ক্লাইবের বিপক্ষ পক্ষগণের অধিকাংশ ভোটে বার্ষিক দশ টাকা হার সুদ হইতে সাড়ে বার টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল ও ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই ক্লাইব বিলাতে পৌঁছিয়া ঐ বিলাতের রাজা ও রাণীর সহিত সম্মানস্পদ সাদরাহ্বান সম্ভাষণ ও তাঁহাদের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের ধন্যবাদাদি লাভ

করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীগণ মীরজাফরের প্রদত্ত ক্লাইবের জায়গীর লাভ ও উহার উপস্বত্ব ভোগ দশ বৎসরের জন্য সর্বাদি সম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়াছিলেন। তখন ইংলণ্ডের রাজা ক্লাইবকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধে বিলাতে ও এখানে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে মঙ্গলজনক হইবে উহার প্রস্তাব তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার অনুমতি দান ও উহা যাহাতে কার্যে পরিণত হয় উহার চেষ্টা করিবেন বলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সস্ত্রীক ক্লাইব প্যারিসে বেড়াইতে যান তখনও কোনরূপ গোলযোগ ছিল না। ক্লাইবের ডাক্তার ও বন্ধুবর্গের উপরোধে স্বাস্থ্যলাভ ও উহার উন্নতি করিবার জন্য চৌদ্দ পনের মাস থাকিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আট মাসের অধিককাল থাকেন নাই। তিনি ও তাহার ছয়জন বন্ধু বিলাতের পার্লামেন্টে মনোনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সময় ইহার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই কেবল অভিমত প্রকাশ করিয়াই সফল হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধানুযায়ী ভারেলেষ্ট বাংলায় তাঁহার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইবের বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় প্রবেশ মঙ্গলজনক হয় নাই। ক্লাইবই বিলাতের খ্যাতনামা বিলাস গৃহাদি ক্রয় করিয়া বিলাতের আভিজাত্য গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের ইর্ষাকর্ষণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিলাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও শেষে এখানে তদন্ত সভা নিযুক্ত হইয়াছিল। বিলাতের পার্লামেন্ট সভায় কর্ণেল বরগয়েনই ক্লাইবের নিন্দা কুৎসার বিষয় উত্থাপন করেন ও শেষে পরাস্ত হন। ক্লাইব তখন পার্লামেন্টে যেরূপ নির্ভীকতার সহিত সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহাতে উহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কারণ উমিচাঁদের জাল তিনি নিজে না করিলেই উহার দোষ নীচ ব্যক্তির ন্যায় লসিংটনের উপরে দান করেন নাই, বরং স্পর্ধার সহিত বলিয়াছিলেন ঐরূপ ঘটনাস্থলে ঐরূপ কার্য করিতে তিনি সকল সময়েই প্রস্তুত ও প্রয়োজন হইলে পুনরায় করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। যদি তিনি উমিচাঁদকে ঐরূপে প্রতারিত না করিতেন তবে বহু লোকের জীবন যাইত ও শঠের সহিত শঠতা করাই রাজনীতি। তিনি স্পর্ধার সহিত বলেন যে, উমিচাঁদের প্রাপ্য টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন নাই। ইংরাজজাতি স্বদেশের ও স্বজাতির স্বার্থ গৌরব ও মান রক্ষার জন্য বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য যদি কোন অন্যায় কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কার্য করে উহা কখনই দোষের হইতে পারে না, বিলাতের মহাসভা এই রাজনীতির পোষকতা ও ক্লাইবের দোষ ক্ষালন করিয়াছিল। ক্লাইবের তিরস্কার উল্লেখযোগ্য, কি আশ্চার্য! যাঁহারা কিছু দিন হইল আমাকে জোর করিয়া বাংলার গভর্নর করিয়া পাঠাইয়াছিল ও বলিয়াছিল যে তাঁহারা বড়ই দুঃখিত যে তাঁহাকে শরীরের অসুস্থতাবশতঃ এত শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে হইল, তাঁহারাই কিনা শেষে আমার ষোল বৎসরের দখলি সম্পত্তি হরণ করিবার জন্য বিলাতের পার্লামেন্টে একজন ইতর চোর ডাকাতের যেরূপ বিচার হওয়া উচিত আমার বিরুদ্ধে সেইরূপ প্রার্থনা করিয়াছে। যদি আমি কাহারও নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি তবে উহার উল্লেখ ও বিচার হওয়া উচিত। আরও যে সময় কোম্পানির যুদ্ধেও জয়লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়া মহাপমান গ্রাহ্য না করিয়া কার্য করিয়াছি সেই সময় যদি আমি ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ সঞ্চয় করিতাম তাহা হইলে যে টাকা উপহার স্বরূপ লওয়ায় এখন দোষারোপ হইতেছে তদপেক্ষা যে শতগুণ অর্থলাভ করিতে পারিতাম। আমি আমার সংযম দর্শনে নিজেই আশ্চর্যান্বিত, কারণ তখন মনে করিলে মুর্শিদাবাদের রাজকোষাগারের বহুমূল্য মণি মুক্তা ধনরত্ন অর্থাদি সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারিতাম কিন্তু উহা করি নাই কেবলমাত্র মীরজাফরের প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

যদি তাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহারা আমার পৈত্রিক সম্পত্তির বার্ষিক পাঁচশত পাউণ্ড বাদে সমস্ত সম্পত্তি লইতে পারেন তাহাতেও আমি আপনাকে অধিকতর সুখী জ্ঞান করিব।" তাঁহার সেই সকল দারুণ শ্লেষব্যঞ্জক দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেন্টের সভ্যগণ দ্রবীভূত ও আর্দ্র হইয়াছিল। সিরাজের হত্যাকালে সেই বাড়ীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন ইহা একজন ফরাসি লেখক লুই হারমান প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ক্লাইবের শত্রুগণ সেকথা তাঁহার বিরুদ্ধে বলেন নাই।

যাহাই হউক, ক্লাইব বিলাতের বিচারে নির্দোষী প্রমাণিত হইয়া সুস্থির হইতে পারিলেন, তিনি রোগে দুঃখে ও অপমানে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য লাভের জন্য স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তিলাভ হইল না। রাত্রে নিদ্রা হইত না, থাকিয়া থাকিয়া ফিট হইত, শেষে জীবনের শেষ জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করার মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই দেখিয়াই পলাশি যুদ্ধের সেই অমর বীর স্বহস্তে ইহলীলা ১৭৭৪, ২২শে নভেম্বর শেষ করিয়াছিলেন। হায়! তাঁহার ইংরাজী জীবনচরিত লেখক কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন— "With all of faults Clive was one of the men who did the most for greatness of England." অর্থাৎ ক্লাইবের যতই কেন দোষ থাকুক না, তিনি ইংলণ্ডের অত্যন্ত মহত্ত্ববৃদ্ধিকারক মহাত্মাদের মধ্যে একজন গুণনীয় ব্যক্তি। আর তাঁহার বাঙালী জীবন চরিত লেখক এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"টাকার সহিত তিনি ভারতবর্ষ হইতে আর একটি দুর্লভ জিনিস লইয়া যান। তাহা অহিফেন, কেহ বলেন তিনি ইহার পাকা ব্যবহার করিতেন। পাকাই করুন আর কাঁচাই করুন, তিনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন।"

"ধনে মানে সকল অপেক্ষা বড়, তাই তিনি স্বদেশবাসিকে নানারূপ ভোজ্যে আপ্যায়িত করিলেও তাহারা তাঁহাকে দৈত্য দানব শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। যাহারা ক্লাইব অর্থে প্রতিপালিত হইত তাহারাও মূর্তিমান পাপের অবতার, ক্লাইবকে দূর হইতে উকি মারিয়া দেখিয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইত।"

ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন যে অর্থের দ্বারা সকলকে বশীভূত করা যায়। তজ্জন্য ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দশ লক্ষ টাকার অধিক অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। ক্লাইব কলিকাতায় যে একচেটিয়া ব্যবসারম্ভ করিয়া যান, উহাতে বিলাতে বসিয়া কোম্পানীর স্বত্বের অধিকাংশের মালিক হইয়া কলিকাতার গভর্নরীর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বেসর্বা হইবেন ভাবিয়াছিলেন। এদেশের মত স্বদেশবাসির সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহার শেষে দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। হায়! উহাতেই শেষে জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা জীবন শেষ করাই শ্রেয় হইয়াছিল।

বাঙালীর পলাশীর যুদ্ধের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতার শেষ, হত্যা ঃ— ইংরাজের রাজত্বের ও ব্যবসায়ের জন্য সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু ঘাতক হস্তে, আর ইংরাজ জাতির জন্য তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রকাশ্য পার্লামেন্ট সভায় শাস্তি বিধানের জন্য বিচারাধীন হইয়া অপমানিত হওয়ায় ক্লাইবের মৃত্যু স্বহস্তে হইল। হায়! রোগের ও দুঃখের জ্বালা নিবৃত্তির জন্য তিনি স্বয়ং আত্মহত্যা করিলেন। ধর্মের কি সূক্ষ্ম বিচার! কালের কি কুটিল গতি! এতদিনেও সেই সকল অভিনেতৃগণের কথা লইয়া বর্তমানকালে বিচার চলিতেছে। কত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, ঐতিহাসিকগণেরও দোষ গুণ বিচার উহার সঙ্গে হইতেছে। সে যাহাই হউক, কিন্তু এ কি অবিচার! ক্লাইবের সেই ন্যায্যান্যায্য বিচারযোগ্য

কলঙ্ক কালিমা কলিকাতার স্কন্ধে যাহা বর্তাইয়াছিল উহা এখনও ছড়ায় বর্তমান। সিরাজউদ্দৌলার প্রতি যে অবিচার হইয়াছিল উহার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকেই কালি কলম ধরিয়াছেন, লক্ষাধিক অর্থ ব্যয়ে দিল্লি হইতে আনীতা অপূর্ব সুন্দরী ফৈজীর চরিত্রদোষে উহাকে জীবন্তে সমাধিস্থ করিবার কথা লইয়া তিনি যে সচ্চরিত্রের পক্ষপাতী ছিলেন এই আন্দোলন চলিতেছে। সিরাজ লুৎফুন্নিসার গুণে যেমন মুগ্ধ সেরূপ ফৈজীর রূপজ মোহে মুগ্ধ ছিলেন না।

যাহাই হউক, এই দুই মহাত্মাই কলিকাতার উন্নতিকাবক। ক্লাইবই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর উচ্চ বেতনের বিরুদ্ধে কোনরূপ কটাক্ষপাত করেন নাই, বরং নবাবি রাজকোষ হইতে উহারা যাহাতে উহা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, কোনরূপ ষড়যন্ত্রাদি না করে, উহার ব্যবস্থা করিয়া যান। বর্তমানকালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সর্বোচ্চ রাজপ্রতিনিধি ঐরূপ বেতন লাভ করেন না। কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া গেল ঃ—

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রেজা খাঁ ও দুর্লভরাম যথাক্রমে বার্ষিক নয় লক্ষ ও দুই লক্ষ বেতন পাইতেন ও ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে নয় হইতে পাঁচ লক্ষে নামিয়াছিল। উহার পরে অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গুরুদাস ঐরূপ এক লক্ষ বেতন পাইতেন। ইহাতে বাঙালীরা ও মুসলমানেরা সেকালে কর্মচারী হইবার জন্য ইংরাজের তোষামোদ করিত ও অগত্যা তাহাদের পক্ষপাতী হইত। ক্লাইবের এই সকল কুটনীতিতেই বাংলায় মুসলমান রাজত্বের শেষ ও বাঙালীর সিংহাসন মুর্শিদকুলি খাঁর আমলের পর হইতে আর সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। উহা কিছুদিন পৈত্রিক সম্পত্তি স্বরূপ সরফরাজ পর্যন্ত চলিয়াছিল, শেষে যে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছিল সেই জগৎশেঠের সাহায্যে উহা লাভ করিয়াছিল। জগৎশেঠেরা কিছুকাল বাংলায় নবাবী লাভের সোনার কাঠি হইয়াছিল। শেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্টিধর পুরুষ ক্লাইব প্রমুখ কলিকাতা উদ্ধার করিয়া মীরজাফর মীরকাশিমাদির সৌভাগ্যোদয়ের বিধাতা দিল্লির সম্রাট সা আলম ইংরাজেরা তাহার অমান্য করিয়া সেই সকল অকর্মণ্য ব্যক্তিগণকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইতেছে দেখিয়া ক্লাইবকে দেওয়ানি দান করিয়া আপনার রাজস্ব আদায় ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখা কর্তব্য মনে করেন। ক্লাইবের দোষ গুণ বিচার সেইখানেই, কারণ বিধাতা যখন তাহাকে অর্থে সম্মানে ও ক্ষমতায় সমধিক উন্নত করিয়াও দুঃখী বাংলার বণিক জমিদার প্রভৃতির সর্বনাশের প্রতিবিধান না করিয়া উহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন! দেখিলেন তখনই তিনি তাঁহার রুদ্র দণ্ডে ধীরে ধীরে শাস্তিবিধান করিয়াছিলেন। যদি ক্লাইব মীরকাশিমের স্থাপিত অন্যায় কর ভার হইতে জমিদারগণকে মুক্ত করিয়া ন্যায্য রাজস্ব স্থির করিতেন, যদি তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের অভিমত লবণাদির ব্যবসা কোম্পানী করিবে না স্থির করিতেন, তাহা হইলে কোম্পানীর দেওয়ানি লাভে সকলেই সুখী হইত, তবে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত না, বিলাতে স্বদেশবাসি তাঁহার কর্মাদি লইয়া অভিযোগাদি গ্রাহ্য করিত না। বিলাতের কবি কাওপার সেই মর্মে গাহিয়াছিলেন—

"Remember Heaven has an avenging rod
To smite the poor is Treasen against God."

পূর্বে প্রকৃতপক্ষে, ক্লাইবই বাংলার দেওয়ানি লাভ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর ও বাংলার সজীব নবাব ছিলেন। ক্লাইবের বিচারে ইংলণ্ডের রাজশক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ নীচ কর্মচারীর উপর ছিল, ইহাই তখন বাংলার সকলে বিশেষতঃ কলিকাতাদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মক্ষেত্রে উহা সম্যক প্রচারিত হয়। সেই সময় হইতেই

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত।

এডমিরাল ওয়াটসন, লর্ড ক্লাইব যাহা চাহিয়াছিল মুর্খ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের ঈর্ষা ও অন্তর্দাহে ক্লাইবের বিচার প্রার্থনা করিয়াই উহা পূর্ণ করিয়াছিল। ক্লাইবের কার্যের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতায় পার্লামেন্টের বিচারের নিমিত্ত তদন্তকারিগণ আসিয়াছিল। উহাতেই কলিকাতাবাসি বাঙালীদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণের উপর এক অপূর্ব ভাবান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। উহাতেই নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণও প্রভৃতির অবনতি ও উন্নতি কলিকাতার গভর্নরাদির অনুগ্রহ ও নিগ্রহে আরম্ভ হয় ও তাঁহাদের বিলাতে বিচার হইতে থাকে। বাংলার সহিত বিলাতের বাণিজ্য সম্বন্ধ হইতে অবশেষে উহার রাজত্বের রাজস্ব লাভ ও কর্মচারিগণের সৎকর্ম ও দুষ্কর্মের পুরস্কার ও বিচার ক্লাইবের সঙ্গেই সূত্রপাত হইল। ক্লাইবকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বতোভাবে উন্নতিকারক বলিতে হইবে। যে দেশের লোক সেই দেশের লোকই তার দোষ গুণ বিচার করিতে পারে, বিদেশী পরাধীন ব্যক্তির উহা করিবার অধিকার নাই। "The English Army of traders in their march, ravaged worse than Tartarian Conqueror. The trade they carried on more resembled robbery than commerce. Thus this miserable country was torn to pieces by the horrible rapacity of the Foreign Trades." * অর্থাৎ সংক্ষেপে বিদেশী বাণিজ্যেই বাংলার সর্বনাশ হইয়াছিল।

ক্লাইব ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের কমিটিতে সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন উহাতে সেকালের বাংলার অবস্থা তখন কিরূপ ছিল অবগত হওয়া যায়।

"Bengal the country of inexhanstible riches, capable of making its masters the richest Corporation in the world."

"The city of Muxadabad is an extensive populous and rich as the city of London with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than any of the last city The inhabitants there must have mounted to some hundred thousand and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones " +

অবশেষে ধনরত্নসমন্বিত বঙ্গদেশ— তাহার অধীশ্বরকে জগতের সর্বপ্রধান ধনী বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে সক্ষম।

মুর্শিদাবাদ নগর লণ্ডন শহরেরই মত বিস্তীর্ণ, অর্থশালী ও জন বিশিষ্ট— কেবল এই প্রভেদ যে প্রথম নগরটিতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শেষোক্ত নগরের অধিবাসী অপেক্ষা বহুতর সম্পদশালী। ঐ নগরের অধিবাসী সংখ্যা কয়েক লক্ষ সুতরাং তাহারা যদি ইউরোপীয়দিগকে বিনষ্ট করিতে মনস্থ করিত, তাহা হইলে তাহারা, অনায়াসে লাঠী এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা করিতে পারিত।

ক্লাইবের সত্য কথার মূল্য অত্যন্ত অধিক, কিন্তু হায়! বর্তমান কালের ইংরাজগণের চিত্তাকর্ষণ করে না, ইহাই অতি দুঃখের বিষয়।

* Burke's Impeactment speech 15-2-1787.

\+ The evidence of Lord Clive before the Parliamentary Committee

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের কারণ

দেওয়ানি— ক্লাইবের পূর্বের গভর্নরগণের নামোল্লেখ মাত্র ইতিহাসে আছে কিন্তু ক্লাইবের কথা শেষই হয় না। তাঁহার শেষ বার কলিকাতায় গভর্নরী করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কেবল দায়ে পড়িয়া তাহার জমিদারির স্বত্ব দশ বৎসরের জন্য লাভ করিবার জন্যই, ক্লাইব গভর্নরী করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ভবিতব্যতার লিপি অলঙ্ঘনীয়! অতীত আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু উহা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় না। যদি লোক উহা করিতে পারিত, তাহা হইলে সংসার হইতে দুঃখ শোক দূর হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তিময় হইত। সেই লর্ড ক্লাইবের পদত্যাগের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য সম্পত্তি হরণ করিবার জন্য বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভায় তাঁহার বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ২৫এ নভেম্বর ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সেই মহাসভা এক বিশেষ তদন্ত সভা মনোনীত করেন ও শেষে সেই সভা— ১০ই ডিসেম্বর কোম্পানীর ১৭৫৬ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীয় ব্যবসার হিসাবপত্র সন্ধি বিগ্রহ বিষয়ক চিঠিপত্র দৃষ্টে এই মীমাংসা করেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লির সম্রাটের নিকট হইতে যে দেওয়ানি লাভ করিয়াছেন উহা ইংলণ্ডের রাজার প্রাপ্য। তজ্জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসর চার লক্ষ পাউণ্ড কর দান ও তদনুরূপ পাউণ্ডের মাল বিলাত হইতে রপ্তানি করিতে হইবে। কোম্পানী কোন এক বৎসরে বার্ষিক সাড়ে বার হারের উপস্বত্ব অধিক করিতে পারিবেন না, উহা দশ টাকার কম হইলে, তদনুপাতে করাংশ হ্রাস হইবে। আর যদি কখন ঐ লাভের বন্টনের হার বার্ষিক ছয় টাকার নিম্নে যায়, তখন কোম্পানীকে একেবারে বার্ষিক কর দান করিতে হইবে না। স্যার জন্ লিণ্ডসে ইংলণ্ডের রাজার রণপোতগুলির সর্বাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইলেন ও রাজার স্বত্ব রক্ষা সমুদ্রে থাকিয়া করিবেন। এইরূপে ক্লাইবের বিচার হইবার পূর্বেই বিলাতের মহাসভা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বিনা অর্থ, বল ও লোকক্ষয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ইংলণ্ডের পক্ষে লাভ করিল। এরূপ সৌভাগ্যোদয় পৃথিবীর মধ্যে কাহারও কখন হয় নাই।

পরিবর্তনশীল জগতের নিয়মানুসারে একদিক ভাঙ্গিল ও অন্যদিক গড়িল— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া আমেরিকার গগনে উদিত হইয়াছিল। হায়! ইংরাজ বণিকগণের শতাধিক বর্ষব্যাপী প্রভূত ধন রত্নোপহার, চিকিৎসা-কৌশল, অবিশ্রান্ত জীবনোৎসর্গ, নিগ্রহাপমান, ষড়যন্ত্র, চাতুরী, সন্ধি, যুদ্ধ বিগ্রহাদির সুফল লাভ তাহাদের না হইয়া শেষে ইংলণ্ডের রাজারই হইল; ইহাকেই বলে সৌভাগ্য। তখনই ইংরাজ মহাপুরুষগণের

পৃথিবীতে স্বর্ণ সিংহাসনে ইন্দ্রত্ব করিবার দ্বার উন্মুক্ত হইল। বামনাবতার ক্লাইব বলির নিকট যেন দেওয়ানি দান গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চক্রদণ্ডধারী চতুর্ভূজরূপে দ্বারিবেশে প্রহরীর কার্য করিতেছিলেন। ভগবান যদি আহম্মদ সা ডুরানি দ্বারা ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী পাণিপথ ক্ষেত্রে সম্মিলিত মারাঠা শক্তি খর্ব না করিতেন, তাহা হইলে লর্ড ক্লাইবকে পূর্বের মত ঐ দেওয়ানি পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিতে হইত। দেওয়ানি লইয়া মারাঠাদিগকে চৌথ দিয়া কি লাভ হইত? ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব বিলাতের প্রধান সচিবকে এদেশের অবস্থা ও দেওয়ানি সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে, তিনি কেন পূর্বে উক্ত দেওয়ানি গ্রহণ করেন নাই, কত ইংরাজ সৈন্য রক্ষা করিলে উহা গ্রহণ করিয়া দেশ শাসন করা যাইতে পারে, সেকালের মুসলমান সুবেদারগণকে কিরূপ বিশ্বাস কবা যাইতে পারে, * দেশের লোকেরা উহাতে কোন আপত্তি করিবে না, বরং তাহারা সন্তুষ্ট হইবে। উহার প্রত্যুত্তর তাঁহার প্রেরিত দূত ওলাস সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হওয়ায় ক্লাইব অত্যন্ত বিরক্ত হন ও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন। ক্লাইবের পত্র নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

"In taking this step there would be no opposition on the part of the people who would rejoice in so happy a change as that of a mild for a despotic Government, provided we agreed to pay him (Moghul Emperor) the stipulated allotment out of the revenues. Application has been made to me from the Court of Delhi to take charge of collecting this payment, the person entrusted with which his styled the King's Dewan and is the next person both in dignity and power to the Subah. But this high office I have been obliged to decline for the pesent, as I am unwilling to occasion any jealousy on the part of the Subah especially I see no likelihood of the Company's providing us with sufficient force to support properly so considerable an employ, and which would open a way for our securing the Subahship to ourselves. So large a sovereignty may possibly be an object too extensive for a mercantile company; and it is to be feared they are not of themselves able, without the nation's assistance to maintain so wide a dominion. I have thereupon presumed, to represent this matter to you, and submit it to your consideration wheather the execution and a design, that may hereafter be carried to still greater, lengths, be worthy of the Government's taking it in hand. I flatter myself I have made it pretty clear to you that there

* The reigning Soubahdar retains his attachment to us and probably while he has no other support will continue to do so; but Mussulmans are so little influenced by gratitude, that should he ever think it his interest to break with us the obligations he owes us would prove no restraint. He is advanced in years and his son (Miran) is so cruel worthless a young fellow, and so apparently an enemy to the English, that it will be almost unsafe trusting him with the succession So small a body as 2000 Europeans will secure us against any apprehensions from either the one or the other, and, in case of their daring to be troublesome, enable the Company to take (the advantage of) sovereignty upon themselves."

will be little or no difficulty in obtaning the absolute possession of these rich kingdoms, and that the Moghul will consent, on condition of our paying him less than a fifth of the revenues thereof. Now I leave you to judge. wheather an income yearly of upwords of £2000000 sterling, with the possession of three provinces abounding if the most valuable productions of nature and art. be an object deserving the public attentions, and whether it be worth the nation's while to take proper measures to secure such an acquisition which under the management of so able and disinterested a minister, would prove a source of immense wealth to the kingdom, and might in time be appropriated in past as a fund towards diminishing the heavy load of debt under which we at present labour"

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন ক্লাইবের প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হন নাই, কিন্তু যখন ক্লাইব কর্তৃক দেওয়ানি গ্রহণ করা হইল, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন না। ইহাই বিলাতি রাজনীতি, তখন তাঁহাকে মনে মনে লর্ড ক্লাইবের মহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে হইয়াছিল ও মহাসভায় তিনি উহা সাধারণে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিলাতের রাজার সনন্দ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, সুতরাং তাহারা সেই রাজার শাসনাধীন ও তদনুসারে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি ও ইংরাজ জাতির সন্ধির শর্তানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চন্দননগর প্রত্যার্পণ করিতে হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ সেই সময় হইতেই সূত্রপাত হইল। যখন দিল্লীর সম্রাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পল্টন লইয়া যেই যুদ্ধ করিতেছে, সেই জয়ী হইতেছে দেখিতেছিলেন, তখনই চতুর শাহ আলম এলাহাবাদে তাঁবুর ভিতর টেবিলের উপর বসিয়া নিম্নে ক্লাইবকে নতজানু করাইয়া কুর্নিশ গ্রহণান্তে দেওয়ানি পাট্টা দান করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে হইতে মুসলমানগণ চীৎকার করিয়া বলিল "জয় দিল্লিশ্বরের জয়। জয় সাহ আলমের জয়!" কিন্তু ইংরাজপক্ষ ইংরাজিতে তাহাদের আনন্দধ্বনিতে মুসলমানগণের যেন কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। সেই দুই শব্দের সম্মিলিত অস্পষ্ট ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। উহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিবাদ্য ও জয়গান হইয়াছিল। কোম্পানীর সিপাহিরা ক্লাইবকে সঙ্গে করিয়া আনন্দোৎসাহে কলিকাতায় প্রবেশ করিয়াছিল ও সেইখানে মহামায়ীর পূজা মহাড়ম্বরে করিয়া শ্রীশ্রী ৺কালীমাতার মন্দির হইতে নিম্নলিখিত গান গাহিতে গাহিতে কেল্লায় প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

"কালি গৈয়ে কলকত্তাকি, যিনকে পূজা ফিরিঙ্গি কিন,
বাঙ্গালিকো মুলুক ধনদৌলত দখল করলিন।"

কলিকাতা উদ্ধার ও সেইখানে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের সহিত সন্ধি এবং পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ ও ক্লাইবের সৌভাগ্যোদয় ও উপাধি লাভের মূল কারণ কিন্তু তিনি কলিকাতার ব্যারণ না হইয়া পলাশির ব্যারণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। ইহা নিশ্চয়ই রহস্যময় বলিতে হইবে। বাংলাদির নিয়মিতভাবে রাজস্বাদায় করা ও ক্লাইব রোমের প্রোটিয়ান গার্ডের সাহায্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইতেছিল উহাতে দিল্লির সম্রাটের যে স্বত্বহানি হইতেছিল সেই স্বত্ব ও মান্য অক্ষুণ্ণ রাখাই দিল্লির সম্রাটের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়ানি দান করার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তখন তিনি উহা মনের সুখে করেন

নাই কারণ দুঃখ কষ্টে মানবের মনে ধর্মালোচনা হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই দিল্লির সম্রাট পাদরী কায়ারনাণ্ডারকে ইংরাজের ধর্ম পুস্তক আরবি ভাষায় অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বোধহয়, তিনি তাঁহাদের ধর্মাধর্ম পর্যালোচনা করিবেন কিন্তু দেওয়ানি দান করিবার পূর্বে হইলেই ভাল হইত। ক্লাইব দেওয়ানি লাভ করিয়াই নানা কৌশলে সকলের চক্ষে ধুলিদান করিয়া সোনার থলি পূর্ণ করিবার উপায় করেন। সেই হইতেই " তোর শীল, তোর নোড়া, ভাঙবো তোর দাঁতের গোড়া" এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হয়।

রাজস্ব —মীরকাশিম নবাবী পদ লাভ করিবাব জন্য কলিকাতার ইংরাজ মহাপ্রভু গণের উদরপূরণ ও মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইলে নানাবিধ অন্যায় কার্য দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি ও অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। উহাতেই বাংলার রাজস্ব দ্বিগুণ ও পীরত্র ব্রহ্মত্র ও নিষ্কর জমির উপর কর ধার্য হইয়াছিল। উহাতে দেশের কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই ভগবানের নিকট ঐরূপ নবাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছিল। উহাতেই কোম্পানী দেওয়ানি লাভ করায় সকলেই প্রথমে যেন নিষ্কৃতি লাভ করিল মনে করিয়াছিল, কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। ক্লাইব এদেশেব রাজস্ব কিরূপ ধার্য হওয়া ন্যায্য মীমাংসা না করিয়া বা উহা ক্রমশঃই যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, এরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া এক অকর্মণ্য নবাব মনোনীত করিয়াছিলেন ও শেষে তাহার গোবব গণেশ সন্তানকে উপবেশন করাইয়া উহার মন্ত্রী শনি রেজা খাঁকে করিলেন। সেই রেজা খাঁ ও সভ্যগণ কোন সুবিচার না করিয়া নানা অত্যাচারে রাজস্বাদায় ও বৃদ্ধি করিতে লাগিল ও সেই সকল মুর্খ ব্যক্তিগণ আশাতীত বেতন লাভ করিয়া যেন অন্ধ হইয়া পড়ে। সেই সকল উচ্চপদ লাভের জন্য সেকালের ক্ষমতাপ্রিয় হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে বিলক্ষণ হিংসাদ্বেষ গাত্রদাহ সৃষ্টি করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদেই পূর্ববৎ রাজস্বের রাজস্বাদায় ও বিচারাদি হইতে লাগিল, সেখানে কেবল কোম্পানীর একজন তত্ত্বাবধায়ক ইংরেজ বেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাক্ষিগোপাল নবাব নিজামতীর উচ্চ কর্মচারীর পদপ্রার্থী কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কবিবার অনুরোধমাত্র কবিতে পারিতেন; কিন্তু উহাদের নিয়োগ, পদচ্যুতি বা বিচার সমস্তই কলিকাতার কোম্পানীর গভর্নর ও সভ্যগণ করিতেন। তখন এদেশের সকল বড় বড় লোক বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা বেতন প্রাপ্তির জন্য কলিকাতায় নানাবিধ উপায়ে ঐ সকল উচ্চ ইংরেজ কর্মচারিগণের মনসন্তুষ্টি কবিত। মহারাজ নন্দকুমার ও রেজা খাঁ ঐ পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। কলিকাতার উচ্চ কর্মচারিরা কোন না কোন এক পক্ষাবলম্বন স্বার্থ সম্বন্ধে করিতেন। তখন যোগ্যতার বিবেচনা করিয়া সেকালের হিন্দু মুসলমান উচ্চ কর্মচারিগণ নিযুক্ত হইতেন না। উহাদের তখন বেতন অধিক না হইলে কোম্পানীর উচ্চ কর্মচাবিগণের উদর পূরণের ব্যবস্থা কোথা হইতে হইবে? নির্যাতীত জমিদারগণ যাহাতে তাহাদের কর বৃদ্ধি না হয় সেজন্য তাহাদিগকে অর্থদানে বশীভূত করিত। সেই নূতন দ্বৈত শাসন প্রণালীর ফল অতীব সুন্দর হইল। নিজামতীর উচ্চ কর্মচারীগণের যৎপরোনাস্তি কঠোব শাসন দ্বারা জমিদারীব রাজস্ব বৃদ্ধি হইত ও সেই অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত জমিদারগণের বিপত্তে মধুসূদন স্বরূপ কলিকাতার উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীগণের ষোড়শোপচারে পূজাদি কবিয়া শরণাপন্ন হইতে হইত। ইহাতে সেকালের দেশের জমিদার ও উচ্চ স্বদেশী কর্মচারীরা ইংরাজ গভর্নর ও তাঁহার সভার সভ্যগণের কামধেনু স্বরূপ হইয়াছিল। অথচ সেই সকল অত্যাচাব যে স্বদেশবাসী করিতেছে ও ইংবাজ সুবিচার

করিতেছে ইহাও এক অন্যায় ধারণা সাধারণ লোকের মনে বদ্ধমূল ইইতেছিল। কি অপূর্ব কৌশল! সেকালেব রাজস্বাদায় কিরূপ উত্তরোত্তব বৃদ্ধি হইয়াছিল. নিম্নে তালিকা দ্বারা উপলব্ধি হইবে।

১৭৬১।২ খ্রীষ্টাব্দে	১৩৯৫৯৫৯ পাউণ্ড	১৭৬২।৩ খ্রীষ্টাব্দে	১৩০৫৬৫২ পাউণ্ড
১৭৬৩।৪ ”	১৩৬৬৪৬৩ ”	১৭৬৪।৫ ”	১৮৬১৭২৬ ”
১৭৬৫।৬ ”	৩৬৬৬৩৪৭ ”	১৭৬৬।৭ ”	৩১৮১৭৬৩ ”
১৭৬৭।৬৮ ”	২৯৯৬৫৩৮ ”	১৭৬৮।৯ ”	৩৯৩৩২৫৫ ”
১৭৬৯।১৭৭০”	৩২৮৭৭০৬ ”	১৭৭০।১ ”	২৭৯৭৩০৬ ”

খেলাৎ —ক্লাইব মুর্শিদাবাদের দরবারে শুভপুন্যাহ সময় সাক্ষিগোপাল গোবর গণেশ নবাবকে মসনদে বসাইয়া খেলাৎ আদি বিতরণ আরম্ভ কবেন। উহার ব্যয় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দুই লক্ষ ষোল হাজার আটশত সত্তব টাকা হওয়ায বিলাতেব কর্তৃপক্ষগণ উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই আশ্চর্য কৌশল খেলাৎ দান দ্বারা অনেকেই বিনা বেতনে কোম্পানীব অনুগত ভৃত্যের ন্যায় কার্য করিত। উহাতেই মুর্শিদাবাদেব দরবারে পূণ্যাহ কর্মের সময় লোকে লোকারণ্য হইত ও সেই দববারের মহাসমাবোহের মধ্যে দেশের লোকে কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন লাভ করিত। লোকে তখন তাঁহার হস্তে খেলাৎ লাভ করিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত।

নতুন ব্যবসা— তখন দিল্লির বাদশাহ আপনাকে গৃহশক্রব হস্ত হইতে রক্ষা কবিবার নিমিত্ত দেওয়ানি দান কবিয়া দেশের কি সর্বনাশ করিয়াছিলেন পরবর্তী ঘটনায প্রমাণ হইয়াছিল। ক্লাইব রাজস্বাদায় ও শাসন প্রণালীকেও এক নূতন অর্থকরী ব্যবসায় পরিণত করিয়াছিলেন। ক্লাইবের সময় এইরূপ দেওয়ানি কার্যাবম্ভ হইয়াছিল মূর্খ মীরকাশিম প্রমুখ নবাবগণ যে অযথা বাজস্ব বৃদ্ধি আদি করিয়া দেশের সর্বনাশ ও দশেব উপর অত্যাচার করিয়াছিল উহার কোন প্রতিকার কি ক্লাইব, বা তাহাব পরবর্তী কোন শাসনকর্তা বা বিলাতের পার্লামেন্ট সভা কেহই কিছু করেন নাই, ইহা অতি দুঃখেব বিষয় বলিয়া বোধহয। উহাব জন্যই বোধহয় বিধাতার অভিশাপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিলাতের রাজাকে কর দান করিতে হইয়াছিল। ভগবান উদাহবণ দ্বাবা করভাব কার্যতঃ কিরূপ দুঃসহ উহাই তখন উক্ত কোম্পানীকে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত সুযোগ দান করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

কলঙ্ক —সেকালের কোম্পানীর কর্মচারীরা যখন সামান্য কার্য করিত তখন এদেশের লোকের সহিত তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও তাহাদের প্রতি যে অত্যাচারাদি হইতেছে উহার প্রতিকারের জন্য পরামর্শ ও সাহায্য দান করিত; কিন্তু তাহারা যেমন কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইত, অমনি যেন তখন তাহাদের সম্পূর্ণ পবিবর্তন হইত। লোকে আন্তরিক দুঃখে উহার প্রতিকারের পথ না থাকায় বলিতে আবম্ভ করে যে, **“যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ”** ও সেই কথা এখন প্রবাদ হইযাছে। তখন বামায়ণ মহাভারতই লোকের জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষাব একমাত্র অবলম্বন ছিল, সেইজন্য উহার উপমা দিয়া তখনকার লোকে আপনাব সুখ দুঃখ বিবৃত কবিত। কলিকাতায় বোগে শোকে জর্জবিত ইংবাজ কর্মচারিগণ অর্থলাভ লালসায় সে সব দুঃখ যেন অনুভব করিত না ও উহাদের অপরের দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল না। হায! তখন যাঁহারা এদেশের গণ্য-মান্য বরেণ্য ব্যক্তি, যাঁহারা চেষ্টা করিলে

স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখ দারিদ্র্য আদি কষ্ট দূর করিতে পারিত, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্বার্থোন্নতির জন্য সর্বদা মুগ্ধ ও ব্যস্ত! হায়! যে রবার্ট ক্লাইব বাঙালীর সহানুভূতি ও আন্তরিক সাহায্যে এই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন ও আপনার দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিয়া উচ্চ পদবী ও গৌরব প্রতিষ্ঠা সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও দেওয়ানি লাভ করিয়া এদেশের জমিদার ও প্রজা সকলকেই উদ্বাস্তু করিলেন। তখন এদেশে চারিদিকে স্বার্থপরতার জলন্ত দৃষ্টান্ত সকলের আদর্শ হইয়াছিল। অর্থ ও পদপ্রাপ্তির লোভে, স্ব স্ব পদোন্নতি ও বিলাস বিভব ভোগ করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর দাসত্ব করা প্রায় সকলের ধ্যান ও ধারণা হইয়াছিল। তখন যেন সকলে উহা করিতে পারিলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত।

কোম্পানীর এই দেওয়ানি লাভ হওয়ায় মুসলমানগণ বাংলার যথার্থ মসনদ হইতে একরূপ বঞ্চিত হইলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সিরাজউদ্দৌলার উপর নানা অযথা কলঙ্কদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার পক্ষের অধিকাংশ লোক মনের দুঃখে সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার করুণ উক্তির গল্পটি এখনও বলিয়া থাকে। পলাশি যুদ্ধের কবি উক্ত নবাবের অন্যায় চিত্র অঙ্কন করিয়া যে মহাপরাধ করিয়াছিলেন উহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন তাঁহার জীবনীতে উহা উল্লিখিত করিয়াছেন। কারণ তিনি তাঁহার পিতার নিকট উহা শ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয় উহা তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যে স্থান পায় নাই। মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার অনুগ্রহে বা মূর্খতায় যে রাজ্যাপহরণ করে উহা তাহার ভোগে হয় নাই; ইংরাজ বণিক কর্মচারীগণই উহার ধনরত্নাদি সর্বস্ব লাভ করিয়াছিল। উহা নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট হইতে দুই ফকিরের তরমুজ লাভের গল্পে উক্ত হইয়া থাকে। একজন ফকির নবাবের কৃপা, অপরে ভগবানের কৃপায় দুঃখ দূরের পথ বলিত। সেই দুই ফকিরের উক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য নবাব প্রথম ফকিরকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সুপক্ক তরমুজের মধ্যে ধনরত্ন দান করিল, আর অন্যকে একটি সুপক্ক তরমুজ মাত্র প্রদান করিল। উহাদিগকে পরদিন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলা হইল। ভাগ্য চক্রে উহারা পরস্পর তরমুজ বিনিময় করিয়াছিল। উহাতেই সিরাজউদ্দৌলা বলিয়াছিল ঃ —"**নাহি দেনেসে মৌলা; কেয়া করেগা সিরাজউদ্দৌলা**" হায়! শেষে সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধেও সেই উক্তি সম্যক প্রযুজ্য উল্লিখিত হইতে পারে।

ভাগ্য ও ভগবান-- পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে মূর্খ নবাব সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে তৎকৃত শপথাঙ্গিকার পূর্ণ করিবার জন্য যে মুকুট শিরদেশ হইতে উহার সম্মুখে ত্যাগ করিয়াছিল উহা মীরজাফর শিরে ধারণ করিয়াছিল বটে কিন্তু শেষে উহার রাজ্যের সমস্তই বিদেশী ইংরাজ বণিকগণের হস্তগত হইল। যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম শুভ হয় নাই। ভাগ্যই বলবান! মানব ঘটনাচক্রে উহা অর্জন করিয়া থাকে। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ এদেশের গণ্ডগোল যুদ্ধ হত্যাকাণ্ড মীমাংসা করিবার নিমিত্ত লর্ড ক্লাইবকে নানা উপরোধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি কলিকতায় পদার্পণ করিবার পূর্বেই উহার সমস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছিল। যাহা কিছু বাকি ছিল উহা তিনি করিলেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভান্সিটার্ট, কর্ণেল ফোর্ড ও স্ক্রাফটন আরোরা জাহাজে এদেশে তদন্ত করিবার জন্য আসিতেছিল কিন্তু তাঁহাদের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। ক্লাইব যখন এখানে কার্যারম্ভ করেন তখন চারজন মনোনীত সভাপতি তিনমাস অন্তর ক্রমান্বয়ে সভার সভাপতিত্ব করিবেন স্থির করিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ হুকুম প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহারা সকলে একমত হইয়া উহা

কার্যকরী হইবে না স্থির করেন ও ক্লাইবকেই স্থায়ী সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি ভান্সিটার্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদেশে তদন্ত করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় ক্লাইবের বিচার ফল অন্যরূপ হইত। উহাতেই তাঁহারা ঘটনাচক্রে বিস্মৃতির অতল গর্ভে সমুদ্রে লুক্কায়িত হইলেন। ক্লাইব কখনও বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের আদেশানুসারে কোন কার্য্য করেন নাই, কি সন্ধি, কি বিগ্রহ, কি ব্যবসা, কি শাসন, কি দেওয়ানি সকলই নিজের মতে অনুগত সভ্যগণের অনুমোদনে করিয়াছিলেন ও স্বয়ং ও বন্ধুবর্গ সকলেই অপরিমিত অর্থলাভ করিয়াছিল। তাঁহার মূল অস্ত্র ছিল ষড়যন্ত্র; তিনি একজন উহার প্রধান নেতা ও কর্তা ছিলেন। তাঁহার অধীনে যাহারা কার্য করিত তাহারাও সকলে অর্থশালী মর্যাদাবান হইয়াছিল। ইংরাজেরা ক্লাইবকে পলাশি যুদ্ধের নেতা বলিয়াই গৌরব করিয়া থাকেন ও তিনি সেইজন্য আভিজাত্য লর্ড পদবী লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু উহার যথার্থ মূল্য যে কি উহা নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরকে মহারাজা উপাধি লাভের সনন্দ দানের সময় কোম্পানীর কর্মচারি মণি সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন উহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

" Government had conferred on the Rajah the title of Maharajah Bahadur because he had long thought him worthy of it It was through the advice and assistance of the ancestors of this Rajah that the British founded the magnificient Empire in Hindustan. If it were not for that assistance, Lord Clive would never perhaps have succeeded in winning the battle of Plassay অর্থাৎ বোধহয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপদেশ ও সহায়তা ব্যতীত লর্ড ক্লাইব কখনই পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইতেন না। " **একে বলে ভূতের মুখে রাম নাম।**"

প্রায়শ্চিত্ত — কোম্পানী ব্যবসাদারের রাজত্বে অর্থের ব্যাপারে মুড়ি মিছরির একদর। সেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজস্বদানের বিলম্ব হওয়ায় স্ক্রাফটন সাহেব তাঁহাকে সামাজিক দণ্ড দ্বারা জাতি নাশ করিবার ভয় প্রদর্শন করাইয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রকে ঐজন্য কলিকাতায় নজরবন্দি পর্যন্ত করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। লর্ড ক্লাইব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ব হ্রাস করিয়া ও পলাশি যুদ্ধ লব্ধ কতকগুলি কামান উপহার দিয়া যে সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন, তিনি যদি উহার মর্মাবগত হইতেন তবে তাঁহার সেই দুর্দশা হইত না। মানবের উদ্যমশীল হইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন সর্বাগ্রে করা উচিত; তবে কেবল চাতুরি চক্রান্তে আলস্যের উদাহরণ স্বরূপ হওয়া বা নিশ্চিন্তে রাজস্ব আদায় করিয়া বিলাস, জাতি, কুল, মানের ভিখারি হইয়া তন্নিমিত্ত অর্থ নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারে না। গোপাল ভাঁড় প্রমুখের ভাঁড়ামিতে বা কবি ভারতচন্দ্রের অশ্লীল আদিরসের প্রশ্রয়দান বা বানরের বিবাহে অর্ধ লক্ষ অর্থ ব্যায় করা শ্লাঘার কথা নয়। প্রকৃত জমিদারের ন্যায় দেশের যাহাতে মঙ্গল হয় সে বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে ভাল হইত। ক্লাইবের ন্যায় উদ্যমশীল ব্যক্তি ইংরাজ জাতির গৌরব— তিনি মিঃ রসকে ১৫ই এপ্রিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যে পত্র প্রেরণ করেন উহাতে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন যে সৈন্যসামন্ত দ্বারা বাণিজ্য রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আবার যখন দেখিলাম যে উহা অপেক্ষা সৈন্য তৈয়ারি করিয়া উহাদিগকে কাহারও সাহায্যে প্রেরণ করা অধিকতর লাভজনক ব্যবসা তখন উহাই অবলম্বন করিয়াছি। এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন পশ্চাদনুবর্তন করা যায় না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যদি ক্লাইবের ন্যায় উদ্যমশীল হইতেন, তাহা হইলে চেষ্টা করিলে তিনিই অনায়াসে বাংলার

দেওয়ানি লাভ করিতে পারিতেন। সৌভাগ্য ও উদ্যম উভয়ই মানবের উন্নতির পথ। উহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিলেই মানব কৃতকার্য হইতে পারে। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিয়া ফল লাভ করা উচিত; "**সময়েতে ফলে বৃক্ষ সর্বদা না ফলে**"। ক্লাইবের আর এক প্রধান গুণ যে তিনি আশ্রিত প্রতিপালক ও তাহাদের উন্নতিকারক ছিলেন।

গুরুদক্ষিণা— কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীরা এদেশী পৃষ্ঠপোষকগণের দ্বারা কিরূপ চক্রান্তে কেমন কবিয়া অর্থলাভ করিতে হয় উহা শিক্ষা করিত ও তাহার ফলভোগ করিয়া প্রভুদিগকে গুরুদক্ষিণা দান করিত। উহাতেই কলিকাতায় রাজা মহারাজার ছড়াছড়ি ও গড়াগড়ি হইয়াছিল। সেকালে মোগল শাসনকর্তারা অত্যন্ত অল্প সৈন্য লইয়া দেশ শাসন করিত। সুতরাং তখন অস্ত্রশস্ত্র হাতি পাল্কি আদি ব্যবহার করা সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত কেহ করিতে পারিত না। ক্লাইবের অনুগ্রহে কলিকাতায় উচ্চ নীচ হইয়াছিল ও নীচ উচ্চ হইয়াছিল। কোম্পানীর অনুগৃহীত ব্যক্তি যতই অপরাধী হউক বা সমাজে তাহার স্থান যেমনই হউক, তাহাকে উন্নত করিতে হইবে। কারণ উহা না করিলে লোকে কেন কোম্পানীর কর্ম করিয়া দেশের সর্বনাশ করিবে। ক্লাইব প্রমুখ সৃষ্টিধর মহাপুরুষ দেওয়ানি লাভ করিয়া যেরূপ স্বজাতি ও স্বদেশের রাজার দুঃখ দূর করিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের মুন্সি দেওয়ান ও বেণিয়াণগণেরা রাজা মহারাজা উপাধি, হস্তী, পাল্কি আরোহণ দিল্লির সম্রাটের সনন্দে করিয়াছিল। উহাতেই রাজবল্লভ, নন্দকুমার, রামচরণ, সুখময় প্রভৃতি সকলেই মহারাজা উপাধিলাভ, চার পাঁচ হাজার সৈন্যরক্ষা ও হাতী পাল্কী আরোহন করিবার সনন্দ লাভ করিয়াছিল। কোম্পানী সেই সকল উপাধির সনন্দ দিল্লি হইতে আনাইয়া প্রদান কালে কলিকাতায় বা অন্যত্রে শোভাযাত্রায় উহা জাহির করিত। সেকালে যাহারা কোম্পানীর সহায়তা করে তাহাদের কিরূপ সৌভাগ্যোদয় যাহাতে দেশের নরনারী সকলে উদাহরণ দৃষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য আড়ম্বরের শোভাযাত্রা আবশ্যক হইয়া পড়ে। লোকে তখন উহাদিগকে কোম্পানীর পোষ্যপুত্র বলিয়া উপহাস করিত। উহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত কোম্পানী তাহাদের পরামর্শে কলিকাতায় এক নূতন বিচারালয় সৃষ্টি করেন। উহাতে জাতি সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করা হইত। সেই আদালতের বিচারপতি হইতেন সেই সকল কোম্পানীর পৌষ্যপুত্রগণ। উহাতেই সেই উপহাস বন্ধ হইয়া সকলেই তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অত্যন্ত সম্মান করিত। কোম্পানীর কর্মচারীরা যে কেবল ব্যবসা ও রাজত্ব করিত উহা নয়, এইরূপে তখন সমাজ শাসনও আরম্ভ করিয়াছিল। মহাপ্রভুদের কৃপায় সেই সকল এদেশের মহাপুরুষগণ সকলেই কলিকাতায় বাস করিতেন ও তাঁহাদের রাজত্ব বা জমিদারী করিবাব কোন কিছু অভাব হয় নাই। তাঁহারা একরূপ স্ব স্ব প্রভুদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের উপাধি ও বংশ মর্যাদা তাঁহাদের দ্বারাই হইয়াছিল বলিলেই চলে। তথাপি তাঁহাদের লইয়া কলিকাতায় দলাদলি বিবাদ হইত, ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের পার্লামেন্টেও কোম্পানীর সৃষ্টিধর গভর্নরগণও যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত ও অপমানিত হইতে লাগিলেন। সেইখানেই বাংলা ও বাঙালীর মাহাত্ম্য ও ইংরাজের অপূর্ব কীর্তি !!! বাংলায় বল্লালী পন্থায় রাজ্যশাসন ও জাতি বিচার আদর্শ হইয়াছিল।

আশ্চর্য প্রত্যুপকার —এদেশের ব্যবসায়ীরা তখন কোম্পানীর বীর ও বরপুত্রগণের ন্যায় কোনরূপ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, বরং তাহারা তাহাদের পৈত্রিক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সঞ্চিত অর্থ ঋণদান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সুদের উপস্বত্বে জীবন-যাপন করিতে আরম্ভ করে।

সেইখানেই ক্লাইবের সর্বাপেক্ষা অধিকতর কলঙ্ক ও অপরাধ। বাংলায় পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে জনসাধারণ এক অসভ্যোচিত ইতর নিষ্ঠুরতায়, অদম্য পাশবিক ইন্দ্রিয়াসক্তি, দুর্দমনীয় অত্যাচার ও অর্থপীড়নে প্রপীড়িত ছিল; তাহারা ভাবিয়াছিল যে ইংরাজ জাতি বৈজ্ঞানিক শিক্ষিত রণনিপুণ ও ব্যবসায়ী, তাহাদের অভ্যুদয় হইলে সকলে এবং যাহারা তাহাদিগকে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য কেমন করিয়া করিতে হয়, অর্থ সাহায্যাদি দ্বারা উহাদিগকে শিখাইয়াছিল তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইবে কিন্তু পরিণাম অতীব শোচনীয় হইল। ব্যবসায়ীও ধনে প্রাণে মারা গেল। বাংলাদেশে ইংরাজ ব্যতীত আর কেহই ব্যবসা করিতে পারিল না। তাহাদের একাধিকার ব্যবসা ক্লাইবের কঠোর শাসন দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাইবের গভর্নরীব শাসন ও ব্যবসা রীতি দ্বারা ব্যবসার কিরূপ লাভ কোম্পানীর কর্মচারীগণ করিত উহার মর্ম পূর্বের সহিত পরবর্তীকালের তুলনা করিলেই উহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় কুড়ি বৎসর ব্যবসা করিয়া টমাস ফক্‌নার নামে এক কোম্পানীর সামান্য কর্মচারী মৃত্যুকালে উইলে তাহার সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া যান। উহাতে তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিক মূল্য অবধারিত করিবাব উপায় নাই বটে, তবে উহাতে যে সকল দানোল্লেখ আছে উহাতে তাহার সম্পত্তির পরিচয় অনুমান করা যায়। সেই ব্যক্তি তাহার মাতাকে দশ হাজার পাউণ্ড, গর্ভনব ফিচের কন্যাকে (যাহাকে সে ভগ্নি বলিয়া সম্বোধন কবিত) সাড়ে ছয় হাজার পাউণ্ড, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দুই হাজার ও ভৃত্য আন্টিলোপকে বিলাতের শিক্ষাদান করিবার জন্য আড়াইশত পাউণ্ডের সুদ দান করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তুল্যাংশে দুই সহোদরকে প্রদান করেন। * আর সেকালের ইংরাজগণের মধ্যে যিনি বাংলা ভাষায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন ও এদেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন, তিনিও বলিয়াছেন যে, কতকগুলি কোম্পানীর কর্মচারী প্রদেশে গোপনে দুই বৎসর একাধিকার + লবণ, পান ও তামাকের ব্যবসা করিয়া যাট জন অংশীদারকে দশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার লাভাংশ বিতরণ করেন।

তখন এদেশের লোক পরিশ্রমী ছিল জমিদারগণের ন্যায় অলস ছিল না। স্ত্রী পুরুষ বালক সকলেই স্ব স্ব পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত ধনে জীবন নির্বাহ করিত। দিবাভাগে গৃহস্থালী করিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকিত উহা স্ত্রীলোকেরা বয়ন, সুতাকাটা শিল্পাদিতে ও পুরুষ বালকেরা পৈত্রিক বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিত। দেশের অভাব দেশের লোকে দেশের দ্রব্য ব্যবসায়ীর দ্বারা বিনিময়াদি করিয়া পূরণ করিত। বিদেশীর মুখপ্রত্যাশী হইয়া আমদানী ও রপ্তানির অভাবের অনুপাতে দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। এদেশের ব্যবসার মূলে কুঠারাঘাত বিলাত হইতে পার্লামেন্টের আইনে চার লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য আমদানি করিতে হইবে বিধিবদ্ধ করায় হইয়াছিল। পূর্বে যে জিনিষ বিক্রি করিয়া এদেশের বণিকগণ অন্যদেশ হইতে ধনাগম করিত, উহার পথ সেই বিদেশী বণিকের ব্যবসায় ও দেওয়ানিতে শেষ হইয়াছিল। শিল্পীকে কোম্পানীর কর্মচারীগণের শাসনদণ্ডে ও চাতুরীতে কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াও দাসত্ব করিতে হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা নষ্ট হয় নাই। দেশে রোগে

---

* Geantleman's Magazine 1784

+ 45 per cent profit in Salt trade in nine months অর্থাৎ লবণের ব্যবসায় নয় মাসে বার্ষিক শতকরা ৪৫ টাকা হারে লাভ হইয়াছিল। (Martin's History P 306)

দুর্ভিক্ষে যে কিছু দুঃখ দারিদ্র্য উপস্থিত হইত তখনকার কালে উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার পথ ও উপায় ছিল; কিন্তু কতকগুলি মুর্খ গোবরগণেশ নবাব ও তাহাদের কর্মচারীগণের ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করায় ও উহার প্রতিবাদ না করিয়া জমিদারগণ পীড়ন করিয়া নিরীহ প্রজার নিকট রাজস্ব আদায় করায় কৃষকগণ পলায়ন ও জমি জায়গা পতিত হইতে থাকে। কি ছিল !! কি হইল!!!

ক্লাইব ইউরোপীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই বা কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন নাই। তাঁহার যাহা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই কলিকাতায় হইয়াছিল; কি ব্যবসা, কি জমিদারী, কি যুদ্ধ জয়, কি রাজ্যাধিকার, কি সন্ধি, কি বিগ্রহ সমস্তবই হাতে খড়ি ও নৈপুণ্য লাভ কলিকাতায় হইয়াছিল। তিনি এদেশেই ঐ সকল শিক্ষা করিয়া যে গুরুদক্ষিণা দান করিয়াছিলেন উহা বিস্মৃত হইবার কথা নয় ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্লাইবের শাসন প্রণালীতে দেশের ভয়ানক সর্বনাশ হইয়াছিল। প্রাচীন জমিদারগণ যতদিন পূর্ব সঞ্চিত ধনরত্নাদি ছিল, ততদিন তাহারা উহা দ্বারা পৈত্রিক সম্পত্তি জমিদারী রক্ষা করিয়াছিল কিন্তু শেষে উহা কোম্পানীর কর্মচারীগণের উমেদারগণের করতলস্থ হইল। উহারা কেহ বিনামূল্যে, কেহ স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াছিল। বর্তমান গভর্নমেন্টের সাহায্যে মিঃ জর্জ ডবলিউ ফরেষ্ট সেকালের কোম্পানীর কাগজপত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন উহার মুখবন্ধেই ঐরূপ বলিয়াছেন ঃ—

" The double Government established by Clive, by which, the internal administration of the Country had been placed in the hands of natives under the control of a few European supervisors. had proved a failure The people grew poorer day by day and the native functionaries and Zaminders richer. To remedy the evil, the court of Directors determined to place the internal administration of Bengal and the Collection of the revenue directry under their own European servants. They henceforward determined to use their own words to Startforth as. Duan" অর্থাৎ ক্লাইবের শাসন প্রণালী বিলাতের কর্তৃপক্ষ ফল দ্বারা বিভ্রাটকারী ও অনিষ্টকারী মনে করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা এদেশী লোকজনের সাহায্যে কোন কার্য করা যুক্তি সঙ্গত নয় স্থির করেন। সেই হইতে ইংরাজি কর্মকর্তাগণের দ্বারা এদেশের শাসন ও রাজস্ব আদায়াদি আরম্ভ হইয়াছিল। ক্লাইবের শাসন প্রণালী অনুসারে কার্য করিবার ভার ভেরিলষ্ট ও তাঁহার পরে কার্টিয়ারের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহারা ক্লাইবের যুগের লোক ও পরবর্তী শাসন কর্তা ছিলেন। কলিকাতার ইংরাজ শাসনকর্তাগণের নামের সহিত তাঁহাদের শাসনকালের তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

১৭৪৮ খ্রীঃ ২৭শে জানুয়ারী হইতে উত্তরাধিকারের সময়ারম্ভ পর্যন্ত মিঃ আলেকজাণ্ডারসন্
১৭৫২ ,, ৮ই জানুয়ারী ,, ,, ,, ,, উইলিয়ম ফিচ্
১৭৫২ ,, ৮ই আগষ্ট ,, ,, ,, ,, রজার ড্রেক্
১৭৫৮ ,, ২৫শে মার্চ ,, ,, ,, কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব
১৭৫৯ ,, ২৪শে নভেম্বর ,, ,, ,, মিঃ হেনরি ভান্সিটার্ট
১৭৬৪ ,, ২৬শে ,, ,, ,, ,, ,, জন স্পেনসার

১৭৬৪ খ্রীঃ ১লা জুন ,, ,, ,, ,, লর্ড ক্লাইব
১৭৬৭ ,, ২৬শে জানুয়ারী ,, ,, ,, ,, হ্যারি ভেরিলষ্ট
১৭৬৯ ,, ১৬ই ডিসেম্বর ,, ১৭৭১ খ্রীঃ ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত মিঃ জন্ কার্টিয়ার।

ইহাদের রাজত্ব ও শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদিকাণ্ড শেষ হইয়াছিল। আর ওয়ারেণ হেস্টিংস ক্লাইবের যুগের লোক ও তিনিই সন্ধিক্ষণের সন্ধিপূজায় মহামায়ীয় নিকট ব্রাহ্মণ নরবলি দান করিয়া কলিকাতার মাহাত্ম্য বর্ধিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার — সেই মহাত্মা নন্দকুমার কলিকাতার অধিবাসী ও কলিকাতা হইতে নবাব মীবজাফরেব বাজ্য প্রাপ্তির জন্য যাবতীয় চক্রান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তিনি সেইখানেই নিগৃহীত হইয়াছিলেন। **ক্লাইবই** মীরজাফরের **বিধাতা পুরুষ,** কিন্তু শেষে নন্দকুমার শ্বশুর জামাতার সিংহাসন বিনিময উপন্যাসের ন্যায় করাইয়া অনেকের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। সেইজন্যই তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে কোম্পানীর মাতা মণি বেগমের অনুরোধও উপেক্ষিত হয় ও রেজা খাঁ নিজামতির সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন। সেই নন্দকুমারই বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ দ্বাবা রেজা খাঁর পদচ্যুতি করাইয়াছিলেন। সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর কিরূপ ক্ষমতা ছিল, উহা নন্দকুমারের কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হয়। তাঁহাব বিচার বিভ্রাট লইয়া বাংলায় ও ইংরাজিতে বহু পুস্তক প্রকাশিত হইযাছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিলেই চলে। তবে তাঁহারা নন্দকুমারের সহিত কলিকাতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা যাহা প্রকাশ করেন নাই উহাই বলিতে হইবে। কলিকাতাতেই তাঁহার বিচার ও লীলা শেষ হইয়াছিল। পূর্বে সেইখানে তিনিই বেজা খাঁব শাস্তি বিধানের আয়োজন অতি দক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে অর্থের মোহিনী শক্তির নিকট তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল। ক্লাইব ভেবিলষ্ট প্রমুখ গভর্নরগণ মুর্শিদাবাদে গমন করিলে মণি বেগমের আতিথ্য স্বীকার হিসাবে প্রতিদিন দুই হাজার টাকা লাভ করিতেন, একথা ওযারেন হেস্টিংসের বিচারের সময় প্রকাশ হইয়াছিল। সেজন্য নন্দকুমারকে ইতিহাসে ধন্যবাদ দান করা উচিত ও সেকথা এখানে উল্লেক করা অবশ্য কর্তব্য।

"Every Governor coming to Murshidabad received two thousand rupees a day in lieu of provisions, beyond that Munny Begum had not given a single cowrie and every payment would appear on the record. At the trial Warrren Hastings the managers of the impeachment having summoned the auditor of the India office, he read from a book of public accounts a statement of the allowance made at Murshidabad to Lord Clive first and next to Mr. Varelst when they were Govenrors which confirmed the truth of the Begum's declaration that every Governor at Murshidabad received the same allowance as Hastings." (Forrest selection from Government records) xxxviii Introduction.

নন্দকুমার এদেশী কর্মচাবী বলিয়া এই সকল গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যতে কোম্পানীর কর্মচারীগণের অর্থোপায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই বোধহয়, বিদেশী কর্মচাবীগণের দ্বারাই এদেশের যাবতীয় কর্ম করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। নন্দকুমার যখন নবাব মীরজাফবেব দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মুর্শিদাবাদের রাজকার্য করিতেন, তখন ওযারেন

হেষ্টিংস সেইখানে রেসিডেন্ট ছিলেন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ভিন্ন কোন বিবাদ ছিল না।

ওয়ারেন হেষ্টিংস — কলিকাতার আদিকাণ্ডে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরিচয়ও পুরাতন প্রথায় শাসনাদির বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। হেষ্টিংস কলিকাতায় সর্বপ্রথমে কেরানিগিরি করিতেন ও সিল্ক মসলিনের যাচাই ও ইনভয়িস্ লিখিতেন। পরে মুর্শিদাবাদে বন্দি হইলে পলতায় পলাইয়াছিলেন ও ক্লাইবের অধীনে বজবজের যুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার কোম্পানীর সভায় সভ্যরূপে গভর্নর ভান্সিটার্টের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সততার জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিলাতে পনের বৎসর কার্যের পর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গমন করেন ও পূর্বোক্ত ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের তদন্ত সভায় এতদ্দেশের কর ও রাজা নবাবগণের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিয়া বিলাতের কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মাদ্রাজের গভর্নরের সভায় নিম্নে দ্বিতীয় সভ্য মনোনীত করেন। সেই হইতেই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। কোম্পানীর রাজত্বকালের আদিকাণ্ডের শেষ ও অন্ত্যলীলার আদি হেষ্টিংসই পত্তন করিয়া ইতিহাসে কলঙ্ক ও গৌরব উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতির পর হইতে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের সেখান হইতে এদেশের প্রতিনিধি বা কর্মচারীগণের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করিবার কোন সুযোগই ছিল না। ক্লাইবের একাধিকার ব্যবসা বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের হুকুমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল। উহাতে লবণের অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি হওয়ায় উহা গরীব প্রজাগণকে কর স্বরূপ বহন করিতে হইয়াছিল। দরিদ্রের দুরবস্থা চিরকাল, কিন্তু সেকালের এদেশী কর্মদক্ষ অর্থশালী ব্যক্তিরও সেই দশা হইয়াছিল।

সেকালের পদমূল্য ও মর্যাদা— ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের তদন্তফল যাহা বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল উহাতে প্রকাশ যে, কোম্পানীর প্রধান প্রধান কর্মচারিরা নবাবকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইবার ও রেজা খাঁকে কর্মকর্তা করিবার জন্য উহাদের নিকট হইতে সতের লক্ষ টাকার অধিক লাভ করিয়াছিলেন। আরও তাঁহারা ঐ পদ প্রদানের পূর্বে দুর্লভরাম ও নন্দকুমারের নিকট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা উপহার লাভও করিয়াছিলেন, কিন্তু রেজা খাঁ তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পদের যথার্থ মূল্য দান বা কর্তাগণের মর্যাদা স্বরূপ উপহার দান করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহাও কি এক নূতন ব্যবসা নয়, যে, যাহার জন্য ক্লাইবের ও পরবর্তী গভর্নরের মর্যাদা রক্ষিত হইত এমন অর্থকরী গৌরবের পদ মর্যাদা তখন বোধহয়, আর কোথাও বর্তমান ছিল না। সেইজন্যই তখন কলিকাতায় সৌভাগ্যলাভ করিবার জন্য রোগ ও প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া লোকে গভর্নরী করিতে আসিত। সেই সকল ভাগ্যবান পুরুষেরা স্বদেশে নবাব বলিয়া আদৃত হইতেন। কলিকাতা ইংরাজের অর্থলাভ ও শক্তি বিস্তারের কেন্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ উহার নিকটবর্তী স্থানে থাকিয়া সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই। ইহাতেই কলিকাতার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হয়। ফরাসিরা ইংরাজগণ অপেক্ষা বলশালী ছিল, কারণ ক্লাইব কলিকাতায় আসিবার পূর্বেই উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিবার কৃতসঙ্কল্প করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লারও সেইরূপ ধারণা ছিল।

রাজধানী— কোন নগর রাজধানীতে পরিবর্তিত হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে সেই নগরের

ক্রমশ কালে উন্নতি হইয়া থাকে, সেরূপে কলিকাতা কিছু হয় নাই। বাংলায় কোন এক স্থানে কোন এক বাণিজ্য বা শিল্পকেন্দ্রীভূত হইয়া ব্যবসা চলিতেছিল। উহাতে ঢাকা, শান্তিপুর আদি স্থান বিখ্যাত হয়, কিন্তু দেশের দুরবস্থায় ও ইউরোপের ব্যবসায়ীগণের কুঠিতে মাল সরবরাহ করায় ও তাহাদের অধীনে শিল্পীগণ কার্য করায় সেই সকল স্থানের গৌরব ক্রমশই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইংরাজের প্রাদুর্ভাব ও ফরাসিগণের দুর্দশা হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একাধিকার ব্যবসা ও শাসনদণ্ডে লোকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প করিতে পারিত না, দেশে দুর্ভিক্ষে ভোগবিলাসের দ্রব্য উৎকৃষ্ট কারিকরগণ বিক্রি করিতে না পারিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য করিতেছিল। উহাতেই তখন কলিকাতায় আসিলে লোকের সৌভাগ্যোদয় হয়, ইহা কি ব্যবসায়ী, কি শিল্পী, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু তখনও উহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই। উহাতেই দেশে রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল। সেইজন্যই কার্টিয়ারের রাজত্বকাল খ্যাত ও ভেরিলষ্টের সময় চট্টগ্রামাদি স্থানের বিলিবন্দোবস্তাদি হইয়াছিল। তাঁহারই দেওয়ান বা মুন্সী গোকুল চন্দ্র ঘোষাল ঐ কার্য করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। তিনিও গোবিন্দপুরে থাকিতেন শেষে দুর্গ নির্মাণ কালে ভূকৈলাসে বাসারম্ভ করেন। তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র জয় নারায়ণ ঘোষাল উচ্চ উপাধিলাভ ও মান সম্ভ্রমাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। উহাই ভেরিলষ্টের কীর্তি বলিলেই চলে। কলিকাতার টাঁকশালে টাকা হইতও তাহারও ব্যবসা চলিয়াছিল। ক্লাইব উহার ব্যবসা কেমন করিয়া করিতে হয় জগৎশেঠের বংশধরগণের নিকট হইতে সেই শিক্ষালাভ করেন ও উহার গুরুদক্ষিণায় এদেশে ঐ ব্যবসা আর কাহাকেও করিতে হয় নাই।

পোদ্দারি— কোম্পানীর কর্মচারীরাই কেমন করিয়া পরের ধনে পোদ্দারি করিতে হয় সর্বসাধারণকে শিক্ষা দান করেন ও উহা কালে চলিত কথায় পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় যাহারা পোদ্দারি করিত, উহাতে তাহাদিগকে ঘর বাড়ি বাগান আদি বিক্রি করিতে হইয়াছিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর রাজা নবকৃষ্ণ অতি অল্প মূল্যে পোদ্দার বীরেশ্বর সেনের আঠার কাঠা বসতবাড়ি নয়শত টাকায় ও গোবিন্দচন্দ্র শীলের বাগান খরিদ করিয়া সেইখানে বসবাস করেন মুন্সী নবকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদের নবাবগণের বিলাস বিভব যাহা দেখিয়াছিলেন ও যাহা কিছু হস্তগত করিয়াছিলেন উহা স্বয়ং ভোগ করিবার নিমিত্ত উহা দ্বারা নবাবি প্রাসাদ ও দাস দাসী, সপ্তপত্নী বা উপপত্নী কোন অনুষ্ঠানেরই কোন ত্রুটি করেন নাই। শেষে উহা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতায় বৃহৎ অভিযোগাদিও হইয়াছিল। বাগবাজারের নামকরণ পেরিণের বাগানের নাম হইতে হইয়াছিল, হিন্দুস্থানী ভাষায় বাগানকে বাগ বলে। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ঐখানে মাটির বুরুজে কামান দ্বারা রক্ষাবন্ধনী হইয়াছিল; উহা ১০ই মার্চ ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নয়ানচাঁদ দত্তের নিকট হইতে সাতশত টাকায় খরিদ করা হয়, কলিকাতায় তাঁহার নামে রাস্তা আছে। বাগবাজারের নিয়োগীরা পুরাতন বাসিন্দা— বোধহয়, উহাদের পূর্বপুরুষ কেবলরাম নিয়োগী কলিকাতায় মাশুল আদায়ের জন্য যে সকল মাল আটক ও বিক্রি হইত তন্মধ্যে লৌহ খরিদ করিত। ঠাকুর গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর গালা মোমবাতি ও ফ্রান্সিস ডিকোষ্টা চাউল খরিদ করিত। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নামেও কলিকাতায় রাস্তা আছে। হায়! তখন দেশের কি দুরবস্থা— তখন লোকে সেই আটকি মাল খরিদ ও বিক্রি করিয়া ব্যবসা করিত, উহাতেই দু পয়সা লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বড় মানুষ হইত।

স্মৃতি— ইতিহাসে ক্লাইব ও সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি কলিকাতা অধিকার করার জন্য বহন

করিতেছে হায়! সিরাজের কলিকাতা অধিকার ক্ষণস্থায়ী, সে পুরাতন কলিকাতার চিহ্নমাত্রও এখন নাই, আছে কেবল তাহার সৈন্যগণের আস্ফালন ধ্বনি যাহা ছড়ায় চলিত ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে—

"নবাব বাহাদুরকো ফৌজ, যৈসি খোলা তলোয়ার
ঘড়ি ভরমে জিৎ লিয়া, কেল্লা কলকাত্তা বাজার।"

তাঁহার প্রদত্ত সেই আলিনগর নামও নাই, সেই স্মৃতি মাত্র আলিপুর বহন করিতেছে। তবে তাঁহার কলঙ্ক কাহিনীর স্মৃতিমাত্র ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন কর্তৃক শ্বেতমর্মরে পুনরুদ্দিপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কৃত কলিকাতা সন্ধির সর্তানুসারে মিরজাফর উত্যক্ত রাজকোষ হইতে কলিকাতা দগ্ধ কবিয়া উহার ক্ষতিপূরণের অর্থ শেষে দান করিয়াছিলেন ও উহাতেই কলিকাতার পুর্নগঠন হইয়াছিল; সিরাজের সেই স্মৃতি চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা আর এক স্মৃতি আরও অধিকতর গৌরবময়, সিরাজ ক্লাইবের প্রতিদ্বন্দ্বি, ক্লাইব কলিকাতার যুদ্ধে যাঁহাকে সাক্ষাৎ সংগ্রামে পরাভব অসম্ভব প্রত্যক্ষ করিয়া ষড়যন্ত্র ভিন্ন উপায় নাই স্থির করেন ও সৈন্যাধক্ষকে গোপনে বশীভূত করিয়াছিলেন। সেই রাজ্যলাভ অসিদ্ধ ও অস্থায়ী হইবার ভয়ে সিরাজকে গোপনে হত্যা করিতে হইয়াছিল। কারণ যখন সেই নবাবকে রাজধানীতে ধৃত করিয়া আনা হয় তখন সৈন্যনায়কগণ বিচলিত হইয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিলে যে রাজ্যোদ্ধার করিবেন ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিয়াই মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম তাঁহাকে ধৃত করিয়াছিলেন। যদি সেই নবাব অকর্মণ্য, লম্পট ও অত্যাচারী ছিল, তবে এসব করিবার প্রয়োজন কি? হায়! পলাশি যুদ্ধের কবি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ফৈজী ও লুৎফুন্নিসার পরস্পর বিরোধী নারী চিত্র দ্বারা যৌবনোন্মত্ত নবাবের চরিত্র অঙ্কিত না করিয়া কি এক বিসদৃশ চিত্রই উপহার করিয়াছেন।

কাম ও প্রেম— মুসলমান রমণীগণের মধ্যে ফৈজি ও লুৎফুন্নেসা কাম ও প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ! নবাব কামুক ফৈজীকে জীবন্ত সমাধি দান করেন ও লুৎফুন্নিসা যতদিন জীবিতা ছিলেন নবাবের সমাধি পূজা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ প্রেমের উৎসর্গ স্বরূপ ত্যাগ করিয়াছিল। চমৎকৃত ইংরাজ জাতি ঐতিহাসিকগণও সেই কথা উল্লেখ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করিয়া থাকে। হায়! হতভাগ্য সিরাজের হৃদয়রাজ্য যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারী অপেক্ষা শতগুণে মূল্যবান। সেই হৃদয় এক সময় দিল্লির আলোকসামান্যরূপসী নর্তকী ফৈজীর রূপ ও প্রেমাস্বাদন করিবার জন্য যখন লক্ষ মুদ্রা উপহার করা তুচ্ছ করিয়াছিল, কিন্তু যখন যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গের মধ্যে মত্ত নবাব সেই রূপমাধুরীর মধ্যে পবিত্র প্রেমের লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না, কেবল কামই বিদ্যমান, কেবল উহার ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা করাই মুখ্য লক্ষ্য, যখন সে ঐরূপ শ্লেষোক্তির দ্বারা নবাবের আত্মমর্যাদা লঙ্ঘন করে, তখনই তিনি তাহাকে উপযুক্ত কঠোর শাস্তি দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তিনি আর রূপজ মোহে মুগ্ধ অপদার্থ যুবক নন! অবার ক্রীতদাসী জারিয়ার মধ্যে যখন প্রেমসুরভি আঘ্রাণ করিয়াছিলেন, তখন মাতামহের শত শাসনানুরোধ উপেক্ষা করিয়া সেই ক্রীতদাসীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লুৎফুন্নেসা নাম দান সার্থক, জগৎ উহার যথার্থতা প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও ইতিহাসে উহার স্মৃতি বর্ত্তমান। গুণীর নিকটই গুণের আদর, সিরাজ গুণগ্রাহী প্রেমিক নবাব ছিলেন।

লুৎফুন্নিসা— নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রেমিক, তিনি লম্পট ছিলেন না। সেইজন্য বাজত্ব

ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার সময়ও লুৎফুন্নিসাকে ত্যাগ করেন নাই। সেই লুৎফ (ভালবাসা) নেসা (স্ত্রী) নবাবের ভালবাসার পত্নী, সিরাজউদ্দৌলার প্রেম রাজ্যের অপূর্ব কীর্তিস্তম্ভ! আহা! হৃত ও হত সিরাজের পাষাণ নির্মিত সমাধি স্তম্ভ কামিনীর কোমল হৃদয়ের উৎস নয়নের জলে স্নাত ও পবিত্র হইত। জগত মুসলমান যুবতীর যাবজ্জীবন অলৌকিক আত্মোৎসর্গ ও প্রেমোপহার দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত! ক্লাইবের বা মীরজাফরের হৃদয়ে যদি প্রণয়বেদনা যে কি, প্রেম কি বস্তু কখনও অনুভূত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কখনই সিরাজউদ্দৌলার ঐরূপ নির্দয় হত্যা তাঁহারা কেহই কখনও অনুমোদন করিতেন না, আর যদি উহা তাঁহাদের অজ্ঞাতে হইয়া থাকিত, তবে তাঁহারা হত্যাকারীকে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দিতেন না। সেই পবিত্র প্রেমের স্মৃতি নবাবের সকল কলঙ্ক মোচন করিয়াছিল। কলিকাতা দগ্ধের অনুতাপার্থে যে অর্থদান করিয়াছিলেন উহার পুনর্গঠন দ্বারা নবাবের স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

মহত্ত্বের লক্ষ্যভেদ— সেই সাধ্বী রমণীর গভীর প্রেমের মধ্যেও নবীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যরক্ষার চেষ্টা ও কর্তব্যকর্মের অবহেলা না করা, মহত্ত্বের প্রধান প্রমাণ। ক্লাইবের সদ্‌গুণের মধ্যে একমাত্র ভোগ ও অর্থ লালসা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কলিকাতার ভীষণ রৌদ্র, বর্ষা, রোগ, হিংসা, দ্বেষ, অপমান, অধর্ম, কিছুতেই ক্লাইবের সেই কামনা ও অর্থ লাভ লালসা তিরোহিত হয় নাই। শত্রুর সেনাপতির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কোন্ বীর তাহাকে বশীভূত করে, না তাহাব রাজত্বাপহরণ করিয়া নিজের বীরত্বের পরিচয় দান করে, না, উহার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত আপনার উপাধি সংযুক্ত করে? সেইখানেই ক্লাইবের মহত্ত্বের ও বীরত্বের পরিচয়! প্রবঞ্চনা করিয়া রাজ্যলাভ কাপুরুষ আলস ব্যক্তিরই পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে। যখনই ক্লাইবের বিচার মুক্তির পর সেই সূক্ষ্ম বিষয় বিবেকে আঘাত করিতেছিল, তখনই তিনি কাতর হইয়া যন্ত্রণায় মুক হইয়া পড়িতেন। শেষে বোধহয় **"যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর"** এই দুঃখে হৃদয় দগ্ধ হইত বলিয়া তিনি ঐরূপ করিতেন। মানবমাত্রেই দোষগুণ বর্তমান, তবে তিনি যে ক্ষণজন্মা পুরুষ একথা অস্বীকার করা যায় না ও ইংরাজ জাতিমাত্রেই তাঁহার সুখ্যাতি করিবে। বিলাতের সুবিখ্যাত মন্ত্রীর কথা সকলের ধ্যান ও ধারণার বিষয় হইয়াছে। তিনি মুক্তকণ্ঠে ক্লাইবের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐরূপ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা তাঁহার জীবনে আর কাহারও মুখে পূর্বে শ্রবণ করেন নাই ও তিনি যে, মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য করিয়াছেন উহার প্রতি সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করা উচিত। ঐরূপ মহৎ কার্যে ব্যক্তিগত দোষগুণ বিচার করিলে চলিবে না, দেখিতে হইবে ক্লাইব স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য ভারতবর্ষের সহিত এদেশের বাণিজ্য ও রাজস্ব সম্বন্ধে এক অভিনব শৃঙ্খলাবদ্ধন করিয়াছেন, যাহাতে কালে উভয় দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে। ঐরূপ কার্যে কতকগুলি দুষ্কর্ম অনিবার্য, উহা উপেক্ষা করিতে হইবে। সেই সূক্ষ্ম বিচার বিলাতের মহাসভার অধিকাংশ সুধীবৃন্দ সাদরে অনুমোদন করিয়াছিলেন, আর ক্লাইব সসম্মানে মুক্ত হইলেন। স্বদেশবাসী বিলাতের সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার জন্য ইংলণ্ডের জয়! ধর্মাবতার ক্লাইবের জয়! বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান বাহাদুরের জয়! কিন্তু হায়! ইত্যাকার জয় জয়কার ধ্বনিতেও ক্লাইবের আত্মকৃত অপরাধের শাস্তি হইল না। সেখানেই ক্লাইবের হৃদয়ের যথার্থ মহত্ত্বের পরিচয়। যাহার জন্য ইংরাজ জাতি ধন্য হইতে পারেন, কিন্তু হায়! সেকথা তাহার জীবন চরিত লেখকগণ কেহই বলেন নাই। বিচারের পর দেশ-বিদেশে ভ্রমণ

করিলেন কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ পাইলেন না, শেষে নিরুপায় হইয়া সর্বাপেক্ষা প্রিয় জীবন ক্লাইব স্বহস্তে রক্ষা না করিয়া বিসর্জন করিলেন। ইহা কি ভগবানের শাস্তি, না, ইহা মুর্খতার ফল? হায়! উষ্ণ রক্তের স্রোতে দগ্ধ অনুতপ্ত জীবনের স্মৃতি শেষ করিলেন। হায়! ক্লাইবের স্মৃতি সুখজনক নয়, কলিকাতায় তাহার স্মৃতির অভাব নাই। সেখানেও সব লাল ঃ— বাংলার লাল পল্টন, কলিকাতার লালদিঘি, লালবাজার, লালরাস্তা, লালকুঠি সমস্তই তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। কলিকাতার মাটি পোড়াইয়া লাল করিয়া ইংরাজ কর্মচারিগণের জন্য লালদিঘির উত্তরে বৃহৎ লাল বাড়ি হইয়াছিল। উহাকে এখন Writer's Building বলে। লালপল্টন পুরাতন দুর্গের মধ্যে থাকিত, দিঘির জল ব্যবহার করিত, তাহাদের জন্য উহার নিকটে বাজার ও কুচকাওয়াজের জন্য লাল রাস্তা ছিল। সকলেরই নাম সেই লালপল্টনের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া লালে লাল হইয়াছিল। উহাতেই লালদিঘি, লাল বাজার ও লাল রাস্তা (Red Road) নামোৎপত্তি। তাঁহার অবস্থান গৃহস্থলে কলিকাতার সুন্দর (Royal Exchange) গৃহ নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর তাহার নামে অফিসগৃহ (Clive House) নির্মাণ করিয়া কলিকাতার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেই রাস্তা ক্লাইবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে ও যাবতীয় বিদেশী বণিকগণ সেই রাস্তার ধারে কার্যালয় করিয়া এখনও পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থোপার্জন করে। তখনও যেরূপ এদেশবাসীর রক্ত জল করিয়া ব্যবসা চলিয়াছিল এখনও সেই ধারার পরিবর্তন হয় নাই, এদেশের যে কিছু ব্যবসা প্রায় সমস্তই বিদেশীদের হস্তে, স্বদেশের লোক কিছুই করিতে পারে না। উহাই ক্লাইবের মহিমা ও সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল স্মৃতি। ইউরোপবাসীর অর্থই তাহাদিগকে একাধিকার ব্যবসা করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছে, সেইজন্য এখন আর ক্লাইবের শাসনদণ্ডের আবশ্যক হয় না। ক্লাইবের কলিকাতায় মর্মর প্রতিমূর্তি ছিল না সেই অভাব লর্ড কার্জন তিনিই করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয় মুসলমানগণের মধ্যে এখন এমন কেহই বর্তমান নাই যে, যিনি মুসলমান জাতিকে তাহাদের কর্তব্যপরায়ণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি কলিকাতায় স্থাপন করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ কবিতে উপদেশ দান করেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের সমাধি স্তম্ভই কি সেই কার্য করিবে? কলিকাতাতেই প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগল বাহিনীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইখানেই ইংরাজ ও নবাবী সেনার প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মে পাদরী কায়ারনাস্তার ষাট হাজার টাকায় প্রথম প্রোটেষ্টান গির্জা কলিকাতায় করিয়াছিলেন ও মিসেস কিণ্ডার্সলি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সর্বোৎকৃষ্ট রাস্তা কষ্টম গৃহ হইতে বৈঠকখানায় গিয়াছিল ও ইংরাজদিগের মধ্যে যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে অর্থ সাহায্য করে সেরূপ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই বলিয়াছেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে অস্থায়ী গির্জা পুরাতন দুর্গের মধ্যে হইয়াছিল, পুরাতন টাঁকসাল তখন সেন্টজন গির্জার পশ্চিমে ছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক জাতি কলিকাতায় ব্যবসা করিতে আসে ও তাহারা কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ীর স্থানাধিকার করিয়াছিল। কলিকাতার আয়তন বৃদ্ধিকারক ভান্সিটার্ট ও উহার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণকের স্মৃতি সেইখানের রাস্তার নামে রক্ষিত হইতেছে। সেকালের ইংরাজ কর্মচারীগণের কায়ব্যূহ সমস্তই লালবাজার লালদিঘি ক্লাইব ষ্ট্রীটে ও বৌবাজারে ছিল। বৌবাজারের নাম সেকালের ব্যবসার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। মুর্শিদাবাদে যখনই নবাব পরিবর্তন হইত তখনই বেগমগণকে ভরণ-পোষণ দান করা অপেক্ষা তাহাদিগকে বিতরণ করা হইত। পলাশির যুদ্ধের পরে ক্লাইবের ভাগ্যে সেইরূপ উপহার লাভও হইয়াছিল তবে সে সময়ে তাহাদিগকে কোথায় কিভাবে রাখিয়াছিল উহার কোন সঠিক সন্ধান পাওয়া

যায় না। দমদমায় ক্লাইব হাউস বাগান এখনও বর্তমান, বোধহয়, সেইখানেই সেই সকল উপহারলব্ধ * ললনারা বাস করিত। বৌবাজারের আশে পাশে ফিরিঙ্গি পল্লী ও নানা জাতীয় বেশ্যা এখনও বাস করে ও পূর্বেও থাকিত। সেই হইতে উহার নামে বৌবাজার হইয়াছিল অর্থাৎ রাত্রে লালবাজার লালদিঘি হইতে কোম্পানীর কর্মচারীরা ঐ সুন্দর রাস্তায় সুন্দরীর হাটে অর্থের সদ্ব্যবহার আহার বিহারের সঙ্গে করিত। উহাতেই ফিরিঙ্গি জাতির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সেকালে এদেশে ইউরোপের স্ত্রীলোকেরা রোগ জলবায়ু গ্রীষ্মাদির জন্য আসিত না। বোধহয় যে, পূর্বোক্ত মুর্শিদাবাদের উপহারের সদ্ব্যবহারে সেকালে ফিরিঙ্গি সংখ্যাবৃদ্ধি হইত, সেইজন্য ঐখানে ফিরিঙ্গির বাস অধিক হইয়াছে। ফিরিঙ্গিরা সেই বৌবাজারে কালীপূজা করিত ও সেই + কালীঠাকুর এখনও বর্তমান ও ফিরিঙ্গি বিশেষণে উক্ত হইয়া থাকে। মারাঠার স্মৃতি উহাদের ভয়ে যে খাত নির্মাণ হয় উহাতে বর্তমান আছে। বৌবাজারে ফিরিঙ্গি বারবণিতার সহিত মুসলমানীগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইউরোপবাসী মহাপ্রভুগণ হিন্দুকেও ত্যাগ করেন নাই। তখন কলিকাতার বিলাস-বিভব মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন থাকিলেও অনেকেই সেখান হইতে অর্থ লাভ লালসায় যাতায়াত ও অবস্থান করিত। সেকালের মুর্শিদাবাদের মুন্সী বা কোম্পানীর উচ্চকর্মচারীগণ কলিকাতায় নবাবদের হীরামতি ঝিলের প্রাসাদের অনুকরণে কলিকাতাকে সজ্জিত করিতেছিল। সেইখানের নাচ গানে ক্লাইব প্রমুখ উচ্চ ইংরাজ গভর্নরগণ যোগদান করিত।

মুর্শিদাবাদ মসনদ— নবাবের আমলে মুর্শিদাবাদে দিল্লির নর্তকীবৃন্দ আগমন করিয়া নবাবগণের প্রধান মহিষী হইয়াছিল, মীরজাফরের মণি ও বর্বু পত্নীদ্বয় সেইরূপ। অর্থের লহরীতে ও ইংরাজ মহাপ্রভুদের কৃপায় তাহাদের পুত্রগণই মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করিয়াছিল। হতভাগ্য মীরণের বংশধর সেই সিংহাসন লাভ করে নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অবশেষে তাহাদের হইল। কালের কি অপূর্ব মহিমা! কাহার ধন কে পায়, ইহাতেই ভাগ্যের সূক্ষ্ম গতি লক্ষ্য হয়। মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা মঙ্গলের হয় নাই। ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর বংশ বা আলিবর্দি খাঁব বংশ লোপ হইয়াছিল। মীরজাফরের বংশে কে কিরূপে মসনদে বসিল উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। মীরকাশিমের স্মৃতি মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে নাই, উহা পাটনার বর্বরোচিত হত্যায় পলাশীযুদ্ধের পাপী জগৎ শেঠ মহাতাপ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস ইত্যাদিকে গঙ্গার জলে মগ্ন করিয়া মুক্তিদান করায়, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং বন্দি হইবার ভয়ে অনুপস্থিতি থাকায়, বিশ্বাসঘাতক শ্বশুরের সিংহাসন চ্যুতিতে, রাজস্ববৃদ্ধি ও জমিদার প্রজাপীড়নে, স্ত্রীহত্যায় এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। আলিবর্দির খাঁর খোশবাগ মুর্শিদাবাদের নবাবগণের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। সেইখানেই ৯ই এপ্রেল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি সমাহিত, ৩রা জুলাই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

* The violation of all decorum was committed by Mirjaffer in giving Clive ten handsome women out of Serajudoulla's Serajlio. Sijaw-ul Muktakhan I 772 Wards Hindu Mythology V. VII P 123 (see Appendix 3)

* মুস্তাফা বলেন মীরকাশিম স্ত্রীগণের চরিত্র সন্দেহ করিয়া কয়েকজন অনুচরের হত্যা স্ত্রীগণকে বেত্রাঘাত ও দশজনকে কূপে ত্যাগ করে। জ্ঞাতি ভাই ফতে আলিও সেই বেত্রাঘাত লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ভীষণ দণ্ডের হস্ত হইতে রাণাব অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর নিকট হইতে মাসিক দেড় হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

সিরাজউদ্দৌলা কবরস্থ, মির্জামেহদী পঞ্চদশ বৎসরে হত ও ভ্রাতা সিরাজউদ্দৌলার পার্শ্বে প্রোথিত আর সিরাজের দক্ষিণে পদতলে লুৎফুন্নিসা চিরনিদ্রিতা। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপবাসী ফষ্টার সেই বিভৎস সমাধির প্রশংসা, পতির জন্য লুৎফুন্নিসার দুঃখ-কাতরোক্তি দর্শন করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সমাধিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান ভার লুৎফুন্নিসা ও তাহার অবর্তমানে তাঁহার চার দৌহিত্রীরা করিতেছিল। লুৎফুন্নিসার কন্য জহুরা মাতার জীবিতাবস্থায় উন্মত্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করে ও তাহার চার কন্যারা মাতামহীর অনুসরণ করিয়া খোসবাগের তত্ত্বাবধান ভার কোম্পানীর গভর্নর হেষ্টিংসের নিকট প্রার্থনা করেন ও লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ করেন।

মণি বেগমের দুই পুত্র কেমন করিয়া মসনদে বসিয়াছে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের প্রতিবাদেও সুফল হয় নাই, কিন্তু হায়! শমন শাসনে তাহারা অকালে সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিল। তখন বব্বু বাই-এর গর্ভজাত দ্বাদশ বর্ষের নাবালক পুত্র মোবারকউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হইল। আর লুৎফুন্নিসার কন্যারা সমাধির পরিচর্যায় রত হইল। এইখানেই ধর্মের সূক্ষ্ম বিচার রহস্যময় উঠে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের পর মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অপেক্ষা মাতামহের সমাধি পবিচর্যাভার তাহাদের চক্ষে উচ্চতর হইয়াছিল বলিয়া সিরাজউদ্দৌলার যথার্থ পত্নী ও দৌহিত্রীরা সেই পবিত্র স্মৃতি সেইরূপে রক্ষা করাই শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিল। তাহারা দরিদ্র ছিল, তাহাদের সিংহাসন দাবী করিবার কোনরূপ সঙ্গতি ছিল না। ক্লাইবের অভ্যুদয়কাল হইতে অর্থ বিনিময়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন প্রাপ্তি আরম্ভ হইয়াছিল তখনও পর্যন্ত শেষ হয় নাই। মনিবেগম অর্থের নৃত্যকলা কেমন করিয়া করিতে হয় উহা জগৎকে দেখাইয়াছিলেন। অর্থ অপেক্ষা ধর্মপালন করা যে অধিকতর কর্তব্যকর্ম খোসবাগের সমাধি মন্দিরে লুৎফুন্নিসা চক্ষের জলে শিক্ষা দান করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। আহা! উহাই প্রেমের অপূর্ব স্মৃতি। ঐরূপ পতিভক্তি মুর্শিদাবাদের বেগমগণের মধ্যে কেবল যে একমাত্র লুৎফুন্নিসার ছিল, উহা নয়, মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা জিন্নদু ন্নিসার নামও তদনুরূপ গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইতে পারে।

কিন্তু হায়। সেই সমাধি মন্দিরের বর্তমান দুর্দশা সম্বন্ধে কোন লেখক বলেন — "পূর্বে খোস বেগমের সমাধিভবন রৌপ্য ও স্বর্ণময় পুষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত হইত ও সমাধিগৃহে উত্তমরূপে প্রদীপ জ্বালিত হইত। এক্ষণে আর সে সকল বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনা যায় বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে শতচ্ছিন্ন সেই পুরাতন বস্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমাধি গৃহে দীপ জ্বালিবার জন্য এক্ষণে মাসে চারি আনা মাত্র তৈলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে সমাধিগুলির উপর মিষ্টান্নাদিও নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।"

উক্ত গ্রন্থকর্তা যদি কলিকাতার ইংরাজ সৃষ্টিধর ব্যক্তিগণের সমাধিস্থান অবলোকন করিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, তাঁহার দুঃখ করিবার কিছুই থাকিত না। কলিকাতার বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপূর্ব নৈপুণ্য কীর্তিছটা মহিমান্বিত ভারতেশ্বরীর সমাধিমন্দিরে বা উদ্যানে রজনীতে কোন আলোক দান করা হয় না। সেই মনোরম উদ্যান অন্ধকারে বোধহয় তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকে, তখন এখনও পর্যন্ত যে সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির সমাধিমন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে কিনা ইহার নিশ্চয়তা নাই; উহাতে দুঃখ করিবারও কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা হিন্দুর গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া এখনও হিন্দুরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

পুরাতন আদালত গৃহ
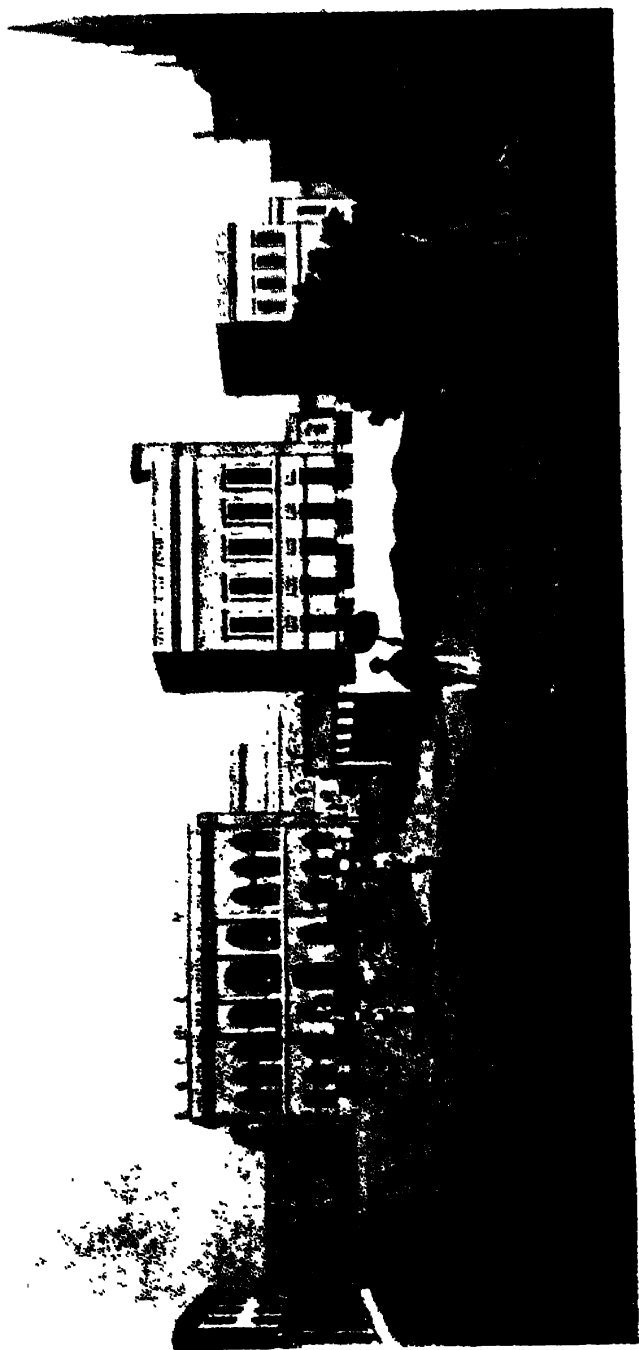
সেইজন্যই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নামে অযথা কলঙ্ক দান করিয়াছিলেন। ফৈজিকে মোহনলালের ভগ্নী সাজাইয়া মোহনলালের উন্নতির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা উহা কীর্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা ভাবেন নাই যে, ফৈজি দিল্লির মুসলমান নর্তকী, নবাব যাহাকে লক্ষ টাকা উপহার দিয়া মুর্শিদাবাদে আনাইয়াছিলেন। আর যদি সে কথাও মিথ্যা হয়, তবে কি মোহনলাল ফৈজীর জীবন্ত সমাধিতে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতেন, বা সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে পলাশির যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন? কি অবিচার!!!

সেকালের মুর্শিদাবাদের নবাবগণ যেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের নবাবীর আনুকূল্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল গোবর-গণেশ সাক্ষিগোপালগণ মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়া যাত্রাদলের অভিনেতৃগণের ন্যায় নানা অভিনয় প্রহসনাদি মাত্র করিত। উহাই কলিকাতার উন্নতির মূল কারণ। কলিকাতার উচ্চকর্মচারীরা যেন কলে পুত্তলিকার ন্যায় মুর্শিদবাদের নবাব হইতে সমস্ত কর্মচারিগণকে নৃত্য করাইত। উহাই ক্লাইবের দেওয়ানি শাসন প্রণালীর অত্যাশ্চর্য নীতি ও সেই দেওয়ানি লাভই ক্লাইবের সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতি ও গৌরবময় কীর্তি।

উড়িষ্যা তখনও ইংরাজ কোম্পানীর হয় নাই, তবে ভেরিলষ্টের গভর্নরীর সময়ে নেপালে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল ও সেই সময়েই বর্তমান রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহারা ইংরাজগণের সাহায্যে প্রার্থনা করিয়াছিল। তখন ভেরিলিষ্ট রংপুর ও পূর্ণিয়ার কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে বাংলার ও বিলাতের কর্তপক্ষগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল উহা ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেব বলিযাছেন। উহার সার মর্ম এই যে, দেশে সর্বত্রই অরাজকতা, কোম্পানীর কর্মচারীরা দেশের ও দশের দুঃখ দুর করিবার জন্য রাজত্ব ও দেওয়ানি লাভ করে নাই, উহারা কেবল স্ব স্ব উদর পুরণের জন্য ব্যস্ত। বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ ক্লাইবের আড়ম্বর ও বাক চাতুরীতে মুগ্ধ হইলেও লাভাংশ বৃদ্ধি অথবা তদনুযায়ী অর্থাগম হইতেছে না দেখিয়া বিষণ্ন ও হতাশ হইয়াছিল। তাঁহাদের লাভাংশ নানা চাতুরী করিয়া বিশ্বাসী কর্মচারীরা আত্মসাৎ করিতেছিল। লর্ড ক্লাইব দেখিয়াছিলেন যে, যে সকল সৈন্যগণ হাসপাতালে শয়ন করিয়াছিল তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিবার করিবার খরচ খাতায় পড়িয়াছে। সেইরূপ অসদুপায়ে ও চীনের সহিত সোনা-রূপার বাটের কারবারে যাহা কিছু লাভ হইতেছিল উহা সমস্তই বা কতকাংশ অন্যায় অপহৃত হইতেছিল। উহার উপর কোম্পানীকে বিলাতের গভর্নমেন্টকে কর দান করিতে হইবে। ইহাতে উহাদের দেওলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের হায়দার আলির অভ্যুদয় আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানি লাভ করিয়াই যদি দেশের সমস্ত কার্য স্বহস্তে লইতেন, মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে মুসলমান রাজ্যাপহরণকারীর সন্তানকে উপবেশন না করাইয়া কর্মচারীগণের অর্থলাভের পথ বন্ধ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। * এখন কেহই কলিকাতায় ক্লাইব ও তাঁহার পরবর্তী গভর্নরগণের শাসন ও বিচার প্রণালীর পরিণাম দর্শন করিয়া প্রশংসা করিতে পারেন না।

* Martin's Indian Empire V. I. p 308-9

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কোম্পানীর বিচার কৌশল ও ছিয়াত্তর মন্বন্তর

ভেরিলষ্টের রাজত্বকালে কলিকাতার জমিদার চার্লস ফ্লায়ারের নিকট রাজা নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ হইয়াছিল; উহা লইয়া তখন সহর তোলপাড় হয়। বোল্টস্ সাহেব সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে তাহারা বিধিমত অপমানিত করিত। নবকৃষ্ণ সেই সমস্ত মোকদ্দমায় যথারীতি উত্তর নন্দকুমারের কৌশলে কৃত্রিম বলিয়াছিলেন। উহা জমিদার বোল্টস সাহেব স্বয়ং বিচার না করিয়া কলিকাতার গভর্নরের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রিয়পাত্র নবকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে অভিযোগমুক্ত করিলেন। আর তাঁহারা সেই সূত্রে বোল্টসকে এদেশ হইতে বহির্গত ও নন্দকুমারকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার উপযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তদুপলক্ষে তাহাকে বলপূর্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। নন্দকুমারের প্রতি তখনই ঐরূপ আদেশ নূতন হয় নাই, আরও যখন মীরজাফরের সিংহাসন চ্যুতির পর তাঁহাকে গোপনে পুনর্স্থাপিত করিবার আয়োজনাদি করেন। তাহাব মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজমউদ্দৌলার নামে গোপনে বাদশাহি সনন্দানয়নের চেষ্টাদির অপরাধে নন্দকুমারকে ও তাহার জামাতা জগচ্চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনয়ন ও তাহাদিগকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তৎপরে ক্লাইবই তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তখন উহাতে নন্দকুমার ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। তখন এদেশের এমনই দুরবস্থা হইয়াছিল যে, যে কেহ গরীবের উপর অত্যাচারের প্রতিকার করিতে যাইত, তাহারই সর্বনাশ হইত। তখন এদেশে অর্থ অপেক্ষা বলবান আর কিছুই ছিল না, অর্থের নিকট সমস্তই পরাস্ত হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী লেখক নবকৃষ্ণ ও নন্দকুমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন উহাই উদ্ধৃত করা হইল— "ক্লাইব নন্দকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, সে সময়ে নবকৃষ্ণ তাঁহার অধীনতায় সামান্য মুন্সীগিরি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারের এত সম্মান তাঁহার প্রাণে সহ্য হইবে কেন? উহার পর যে অবধি তিনি ইংরেজদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন, তখন হইতে নবকৃষ্ণ তাঁহার নিন্দা করিয়া ইংরেজ মহলে আপনার প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই পবামর্শক্রমে ইংরেজেরা নন্দকুমারের উপর মহাক্রুদ্ধ হইযাছিলেন। ক্রমে নন্দকুমারেব পতন হইলে, নবকৃষ্ণ বাঙালীদিগের মধ্যে ক্ষমতাবান হইয়া উঠেন। যথেষ্ট অর্থ ও নানাবিধ পদের ক্ষমতা লাভ করিয়া তিনি দেশেব লোকের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ কবিতে আরম্ভ করেন। সকলে আসিয়া নন্দকুমারের আশ্রয় লয়।" * * * "নবকৃষ্ণের উৎকোচ গ্রহণ ও গৃহস্থের পরিবাববর্গেব সতীত্বনাশ প্রভৃতির দ্বারা নিন্দনীয় হইয়া উঠেন,

অন্ততঃ এই মর্মে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যদিও তৎকালের ইংরেজদিগের প্রিয়পাত্র নবকৃষ্ণ উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তথাপি সাধারণ লোকের মনে সে সমস্ত অভিযোগ একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় নাই।'' সেই গ্রন্থকর্তা ২৮শে জুলাই ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার সম্বন্ধে হেষ্টিংসের অভিমত যাহা লিখিয়াছেন উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলেই নন্দকুমারের দোষ গুণ উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইবে না।

নন্দকুমার প্রভুভক্ত কর্মচারী ও মন্ত্রীর ন্যায় স্বীয় প্রভুর কল্যাণের বা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিকগণের সাহায্য গ্রহণের প্রার্থনা দ্বারা কোম্পানীর শক্তি হ্রাসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবাব মীরজাফর তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন ও তিনি কখনও তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া কোন দোষারোপ করেন নাই, বরং তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন তাঁহার কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রভুর সাপক্ষে কার্য করায় তাঁহার নিন্দা না করিয়া প্রশংসাই করিতে হয়। আর তিনি যে মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন উহাও স্বাভাবিক, প্রত্যেকেই আপনার স্বার্থ ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করে।

এখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেকালের ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রালোচনা করিতে প্রস্তুত হইবেন না, তবে সেকালের কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের কৃপায় কলিকাতায় কিরূপ বিচার মীমাংসা হইত, উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে উহা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। নন্দকুমার উচ্চ ব্রাহ্মণ ও নবকৃষ্ণ হীন কায়স্থ ও নন্দকুমারের অধীনে কার্য করিত। ব্রাহ্মণ পত্নীর সতীত্বনাশের দ্বারা ব্রাহ্মণ নন্দকুমার উহার মিথ্যাপবাদ করিবেন ইহা সেকাল কি, এ কালের হিন্দু সমাজও বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশেষত নবকৃষ্ণের বংশধরগণের অতি নিকট আত্মীয় তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। উহার ৯১/৯২ পৃষ্ঠায় আছে— "তাঁহার দোষের মধ্যে ইন্দ্রিয় দোষই অধিক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল।" আবার ঐ সম্বন্ধে ক্লাইবের জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন * "তাঁহার ৭টি স্ত্রী (মিঃ এন ঘোষের মতে ৬টি) বর্তমান থাকিলেও তাহার বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয় দোষের কথা যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। ক্লাইবেরও ঐ দোষ বড় কম ছিল না, কাহার সঙ্গগুণে কে এ বিষয়ে গুণবান হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নাহি।" তাঁহার সম্বন্ধে ক্লাইবের ইংরাজি জীবন চরিত লেখক নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইবের গভর্নরীর সময় তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত নাচগানাদি উৎসবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন ও তিনি প্রভুর নিকট হইতে আপনার ধনরত্ন লুক্কায়িত রাখিতেন। তিনি প্রভুব ও নিজের স্বার্থের জন্য দেশের সর্বনাশ করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে ঃ—

"Lord Clive's chief banyan Nobhoiss .... by his skilled up connections became one of the wealthiest agents in the East, his riches werc not known and he had the policy to hide his views and his treasure from his noble master. whose plan he pursued with a relentless severity for their mutul advantage and the ruin of the country. He spent within a few years after Lord Clive's return to Europe lacs of rupees (1200001) in balls. feasts and other entertainments.+

* শাস্ত্রীর ক্লাইব চরিত ১৫২ পৃষ্ঠা।

+ Carrocaoil's Life of Lord Clive V II Page

আক্কেল সেলামী— এইরূপ বিচার বিভ্রাটের সূত্রপাত ভেরিলষ্টের সময় হইতে কলিকাতায় আরম্ভ হয়। কলিকাতার ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নবকৃষ্ণের উপাধি ও অর্থ সত্ত্বেও তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তিনি তাঁহার সামাজিক হীনাবস্থা কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের যোড়পচারে পূজা করিয়া উন্নত করিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবহর্ত্তা পদবী স্থলে দেব উপাধি হইয়াছিল। অগ্রদ্বীপের ˚ গোপীনাথ বিগ্রহ লইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মহারাজা নবকৃষ্ণের বিলক্ষণ বিবাদ হয়। তিনি চোরের উপর বাটপাড়ী করিতে গিয়াছিলেন। * উক্ত গোপীনাথ ঠাকুর পাটুলির জমিদারগণের ছিল কিন্তু একবার মেলার সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় চার পাঁচ জন খুন জখম হয় তৎকালীন বিচারাধীন হওয়া অপেক্ষা ঠাকুর তাহাদের নয় স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। তিনি সেইরূপ কার্য করিলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর দখল করিয়া লন। নবকৃষ্ণ কলিকাতায় বাংলার যাবতীয় বিগ্রহ আনয়ন করাইয়া এক দেবতার সভা করেন ও ঐ গোপীনাথ বিগ্রহ প্রত্যার্পণ করিতে অস্বীকৃত হন। উহাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গভর্নরের সাহায্য গ্রহণ করেন ও তাহার অনুমতিক্রমে নবকৃষ্ণ ঐ ঠাকুর প্রত্যার্পণের সময় স্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এক কৌশল করিলেন। সেই বিগ্রহের অবিকল নকল করিয়া আর এক বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া আসল ঠাকুর আপনার বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন নকলটিই প্রত্যর্পণ করিবেন, কিন্তু পরিণাম বিপরীত হইল। আসল ঠাকুরও গেল ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বহুমূল্যের অলঙ্কারাদিও ফেরৎ পাইলেন না। শেষকালে বল্লভপুরের বল্লভজীউকে লইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু উহাতেও কৃতকার্য হইলেন না। তিনি সেই বিগ্রহের সেবার খরচার দাবী করিলে ভাবিয়াছিলেন যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেবাইতগণ ঠাকুর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; কিন্তু তাহারা যখন অনাহারে কলিকাতায় ক্ষিপ্তের ন্যায় বেড়াইতে লাগিল, যখন ˚ নয়ানচাঁদ মল্লিক সেই অর্থদান করিবেন স্বীকার করিলেন ও নবকৃষ্ণকে উহাদের দেবতা প্রত্যার্পণ করিতে বলিলেন, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া বিনার্থে ঐ দেবতা দিয়াছিলেন। + সেই প্রতিশ্রুতার্থ গ্রহণ করা মহাপাপ মনে করিয়া উহাতে ˚ নয়াদচাঁদ দেবতার মন্দির করিয়াছেন। রাজা নবকৃষ্ণ অপযশ দূর করিবার জন্য দেবতার সেবার্থ বল্লভপুর তালুক দান করেন। সেই নবকৃষ্ণের দেবসভার সময় উহার দর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় মেলা বাজার বসিয়াছিল। সেই নবকৃষ্ণের দেবসভার সময় উহার দর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় মেলা বাজার বসিয়াছিল। তজ্জন্যই উহার নাম সভাধাম ও সভাবাজার হইয়াছিল। উহা এখনও তাঁহাদের মূল্যবান সম্পত্তি ও দেবতার সেবায় উহার আয় ব্যয় হয়।

মহারাজা নবকৃষ্ণের ইংরাজিতে জীবন চরিত তাঁহার বংশধরের চেষ্টায় বারিষ্টার এন. এন. ঘোষ লিখিয়াছেন। উহাতে ঐ সকল ঘটনা অন্যরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বপ্নের প্রত্যাদেশে রাজা নবকৃষ্ণ ঐরূপ করিয়াছিলেন ও তিনি আসল ঠাকুরই রাখিয়াছিলেন। আবার তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে যদি তিনি আসল ঠাকুরটি পাইতেন তবে কৃষ্ণচন্দ্রকে তিনি যে লক্ষ টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন উহাও ত্যাগ করিতে চাহিয়া ছিলেন। তখন জীবনচরিতকার কেমন করিয়া আসল ঠাকুর রাখিয়াছিলেন বলেন উহা বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ তাঁহার পুস্তকে উহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি যে ওয়ার্ড সাহেবের পুস্তকের অংশ উদ্ধৃত

দেবতাগণের মর্ত্তে আগমন ৬৭৬ পৃষ্ঠা
দেবতাগণের মর্ত্তে আগমন ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

করিয়াছেন তাহাতেও উহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হয় না। সেকালের বাঙালীরা দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দেবতা প্রতিষ্ঠা ও দেবার্চনা করিত। নবকৃষ্ণ প্রমুখ এতদিন বিদেশী বণিকগণের ও মুসলমান নবাবগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছিল, উহার কলঙ্কাপনোদন করিবার জন্য দেবসেবায় ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু সেখানেও লোকের 'তুম্বানাড়া' স্বভাবটি যায় নাই। প্রবাদ আছে 'স্বভাব যায় না মলে।' উক্ত নবকৃষ্ণের জীবনচরিতকার আসল ঠাকুর রাখার কথায় ধর্মের চক্ষে তাঁহার অধোগতির পথই পরিষ্কার করিয়াছেন। কোন হিন্দু বা বাঙালীই উহা করিতে প্রস্তুত হইবে না; বিশেষতঃ যাহাদের সেই রাজবংশের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। রাজা নবকৃষ্ণ কখনই ঠাকুরাপহরণ করেন নাই। কেমন করিয়া তাঁহার বংশধর ব্যারিষ্টার গ্রন্থগার দ্বারা পূর্বপুরুষকে সেই অপরাধে অপরাধী করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন উহা বুঝিতে পারা যায় না। সেকালের ইংরাজ কর্মচারিরাও হিন্দুর দেব-দেবী পূজা করিত ও তাহাদের উৎসবে যোগদান করিত। কলিকাতায় হিন্দু ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সমাধি মন্দির উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার সেই সমাধির শিখরদেশে হিন্দু মন্দিরের আকৃতি স্থাপিত, তিনি ধর্মাকাঙক্ষায় নগ্নপদে উড্ স্ট্রীট হইতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। কোন যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ কালিঘাটে জগন্মাতা কালীদেবীর পূজা অতি সমারোহে করিতেন। ঐরূপ পূজা ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল, তৎপরে আইন করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ওয়ার্ড সাহেবের পুস্তকে মুসলমানেরাও কালীপূজা করিত উল্লেখ আছে।

জাতি বিচার — কলিকাতায় ইংরাজেরা এদেশের লোকের জাতি বিচার করিবার নিমিত্ত এক কাছারি করিয়াছিল, উহার মীমাংসা ব্রাহ্মণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র করিতেন না। নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্ত প্রমুখ ঐ সভার সভাপতি ছিলেন, উহাতে হিন্দু সমাজ খড়্গহস্ত হইয়াছিল। তখন ন্যায্য জাতিবিচার উঠিয়া যায়, অর্থ ও পদই জাতির মূলাধার হইয়া পড়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর ভেরিলস্ট সেই সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন উহা উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ--

" All nations have their courts of ecclesiastical jurisdiction distinct from the administration of civil justice in some with a more limited, in others with more extensive authority. The followers of Brahma in Bengal have their caste cutcheries or courts to take cognisance of all matters relative to the several castes or tribes of the Hindu religion. Their religious purity depends on the constant observance of such numberless precepts that the authority of their courts enters into the courses of common life, and is consequently, very extensive. A degradation from the caste by their sentence is a species of excommunication attended with the most dreadful effects, rendering the offender an outcast from society. But as the weight of punishment depends merely upon the opinion of the people, it is unnecessary to say that it cannot be inflicted by the English Governor (as Mr. Bolts asserts p. 83) unless the mandate of a Governor could instantly change the religious sentiments of a Nation. Neither can a man once degraded be restored, but by the general suffrage of his own tribe the sanction of the Brahmins (who are the

head of the tribe) and superadded the concurrence of the supreme civil power."

উহার সারমর্ম আর কিছুই নয়, যে তখন সেকালের উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীরা আপনাদের এদেশী অনুগত ভৃত্যগণের দ্বারা এদেশের কি ব্যবসা, কি রাজ্য, কি জমিদারী, কি সমাজ, কি জাতি, সমস্তের উপরই কর্তৃত্ব করিতে গিয়াছিল। যাহাতে এদেশের কেহই তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণের উপর বিপক্ষতাচরণ করিতে না পারে। উহাতেই নবকৃষ্ণ প্রভৃতির হিন্দু সমাজে ও স্বজাতিগণ মধ্যে উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু উহা সর্ববাদী সম্মত হিন্দু সমাজানুমোদিত হয় নাই। ঐ নিমিত্তই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও নন্দকুমারের মনোমালিন্যের প্রধান কারণ ও উহার সৃষ্টি হয়। কলিকাতায় যদি জাতিবিচার কাছারি না থাকিত, তাহা হইলে বোধহয়, উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীগণের মনোভিলাষ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার সুবিধা ও সুযোগ হইত না। সেইজন্যই উক্ত কাছারির কর্তা তাঁহাদের মুন্সীগণ না হইলে চলিত না। সেকালের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণের কলিকাতায় কিরূপ চাল চলন ও নবাবি ছিল উহা ক্লাইবের কথায় বলিলেই যথেষ্ট হইবে যথা।

" They ride upon fine prancing Arabian horses and in palanquins and chaises, they keep seraglios, make entertainments and treat with champagne and claret."

অর্থাৎ তাহারা পক্ষীরাজ আরব ঘোড়ায় বা গাড়ি পাল্কী চাপিয়া বেড়াইত, ও তাহাদের বিলাসের রঙমহলাদিও ছিল, সেখানে শাম্পেন ক্লারেট মদ খাইয়া আনন্দোৎসব করিত, সেই সকল উচ্চকর্মচারিরা নবকৃষ্ণ প্রমুখ বেণিয়ান মুন্সিগণের হাতের পুতুল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখনকার শিক্ষিত যুবকবৃন্দ যাহা রঙ্গালয়ে উপন্যাস ইতিহাসের প্রণয় প্রহসনাদি দর্শন ও পাঠ করিয়া চিত্ত বিনোদন করে, তখন সেকালের বিদেশী মদনমোহনগণ কলিকাতায় রাসলীলা করিত। নবকৃষ্ণ প্রমুখের কৃপায় তাঁহার প্রাসাদের নিকট কলিকাতায় দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের বাড়িতে বাংলার নিষ্কর্মা যুবকের খোসগল্প আহার- বিহারাদি পরের পয়সায় বাবুগিরির বেশ সুবিধা হইয়াছিল। সেইখানে হরি ঘোষের নামে রাস্তা ও "হরি ঘোষের গোয়াল" প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

বাগবাজারে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুর লইয়া ঐরূপ আর এক গণ্ডগোল হইয়াছিল। গোকুল মিত্রের উহা লাভ করিবার ছড়া তদ্বংশধর মুদ্রিত করিয়াছেন। উহার কিয়দংশ যথা।

"বাগবাজারে এসে ঠাকুর রহিলেন বোসে, বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে খসে।
রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, কাঁদে প্রজাগণ, পুজারী ব্রাহ্মণ কাঁদেন হয়ে অচেতন।
হাতিশালের হাতি কাঁদে, ঘোড়ায় না খায় পাণি, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন গোপাল সিংহের রাণী।

* * * *

রাজা ডাকে গোকুল মিত্র শুনহে বচন, টাকা লয়ে দেও আমার 'মদনমোহন'।
মিত্র বলে মহারাজ কোয়াঁলা দেখ আছে, বন্ধক নয় মদনমোহন বিক্রি করে গেছে।"

সেকালে লবণের ব্যবসায় গোকুল মিত্রের ভাগ্যোদয় হইয়াছিল ও ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বালি হইতে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ ও তথায় তিনি সেই অর্থে উক্ত বিগ্রহ খরিদ বা লাভ করিয়া ঠাকুর বাড়ি করেন। প্রসিদ্ধ মহামায়ীর গান রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন সেই গোকুল মিত্রের নিকট সরকার ছিল ও ঐ ছড়া তাঁহারই প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভিখারীরা উহা গান করিয়া কলিকাতায় কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিত। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তিনি যাহা

প্রকাশ করিয়াছেন উহা ভিখারীর গানে স্থান পাইতে পারে না। উহার যতটুকু সম্ভব হইতে পারে উহাই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গোকুল মিত্রের দেবতা লাভ সম্বন্ধে ও কলিকাতার সেকালের ও একালের গ্রন্থকর্তা পূর্বোক্ত নবকৃষ্ণের গোপিনাথ হরণ সদৃশ এক অনুরূপ প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহাই হউক, কলিকাতায় দেশ ও বিদেশ হইতে বিখ্যাত দেবতারাও আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মদন মোহন বাগবাজারের মধ্যে প্রসিদ্ধ দেবতা, সাধারণ লোক তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি করে সেরূপ নবকৃষ্ণের গোপীনাথ বা গোবিন্দ জীউকে করে না, উহাই নকল ও আসলের উত্তম প্রমাণ বলিয়া বোধহয়।

মন্বন্তর—১১৭৬ সাল ও ১৭৬৯ খ্রীঃ—বিলাতে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টলমল করিতেছিল, তখন বাংলায় বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপস্থিত হয়। উহাতে কেবল কলিকাতায় ছিয়াত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ও সমগ্র বাংলায় এক কোটি লোক নষ্ট হইয়াছিল। তখনও দেশে মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই। তখনকার যৎকিঞ্চিত চিত্র ছড়াতেই বর্তমান রহিয়াছে।

"নদনদী খাল-বিল সব শুকাইল, অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে, দেশ ছারখার হল, রেজা খাঁর তরে।
একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর।
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে, পেটের লাগিয়ে, মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।"

বোধহয়, যেন ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল যে, উহাতে ইউরোপের বণিকগণ এদেশ ত্যাগ করিবে, কিন্তু উহা হয় নাই।

রেঁজা খাঁর আদায় প্রণালীতে কৃষক জমিদারেরা বীজের ও সঞ্চয়ের ধান্য চাউল পর্যন্তও বিক্রয় করিয়াছিল। কোম্পানীর সৌভাগ্যোদয়ে বাংলায় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। দুই বৎসরকাল ঐরূপ অনাবৃষ্টিতে যে পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হইত, উহার চতুর্থাংশ কি অষ্টমাংশও হয় নাই। উহার উপর রেজা খাঁ বিলাতী প্রণালীতে চাউল ধান একচেটে ব্যবসায় দুর্মুল্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে যান। অথবা বোধহয়, যেন ভগবান তখন দেখাইলেন যে, যাহারা জননী জন্মভূমিকে প্রাণভয়ে রক্ষা করে নাই, তাহাদের মৃত্যু অনাহারেই হইয়া থাকে। ইহাই যেন স্বর্গীয় সূক্ষ্ম বিচার—যেখানে আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, সেখানে বিবেক অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হয়, স্বার্থপরতাই লোকের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুস্থানীরা এইরূপ বলিয়া থাকে।

"মরণা ভালা, বিদেশমে যাঁহা না আপন কৈ, পাঁচো পক্ষী ভোজন করে, মহামহোৎসব হৈ।" আত্মসম্মানই সজীবতার লক্ষণ ও মানবকে পশুর ন্যায় নীচ দাসত্ব বা হীন কার্য করিতে বিরত করে। আত্মসম্মানই সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশির যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সেই মুসলমান জাতির আত্মসম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মীরজাফরের সম্মুখে মুকুট ত্যাগাদি করিয়াছিলেন, যখন উহা হইল না, তখনই তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি যখন রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ফরাসিদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় যাইতেছিলেন তখন ভাগ্যদোষে ধৃত হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। ছায়ের মধ্যে সত্যাগ্নি লুক্কায়িত থাকে না, বায়ু দূরে খার নিক্ষেপ করিয়া উহাকে প্রজ্জ্বলিত করে। যিনি যৌবনসুলভ চপলতায় ও বিলাস বিভবে ফৈজির ন্যায় অপূর্ব সুন্দরী ললনাগণের রূপমাধুর্য্য তুচ্ছ করিয়া মাতামহ আলিবর্দির নানা নিষেধ ও কৌশলে লুৎফুন্নিসার

পবিত্র প্রণয় ত্যাগ করেন নাই, সেই যুবক কি চরিত্রহীন অপদার্থ ব্যক্তি? ধৃত কালে কোন ব্যক্তি তাঁহার সেই রমণীকে ও বহুমূল্যে ধনরত্ন বিনা বাধায় ত্যাগ করিয়া থাকে? তাঁহার অন্তরে ভগবানের উপর নির্ভর ছিল। যাহা হয় হউক, বৃথা অনুরোধ করিয়া আত্মসম্মান নষ্ট করা উচিত নয়, এই ভাবিয়াই তিনি তখন কোন কিছুই করেন নাই। যে নবাব সাধক রামপ্রসাদ সেনের মুখে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আপনার বজরায় আনয়ন করাইয়া কোন রূপ রসের উত্তেজক গান না গাওয়াইয়া মায়ের নাম শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই কি নৃশংস ধর্মহীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা? যিনি হত্যাকালে ভগবানের নাম স্মরণ করিবার জন্য সময় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি পবিত্র শান্তিময় নাম স্মরণ করিতে ঘাতকের কঠিন অস্ত্রাঘাত নিশ্চলভাবে সহ্যপূর্বক অবলীলাক্রমে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, উহার জন্য কাতর হন না, তিনি ধর্মপ্রাণ বৈরাগী নবাব সিরাজউদ্দৌলা, না, হীন পাপী ইন্দ্রিয়াসক্ত উন্মত্ত সিরাজউদ্দৌলা? তখন আর তাঁহার মুখে লুৎফুন্নিসা বা রাজ্য কামনার কোন খেদোক্তি প্রকাশ হয় নাই। মুসলমান জাতি সেই মহাত্মার শাঁপে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন চিরকালের জন্য হারাইয়াছিল। ভগবানের নিকট তাঁহার প্রেতাত্মার শান্তির জন্য কি মীরজাফর, কি মীরকাশিম কেহই প্রার্থনা করে নাই, সেইজন্যই তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছিল। দেশের লোকেও সেইরূপ কিছুই করে নাই বলিয়াই কি ভগবানের বজ্ররোষ দেশকে উৎসন্ন করিয়াছিল? ইহাই সেকালের সকলের ধারণা হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। সেইকথা, সেই রোদনধ্বনি যেন হিন্দু মুসলমান ফকির উদাসিনগণ সাধারণকে সান্তনা দান করিয়াছিল এইরূপ প্রবাদ। দেশে তখন হাহাকার ধ্বনি, পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে সর্বত্রই, জীর্ণ, শীর্ণ মৃতপ্রায় ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া ভগবানের মুখপানে তাকাইয়াছিল। অগত্যা যেখানে সেখানে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অনাথগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সিরাজউদ্দৌলার জীবন ঘাতকের হস্তে কিরূপে গিয়াছিল, আর কিরূপে দুর্ভিক্ষে ভগবানের বজ্ররোষে লক্ষাধিক নিরীহ নির্বিরোধী বাঙলীর প্রাণ বিসর্জন হইয়াছিল! ইহার জন্য কে দায়ি? শূন্য গগণ হইতে প্রতিধ্বনি হইল— আত্মসম্মান হীন মানবগণ!!!

আত্মসম্মান— মানবের আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে নিজের উদর পূরণ হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভগবানদত্ত নখ কুলিস শক্তির অপব্যবহার দ্বারা করিতে পারে না। সিরাজ সিংহাসনে বসিয়া দেশবাসির নিকট রাজস্ব অধিক করিয়া প্রজার সর্বস্ব হরণ করিবার চেষ্টা আদৌ করেন নাই, কিসে রাজ্য নিরাপদ হয়, সেই চেষ্টায় তিনি তাঁহার রাজকোষ শূন্য করিয়াছিলেন: আর মীরজাফর, মীরকাশিম নবাবীর জন্য উন্মত্ত, দেশবাসি রসাতলে যাক্, কিছু যায় আসে না, ইংরাজ কোম্পানী সেইরূপ মুর্খ ব্যক্তির অযথা উচ্চাভিলাষের প্রশয় দিয়া যে মহাপাপ অর্জন করিয়াছিল উহার প্রায়শ্চিত্ত তাহারা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে ইতিহাস ও ক্লাইবাদির বিচারে স্বীকার করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিল। ধন্য ন্যায়পরায়ন ইংরাজ জাতি!!! ভগবান সেইজন্যই তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া আর্যভূমি ভারতবর্ষ তাঁহাদের উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্যই পূর্বতন শাসন ও বিচারবিভ্রাটাদি সংশোধন জন্য বিলাতে হুলস্থূল পড়িয়াছিল। বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগরের দল একচেটিয়া ব্যবসায় যে দুঃখ ভোগ করিতেছিল উহাদিগকে শান্তি দান যেন দুর্ভিক্ষে মৃত্যু আলিঙ্গন দান করিয়া করিল। দেশের সর্বনাশ বিদেশীতে করিতে পারে না; যেমন গাছ কেবল লোহার কুড়ালে

* Martin's The Indian Empire V. I p. 308 9

বিনা কাঠের বাঁটে কাটা যায় না; আর সেই বাঁট গাছের ডালেই হয়, অন্য কিছুতে উহা হয় না। দেশের লোক দেশের সর্বনাশের জন্য যত দায়ী, সেরূপ বিদেশী নহে। স্বদেশী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ বিদেশীর সহিত তাহাদের হিতৈষী হইয়া দেশের সর্বনাশ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে রেজা খাঁর নাম সেইজন্য বিলাত পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। বিলাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাজ নন্দকুমার এজেন্ট দ্বারা রেজা খাঁর দ্বারাই ছিয়াত্তর মন্বন্তর হইয়াছে প্রমাণ করিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতার বিচার বিভ্রাট যে কি, সেই রেজা খাঁর বিচার উহা ছিয়াত্তর মন্বন্তর কি, সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ছিয়াত্তর মন্বন্তরকালে বাংলায় ভগবান একজন বাঙালীকে রক্ষা করিয়া রেজা খাঁকে বিচারাধীন করিয়াছিলেন। আবার সেই বাঙালীই এক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজের সহায়তার জন্য দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়াছিল, উহাতেই বোধহয়, যেন ভগবান শেষে তাঁহাকেও শাস্তিদান করিয়াছিলেন। বাংলায় ইংরাজ মুসলমান দরবারের সহিত নন্দকুমার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল, তখন সেরূপ অন্য কোন বাঙালীর ছিল না। কেবল নবকৃষ্ণ প্রমুখের দাসত্বে ও কৌশলে নন্দকুমার সকলের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে পারেন নাই। কলিকাতার উচ্চ কর্মচারীরা একবার নন্দকুমারকে চাঁটগাঁয়ে নির্বাসিত করিতে গিয়াছিলেন তখন কিন্তু নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের ন্যায় প্রখর বুদ্ধি বলসম্পন্ন ব্যক্তিকে দূরে রাখা কর্তব্য নয় বলিয়া সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন ও সেজন্য উহা হয় নাই। নন্দকুমারকে কলিকাতার ইংরাজ কর্মচারীরা কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার জন্য যখন প্রশ্রয় দান কবিতেন, তখন তিনি উহা লক্ষ্য না কবিয়া সরলভাবে গ্রহণ করায় বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। নন্দকুমার ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁহার ধমণীতে আর্য রক্তস্রোত প্রবাহমান, উহার অনন্য সাধারণ শক্তিতে মস্তিষ্কে জ্ঞান বুদ্ধি পুষ্ট হইলেও কালোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষার অভাবেই উহা তাঁহার কৃতকার্যতার সম্পূর্ণ অন্তরায় হইয়াছিল। সে সময়ে সকলেই উচ্চ ইংরাজ কর্মচারীগণের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য অর্থদান, তোষামোদ বা কোনরূপ হীন কার্য করা দোষের মনে করিত না। তখন নন্দকুমার সেই সকল কর্মচারীগণকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিলাতে অভিযোগ করিলে তাঁহাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে উহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। হায়! সেকালের নবাবি আমলের ঢাকার মসলিন, দলমাদল, জাহান কোষাদি কামান, মসজিদ, প্রাসাদ, নদীগর্ভে সীসকাদি দ্বারা স্রোতরক্ষা প্রভৃতি কলাবিদ্যার আদর্শ প্রসিদ্ধ হইয়া আছে; কিন্তু পরাধীনতায় বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও দীক্ষিত না হইলেও উহার যে স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব দ্বারা সৃষ্টিধর নন্দকুমারাদির আদর্শে বিলাতের মহাপুরুষগণ মুগ্ধ হইয়াছিল, ইহা কি গৌরবের কথা নয়? নিজের স্বার্থ অর্ন্তনিহিত না থাকিলে কেহ কোন কার্য করে না সত্য, কিন্তু নন্দকুমার ভিন্ন কে তখন সাহস করিয়া মুর্শিদাবাদের দরবারের সর্বাপেক্ষা অর্থশালী বলবান মুসলমান কর্তৃপক্ষ রেজা খাঁর সহিত শক্রতা বা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত ও বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত? যাঁহাকে ইংরাজেরা পর্যন্ত অর্থপদ দ্বারা বশীভূত রাখা কর্ত্তব্য মনে করিত, তাঁহার বিরুদ্ধে সেকালে বিচার প্রার্থনা করা মুর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। মহারাজ নন্দকুমার সম্পূর্ণ মূর্খ ছিলেন না, তিনি সেকালের উচ্চ দরের রাজনৈতিক পুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি জানিতেন যে, তখন রেজা খাঁর অর্থবল ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল, তাঁহার উপর তৎকালীন উচ্চকর্মচারি ইংরাজ রাজপুরুষগণের কিরূপ মনোভাব ও তাঁহাদের বিচার শক্তি ও অর্থলিপ্সাদি সকলই তিনি বুঝিতেন; কিন্তু তিনি চক্ষের উপর অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অসীম সাহসে বিলাতে অর্থব্যয় করিয়া উহার

আশু প্রতিবিধান করিবার শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাকালে পুরাণে নিজের হৃদয়াস্থি দ্বারা যেরূপ দৈত্য বিনাশের সহায়তা করায় দধীচি মুনির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, সেইরূপ মহারাজ নন্দকুমার কর্মচারিগণ কর্তৃক রেজা খাঁ প্রমুখ দেশবাসিকে পদে পদে নিগৃত হইতে দেখিয়া উহার প্রতিকারের জন্য আপনার ধন মান জীবন সর্বস্ব পণ করিয়া বিলাতে দূতাদি পাঠাইয়া বিচার প্রার্থনা করায় অক্ষয় কীর্তি করিয়াছেন। বজ্রাঘাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বাড়বাগ্নি, দাবানল প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাতের মধ্যে যেমন ভগবানের কোন না কোন অজ্ঞাত হিতকর উদ্দেশ্য বর্তমান থাকে. সেইরূপ ছিয়াত্তর মন্বন্তরের ভিতর কি কোন কিছু ছিল না? নন্দকুমার বাংলার শত সহস্র লোকের মৃত্যুতে তাহাদের প্রেততর্পণ করিবার নিমিত্ত রেজা খাঁব বলিদানোৎসর্গ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, যদি অতীত ঘটনা দ্বারা সেই ব্যক্তির বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে বলিতে হয় যে, সেকালের প্রধান শ্রেণীর ন্যায়পরায়ণ পাশ্চাত্য শিক্ষিত রাজনৈতিক মহাপুরুষগণ যাঁহারা কখন নন্দকুমারকে চক্ষে দেখেন নাই তাঁহারা কেন নগণ্য নন্দকুমারের জন্য স্বদেশবাসি প্রসিদ্ধ নরশার্দুলগণের বিরুদ্ধে বিলাতের মহাসভায় বক্তৃতা করিলেন? সেই বক্তৃতায় সাক্ষাৎ সরস্বতী যেন তাঁহাদের কণ্ঠে অধিষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়াই সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিল; এমন কি, হেস্টিংসও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও উহা শ্রবণ করিয়া আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় রেজা খাঁর বিচার বড় আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু উহার পরিণাম কিছুই হইল না, উহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তখন কলিকাতায় নন্দকুমারের অধীনস্থ কর্মচারীরা তাঁহার ন্যায় সম্মান অর্থ সমস্তই লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি থাকিতে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছিল না বলিয়া বা অন্যান্য কারণে নন্দকুমারের প্রতিহিংসা করিবার জন্য তাহারা সকলেই রেজা খাঁর মুক্তি লাভের সুবিধা ও সহায়তা করিয়াছিল। সেই সকল ব্যক্তিই যেন ইংরেজের কুড়ুলের মধ্যে বাঁটস্বরূপ হইয়া মহীরুহ বিশেষ সজ্জন দেশহিতৈষী ব্যক্তির সর্বনাশ করিয়া বাংলাদেশকে রসাতলে নিমগ্ন করেন। যে সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছিল তখনই বাংলায় মুসলমান রাজত্ব শেষ হইয়া ইংরাজ রাজত্ব বাংলায় যুগ পরিবর্তনের আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতেই **কোম্পানীর এদেশে শাসন ও বিচারের হাতে খড়ি আরম্ভ হইয়াছিল ও চিয়াত্তরে মন্বন্তর বিচার কৌশল যেন এক সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ।**

কাল ও দেবতা মাহাত্ম্য—কোথা হইতে জন কয়েক বিদেশী অশিক্ষিত ইংরাজ এদেশে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিয়া নবাব সম্রাটের রোগারগ্য করিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিয়া বাংলায় ও অন্যান্য দেশে ব্যবসারম্ভ করে। জলপথে জাহাজে যুদ্ধ করিয়া এদেশের লোকেরা দ্বারা সৈন্য সৃষ্টি করিয়া ও অকর্মণ্য মুসলমান কর্মচারীগণকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিয়া বা ভয়ে জড়সড় করিয়া যুদ্ধজয়াদি দ্বারা দেশ দখল করিতেছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলা দিল্লির সম্রাটের সম্পূর্ণ অধীন ছিল না, কলিকাতায় বর্গীর হাঙ্গামায় ইংরেজের সৌভাগ্যোদয় ও উন্নতি, তাঁহাদের বিধাতা পুরুষ ডাক্তার হামিল্টন বা বৌটন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপনের সম্পূর্ণ সহায়তা করেন, নতুবা মুর্শিদকুলী খাঁ কলিকাতায় ইংরাজের উহা কবিবার অবসর প্রদান করিতেন না। হায়! বাংলায় সেই সময় রোগে দুঃখে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। ইংরাজের দেওয়ানি লাভের পরই এই মন্বন্তর উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন সেই সকল এদেশী শাসনকর্তরা এদেশ বাসি

প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য কে কি করিয়াছিল উহার কোন সবিশেষ উল্লেখ নাই। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনকুবের যিনি দেশের লোক দেশের লোকের দুঃখ অন্নাভাব দূর করিবার নিমিত্ত বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মন্দির নির্মাণ, ভোগ বিতরণ বা ভোজনোপকরণ প্রেরণাদি সৎকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা বাংলার ক্ষমতাশালী জমিদারগণ অপেক্ষা সেই সময় বিখ্যাত হইয়া পড়েন তিনিই কলিকাতার ৺নয়ানচাঁদ মল্লিক। তিনিই কলিকাতায়, মহেশ, বল্লভপুর, কাঁচড়াপাড়াদি স্থানে তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ভোগ বিতরণ ও অন্যান্য দানাদি দ্বারা **"কমল নয়ান"** সংজ্ঞা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টি যেখানে পড়িত সেইখানে কমলার আর্বিভাবে দুঃখকষ্ট দূর হইত। তিনি তাঁহার কলিকাতার আবাস গৃহের নিকট যে এক অতিথিশালায় দরিদ্রগণকে ভোজন ও দানাদি করিতেন উহা "কমল নয়ানবের" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তখন রাস্তার নামে বা নম্বরে কলিকাতার জমি জায়গার পরিচয় হইত না, সীমানা উল্লেখ করিয়া করিতে হইত। ৺নয়ান চাঁদ মল্লিক পলাশি যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণের অর্থ বিতরণের ভারপ্রাপ্ত একজন কমিশনার ছিলেন ও সেকালের কলিকাতার বিখ্যাত দাতা। তাঁহার সহিত কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের কোন সৌহার্দ্য বা কোন বিরোধ ছিল না। তিনি সেকালের জমিদারগণকে ঋণাদি দান করিতেন ও সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন।

ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক সেঁকরার হাত কাটিয়া শাস্তি দিবার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে ৺নয়ানচাঁদ মল্লিকের কথায় লজ্জিত হইয়া তাহার জীবিকানির্বাহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন উহা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। উহা করিলে, বোধহয়, সেকালের জমিদারগণের নৃশংস অত্যাচার দণ্ডের উদাহরণ লঘু হইয়া যাইবে। ৺নয়ানচাঁদ মহারাজকে বলিয়াছিলেন উপযুক্ত কারিগরী মজুরী না দেওয়ায় সেকালের কারিগরেরা চুরি করিতে বাধ্য হইত। উহা বিচার না করিয়া তিনি যখন উহার জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন তাঁহাকে লোকে কেন আর সমাজপতি বলিয়া মান্য করিবে বা তাঁহার নির্মিত সেই ঠাকুরকে দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া লোকে ভক্তি করিবে? কৃষ্ণচন্দ্র লজ্জিত হইয়া সেই কারিগরের জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ওয়ার্ড সাহেব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বানরের বিবাহে অর্থ অপব্যায়াদি করার কথাও লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। উহা উল্লেখ করার তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি রাজস্ব দান না করিয়া তাঁহার অর্থর অপব্যবহার কিরূপে করিতেন উহা ওয়ার্ড, হিবার প্রমুখ ইংরেজেরা সেকালের অনেক কথার নেজা মুড়াদি বাদ দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে অনেক সময় সেই সকল ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া অবগত না হইলে উহার তাৎপর্য বোধগম্য হয় না। তখন ছিয়াত্তরে মন্বন্তর দেশের সকলের মতি গতি ফিরাইয়াছিল; ইংরাজ বা মুসলমান রাজকর্মচারীগণের পূজা করিয়া বড় মানুষ জমিদার হওয়া অপেক্ষা দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ হইতে রোগ শোক দৈন্য দূর করা কর্তব্য ও সৌভাগ্য লাভ করিবার পরমপন্থা বলিয়া লোকের ধারণা হইয়াছিল। সেইজন্যই নবকৃষ্ণ প্রমুখও দেবতার সভা ও প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ৺নয়ান চাঁদ মল্লিকের কুলদেবী শ্রীশ্রী ৺সিংহবাহিনী দেবীর পূজা ও ভোগাদি অতি সমারোহে হইত। সেই দেবীর কৃপায় উক্ত মল্লিক বংশ পুরুষানুক্রমে সৎকর্ম দান ধর্ম করিয়া কোন অধর্মে কিছু লাভ বা কাহারও সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইত না। অনেকে সেই

সময় সিংহবাহিনী দেবীর প্রতিমা ও পূজা আরম্ভ করে। ওয়ার্ড সাহেব সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

" The ten forms of Doorga (3) Singha Vahinee she fought with Rukhi Veiju (this goddes with yelow garment) is represented as sitting on a lion, she has four hands; in one a sword, in another a spear; with a third is forbidding fear and with the forth bestowing a blessing. Many people make this image and worship it in the day time, on the 9th of the increase of the moon, in whatever month they please, but in general in the month Ashwin or Chaitra, for two or three days. The ceremonies, including, bloody sacrifices, are almost entirely the same as those before the image of Doorga. Sometimes a rich man celebrates this worship at his own expense, and at other times several persons, who expect heaven as their reward, unite in it. Some Hindus keep in their houses images at all the forms of Durga, made of gold, silver, brass, copper, crystal, stone or mixed metal and worship them daily." (Ward's Mythology of the Hindus V. III p 213.)

মল্লিকদের সিংহবাহিনী দেবী দুর্বহ ধাতুমূর্তি, অতি প্রাচীন ধাতুময়ী মুকুট বৃক্ষত্বকাবৃতা ছিন্ন হস্তী মস্তকের উপর অসাধারণ সিংহের উপর দণ্ডায়মানা—উহা সেকালের নির্মিত মূর্তি নয়। সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি আন্দুলের রাজবংশ বা বিখ্যাত কলিকাতার ধনী লাহা ও গুপ্তেরা পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেবী অতি ক্ষুদ্র উহা সন্ন্যাসীরা বহন করিতে পারে; কিন্তু মল্লিকদের সিংহবাহিনী মূর্তি বৃহৎ ও গুরু সেরূপ কেহ করিতে পারে না। যখন নিম্নাঙ্গ বৃক্ষত্বক দ্বারা আবৃত করা ও মস্তকে মুকুটাদি দ্বারা রাজচিহ্ন প্রচলন ছিল তখনকার রাজার। ওয়ার্ডের পুস্তকে বাংলাব দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে উহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক কারণ কলিকাতায় মল্লিকদের *সিংহবাহিনী দেবী সে সময়ের নয়। উহা সর্বাপেক্ষা অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ সকলেই তাঁহাকে পূজা ভক্তি করে। তাঁহার কৃপায় অনেকের মনোভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টান জাতির ধর্মপুস্তকে ভগবান তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার ও ধার্মিক রাজাকে স্বপ্নে আগন্তুক বিপদ দুর্ভিক্ষাদির সংবাদ পূর্বেই জ্ঞাপন কারয়া থাকেন উল্লেখ আছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্বে বাংলার রাজত্ব খ্রীষ্টান ইংরাজ রাজার হইবে একথা কোন বিখ্যাত পাদরী লিখিয়া যান নাই, বা তাঁহাদের ধর্মপুস্তকে খ্রীষ্টান জাতির ধর্মমাহাত্ম্য প্রকাশ করেন নাই। মুসলমান ইংরাজ নবাবাদি হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা যেমন ঘৃণা করে তেমনি উহারা অপূর্ব অলৌকিকত্বে মুগ্ধ। উহাতেই এখনও হিন্দু ধর্ম নানা অত্যাচারের মধ্যেও শিরোজ্জ্বল করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। কলিকাতায় শ্রীশ্রী *কালিমাতার যেমন প্রভাব, মুর্শিদাবাদে রাধামাধবেরও সেইরূপ প্রভাব ছিল। কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে উহার সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে উহার সারাংশ উল্লেখ করিলাম। মতিঝিলের প্রসাদে শ্রীশ্রী *রাধামাধবের পূজার সময় শঙ্খঘন্টার শব্দ শুনিয়া নবাব জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ বড়ই উৎপীড়িত হইতেন। সেই দেবতাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তিনি লোক দিয়া খানা

"জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামুচুঃ সিংহবাহিনীং তুষ্ট মুবুনয়শ্চৈনাং ভক্তি নম্রাক্ষ মূর্ত্তয়ঃ।'
চণ্ডীর ২য় অধ্যায় দেবতাগণের শক্তিদ্বারা *সিংহবাহিনীর উৎপত্তি কীর্তিত হইয়াছে।

পাঠাইয়া দেন। সেবাইত গোস্বামীগণ বাহককে যত বার উহার আবরণ উন্মোচন করিতে বলেন, ততবারই সেই অখাদ্য যুই ফুলের মালা হইয়া যায়। নওয়াজেস স্বয়ং উহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু যখন তাঁহার চক্ষু, কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়াছিল, তখন তিনি সেই দেবতার পাকা দালান করিয়া দেন ও শেষে এক্রামউদ্দৌলার শোকে উন্মত্ত হইয়া মারা যান। বাংলাদেশে কালী ও কৃষ্ণ পূজার আর্বিভাব ও মাহাত্ম্য এইরূপ ঘটনায় প্রকাশ হয়।

ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার ভেদ করা দুরূহ উহা কেবল ধর্মধ্বজীরাই করিতে পারেন, সেইরূপ সেকালের কলিকাতার সূক্ষ্মবিচার রহস্যভেদ ইংরাজ জাতি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারে নাই। উহার রহস্যভেদ করিবার অনেক পুস্তক আছে বিলাতের মহাসভায় সার ইলাইজা ইম্পে ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রমুখ এদেশের প্রধান কর্মকর্তা ও মহাপুরুষ বিচারক ও অভিযোক্তাগণের সেকালের বিচার প্রসঙ্গ আছে। কলিকাতায় বিচারের আড়ম্বর ও ফলে কলিকাতা চিরস্মরণীয় হইয়াছে। সেইরূপ ইংরাজ জাতির পৌরুষ, আত্মসম্মান ও গৌরব পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু সেকালের লোকেরা রাধাচরণ, রেজা খাঁ, নবকৃষ্ণের অব্যাহতি ও নন্দকুমারের ফাঁসি বিচার বিভ্রাট ও কলিকাতার কলঙ্ক বলিয়া মনে করিত। নন্দকুমার কলিকাতার যেখানে থাকিতেন সেখানে তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসের নামে রাস্তা আছে ও গঙ্গাধারে কুলিবাজারে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শ্রেষ্ঠ আদালতের প্রধান বিচারপতি কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে সেই সুবিচার করিয়া শেষে বিলাতে তাঁহাকে স্বয়ং বিচারাধীন হইতে হইয়াছিল। উহা তখন সকলের প্রহেলিকাস্বরূপ বোধ হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার শেষ গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস নন্দকুমারের সাহায্যে মহম্মদ রেজা খাঁ দুর্ভিক্ষের সময় চাউল একচেটিয়া করিয়া উচ্চ দরে বিক্রয় ব্যবসায় লোকহত্যা, নিজামতির রত্নালঙ্কার হস্তী, অশ্ব বিংশত্যধিক কোটি টাকা আত্মসাৎ আদি সেতাব রায়ের বিরুদ্ধে নব্বই লক্ষ টাকা তহবিল তচ্ছ্রুপ অভিযোগ কালে উহাদের অব্যাহতির জন্য রেজা খাঁ ও সেতাব রায় যে সকল উৎকোচ দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন উহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই কলিকাতার সেকালের সকল লোক উহাদের মুক্তিতে যারপর নাই অর্শ্চযান্বিত হইয়াছিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস যতদিন কলিকাতার গভর্নর ছিলেন, ততদিন নন্দকুমারের সহিত সখ্যতা ছিল। যখন বিলাতের আইনানুসারে তিনি কলিকাতার গভর্নর জেনারেল পদে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন তখনই গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। বিলাতের পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের যাবতীয় কোম্পানীর বাণিজ্য ও অধিকারের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য গভর্নর জেনারেল পদের সৃষ্টি করেন। নন্দকুমার বিচার কৌতুকের পূর্বেই উৎকোচাদির উল্লেখ করিয়াছিলেন ও শেষে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মার্চ তারিখে যে সুদীর্ঘ আবেদন করেন উহাতেই তাঁহার সর্বনাশ হইল। উহাতেই বন্ধু বিচ্ছেদ হইয়াছিল। সেই সময়ে বর্ধমানের মহারাজ তিলক চাঁদের বিধবা পত্নী হেষ্টিংসের অত্যাচারের কথা কলিকাতা সভায় আবেদন করেন। কলিকাতার গভর্নর জেনারেলের বিচার একজন বিধবা' জমিদার রমণী করিবার অব্যবহিত পরেই নন্দকুমারের অভিযোগ যেন সঙ্গদোষে দুষ্ট অনুমিত হইল। বিলাত হইতে নবাগত কলিকাতার গভর্নর জেনারেল সভার সভ্যগণ স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ তখন পূর্বমত পুরাতন এদেশী কর্মচারী পদোন্নতি দ্বারা সেই সভার সভ্য না হওয়ায় হেষ্টিংসের সহিত

তাঁহাদের মতের অনৈক্য হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহাদের নিকট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিরূপ ভয়ানক হইয়াছিল ইহা লিখিয়া কাহারও বোধগম্য করান দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু উহা কল্পনা চক্ষে অনুভব করা কঠিন নয়। হেষ্টিংস নির্বুদ্ধিতা বশতঃ বুঝিলেন যে নন্দকুমার নিশ্চয়ই তাঁহার সভার বিপক্ষগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই দুঃসাহসিক কার্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সেইজন্য তিনি নন্দকুমারের আবেদন সভায় পঠিত হইবার পর ফ্রান্সিস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ আবেদনের বিষয় পূর্বে কিছু অবগত হইয়াছিলেন কি না উহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইয়াছে। ফ্রান্সিস উহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া উহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ও পরস্পরের মধ্যে উহাতেই মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। ১৩ই মার্চ নন্দকুমার আর এক আবেদন দান করিয়া উহা প্রত্যাহার না করিয়া উহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন বলেন। উহাতেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগণা কিসের জন্য বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া কান্তমুদির সন্তান লোকনাথের হইল, বাদশাহের প্রদত্ত রাজ সম্মান ঝালরওলা পাল্কী যাহা নন্দকুমারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল উহা কেন হেষ্টিংস সাহেব স্বয়ং ব্যবহার করেন ও ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে মণি বেগমের বংশলোপ হইলে নিজামতির সিংহাসনে বব্বুর সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় মণি বেগমের কর্তৃত্ব ও রাজা গুরুদাসের নিয়োগ ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারী কান্তমুদির ভ্রাতা নৃসিংহ আদির মারফত উপহার লাভ ইত্যাদির তালিকা দান করা হইয়াছে উহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়।

সেদিনের কলিকাতার লাটসভার ঘটনাবলী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। যখন সভ্য মন্সন সভাস্থলে নন্দকুমারকে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তাব করেন, তখন হেষ্টিংস বারওয়েল উহা হইতে পারে না বলিয়া তর্ক-বিতর্কে সভ্যগণকে বিরত করিতে পারিলেন না। যখন তিনি বোর্ডের সেক্রেটারীকে নন্দকুমারকে উপস্থিত করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন, তখন হেষ্টিংস সেই সভার সভ্যত্রয়ই যে নন্দকুমারের নাম দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই সমস্ত করিতেছেন বলিয়া সভাভঙ্গ আদেশ দান করিয়া যেমন উঠিয়া যান অমনি বারওয়েলও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যান। নন্দকুমার সেই সভায় উপস্থিত হইয়া দুইখানি মূল দলিল দাখিল করেন। উহাতে কান্তমুদির উপস্থিতি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সভা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান তখনই সে গভর্নরের নিকট উপস্থিত তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে পারেন না বলিয়া লিখিত উত্তর দান করিল। সেদিনের সভা এইরূপে ভঙ্গ হইল। নন্দকুমার ও কান্ত প্রহসন পর্বারম্ভ হইল। সেই হেষ্টিংসের প্রসাদে তখন হইতে যিনি কান্তমুদি বলিয়া সর্ববিদিত ছিলেন তিনি কান্তবাবু বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত দাস কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাবে তিনি কৃষ্ণবিহীন হইয়াছিলেন। শেষে কান্তবাবুকে কলিকাতার সভার সেই অবমাননার কারণ প্রদর্শন করাইবার জন্য উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। সেইদিন সেইখানে কান্তবাবু কলিকাতার সর্বপ্রধান অধিবাসী বলিয়া গভর্নর জেনারেলের অভিনন্দন লাভ করেন। তাঁহার পূর্বোক্ত অপমান করার জন্য শাস্তি দিবার ব্যবস্থালোচনা কালে হেষ্টিংস সাহেব পরিষ্কার বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজের জীবন বিনিময় করিয়া কৃষ্ণকান্ত মণিকে রক্ষা করিবেন। গভর্নর বাহাদুর অত্যল্প অপরাধে প্রত্যহ হতভাগ্য হিন্দুগণকে তুড়ুম শাস্তি দান করিয়া থাকেন এইরূপ শাস্তি বিধানাজ্ঞা কি কান্তবাবুর কৃতাপরাধের যোগ্য শাস্তি নহে উহা বিচার হয়। সেই বিচাব বিভ্রাটের রহস্য কলিকাতাবাসিগণ তখন নিম্নলিখিত ছড়ায় উপভোগ করিয়াছিল।

"কান্তবাবু হয়ে কাবু, হাবুডুবু খায়, তড়ং লাগান হোক ক্লেভারিং-এর রায়
হেষ্টিংস যাহার হাত, তারে করে কাবু, বাংলায় হেন লোক, আছে কেহে বাবু।'

ইহা নন্দকুমারকে অপদস্থিত করিবার জন্য ও হেষ্টিংসের ক্ষমতা প্রচার করিবার জন্য হইয়াছিল, অর্থাৎ আর কেহ ভবিষ্যতে যাহাতে নন্দকুমারের ন্যায় হেষ্টিংসের সহিত শত্রুতা করিতে না পারে।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী— কোম্পানীর সেরেস্তায় স্বাক্ষরিত দরখাস্তে কৃষ্ণকান্ত দাসই উল্লেখ আছে। যিনি সর্ব প্রথমে কান্তমুদি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে বাবু ও সর্বপ্রকারে উন্নত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যে বহরমপুরের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেন নিমক মহলের সর্বেসর্বা ছিলেন তাঁহার সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্য তিনি মুদি বলিয়া পরিচিত হন। তিনি শেষে কলিকাতায় জাত কাছারির কর্তা হইযা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহে 'নন্দি' উপাধি লাভ করেন। উহার পূর্বে পুরীতে অন্নছত্র করিতে গিয়া সেখানকার পাণ্ডারা তাঁহার নিকট হইতে উহাতে অকৃতকার্য হন ও আপনাকে অপদস্থিত মনে করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন কোন এক পিরালি তাহার বাড়িতে গেলে তাঁহাকে লক্ষাধিক টাকা উপহাব দিতে চাহিয়াছিলেন, ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাই হউক, হেষ্টিংসেব দৌলতে এক কান্তমুদি কেন অনেকেই উপাধি, রাজত্ব ও জমিদারী লাভ করিয়া কলিকাতায় আন্দুল, কাশিমবাজারাদির বনিয়াদি রাজবংশের পত্তন করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নরগণের আমলে বিচার কার্যের বিভ্রাট ব্যাপার অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল। কলিকাতায় গোপীনাথ মদনমোহনের মামলা নিষ্পত্তি কলিকাতার আদালত যেরূপ করিয়াছিল, সেইরূপ নবকৃষ্ণ রেজা খাঁ সেতাব রায়ের মামলা কলিকাতায় আরম্ভ হইয়া শেষে নন্দকুমার ও হেষ্টিংসের বিচারারম্ভ হয়। উহা তখন কলিকাতার কর্মকর্তাগণের গৌরব বা কলঙ্ক যাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। উহাতে বাংলার কর্তৃপক্ষগণের সহিত এদেশী রাজকর্মচারী ও জমিদারগণের যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল উহা দ্বারা ছিয়াত্তরে মন্বন্তরাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইয়াছিল।

তবে বিচার বিভ্রাট প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিলে সম্পূর্ণ হয় না। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দুর্গ নির্মাণ কার্যের দরুন একটি বিচার হইবার কথা হয়, কিন্তু চতুর দোষী ক্লাইবকে লক্ষ টাকা উৎকোচ দান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি অর্থাৎ ক্লাইব সেই টাকা নিজে আত্মসাৎ না করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়াছিলেন। উহা কোম্পানী গ্রহণ করায় বোধহয়, উহাদের কর্মচারিগণ ঐরূপ গ্রহণ করা নীতি বিগহিত কার্য নয় মনে করিয়াছিলেন। উহাই কলিকাতার বিচার বিভ্রাটের সূত্রপাত— সেখানেও সৃষ্টিধর মহাপুরুষ ক্লাইব। ধন্য কলিকাতার সূক্ষ্ম বিচার !!! ধন্য সেই সকল মহাপুরুষগণ যাহারা সেই বিচারের সূত্রপাত ও শেষ করিয়াছিলেন!!! যাহারা সেই বিচার প্রার্থনা করিত, তাঁহাদের নন্দকুমারের ন্যায় পরিণাম অপরিহার্য ভাবিয়া আর কেহ করে নাই। ধর্মাবতারগণের সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে গূঢ় রাজনীতি ও শাসন প্রণালী বিরাজমান। উহা লক্ষ্য না করিয়া সৃষ্টিধর ইংরাজ পুরুষ সিংহগণের দোষ ও কলঙ্ক দান যে ঘোর অন্যায় ইহা তখন নন্দকুমার অনুভব করিতে পারে নাই। বিলাতের শিক্ষিত মহাসভা উহা সর্ববাদি সম্মতিক্রমে অনুমোদন না করিলেও অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছিল। উহার আলোচনা সেইখানেই শেষ, অতএব উহা লইয়া ছিদ্রান্বেষণ করা অনাবশ্যক। সেকালের কলিকাতার গভর্নরগণের মাহাত্ম্য ও দেশের লোকের ব্যবহারের

জন্য যতদূর করা উচিত উহাই অতি সংক্ষেপে করা হইয়াছে। ইংরাজের আইনে যে উৎকোচ দান ও যে উহা গ্রহণ করে উভয়ই দণ্ডার্হ। তবে কোথাও সেই দোষ ক্ষমার্হ হইয়া থাকে, কোথাও দণ্ড বজ্ররূপে দোষীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। সেইখানে সেকালের বিচার কর্তাগণ বোধ হয় বলিবেন ঃ—

"সেই লিখি মদনমোহন যে লিখায় কাষ্ঠের পুতুলি যৈছে কুহকে নাচায়।"

"ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতিভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

ভগবানের রাজত্বে কেহই দোষী নাই কেবল ভগবৎ বিশ্বাসের অভাবে একজন নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতে চান। নন্দকুমারই সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশ করিয়া খাল কাটিয়া বাংলায় কুমির আনিয়া সকলের সর্বনাশ করিয়াছিল ও মীরকাসিমই প্রকৃত প্রস্তাবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সূত্রপাত করিয়াছিল। কলিকাতার ষড়যন্ত্রে উমি চাঁদ নন্দকুমারকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বাদশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিল। উহাতেই ফরাসিরা সিরাজউদ্দৌলার সহায়তায় বঞ্চিত হইয়া পরাস্ত হইয়াছিল। আর কিছুদিন পরে সেই নন্দকুমার হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের জন্য অভিযোগ প্রার্থনা করিয়াছিল। মানব উহা লইয়া মারামারি তর্ক-বিতর্ক করিতে পারে কিন্তু ভগবানের নিকট সূক্ষ্ম বিচার, তিনি উহা গ্রাহ্য করিবার অগ্রে অভিযোগকারিকে অগ্রে তৎকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে হেষ্টিংস বা ইম্পের দোষ কি? ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের মধ্যেও সেই সূক্ষ্ম বিচার! দেশের লোক জননী জন্মভূমির দাসত্ব মোচনের চেষ্টা না করিয়া একমাত্র অর্থকরী রাজসেবায় কানগোই নাজীর, নায়েব নাজেমীর মন্ত্রীত্বাদি উচ্চপদ লাভের জন্য লালায়িত— উহার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা উমেদারি করিয়া সেই পদে বহাল হইবার চেষ্টায় ইংরাজ বণিকগণ দেশের অধিপতি, আর তাহাদের উমেদারের জমিদার রাজাদি পদে উন্নত হইয়াছিল। প্রাচীন নীতি উপদেশ দেশবাসি উপেক্ষা করিয়া দেশের ও আপনার সকলের সর্বনাশ করিয়াছিল। লোক পরের ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, নিজের দোষ দেখিতে পান না।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি কর্মনি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব দৈব চ।"

অর্থাৎ বাণিজ্যেই লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপায়, কৃষি দ্বারা উহার অর্দ্ধেক, উহার অর্দ্ধেক রাজসেবায় কিন্তু ভিক্ষায় অষ্টরম্ভা; আর চলিত কথায় "লাভ লোকেসানগণে" চার করে না যে বেনে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ যে দেওয়ানি লাভ করার বিপক্ষে বারংবার উপদেশ সত্ত্বেও ক্লাইব দেওয়ানি লাভ করিয়া সেই কোম্পানীর ভারতবর্ষের বাণিজ্যস্বত্ত্ব বলে আদি পর্বাঙ্ক শেষ করিয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে আদিপর্বের শেষ ও মধ্য লীলার প্রারম্ভ উহা সঙ্গেই কোম্পানীর ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রথম সম্বন্ধ সূত্রপাতের সন্ধিক্ষণ। সুতরাং তাঁহার কথা কলিকাতার কথায় আদি পর্বে শেষে ও আবার মধ্য পর্বের প্রথমেই বলিতে হইবে।

হেষ্টিংসই মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতার রাজপাট বিচারালয় কলিকাতায় আনয়ন করেন ও কলিকাতা কোম্পানীর দেওয়ানির সর্বপ্রথম রাজধানী হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস

কলিকাতার কথার আদি পর্ব ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্নরীর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়াছিল। তিনিই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের কলিকাতার শেষ গভর্নর এবং তৎপূর্ববর্তী গভর্নরগণ অপেক্ষা অধিক সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহানুধ্যায়ী অনেকেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস একজন কলিকাতার কোম্পানীর পুরাতন কর্মচারি ছিলেন। তিনি দেশের অবস্থা ও দেশের লোকজন সকলকে বিলক্ষণ জানিতেন উর্দু ভাষা মুন্সি নবকৃষ্ণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন ও এদেশে ইংরাজের আসিবার পূর্বে যাহাতে ঐ ভাষা শিক্ষা করে সেজন্য সুবিখ্যাত সহাধ্যায়ী ডাক্তার জনসনের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় সামান্য কেরানিগিরি করিয়া গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল পদ লাভ ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাগ্যেই হইয়াছিল। ক্লাইবের উন্নতি মাদ্রাজের সঙ্গে জড়িত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা অধিকার করেন তখন হেস্টিংস কাশিমবাজারে বন্দি ও মুক্ত হইলে দিনেমারগণের সাহায্যে পলাতক ইংরাজগণের সহিত ফলতায় সম্মিলিত হন। কলিকাতা অধিকারের সময় ক্লাইবের অধীনে বজবজের যুদ্ধে ভলান্টিয়ারের কার্য করিয়া ক্লাইবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহাতেই পলাশি যুদ্ধের পর তিনি মীরজাফরের দরবারে ইংরাজ কোম্পানীর রেসিডেন্টের পদলাভ করিয়াছিলেন। পরে ভান্সিটার্টের গভর্নরীর সময় তিনি কলিকাতা সভার সভ্য ও গভর্নরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পনের বৎসর এই সকল কার্য করিয়া ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ফিরিয়া যান। তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা সেকালের কর্মচারীগণের ন্যায় সমুন্নত হয় নাই। ঐ সময়ের পার্লামেন্টের তদন্ত সভায় সাক্ষ্যদান করিয়াই তাঁহার শেষ সৌভাগ্যোদয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রভুর লবণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, উহাতেই সেই কোম্পানীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সভার সভ্য ও ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গভর্নর হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের সম্বন্ধ প্রকাশ্যভাবে স্থাপিত হইল। উহাতেই বাণিজ্য ব্যবসা হইতে দস্তুর মত দেওয়ানি রাজপাট পত্তন হইয়াছিল। কলিকাতা উহার সূত্রপাত ও কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। উহাতেই কোম্পানীর কর্মচারিগণের কার্যাকার্যের বিচার আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতায় সেই অভিনয়ের রঙ্গস্থল, সেইখানেই বাংলা, বিহারের কর্মকর্তৃগণের বিচার ও তাহাদিগকে বন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল। বাংলা, বিহারের নায়েব দেওযানি পদ উহাতেই লুপ্ত হয় ও দুই প্রদেশকে আঠারটি জেলায় বিভক্ত করিয়া নূতন শাসন প্রণালীর সৃষ্টি হয়। এক একজন ইংরাজ কর্মচারিগণের দ্বারা এক একটি জেলাব কর আদায় ও বিচার

কার্য নিষ্পন্ন হইত। হালহেড সাহেব বাংলা পার্শি অক্ষরে ছাঁচ খোদাই ও ঢালাই করেন ও পণ্ডিত মৌলবীরা হিন্দু মুসলমান জাতিয় আইন কানুন ইংরাজীতে তর্জমা করিবার সহায়তা করেন। কারণ তদ্ভিন্ন ইংরাজেরা এদেশবাসির বিচার করিতে পারিবে না। ছয় জেলার কালেক্টারগণ সম্মিলিত হইয়া এক সভা করিত। মহাজনেরা যাহাতে খাতকগণকে রুদ্ধ করিয়া টাকা আদায় করিতে না পারে ও জমিদারেরা ধর্ম ভীরু কর্মচারীগণের কৃপায় অল্প খাজনা দিয়া ছাপি জমি-জায়গা দখল ও উপস্বত্ত ভোগ করিতে না পারে, সেজন্য ধনাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। গভর্নর সমস্ত কার্য স্বচক্ষে ও স্বহস্তে করিবার জন্য কোম্পানীর রাজত্বের রাজধানী কলিকাতায় হইল। ওয়ারেণ হেস্টিংস মুসলমানী শাসন ও বিচার প্রণালী সমূহের মুলোৎপাটন কবিয়া ও কলিকাতায় প্রথম ইংরাজি শাসন ও বিচারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা আগস্ট পর্যন্ত এইরূপই চলিয়াছিল। শেষে উহার পরিবর্তন ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হইয়া করিয়াছিলেন।

শতবর্ষ— জব চার্ণকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্নরীর শেষ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর ব্যবসা শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছিল। সেই একশতাব্দিতে কোম্পানীর যে ব্যবসা ও রাজত্ব পত্তন হইয়াছিল, উহার অপূর্ব কাহিনী অরব্য বা পারস্য উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর কৌতুকাবহ। সম্রাজ্ঞী নুরজাহানই সর্বপ্রথমে তামার পয়সা ও ঢেপুয়ার প্রচলন করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা দেওয়ানি লাভ করিবার পর তাঁহারা কড়ির পরিবর্তে পয়সার প্রচলনের পক্ষপাতী হন ও ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পয়সা তৈয়ারি আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময়ের পর হইতে এদেশে সোনা রূপার গহনা ব্যবহার করা আরম্ভ হয়, পূর্বে দুরবস্থায় এদেশের স্ত্রীলোকেরা রুলী লোহা শাঁখা সিন্দুরই ব্যবহার করিত। বর্গীর হাঙ্গামায় ও চোব ডাকাতের অত্যাচারে লোকে টাকা পয়সা মোহর ঘরে রাখিত না, বা তাহারা সোনা রূপার গহনা পরিত না। উৎপন্ন শস্যাদি মরাই করিয়া রাখিত। সে সময়ে কলিকাতার জমি জায়গা বিলি প্রতি বিঘা আট আনা হইতে বার আনা হারে দেওয়া হইত। ইংরাজ কর্মচারীরা বা তাহাদের বেণিয়ানেরা সেইরূপ বিলি গ্রহণ করিয়া প্রতি বিঘা হইতে দুই টাকা চার আনা হইতে দুই টাকা বার আনা খাজনা আদায় করিত। লর্ড ক্লাইব উহা বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে জানাইয়া বিলির মেয়াদ শেষ হইলে, যাহাতে আব কাহাকেও ঐরূপ জায়গা বিলি করা না হয়, উহার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সে কালের পাট্টাতে কিরূপ সর্ত থাকিত, উহা মাগুরা পরগণা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২লা নভেম্বর হইতে এক বৎসর মেয়াদে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে যে পাট্টা দেওয়া হয় উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইজারাদারেরা জায়গা বিলি করিয়া খাজনার হার বৃদ্ধি বা জোত উচ্ছেদের বা আওলাতাদি নষ্ট করিবার বা বিবাহাদিতে কোন অবওয়াব লইতে পারিত না। প্রতিবেশীর সহিত হাট গঞ্জ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ বা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। উহাদিগকে কোম্পানীর হুকুমানুসারে কার্য করিতে হইত। ফৌত বা পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তির তায়দাদ কতিপয় ভদ্রলোকের শীলমোহর করিয়া কলিকাতার কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। তখন কলিকাতার গভর্নর ও তাঁহার সভা যাহার প্রতি যে আদেশ দান করিত, উহা পালন করিতে হইত। লর্ড ক্লাইব ও তাঁহার অধীনস্থ গুপ্ত সভা যাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ এদেশের লোকের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে উহার প্রতিকারের যে চেষ্টা করিতেছিলেন উহা হেস্টিংসের আমলেও কার্যে পরিণত হয় নাই। কেবলমাত্র সুন্দরবন, ঢাকা, চব্বিশ পরগণার নদীর মধ্যে

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্
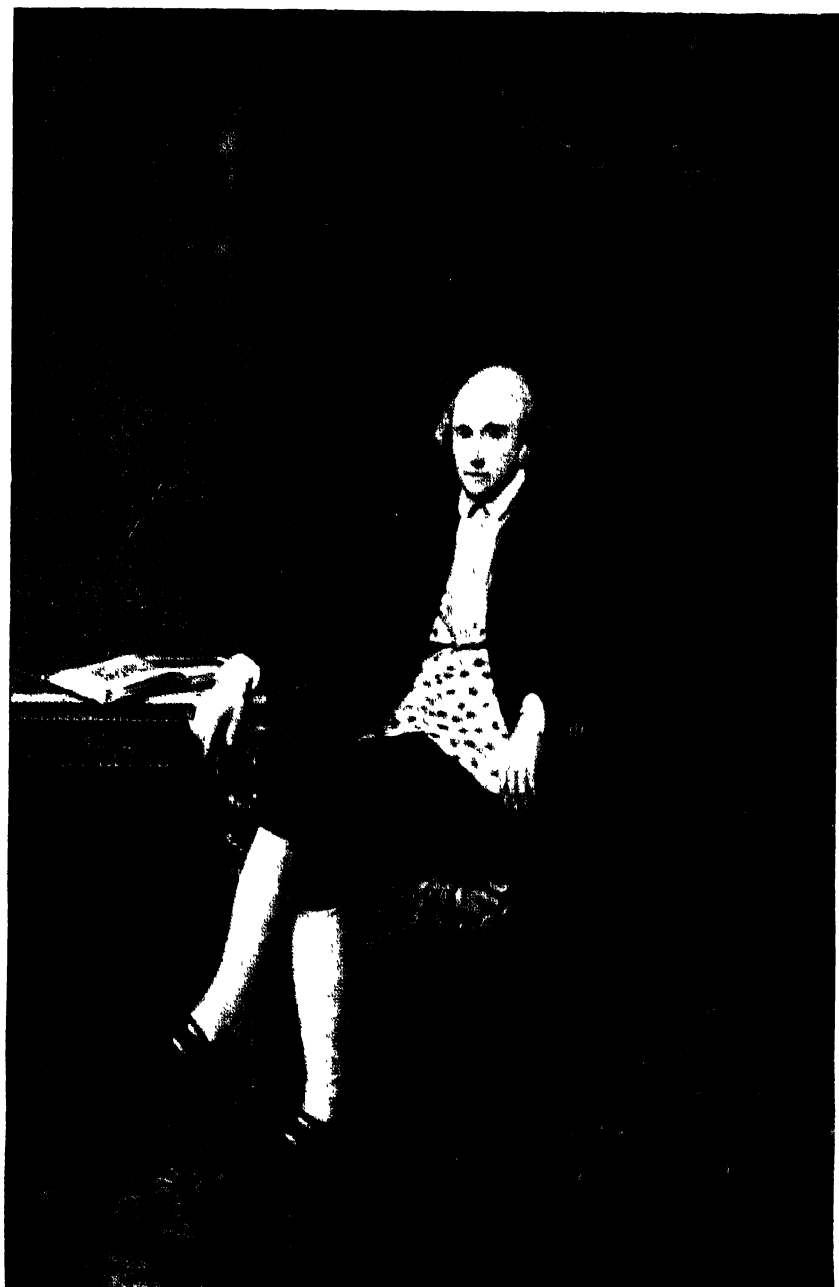
আরাকানী মগ বোম্বেটিয়ারা যে ছেলে মেয়েদের ধরিয়া লইয়া যাইত, গ্রাম লুটপাট করিয়া ভস্মসাৎ করিত ও নদীপথে ব্যবসার দ্রব্যাপহরণ করিত, উহারই কিঞ্চিত শাস্তি হইয়াছিল। উহাতেই কলিকাতাবাসিরা "এটা কি মগের মুলুক নয়" বলিয়া কোম্পানীর রাজত্বের সুখ্যাতি করিত, এখনও উহা প্রবাদ স্বরূপ উক্ত হয়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা চব্বিশ পরগণাদি সমস্ত জায়গা রাজা নবকৃষ্ণ ও গোকুল বার্ষিক তের লক্ষ টাকা খাজনায় ইজারা লইবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু তৎসম্বন্ধে গভর্নর ও তাঁহার সভা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উহাতেও রায়তের প্রতি অত্যাচার হইবার আশঙ্কা আছে। এইরূপ কথা শহরের তদানীন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের প্রতিবাদে ছিল। সেই সময়ে গভর্নর সভায় ঐরূপ সিদ্ধান্তের সারমর্ম এইরূপ ছিল যে, নবকৃষ্ণ ও উহার সহযোগী গোকুলকে তাহাদের প্রস্তাবিত জমি জায়গা বিলি করিলে উহাদের অত্যাচার বর্ধিত হইবে। এদেশের কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা দান করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। যাহাতে সাধারণে ঐ সকল জমি-জমা গ্রহণ করে, উহারই নোটিশ জারি করা হয়। সেই সাধু উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস কার্য করেন নাই, উহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিকতর কলঙ্কেব কথা। তাঁহার শাসনকালে ঘোর কলির অত্যাচারী পঞ্চপাণ্ডবের আবির্ভাব হইযাছিল। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবেরা অত্যাচারীকে দমন করিবার জন্য বিখ্যাত, পঞ্চগ্রামের ভিখারী, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের দরবারে সেই আর্জি পেশ করিয়া কৃতকার্য হন নাই; উহাতেই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ও কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে তাঁহার এদেশি পৃষ্ঠপোষকগণ ধনদৌলত জমিদারী লাভ কবিয়াছিল ও নিরীহ দেশবাসীর সর্বনাশ করিয়াছিল। যে সুতানটীতে জব চার্ণক অবতরণ করিয়া কলিকাতায ব্যবসারম্ভ করে, সেই তালুক নবকৃষ্ণ লাভ করিয়াছিল। তাহার বহুদিনেব মনোভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি গঙ্গামণ্ডলাদি পরগণাও পাইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু, কাশিনাথ, নবকৃষ্ণ ও দেবী সিংহ যেন সেকালের কলিকাতাধিবাসি বলবান পঞ্চপাণ্ডব ছিলেন। তাঁহাদের কীর্তিকলাপ এই কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও তাঁহাদের অভ্যুন্নতির সময় ইহার অন্তর্গত। নবকৃষ্ণের প্রথম উন্নতি ক্লাইবের অনুগ্রহেই হইয়াছিল। ১৬ই জানুয়ারী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ সভার বিবরণে নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে ক্লাইবের সুপারিশের সারমর্ম এইরূপ ছিল।

নবকৃষ্ণ ও নন্দকুমার — মুন্সী নবকৃষ্ণকে তাহার পরিশ্রম ও বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানীর পলিটিক্যাল বেণিয়ান পদে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয়। যখন নন্দকুমারকে বিহার প্রবাসী দিল্লির সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্রাপরাধে বন্দি করিয়া জেনারেল কর্ণাক কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন, তখনও সেই নবকৃষ্ণের অনুরোধে ক্লাইব নন্দকুমারকে চট্টগ্রামে নির্বাসিত করিবার সংকল্প ত্যাগ করেন। ভরেলেষ্টের গভর্নরীর সময়েই নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণের মধ্যে বিবাদ ও পরস্পরের শত্রুতার সূত্রপাত হয়। ক্লাইবের নিকট নন্দকুমারকে ভান্সিটার্টের আরোপিত কতকগুলি দোষ ক্ষালন করিতে হইয়াছিল। কার্টিয়ারের শাসনকালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ প্রমুখের অবৈধ অত্যাচারের কথা নন্দকুমার স্বীয় ব্যয়ে বিলাতে এজেন্ট পাঠাইয়া উহাকে ও পাটনার শাসনকর্তাকে হেস্টিংসের শাসনকালে সর্বপ্রথমে বিচারাধীন করিয়াছিলেন। প্রথমে হেস্টিংস সেই বিচার কার্যের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রেজা খাঁ সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য হেস্টিংসকে দশ লক্ষ ও নন্দকুমারকে দুই লক্ষ টাকা

উৎকোচ দান করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি কৃতকার্য হন নাই। সিতাব রায়ও বৃথা তদনুরূপ কার্য করিতে গিয়াছিলেন। শেষে বহ্বাড়ম্বে লুঘুক্রিয়ার ন্যায় সেই বিচারে কাহারও কোন দণ্ড হইল না। কিন্তু উহাদের উভয়ের নিষ্কৃতি লাভের সঙ্গে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করা হইল। তিনি তাহাদিগকে দোষী করিবার সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারেন নাই, ইহা হেষ্টিংস বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকে জানাইয়াছিলেন ও তিনি নন্দকুমারের যথারীতি নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। নন্দকুমার পুত্রের দেওয়ানি হেস্টিংসের সম্মান রক্ষা লক্ষ টাকা নজর দিয়া মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। অর্থই অনর্থের মূল, তখন পদ ও পদবী সমস্তই এক অর্থের দৌলতে লাভ হইত। হেস্টিংসের শাসনকালে উহাই মূলমন্ত্র হইয়াছিল। উহারই জন্য নাবালক নবাবের সিংহাসন লাভ কালে মাতা তাঁহার অভিভাবিকা না হইয়া বিমাতা মণিবেগম মনোনীতা হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে মণিবেগম নন্দকুমারের মারফত হেস্টিংসকে আড়াই লক্ষ টাকা উৎকোচ দান করিয়াছিলেন বা করিতে গিয়াছিলেন।

নূতন ব্যবসা — কলিকাতা তখন কোম্পানীর একশত বৎসরের তৈয়ারী রোজগারের কারখানা হইয়াছিল। সেইখানেই হরির লুটে অনেক বনিয়াদি রাজা মহারাজা ফতুর হইত, তৎপরিবর্তে মুদি, মুন্সি, কেরাণী, রাজা-মহারাজা ও জমিদার হইয়াছিল। সেকালের কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারিগণের উমেদারগণের দ্বারা তাহাদের প্রভুর উদর পূরণ হইত। তাঁহারা শিকারগণকে উমেদারগণের হস্তে সঁপিয়া নানা উপায়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্যে সিদ্ধি করিতেন। এইরূপে কোম্পানীর রাজত্বে মুড়ি মিছরির একদর হইয়াছিল। নুনের গোলা ও আড়ংয়ের সাহেবেরা বাংলার ছোট বড় জমিদারগণের নামে নালিশ করিয়া কলিকাতায় তাহাদিগকে হাজির করিয়া নানারূপে নাকাল ও অপদস্থ করাইত। তখন তীর্থযাত্রীরা কোন ঠাকুরকে কোন প্রণামী উপহার দান করিবার অগ্রে কোম্পানীকে ভেট দিতে হইত। উহাতে হেস্টিংসের আমলে ত্যাগী সাধু ফকিরেরা দেশ উদ্ধারের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে পশ্চিমের সাধু ফকিরেবা বর্গীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু সাধক ˚রামপ্রসাদ সেন কলিকাতায় ˚কালীমাতার বৈরাগ্যোদ্দীপক গান গাহিয়া পীড়িতের মর্মযাতনা দূর করিতেন। আর রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ কোম্পানীর বেণিয়ান মহাপ্রভুরা˚ কালীমাতার নিকট ও বাড়িতে দুর্গাপূজাদি করিয়া মনোভিষ্ট সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত জোড়া পাঁঠা বলিদান ও ইংরাজের খানা, নাচ তামাসা, কবির গান, তর্জা, হাফ আকড়াই, ফুল আকড়াই আদি নানাবিধ আমোদ প্রমোদের দ্বারা কলিকাতা সরগরম করিতেন। তাঁহারা কলিকাতায় দুর্গাপূজাদিতে ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তি দান করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করিতেন। তাঁহারা এইরূপ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। দেশের লোককে লোকে তখন হিংস্র ব্যাঘ্র সিংহাপেক্ষা অধিক ভয় করিত ও সেকালের ছড়ায় উহাদের স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে ।

"বাঘ ভালুকে নাই ভয়, ঢেঁকি দেখলে প্রাণ যায়।"

কোকিলের ন্যায় বর্ধমানের নাবালক রাজা কলিকাতায় রাজ নবকৃষ্ণের বাড়িতে তিন বৎসরকাল প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইহাতে নবকৃষ্ণের বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন লাভ ও তদ্ব্যতীত যে টাকা ঋণদান করিতেন, উহার উপর সুদাদি নানা বাবদ বিলক্ষণ লাভ হইত। হেস্টিংসের কৃপায় যেমন নবকৃষ্ণের নানাবিধ উপায়ে লাভ হইত, গুডল্যাণ্ড সাহেবের অনুগ্রহে সেইরূপ গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবীসিংহের রানী ভবানী ও তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে প্রভুত অর্থাদি লাভ হইয়াছিল। বর্ধমানের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে বাস করায় যে সকল

পাঞ্জাবীক্ষেত্রীরা আভিজাত্য গৌরব মূল্যবান মনে করিত, তাহারা ছেলেমেয়েদের সহিত উক্ত রাজাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ করিতে আপত্তি করিয়াছিল। এমন কি, দেওয়ান কাশিনাথ পর্যন্তও সেইরূপ করিয়াছিলেন। সেই সময় বাংলার হিন্দুস্থানি ব্যবসায়িরা নিরাশ হইয়া সেকালের ইংরাজগণের সম্বন্ধে এইরূপ বলিত।

"সাহেব মেরা বেনিয়া, করে সকল ব্যাপার
বিন ভারি, বিন পালরা, চোখে সকল সংসার।"

সে সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীরা সাধাবণ ব্যবসা করিয়া অর্থোপায় করিত না, ইহাতেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সেকালের সাহেবরা সকলেই নবাবী আদব কায়দা, আহার-বিহাব শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই প্রায় তখন তামাক খাইত, সেইজন্য হেস্টিংস সাহেবের নিমন্ত্রণের পত্রে অন্যান্য ভৃত্য আনিবার বিশেষ উল্লেখ করা হইত, কিন্তু হুঁকা বরদার সম্বন্ধে সেরূপ করা হইত না। কলিকাতায় তখন দশ মাইলের মধ্যে মদের ভাঁটি করিবার আদেশ দেওয়া হইত না। তখন কলিকাতায় ইংরাজেরা বিধবা পত্নী লাভ করিয়া বড় মানুষ হইবার জন্য যেন ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত। এমন কি; পাদরী কায়ারনাণ্ডার সাহেবও উইলির বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া তাহার নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাংলার ভূতপূর্ব লেফটেনান্ট গভর্নর সার রিভার্স টমসনের পিতামহ জর্জ নিসবেট টমসন ভান্সিটার্ট পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার পশুপক্ষী ও গাছের তত্ত্বাবধান করিতেন। বর্তমানে তাঁহার অনেক পত্রে হেস্টিংসের অনেক গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়াছে। উহার মধ্যে মণি বেগমের মাসহারায় টাকা বর্ধিত হইলে হেস্টিংসের পত্নীর সহিত তাঁহার যে বন্দোবস্ত আছে তিনি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। আর হাইড সাহেব যিনি নন্দকুমারের মামলায় একজন বিচারপতি ছিলেন তিনি হেস্টিংসের অত্যন্ত বাধ্য বন্ধু ছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের কর্মাদি শিক্ষা করিবার হাতে খড়ি কলিকাতায় হইয়াছিল। তাঁহার পরিণয়াদিও সেইরূপ সেইখানে হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকারের পর ইংরাজেরা যখন পলাতক তখন হেস্টিংস কাপ্তেন বুকাননের বিধবা পত্নীর দুর্দশায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর দপ্তরের কাগজে এইরূপ আদেশ জারি হইয়াছিল যে, কোম্পানীর যাবতীয় কর্মচারীরা স্থানীয় স্ত্রীগণের দুঃখমোচন বিবাহ করিয়া করিতে পারেন ও উহা করা কর্তব্য। সেইরূপ কার্যই হেস্টিংস করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ পরিণয়ে তাঁহার সুখভোগ স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার পত্নীর ও কন্যার সমাধি কাশিমবাজারের সমাধিক্ষেত্রে রহিয়াছে। উহাতে সেই ঘটনার সময় ১২ই জুলাই ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত আছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় হেস্টিংস রাজমহলে গিয়াছিলেন। সেকালে এদেশী স্ত্রীলোকগণকেও উচ্চ নীচ ইংরাজ কর্মচারীরা সকলেই বিবাহ করিতেন। কর্ণেল পিয়ার্স প্রমুখ অনেকেই করিয়াছিলেন ও তাঁহারা পুত্রের নামাদিও এদেশীয় রাখিতেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছিল। উহা ও তাহার গভর্নর জেনারেলীর সময় হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিংশতি বৎসর বিপত্নীক অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। সেই সময় তাহার চরিত্র কিরূপ ছিল, উহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই, তবে তিনি যে বাগানবাড়ি আলিপুরে করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। সেই বাগানবাড়িতে যাইবার সুবিধার জন্য হেস্টিংসকে টলির নালার উপর সেতু নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই

তখন তাঁহার বিলাসগৃহ ছিল। উহার সন্নিকটেই মীরজাফর ও মণিবেগম মীর কাশিমের রাজত্বকালে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের নিকট হইতে স্থান উপহার লাভ করিয়া হেস্টিংস সেই বিলাস উদ্যান ও গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে এই পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যে উপায়ে দ্বিতীয় বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাহার রিষড়া, কাশিপুর, সুখচর প্রভৃতি স্থানে স্থানে অন্যান্য নানা বিলাসগৃহ ও উদ্যান ছিল, উহাতে তাঁহার চরিত্র যে ভাল ছিল ইহা অনুমান হয় না। আরও তাঁহার সময়ে কলিকাতায় সুন্দরীর হাট ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার পুলিশের কর্তা মট সাহেব দেনার দায়ে জেলে গেলে তাহার পত্নী পাঁচ শত মোহর লইয়া হেস্টিংসের পত্নীর সহিত বিলাতে গিয়াছিলেন। হেস্টিংসের সহিত মিসেস মটের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কিঞ্চিৎ আভাসও পাওয়া যায়। টমসন সাহেব গঙ্গাগোবিন্দের বিপদের সময় তাহার জন্য কিছু উপায় করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন ইহাও প্রকাশ পায়। এইরূপে দেখা যায় যে, হেস্টিংস এখানে গভর্নরী করিয়া যাইবার পরও আপনার উমেদাগণের মাথা বাঁচাইবার জন্য ও মণিবেগমাদির উপকার করিবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতেন এবং সেইরূপ অনেক কর্ম হস্তে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় হেস্টিংসের বসবাস ভাল লাগিত না, যদিও তাঁহার যৌবনকাল সেইখানেই কোম্পানীর কেরানিগিরি করিয়া কাটিয়াছিল। তিনি সুখসাগরে ছোট খাট জমিদারীর পত্তন করেন ও সেইখানেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। সেখানে ইংরাজী ধরনের ঘর বাড়ি, চাষ বাস সমস্তই করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পশু, পক্ষী ও গাছের সমস্ত সখও মিটাইয়াছিলেন। হেস্টিংসের আমলে এই দেশে ইংরাজী ধরনের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোম্পানীর অর্থলাভ করিয়া সেকালে তাহাদের বিচারাদির সহায়তা করিতে কোনরূপ মনে দ্বিধা করিতেন না। যদিও কোন গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করে বা তাহাদের ধনরত্ন কেহ অপহরণ করে, উহার রক্ষা করিবার জন্য কোম্পানীর সৈন্যেরা তাঁহাদের বাড়ির প্রহরীর কার্য করিত। ত্রিবেণীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোম্পানীর বৃত্তিলাভ করিতেন ও তাঁহার বাড়ি প্রহরী দ্বারা রক্ষিত হইত। তিনি অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ ও বিবাদ ভঙ্গার্থবাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতেই সেকালের ব্রাহ্মণগণেরা যাহাতে ইংরাজগণকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা ও জাত পাতের জারিজুরি করিতে না পারে, সেইজন্য কোম্পানীর মুলুকে কলিকাতায় লোকের জাতিবিচারের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। উহা প্রাচীন আর্য পদ্ধতি অনুসারে হইত না, ইংরাজের উমেদারগণের উহা করিবার শক্তি সামর্থ্য বা বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও তাহারা সেকালের উচ্চ ইংরাজ কর্মচারিগণের ইঙ্গিতে উহা করিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট জাতিপাত করিবার ভয় দেখাইয়া কোম্পানীর তরফে নন্দকুমার খাজনা আদায় করিয়াছিল। বলিহারি! সেকালের কোম্পানীর কল কৌশল ও আদায় প্রণালী!

জাতি কাছারি— ব্রাহ্মণের প্রভাব সম্পূর্ণ শেষ করিবার জন্য কলিকাতায় জাতের বিচার করিবার কাছারি হয়। উহার বিচারপতি প্রিয়পাত্র রাজা নবকৃষ্ণ ও কান্তবাবু হইয়াছিলেন। উহাতেই কায়স্থ ও তিলি হিন্দু সমাজের শিরোমণি হইয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মণেরা বৃত্তিভোগী হইয়া মর্যাদা হারাইলেন। সেকালে অনেকেই আফিম, লবণের গোলার দারোগাদি হীন কার্য করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন ঃ— যেমন দেওয়ান ৺রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺দুর্গাচরণ, মুখোপাধ্যায় ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সূত্রে আরও সেকালের

অনেক নামজাদা কলিকাতার অধিবাসীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তখন কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোম্পানীর বৃত্তি লাভ করিবার জন্য কোম্পানীর কর্মচারিগণের ও উমেদারগণের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাহাদের উৎসবাদিতে বৃত্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। কলিকাতায় তখন হইতেই দুর্গোৎসবাদিতে ব্রাহ্মণ বিদায় নন্দকুমার, নবকৃষ্ণ প্রমুখ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের কৃপায় বঙ্গদেশে কায়স্থাদি নবশায়ক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানীয় সেই জাতি অপেক্ষা মর্যাদাবান হইয়াছিল। জাতি কাছারীর কর্তারা সেই সকল অপদার্থ ব্রাহ্মণগণকে বাধ্য করিয়া সমাজে উন্নত হইয়াছিল। তাহাদের ঐ কার্যের সহায়তা করিয়া উক্ত কায়স্থাদি তখন সমাজের শিরোমণি ও ইংরাজের অনুগ্রহে জাতির বিচারপতি হইয়াছিলেন।

এইরূপে আর্য হিন্দু সমাজের সমাধি কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভেই হইয়াছিল। ওয়ারেণ হেস্টিংসের নাম উহাতেই চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তিনি এদেশে যথার্থরূপে দেওয়ানি কার্য্য করিবার নিমিত্ত শিক্ষা বিস্তার আবশ্যক ও কতকগুলি উমেদারের ধারা হিন্দু মুসলমানকে বাধ্য করা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে উচ্চ ইংরাজ কর্মচারিগণ এদেশের হিতের দিকে তাকাইয়া কার্য করা মুর্খের কর্ম মনে করিত। কিসে তাহাদের আপনার ও পুত্র পরিবারের সমুন্নতি হয়, উহারই প্রতিই সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিত। ইংরাজিতে ঐ সম্বন্ধে যেমন একটি প্রসিদ্ধ চলিত কথা বিদ্যমান, বাংলায়ও সেইরূপ আছে, যথা ঃ— Charity begins at home ' চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। আরও সেকালের ইংরাজ কর্মচারী ও তাঁহাদের সৃষ্ট রাজা মহারাজগণের আচার ব্যবহারে এই কথাই যেন অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে যে, পৃথিবীতে কামিনী ও কাঞ্চন উপভোগ করাই মনুষ্যত্ব, আর যে পশু সেই-ই উহা করে না। উহাতেই লোক বলে ঃ— " এ হেন ধন ছেড়ে, রাম ভজে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে"। ইংরাজের পাদ্রী কায়েরনাণ্ডার প্রমুখ সেই লোভে মুগ্ধ হইয়া আপনার কার্যেও উহা প্রমাণ করিয়াছিলেন ও অনেক হিন্দুকে তাঁহার পথানুসরণ করাইয়া খৃষ্টান করাইয়াছিলেন। কোম্পানীর এদেশে দেওয়ানি রাজত্বশাসনে গৌণ ও মুখ্য ভাবে হিন্দুর ধর্ম লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে বলের দ্বারা যাহা হইয়াছিল, সেই সময়ে এইরূপ নানা কৌশলে উহা হইয়াছিল। কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীগণের শুভদৃষ্টির নিমিত্ত লোকে ধর্ম কর্ম সমাজ সমস্তই ক্রমে ক্রমে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। উহাতেই কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় নীতির শ্লোক রচনা করিলেন "ধনৈরাপদামাপদাস্তরন্তি ধনৈঃ নিষ্কুলীনা কুলীনা ভবন্তি, ধনান্যর্জয়দ্ধং ধনান্যর্জয়দ্ধং নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং" অর্থাৎ ধনের দ্বারাই লোকে আপদ হইতে উদ্ধার লাভ করে, হীন কুলীন হয়। বাসনা শূন্য ব্যক্তির নিকট গৃহই তপোবনস্বরূপ সুতরাং ধনার্জন করা সকলের লক্ষ্য হওয়া ন্যায্য ও উচিত; উহাই করিতে থাক। এতদ্ভিন্ন সেকালের প্রভু ও তাহাদের ভৃত্যগণের মধ্যে কিরূপ পরস্পর সম্বন্ধ ছিল ও হওয়া উচিত সে উপদেশও সংস্কৃত কবিতায় বর্তমান রহিয়াছে।

"দোষোহপি গুণতাং যাতি, প্রভোর্ভবতি চেৎকৃপা
নাস্ত্যহো স্বামিভক্তানাং, পুত্রে চাত্মনি বা স্পৃহা।"

অর্থাৎ প্রভুর যদি ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তবে তাহার দোষ ও গুণ স্বরূপ পরিগণিত হয়, আর প্রভুভক্ত ব্যক্তি প্রভুর হিতের নিমিত্ত পুত্র বা আত্মায় স্পৃহা করে না, এমন কি, তজ্জন্য জীবন পর্যন্তও ত্যাগ করিয়া থাকে। সেকালের পণ্ডিতগণের দীর্ঘ নিশ্বাস এই বলিয়া পড়িতে ছিল যে, দরিদ্র ব্যক্তির সুখ নাই, কারণ লোভী ব্যক্তিকে কেবল অর্থ দ্বারা বশীভূত

করা যায়। তখন রাজা যিনি রক্ষক, তিনি লোভী, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে ধনের সঞ্চয় আবশ্যক। সুতরাং দরিদ্রের দুঃখ ভিন্ন সুখের মুখাবলোকন করা সম্ভবপর নহে। কবি বললেন,— "নির্ধনস্য কুতঃ সুখং যাচনান্তংহি গৌরবং" অর্থাৎ নির্ধনের সুখ নাই যাজ্ঞা করিলেই গৌরব নষ্ট হইয়া যায়।

হায়! কালের বিচিত্র প্রভাবে তখন বাংলার নবাব সুবাগণ হইতে দিল্লির সম্রাট পর্য্যন্ত ভিখারীর মত বৃত্তিভোগী, আর বিদেশী কোম্পানীর উচ্চ কর্মচারীরা দেশের ও তাঁহাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসই উহার উদাহরণ মুর্শিদাবাদের নাবালক নবাবের বৃত্তিচ্ছেদ ও দিল্লির সম্রাটের বৃত্তিলোপ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতে কলিকাতায় গভর্নর দেওয়ানি স্থলে বাংলা, বিহারে রাজার ন্যায় কার্য করিতেছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি প্রখর না হইলেও তীক্ষ্ণ অর্ন্তদৃষ্টি প্রভাবে দেশের লোকেরা "কোম্পানীর মুলুক' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রভু যখন ভৃত্যগণকে আপনার দুষ্কর্মের সহায় স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাঁহার প্রভুত্ব লোপ হইয়া যায়। কারণ তাঁহাকে ভৃত্যের মনস্তুষ্টির জন্য ভৃত্যেরও ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। ওয়ারেণ হেস্টিংস ক্লাইব প্রমুখ সকলকে সেইরূপ কার্য করিতে হইয়াছিল। উহাতেই দেশের লোকেরা নবকৃষ্ণাদির উন্নতিতে আনন্দিত হইতে পারে নাই, বরং তাহাদের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে হিংস্র পশুগণাপেক্ষা ভয় ও ঘৃণা করিতে থাকে। ইংরাজ ব্যবসায়ী গভর্নরের কি বিচিত্র ব্যবসা। কি কার্য প্রণালী ও কৌশল!

আদালত —হেস্টিংস আদালতে ধর্মানুযায়ী হিন্দুমুসলমানগণের বিচার কার্যারম্ভপূর্বক বাদী প্রতিবাদীর অর্থে পণ্ডিত ও মৌলবীগণের উদর পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আর্য তেজস্বিতা ও ধর্মাচরণ উহাতেই পণ্ড হইয়াছিল। সেকালের ধর্ম ভীরু বণিকেরা আর কোম্পানীর বেণিয়াণী করিত না; ক্রমশঃ সে কার্য সকল জাতির ব্যক্তিরা করিতে আরম্ভ করে, উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজনের নামোল্লেখ করা যাইতেছে, যথা ঃ—নবকৃষ্ণ, দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ, কান্তবাবু, কাশিনাথ, রামচরণ, ক্লাইব ও হেস্টিংসের, ভেরিলষ্টের গোকুল ঘোষাল, মিডলটনের শান্তিরাম সিং, গ্লাডউইনের বারাণসী ঘোষ, হুইলারের দর্পনারাযণ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই বেণিয়ানের কার্য করিয়াছিল। কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাতেই বর্ণশ্রমধর্ম ও জাতিগত ব্যবসা একরূপ শেষ হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ দেবের পোষ্যপুত্র গোপীমোহনের সহিত ঔরসপুত্র রাজকৃষ্ণের মামলায় তাঁহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। মাগনটন সাহেবের হিন্দু উইল নামক পুস্তকে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়, কারা তাহারা বোধহয়, ব্যবসা করিত বলিয়া বৈশ্যত্ব লাভ করিযাছিল। জাতির কর্তার পক্ষে ইহা আর বেশি কথা নয়। পাদরী হাউডের বাংলার পেরিশ পুস্তকের ৮৭ পৃষ্ঠায় মহারাজা নবকৃষ্ণ দে উল্লেখ আছে। দেব উপাধি পরে হইয়া থাকিবে।

দেশের সামাজিক দুর্দশা — মুড়ি মিছরীর একদর হইয়াছিল, প্রসিদ্ধ ঈশপের দাঁড়কাকের গল্পের ন্যায় যাহারা আপনার আপনার বেশ পরিবর্তন করে তাহাদের দুঃখের শেষ নাই। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তখনও কোন মনোমালিন্য ছিল না, বা মুসলমান হিন্দুকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করিত না, বা হিন্দুরা কোন মুসলমানকে সেইরূপ কোন অনাদর করিত না। মুসলমানেরাই জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র বিলক্ষণ ঘৃণা করিত, বোধহয়। কারণ সামাজিক ইতিহাসকার যাহা বলিয়াছেন উহাতেই বোধহয় যথা ঃ— " ইংরাজেরা বিবেচনা করেন যে, নবাবী আমলে এঁদেশের মুসলমানেরা হাজার জাতি ছিল এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও

উচ্চপদস্থ ছিল; বাস্তবিক উহা নহে। বাংলাদেশের মুসলমান মধ্যে প্রায় সাড়ে পনের আনাই অতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সন্তান, অতি অল্প সংখ্যক সদ্বংশজাত হিন্দু সন্তান। কোন কারণে জাতিভ্রষ্ট হইয়া মুসলমান হইয়াছে। বিদেশ হইতে সমাগত মুসলমান শতকরা একজন হইবে কিনা সন্দেহ। মোগলেরা এদেশের মুসলমানদিগকে স্বজাতি বলিয়া জ্ঞান করিত না। এদেশীয় মুসলমানদিগকে লোকে "পাতিনেড়ে" বলিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা হাড়ী মুচিদিগকে যেসরূপ জ্ঞান করে, সৈয়দ ও মোগলেরা পাতিনেড়েদিগকে তদ্রূপ জ্ঞান করিত। মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দুদিগকে যতদূর সম্ভ্রম করিত, পাতিনেড়েদিগকে কদাচ তত সম্ভ্রম করিত না, অথবা তাহাদিগকে কখন কোন উচ্চপদ দিতে না। ফলতঃ ইংরাজ রাজত্বে বাঙালী মুসলমানদিগের মান মর্যাদা ও অবস্থা যেরূপ আছে, মোগল রাজত্বে কালে তদপেক্ষা সর্বাংশেই অপকৃষ্ট ছিল। ইহাতেই ইংরাজ রাজত্বে মুসলমানগণের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, বরং রেজা খাঁ প্রমুখের সর্বোচ্চ পদ লাভ করায় মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

বৈষ্ণবী— উক্ত গ্রন্থকার * মুসলমান অবলা বিধবাগণের সুখ শান্তি ইংরাজ রাজত্বে হইয়াছিল বলিয়া আভাস এইরূপ দিয়াছেন * "অতি সামান্য কারণেই জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুতি হইত, কিন্তু সহস্র সৎকার্যে দ্বারা উহার প্রতিবিধান হইত না। বিধর্মীকে স্বধর্মে গ্রহণ করার রীতি শ্রীচৈতন্য প্রভু সংস্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই উহা পুরুষের সম্বন্ধে রহিত হইয়াছিল। অথচ মুসলমান রমণী মধ্যে যাহারা হিন্দুর উপপত্নী হইত, তাহারা বৈষ্ণবী হইতে পারিত। বোধহয়, মুসলমান শাসনই ঈদৃশ বৈষম্যের আদি কারণ। মুসলমানেরা স্ত্রীজাতির আত্মার স্থায়ীত্ব স্বীকার করে না, সুতরাং তাহাদের পাপ পুণ্যের জন্য পরলোকে কোনরূপ দণ্ড বা পুরস্কার হইবে বলিয়া মনে করে না। তজ্জন্য পরদাবদ্ধ কুলবধূ ভিন্ন অপর কোন মুসলমানী বৈষ্ণবী বা খ্রীষ্টানী হইলে মুসলমান কাজিরা তাহাকে কোন শাস্তি দান করিত না, কেবল মুসলমান পুরুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে কাজিরা তাহাদিগকে এবং তৎসংসৃষ্ট সমস্ত লোককে অতি কঠিন দণ্ড করিত। মোতিবিবি, ঘষেটি বাই প্রভৃতি বুদ্ধিমতী মুসলমানীরা স্পষ্ট বলিত যে,—"মুসলমান ধর্ম যদি সম্পূর্ণ সত্যই হয়, তথাপি উহা মানিয়া স্ত্রীলোকের কোন লাভ নাই। যদি বৈষ্ণবধর্ম সত্য হয়, তবে আমরাও হরিনাম জপিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিব। এইজন্য অনেক মুসলমানী বৈষ্ণবী হইত। তখন তাহাদের সঙ্গে বসিয়া পান খাওয়া এবং জলভরা হুঁকায় তামাক খাওয়া হিন্দুরা দুষ্যজ্ঞান করিত না।" হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তখন কিরূপ সুন্দর সৌহার্দ্য ছিল ও কোনরূপ বিবাদ ছিল না বলিয়াই বোধহয়।

গ্রন্থকার ১৪৪ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন — "হিন্দুদের নানাজাতি, নানাশ্রেণী এবং তাহাতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা হওয়াতে এমন কোন্ বিধর্মীকে কোন্ শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে, উহা নির্বাচন করা যায় না। সেইজন্য বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করিবার প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। চৈতন্য প্রভুর বৈষ্ণব মতে ব্রাহ্মণেরা "অধিকারী" আর সকল জাতীয় লোকই "বৈষ্ণব"। এই দুইটি মাত্র ভাগ ছিল এবং সেই দুই ভাগের আর কোন শাখা প্রশাখা ছিল না। এজন্য তিনি কতিপয় মুসলমানকে বৈষ্ণবরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহার পর বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতি বিচার আরম্ভ হওয়ায় বিধর্মীকে বৈষ্ণব করা অসম্ভব হইয়াছে।'

হায়! হিন্দু সমাজের যখন এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা তখন যে নবকৃষ্ণ ও কান্তবাবু

---

* পৃ. ৩৩৬   * পৃ. ৪২৮

জাতির বিচার কলিকাতায় করিবেন উহাতে আর আশ্চর্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। ইংরাজ গভর্নরেরা এইরূপে শতবর্ষে তখন ব্যবসা রাজ্য ও জাতির হর্তা কর্তা বিধাতাপুরুষ স্বরূপ হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দেশের ব্যবসায়ীরা তখন কি কার্য করিত, উহার উল্লেখ ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার পুস্তকে এইরূপ করিয়াছেন — " দেশের সকল স্থানে সুবর্ণ বণিকেরা লোক রাখিয়া ব্যবসা ও টাকা ধার দিত। পুরাতন সোনা রূপা খরিদ, বিক্রি ও যাচাই আদি করিয়া অনেকে সামান্য অবস্থা হইতে ধনী হইয়াছে। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ সামাজিক উৎপীড়নের কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই, বরং তাহাদের কীর্তিকলাপ বাংলা ও উড়িষ্যায় ছিল বলিয়াছেন। যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়ার মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ৺নয়ানচাঁদের পুত্র ৺নিমাইচরণ মল্লিক করিয়াছিলেন ও তাহার সেবার জন্য জমিদারী দান ও পুরীর ৺জগন্নাথ দেবের নিত্যভোগের নিমিত্ত অর্থদানের উল্লেখ করিয়াছেন। ৺দুর্গারাম ব্রহ্মচারী ঐ সকল দেবতার সেবা করিতেন ও সেখানে সেই ৺নিমাইচরণ মল্লিকের জন্মোৎসবাদি নির্বাহ করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়াছিলেন।"

উক্ত মল্লিকের পূর্বপুরুষের উপদেশ মতে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্ব প্রথমে মালদহে রেশমের কুঠি খুলিয়া কার্য করিত এবং হুগলি হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেই মালদহের ইংরাজ কুঠিকে সকলে ইংরাজবাজার নামে উল্লেখ করিত, মালদহের নামোৎপত্তি ও ব্যবসার কথা উপসংহারে উল্লিখিত হইয়াছে।

তহবিলদারী— ক্লাইব কোম্পানীর কর্মচারীগণকে যেরূপ শাসন করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের উপায়ের পথও সেইরূপ আবিষ্কার করিয়া যান। উহাতে তাঁহারা অতি অল্পদিনেই স্বদেশে গিয়া নবাবী করিতে পারিতেন। সাইক্‌স সাহেব মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্টের কার্য করিয়া দুই বৎসরের খাজনার কমিশনে ছত্রিশ হাজার, মাথটে ছয় হাজার এবং নজরে দুই হাজার পাউণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। সেই সাইকস সাহেবকে ক্লাইব তাঁহার এক বৎসরের লবণের একচেটিয়া ব্যবসার অংশ পাঁচিশ হাজার পাউণ্ডের বিক্রি করিয়াছিলেন। তখন টাকার বিনিময় দুই শিলিং আট পেন্স পর্যন্ত হইত। এদেশে তখন কোম্পানীকে শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা ডিস্কাউন্টে টাকা ধার করিতে হইত ও সুদের হার শতকরা বার টাকারও অধিক ছিল। বিদেশী বণিকগণের নিকট হইতে পণ্ডিতগণের অর্থ লাভের উপায় হেস্টিংস করেন, সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিবাদভঞ্জনসূচক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক রামপ্রসাদ ও কলিকাতার জমিদারের বাড়িতে কার্যারম্ভ করে ও শেষে মা কালির গান গাহিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় ভিখারীরা সেই প্রসিদ্ধ সাধকের সঙ্গীত গান করিয়া অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তিনি হিসাবের খাতায় মায়ের সঙ্গীত লিখিয়া জমিদারের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন মায়ের কৃপায় আর প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ কোম্পানী বাংলার তহবিলদারী লাভ করিয়া পৃথিবীর ঈশ্বর হইয়াছিলেন। "**আমায় দাও মা তহবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই মা শঙ্করী**।" কোথায় সেই রামপ্রসাদ! আর কোথায় সেই ক্লাইব ও ওয়ারেন হেস্টিংস!

সততা— তখন রামপ্রসাদের গানে বিষয়ী ও উদাসী সকলেই যেমন মুগ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভায় ক্লাইব ও ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যের বিচারে ইংরাজ জাতির অপূর্ব সততার পরিচয়ে সেকালের লোকেরা চমৎকৃত হইয়াছিল। কালের কি অপার

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ২য় পত্নী

মহিমা! তখন ইংরাজ জাতির গৌরব প্রতিধ্বনিত হইল। ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল অনর্গল বক্তৃতায় রহিয়া গেল। ওয়ারেন হেস্টিংসের সঞ্চিতার্থ নিঃশেষ হইল, আর ক্লাইব নিজেই তাঁহার জীবনোৎসর্গ করিলেন। সেইখানেই ভগবানের ন্যায় বিচার যেন নশ্বর মানবের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এডমণ্ড বার্ক প্রমুখ ইংরাজ মনীষী বাগ্মিগণ কোম্পানীর কর্মচারীগণের জাল, জুয়াচুরি ও মিথ্যা কথার কলঙ্ক যাহাতে ইংরাজ জাতির অঙ্গস্পর্শ না করে, সেইজন্য বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভায় তুমুলান্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন ও এদেশবাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের কথা এরূপ সুন্দর করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হেস্টিংসকেও উহা শ্রবণ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ দোষী মনে করিতে হইয়াছিল ও উহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন উহা অন্যের কিরূপ বোধ হইয়াছিল ইহাতে স্পষ্টই অনুভব করা যাইতে পারে। অবশেষে সেই ইংরাজ জাতি সেই সৃষ্টিধর পুরুষগণের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। মেকলে প্রমুখ লেখকাদি এদেশের অন্নে পুষ্ট হইয়া বাঙালী জাতির উপর জলন্ত ভাষার ছটায় গালিবর্ষণ করিয়া সেই সকল মহাত্মগণের প্রেতাত্মার যে তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, এখন বাংলার কৃতি সন্তানেরা উহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের মুখে চুনকালি মাখাইতেছেন— ইহাই ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার পরিণাম ও গৌরব। এডমাণ্ড বার্ক প্রমূখ ইংরাজগণই ভারতবাসীকে ইংরাজ জাতির অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষ বিচার প্রার্থনায় তাঁহাদের পক্ষপাতী করিয়াছিল। উহাতেই ভারতবাসী গোলামি শিক্ষা করে। গোলামির জন্যই নন্দকুমার, রেজা খাঁ আদির বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন; যদি নন্দকুমারকে সেই রেজা খাঁর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইত, তাহা হইলে তাঁহার পরিণাম স্বতন্ত্র হইত।

ঋণপরিশোধ — যাহাই হউক, সে সময়ে কি ওয়ারেন হেস্টিংস, কি বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের সভাপতি কেহই বাংলার ও বাঙালীর যুদ্ধ বিগ্রহ, অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষে যে সর্বনাশ হইতেছিল উহার প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করেন নাই, কোম্পানীর যে উত্তরোত্তর ঋণবৃদ্ধি হইতেছিল কেবল উহা পরিশোধ করিবার জন্যই বিব্রত ছিলেন। রেজা খাঁ আদির নিষ্কৃতি দানের সঙ্গে উহার যে কোন সম্বন্ধ নাই, একথা কেহই বলেন নাই। সেইজন্যই মুর্শিদাবাদের নবাবের বৃত্তি হ্রাস ও দিল্লির সম্রাটকে করদান করা রহিত এবং কোড়া ও এলাহাবাদ এই দুই প্রদেশ অযোধ্যার নবাবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হইল। ওয়ারেন হেস্টিংসে আমলেই লোকে "কোম্পানীর মুলুক" বলিতে লাগিল ও কলিকাতা সেই দেওয়ানি রাজত্বের রাজধানী হইয়াছিল।

আক্কেলসেলামি — কলিকাতায় হেস্টিংসের গভর্নরী করিবার পূর্বেই ভান্সিটার্টের সভায় সভ্যের কার্যের সময় বাটসন সাহেব তাঁহাকে মিথ্যাবাদি বলিয়া গালে চড় মারিয়া ছিলেন ও সেইজন্য তাহাকে সেই সভার সভ্যপদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয় ও ক্ষমা ভিক্ষা করিলে উহা রহিত করা হয়। সেই ঘটনা রিচার্ড কোর্টের বাড়িতে হইয়াছিল। ঐ কোর্ট সাহেব ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীতে মগ্ন হইয়া মারা যান ও কোম্পানী তাঁহার বাড়ি খরিদ করিয়া সেইখানে গভর্নরের সভাদি করিবার স্থান করিয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, কলিকাতায় ওয়ারেন হেস্টিংসের আক্কেল সেলামি গভর্নরীর পূর্বেই লাভ হইয়াছিল।

" Mr. Batson making some unbecoming reflections on the Governor. writes Hastings in his official representation, I replied there to and I appealed to the Board whether any indecent or provoking terms upon

which Mr. Batson gave me the lie and struck me in the presence of the Board. I leave them to take such notice as they may think proper of the indignity offered to themselves by this step of Mr. Batson. For my part I can not think of sitting any longer at a board where I am subjected to such insult."

তখন হেস্টিংস শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সেকালের গভর্নর সভায় সভ্যগণ কিরূপ সভ্য ও শিষ্ট ছিল কেমন করিয়া তাহারা দেশ অধিকার ও রাজত্ব করিত উহার উদাহরণ জাজ্জ্বল্যমান বর্তমান রহিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংস লাল দিঘির সর্ববিধ সংস্কার করিয়াছিলেন। উহার জল সেকালের ইংরাজেরা ব্যবহার করিত। কলিকাতার বিখ্যাত সওদাগর * জন পামারের পিতা ওয়ারেন হেস্টিংসের সেক্রেটারি ছিলেন। সেই জন পামারের সওদাগরী বাড়ি ও অফিস বর্তমান লালবাজারের পুলিশ গৃহস্থলে ছিল। উহার সম্মুখেই সেকালের জেল ও উহার পার্শ্বে নাবিকগণের থাকিবার স্থান ছিল। সেইখানেই হারনোনিক টাভারন নামক সেকালের ইংরাজগণের আহার বিহারের সুন্দর স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সেকালের চাঁদ পাল মুদির দোকান গঙ্গার ঘাটের ধারে ছিল ও ঐ নামেই ঐ ঘাট এখনও পরিচিত। এখন লোকে ঘাট তৈয়ারী করিয়া যে কার্য স্মৃতি ফলক দ্বারা করিতে পারে না, উহা এক সামান্য মুদির দোকান থাকায় সেই স্মৃতি আজও বহন করাইতেছে। সেইরূপ রাণিমুদি গালির রাস্তা, আজও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটকে বলিয়া থাকে। সেই চাঁদ পাল ঘাটেই সেকালের সকল গভর্নরাদি জাহাজ হইতে অবতরণ করিত ও সন্নিকটস্থ কেল্লায় তোপধ্বনি দ্বারা কলিকাতার মুখরিত হইত। ওয়ারেন হেস্টিংসের কলিকাতা আবাস গৃহ হইতে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের নাম পত্তন হইয়াছে। তিনি যে বাড়িতে থাকিতেন, উহা এখনও বর্তমান আছে ও উহা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সম্পত্তি। সেইখানে কিছুদিন পূর্বে বরণ কোম্পানীর অফিস ছিল। সওদাগর জন পামারেব + কারবার বন্ধ হওয়ায় কলিকাতার ব্যবসার অতীব শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। উহাতে সতের মিলিয়ান পাউণ্ড নষ্ট হওয়ায় অপর ছয়টি সওদাগরের অফিস নষ্ট হইয়াছিল।

" Palmer & Co. whose fall in 1830 shook Calcutta society to its foundation, followed as it was by the collapse of six other houses of agency between 1830 and 1834 for a total of seventeen millions sterling." (page 579) Cotton's Calcutta.

পাদ্রীর কীর্তি —কিরূপে কলিকাতার মিশন রোর গির্জা নির্মাণ হইয়াছিল উহাও উল্লেখযোগ্য বিষয়। উহা কলিকাতার প্রোটেষ্টন পাদরী কায়রণাণ্ডারের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। পাদরী সাহেব কর্ণেল ফিসারের বিধবা-পত্নীকে বিবাহ করিয়া যে কিছু অর্থলাভ করিয়াছিলেন

* His cemetery tablet reads - "John palmer, friend of the poor born 8th October 1767 died 21st January 1836 aged 69"

+ "Palmer, whose bust may be seen in the Town Hall, lived in the large house in Lall Bazar, which was subsequently the old police office. His father who died a General at Berhampore in 1814, had been confidential minister to Warren Hastings and was Grand's proposed second in his duel with Francis" Cotton's Calcutta (page 579)

উহাতেই তিনি ঐ গির্জার প্রথম পত্তন করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীর মৃত্যু হইলে পাদরী সাহেব মিসেস আনা উলিকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হয় ও তাঁহার অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া পাদরী সাহেব ছয় হাজার টাকায় মিশনের বিদ্যালয়ে ব্যয় করিয়াছিলেন। সেই পাদরী সাহেবের কামাক স্ট্রীটে বাড়ি ও ভবানিপুরে বাগান ছিল ও তিনি কারবারও করিতেন। উহাতে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তাঁহাকে আদালতে ইনসলভেন্ট হইয়া ঋণমুক্ত হইতে হইয়াছিল। ঐ সময় ঐ গির্জা সেরিফের লোকেরা বিক্রি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু উহার মূল্য দশ হাজার টাকা মালদহের চার্লস গ্রান্টসাহেব দান করিয়া গির্জাকে দায়মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যে, তিনি কোম্পানীর ডাইরেক্টার হইয়াছিলেন ও তাঁহার সন্তান বোধহয়, লর্ড গ্লেনেলা হইয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে মিশান রো-র গির্জায় পূর্বোক্ত দুই পত্নীর দেহ সমাহিত হইয়াছিল, সেইখানে পাদরি কায়রনাণ্ডারের শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩এ ডিসেম্বর উক্ত পাদরি বিবাহাদি লব্ধ ধনে যে গির্জাদি ৭৫০০০ পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে করিয়াছিলেন, উহা ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে উক্ত গ্রান্ট সাহেব তিন জন ট্রষ্টীর হস্তে দশ হাজার টাকায় খরিদ করিয়া অপর্ণ করিয়াছিলেন। উহার পরে বর্তমান গির্জার পরিবর্তন হইয়াছিল। ঐ মিশনের গির্জানুসারে বর্তমান মিশন রো-র নাম পত্তন হইয়াছিল। সেই গির্জায় মিসেস হানা এলারটনের সমাধি বর্তমান, তিনি হেস্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের ডুয়েল যুদ্ধ ও চৌরঙ্গিতে সবে মাত্র দুইখানি বাড়ি ছিল দেখিয়াছিলেন। পাদ্রি জেমস লঙকে বলিয়াছিলেন এই গির্জার উৎপত্তি ও রক্ষার কথা কৌতুকাবহ নয় কি?

" The original church, as Kiernander built it, appears to have been a plain, oblong building, extending from the present west porch to the beginning of the semi-circular chancel in the east."

' Mrs Hannah Ellerton died in January 21st, 1858 aged 86 years. This is the lady who assured the Revd. James Long that she had a vivid recollection of the duel between Hastings and Francis and could remember the day when there were only two houses in the ' road to Chowringhy.' Cotton's Calcutta (P. 635-37)

জবানদিহি— হেস্টিংসের গভর্নরী করিবার সময় তাঁহার সভার সভ্যগণের সহিত অনেক সময় বিলক্ষণ মতভেদ হইত ও তজ্জন্য তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। ওয়ারেন হেস্টিংস বিলাতের গুপ্ত সভার অভিমতানুসারে কলিকাতা কাউন্সিলের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই ২৮শে এপ্রিল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ রেজা খাঁ, দেওয়ান রাজা অমৃত সিংহ ও সেতাব রায়কে বন্দি করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কলিকাতা সভার অধিকাংশ সভ্যগণ বলিয়াছিলেন যে, রেজা খাঁ কলিকাতায় আসিলে তখন তাহাদের মধ্যে একজন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উহাকে বন্দি করিবার কারণ জ্ঞাত করান কর্তব্য, গভর্নর হেস্টিংস উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা নীতি বিগর্হিত কারণ কোন বন্দি ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ সম্মান দর্শন করা উচিত নয়। রেজা খাঁর সেই পদচ্যুতির পর মণিবেগমকে মুর্শিদাবাদের নাবালক নবাবের তত্ত্বাবধায়ক ও রাজা গুরুদাসকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিবার প্রস্তব করিলে সেখানেও অধিকাংশ সভ্যগণ আপত্তি করিলেন যে, রাজা গুরুদাসকে দেওয়ানি কার্যে মনোনীত করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহার পিতা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কার্য করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। নন্দকুমারের উপর তাঁহারা যে কটাক্ষপাত

করিয়াছিলেন উহা ন্যায়সঙ্গত নয়, ইহা তখন হেস্টিংস প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হেস্টিংসের সহিত নন্দকুমারের শত্রুতার কথা স্বয়ং হেস্টিংস তাঁহার বন্ধুকে পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সাত বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন ও কোম্পানীর পরম শত্রু ছিলেন। আবার ভূতের মুখে রাম নামও উচ্চারিত হইয়াছিল যে, নন্দকুমার তাঁহার প্রভু মীরজাফর ও তদ্বংশধরগণের পক্ষে কার্য করিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে কিছু বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল উহার জন্য ন্যায় বিচারে তাঁহাকে দোষী করিতে পারা যায় না, কারণ যদি তিনি উহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করা হইত। ওয়ারেন হেস্টিংস কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণকে ১১ই নভেম্বর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্র লেখেন। উহার মধ্যে সেকালের অবস্থা যাহা বিবৃত আছে উহারই কিঞ্চিত সারমর্ম দেওয়া গেল। বাংলার কর্তৃপক্ষগণের উপর যে দোষারোপ করা হয়, উহা ন্যায্য নহে, কারণ তখনও উহাদের শাসন করিবার প্রণালী ও ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হয় নাই; কেবলমাত্র ব্যবসা করিবার স্বত্ব লাভই হইয়াছিল। বাংলাদির পরিধি অনুসারে রাজত্ব করিতে গেলে ও আপনাদের যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার যে পরিমাণ ক্ষমতা ও লোকজন আবশ্যক, উহা ছিল না। আর কর্মকর্তারা যেমনই সর্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কার্য করিবেন স্থির করেন, অমনি তাহাদের কাল শেষ হয়। ইহাতে কেমন করিয়া সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন কোম্পানীর কর্মচারিগণের মধ্যে এমন ধর্মাত্মা ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল যে, যাঁহারা নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া কোম্পানীর স্বার্থাস্বার্থের দিকে তাকাইতে পারেন। তবে তিনি এই পর্যন্ত বলিতে পারেন যে, ইহা তিনি নিজের কোন দোষক্ষালনের জন্য লেখন নাই, কেবল সত্যের অনুরোধে বলিতেছেন জানিবেন। আরও তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন যে, যাহাতে তাঁহারা আর কোম্পানীর কর্মচারীগণের নষ্ট চরিত্রের কথা শুনিতে না পান। আমাকে বর্তমান রাজ্যপ্রণালীর দোষ সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুমতি দান করা হউক। সেই সকল দোষের মধ্যে দুইটি প্রধান যথা (১) কর্মকর্তাকে তাহার কার্য করিবার সম্পূর্ণ অবসর ও সময় দান করা উচিত, (২) প্রত্যেক কর্মচারীর কার্যের তালিকা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রধান কর্তব্য কর্ম, একথা আমায় বেনারসের সভার উজীরও (মন্ত্রী) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। গভর্নরের ক্ষমতা অসীম অথচ প্রকৃতপক্ষে সভার প্রত্যেক সভ্যের সমান ভিন্ন অধিক কিছুই নয়।

যুক্তি— উক্ত পত্রের সহিত ওয়ারেন হেস্টিংসের বিলাতের পার্লামেন্ট সভার অভিযোগের প্রত্যুত্তরের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত। উহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগাদি উল্লিখিত হইয়াছে উহা কখনই তাঁহার নিজ কৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ উহা

" And the said Warren Hastings begs leave to represent that many of the measures which in the said articles are stated as crimes or misdemeanours by him individually committed were, in fact, measures of the council at large, and for which, therefore, he humbly conceives, he ought not to be separately and distinctly charged; and with respect to many others of the said measures, he trusts he shall be able to satisfy your Lordships that they were rendered expedient and necessary by former Acts and Resolutions of the Board, adopted, in some instances, not only without his concurrence, but against his opinion and vote"

সমস্তই সভার সভ্যগণের অনুমোদিত হইয়া করা হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমতের বিরুদ্ধেও তাঁহারা কার্য করিয়াছেন, তিনি এই যুক্তি দ্বারা অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক ওয়ারেন হেস্টিংসের গুণ গরীমা ইংরাজী ঐতিহাসিকেরা যতই প্রশংসা করুন না, কিন্তু তাঁহার নিজের বিচারের সময় তিনি যে কথা বলিয়া তাঁহার কৃতাপরাধের দোষ প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন উহা এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। সেইখানে তাহার পরিচয় হয়। তিনি তের বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি 'ত আর পাঁচ বৎসর করিয়া চলিয়া যান নাই। কোর্ট অফ ডিরেক্টর তাঁহার প্রার্থিত অতিরিক্তকাল ঐ রাজত্ব করিতে দিয়াই ভয়ানক সর্বনাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সময়কে অতি ঘোর সমস্যার সময় বলিয়াছেন। তখন তিনি যাহা করিয়াছেন উহা না করিলে, কোম্পানীর রাজত্ব থাকিত না বলিয়া সকল দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ক্লাইবের বিচারে যে পথাবলম্বন করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই উপায়ই ন্যায্য, অধিকন্তু চতুর ওয়ারেন হেস্টিংস এক নূতন অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, তজ্জন্য স্বদেশের রীতিনীতি আদির বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উহা জানিবার প্রকৃষ্ট সুবিধা লাভও করেন নাই। যাঁহারা তাঁহাকে উচ্চ গভর্নরী পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যদি কোন দোষ বা অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা সে জন্য দায়ী উহার জন্য তিনি কেমন করিয়া দোষী হইতে পারেন? অর্থাৎ যাঁহারা অনুপযুক্ত লোককে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহারা কি সর্বাগ্রে দোষী নন? এইখানেই হেস্টিংসের যুক্তির বাহাদুরি ও যেন চক্ষে অঙ্গুলি দান করিয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষগণের অকর্মণ্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। আরও তিনি যে কোন দুরভিসন্ধি বশতঃ কোন অন্যায় কার্য করেন নাই বলেন। আর যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে তবে, উহা তাঁহার অধিক বয়সের দোষের কথাই মনে করিতে হইবে; অর্থাৎ যাহাকে ভীমরতি বলে। বলিহারি!! ওয়ারেন হেস্টিংস ভিন্ন আর কে চারিদিক বজায় রাখিয়া কথা কহিতে জানেন?

" For with respect to the said charges, the said Warren Hastings begs leave to observe that they consist of a minute and elaborate scrutiny into his whole official conduct during a government of thirteen years comprehending an infinite variety of events and involving the management of a great commercial and political system in a service of uniform difficulty and exigence, and at many times of extreme National peril. Nor are the said charges confined to measures, but even his declarations and opinions delivered in the course of debate and consultation, according to such information as he possessed at the moment and often under circumstances which would not afford time for adequate deliberation, are made subjects of accusation against him. The said Warren Hastings, therefore, humbly represents, that under such circumstances he must necessarily stand in much need of your lordships favourable construction of his conduct, in order that the many omissions and imperfections, which in the review of the past measures of his long and arduous administration, your Lordships superior wisdom shall discover, may be imputed to error and infirmity, and not to any corrupt or criminal

intention. And the said Warren Hastings feels it the more necessary to solicit your Lordships indulgence, as he was separated at a very early age from his native country, from every advantage of that instruction which might have hetter qualified him for the high offices and difficult situations which it has been his lot to fill, and left to form his rule of conduct in a great degree on his own practice, and by the light of his 0wn understanding". অর্থাৎ সার কথা লোকের যোগ্যতানুসারে দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। যে যেখানে যেমন করিয়া কার্য প্রাণালী শিক্ষা করিয়াছে, সে যদি তদনুসারে কার্য করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার দোষ কি? এইখানেই বলিতে হয় তিনি কি সম্রাট শাহ আলমের পথানুসরণ করিয়াছিলেন?

সারমর্ম — কলিকাতার গভর্নরীর শিক্ষা-দীক্ষা তখন কিরূপ ছিল ও ওয়ারেন হেস্টিংস যিনি ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন অনেকে বলিয়া থাকেন, তিনিই পার্লামেন্টের বিশিষ্ট বিচারপতিগণের নিকট কি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন উহাই উল্লেখ করা হইয়াছে, কেবল হেস্টিংসের গুণ কীর্তন করা হয় নাই। ওয়ারেন হেস্টিংসের জয়!!! গভর্নরী করিবার তুমিই যোগ্যপাত্র; "যখন যেমন তখন তেমন"।

"দোষ গুণ কব কার, এক ভস্ম আর ছার"।

ক্লাইবের ভাগ্যে K.C.B উপাধি লাভ ও তিনি ব্যারণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সে সব কিছুই হয় নাই, ইহাই প্রভেদ। এমনকি, তাঁহার ভাগ্যে সার উপাধি লাভও হয় নাই। বিচারের পরে ক্লাইবের অর্থ কৃচ্ছতা হয় নাই, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস সেরূপ ভাগ্যবান ছিলেন না। তবে সাত বৎসর ধরিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার হয়, উহার পরেও অনেকদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন। ক্লাইবের ন্যায় তাহাকে বিবেকের তাড়নায় মৃতুকে শরণ লইবার আয়োজন স্বয়ংকে করিতে হয় নাই। ইহাই শেষ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের বিশেষত্ব বলিতে হইবে। এইখানেই আদি কবি বাল্মীকির কথা মনে পড়ে। তিনি রাবণ বধের পর সতী সাবিত্রী সীতা হনুমানকে এই উপদেশ দান করিযাছিলেন,— **"কার্যকারুণ্যমার্য্যেণ ন কিঞ্চিন্নাপরাধ্যতি"** অর্থাৎ জগতে কে না অপরাধি তবে ক্ষমা করাই আর্যের লক্ষণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাতের রাজার অনুমতি লইয়া দেশের সম্রাট, নবাব ও কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টি দ্বারা সর্বপ্রথমে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। উহাতে তাঁহারা নানারূপে নির্যাতীত হইয়া ক্লাইব ওয়ারেন হেস্টিংস বল দ্বারা সেই ব্যবসা রক্ষা করা আবশ্যক মনে করেন। তাঁহারা সেই বল সংগ্রহ বিলাত হইতে না করিয়া এদেশের মুর্খ নবাব রাজা উজীরগণের ঈর্ষাদ্রোহাদিসূচক মনোভিলাষ সিদ্ধ করিয়া কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়াছিলেন ও শেষে তাঁহারাই দেশের সর্বেসর্বা ও মালিক হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন বারাকে কোম্পানীর ব্যবসার গুদাম ও সৈন্যের আবাস করিয়াছিলেন। কলিকাতা বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ ব্যবসা ও সৈন্যগণ থাকিত। ক্লাইব উহার পথপ্রদর্শক ও ওয়ারেন হেস্টিংস উহার পরিপোষক মাত্র। ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে যে ৪০০ বিঘা জমি কাশিমবাজার খগড়ার দক্ষিণে সনন্দ দ্বারা লাভ করিয়া সৈন্যবারাক করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিলাতের ডিরেক্টারগণের অনুমতি অভাবে উহা হয় নাই। শেষে উহা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া খাত পরিখা দ্বারা বেষ্ঠিত করিয়া দুই বৎসর শেষ করা হইয়াছিল। পরে ১৭৭২ ও

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস উহার উন্নতি কাঁটা তারের বেড়া ও পাকা দেওয়াল দিয়া করিয়াছিলেন। উহাতে ক্লাইবের স্মৃতিই বিজড়িত। ক্লাইব হেস্টিংস রাম লক্ষণ দুই ভাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা কথার আদিকাণ্ডে তাঁহাদেরই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ হইতে দেওয়ানি আদি কার্য করিবার জন্য সমস্তই কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। আইন আকবরীর রাজস্ব হিসাবে আছে যে, সরকার সাতগাঁর অধীনে কলিকাতা ছিল এবং সাতগাঁ ও হুগলী ইউরোপবাসীগণের অধিকৃত বলিয়াছিল। ওয়ারেণ হেস্টিংসের গভর্নরীর সময় যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহারের দেওয়ানি উড়িষ্যার সহিত লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও উড়িষ্যা তাঁহারা করায়াত্ত করিতে পারে নাই। যদিও কোম্পানী সুরাট হইতে সর্বপ্রথমে উড়িষ্যায় ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল, শেষে কলিকাতাই সেই বাংলা, বিহারের মধ্যে প্রধান কোম্পানীর কর্মক্ষেত্র ও দেওয়ানির যাবতীয় কার্যারম্ভ হইল। কলিকাতার নাম প্রতিপত্তি ও উন্নতি ক্লাইব ও ওয়ারেন হেস্টিংস পূর্ণমাত্রায় করিয়াছিলেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। কলিকাতাবাসিকে একথা স্বীকার করিতে হইবে। কলিকাতার আদিম অধিবাসিরাও সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দাবি করিতে উহাও অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। পূর্বের ব্যবসায় বাংলার উন্নতি কেমন করিয়া হইয়াছিল ও উহা কিরূপে হইয়াছিল, সেইকথা অতি সংক্ষেপে বিদেশী ও স্বদেশী বাণিজ্যের পরস্পর উন্নতি ও অবনতির কারণের সহিত প্রকাশ করা উচিত।

---

* " There are two emporiums, a mile distant from each other, one called Satgong and the other Hooghly, with its dependancies, both of which are in the possession of the Europeans."

" Diamonds, emeralds, pearls, agates and cornelians are brought from other countries to the seaports of Bengal."

উপসংহার

প্রাচীন ব্যবসা বাণিজ্য

কলিকাতার কথার আদিকাণ্ডে বিদেশী বণিকগণের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের পূর্ব হইতে হেস্টিংসের গভনরী পদ পর্যন্তের কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, কিন্তু উহার পূর্বে কেমন করিয়া বাংলাদেশে স্বদেশী ও বিদেশী বণিকগণ ব্যবসারম্ভ করিয়াছিল ও উহার সূত্রপাত কিরূপে হইয়াছিল উহা সংক্ষেপে বলা বিশেষ আবশ্যক। কলিকাতার আদিম অধিবাসিগণ সকলেই বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র ও রাজধানী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল। বাংলার বিখ্যাত ব্যবসা শিল্পনৈপুণ্য কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও কাহার দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল সে কথা এই কলিকাতার কথার বহির্ভূক্ত নয়, বরং প্রধান অঙ্গ বলিলেই চলে। মোগল রাজত্বকালে বাংলার গৌরবসূচক সোনার বাংলা নাম এখনও উল্লিখিত হয়, কিন্তু কেমন করিয়া সোনার বাংলার সেই অবস্থা হইয়াছিল উহারই উল্লেখ করিতে হইবে। বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই; সুতরাং ব্যবসার সহিত উহার সম্বন্ধ যে অধিক সে কথা বলা বাহুল্য। পূণ্যভূমি আর্যবর্তে ধর্ম, শৌর্যাদি বর্ণাশ্রম ধর্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু কলিকালে উহার ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী উহাতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পতন হইয়াছিল। হিন্দু রাজত্বকালে জাতি জন্মগত ছিল না, স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডব দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিল ও ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিল ও তিনিই বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৈশ্য গৃহে লালিত পালিত ও তাঁহার ভগ্নী সুভদ্রার সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। জাতিগত শত্রুতার সৃষ্টি পরশুরামের সময়েই সমুজ্জ্বল হইয়া পড়ে।

ইহাতে কলিকালের প্রারম্ভে জাতি কর্মগত ছিল বলিয়া বোধহয় ও আর্য ও অনার্য মধ্যেই বিবাহাদি হইত না। সূতপুত্র কর্ণের লক্ষ্যভেদের সময় সেই আপত্তি হইয়াছিল। একলব্যের শিক্ষা লাভের সময়ও সেই কথা। বাংলার সীমা আর্যাবর্তের মধ্যে নির্দিষ্ট হয় নাই। মনুতে বাংলার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বাংলার নাম সোনার বাংলা। প্রাচীন পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে বাংলার স্থান, বাংলাদেশের অনেক স্থানের নাম ব্যবসানুযায়ী হইয়াছিল বলিয়া অনেকের মত ও সিদ্ধান্ত। গৌড়ের ইতিহাসকার বলেন যে পুণ্ড্রদেশের ইক্ষু সেকালের বিখ্যাত ছিল ও উহাতে গুড় হইত। সেই গুড় হইতে গৌড় নামোৎপত্তি অসঙ্গত বলিয়া বোধহয় না। খ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু শতাব্দী পূর্বে জৈনগণের কল্পসূত্রে পৌণ্ড্রবর্ধনের নিকট পুণ্ডরীক নাম বণিক শাখার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যাঁহারা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা পুণ্ড্রে উপনিবেশ করিয়া জৈন ধর্মাবলম্বন করিয়া পুণ্ডরীক নামে খ্যাত হন, ইহা কৃষ্ণদাস রচিত গ্রন্থে আছে। বাণভট্টের হর্ষচরিত পৌণ্ড্রবাসের কথা আছে। মালদহ হইতে বগুড়া পর্যন্ত স্থানে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত। রেশমের কীট পালন ও রেশম উৎপাদন পুণ্ডরীকগণের ব্যবসা ছিল। ব্যাকরণ

মহাকাব্যে পৌণ্ড্রপদ পুণ্ড্র নগরবাসী শব্দে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাতে পুণ্ড্রনগর যে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল ইহা সন্দেহ করা যায় না। ব্রাহ্মণগণের ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক রেখা ইক্ষুদণ্ডের অগ্রভাগের ন্যায় দেখা যায়। গৌড়ব্রাহ্মণই জন্মেজয়ের সর্পসত্রে ব্রতী হইয়াছিল। বর্তমান দিল্লিতে ও সন্নিকিটবর্তী স্থানের ব্রাহ্মণগণ এখনও শ্লাঘার সহিত গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মহাভারতে অর্জুন পুণ্ড্রদিগকে জয় ও শ্রীমদ্ভাদবতে ৯ম স্কন্ধে ভরতরাজা পুণ্ড্রদেশের অব্রাহ্মণ্য রাজাকে জয় করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত যে, মালদহের পাণ্ডুয়াই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন হইতে পারে। পেরিপ্লুস অফ দি ইরিয়ান গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীতে কোন গ্রীক বণিক ও টলেমী সেকালের বাণিজ্যের কথায় বলিয়াছেন যে, তখন ইউরোপে এদেশের দ্রব্য গঙ্গা বাহিয়া লইয়া যাইত। মেলায় লোকে রেশমী কাপড় ও রেশম সুন্দর পাটিতে জড়াইয়া বিক্রি করিতে আসিত। যোগবাশিষ্ট রামায়ণে তাম্রলিপ্ত ও গৌড়ের কথায় গৌড়ভট্টগণের লাঠি যুদ্ধের অত্যন্ত প্রশংসা আছে। সেখান হইতে প্রাচীন ৫ম শতাব্দির বৌদ্ধ যুগের রৌপ্য তাম্র মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছে। সেইখানে একান্ন পীঠের অন্তর্ভুক্ত দেবীমূর্তি বর্তমান আছে। ইহার সহিত বাংলাব সম্বন্ধ প্রাচীন সুন্দর রাস্তাদি দ্বারা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া মোগলবাহিনী উড়িষ্যাদি জয় করিয়াছিল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও সেই পথাদি মেরামতাদি করিয়া রক্ষা করিয়াছিল। সেকালে ইউরোপবাসী বণিকগণ তাহাদের জাহাজে জহরত সোনা-রূপাদির বিনিময়ে এদেশের দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। সেই হইতেই বাংলার বহির্বাণিজ্যের লোপ হইবার সূত্রপাত হয়। তখন গ্রীস ও রোমবাসী বণিকগণ সপ্তগ্রামকে গাঞ্জেস রিজিয়া বলিত। সেই সপ্তগ্রামের অভ্যুদয় সম্বন্ধে বাণভট্টের হর্ষচরিতের মধ্যে কিঞ্চিৎ গূঢ় তথ্য আবিষ্কার কবা হইয়াছে, উহাই অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বর্তমান দিল্লি বা পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থ শ্রীকণ্ঠ নামক অতি প্রাচীন জনপদের অন্তর্গত ছিল। উহার রাজধানী স্থানীশ্বর একটি সমৃদ্ধশালী নগর ছিল ও পুষ্পভূতি সেই দেশের রাজা ছিলেন। তিনি ভৈরবাচার্য নামক সিদ্ধ গুরুর নিবট তান্ত্রিক শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন ও এক অট্টহাস নামক শত্রুজয়ী অসি সেই দীক্ষার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লাভ করেন। উঁহারই বংশধর রাজা হর্ষবর্ধনের কথা বাণভট্ট হর্ষচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে, রাজা হর্ষবর্ধনই কনৌজের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা প্রভাকরবর্ধন মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্ধনকে হূনদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রভারকবর্ধনেব মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার জামাতা কান্যকুব্জাধিপতি গ্রহবর্মাকে মালবাধিপতি যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করেন। কর্ণসুবর্ণরাজ উক্ত মালব রাজের পরম মিত্র ছিলেন, তিনি বন্ধুতাছলে বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্যবর্ধনের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। কুণ্ডল নামক জনৈক দূত সেই সংবাদ হর্ষবর্ধনকে জানাইবার পূর্ব রাত্রে হর্ষবধন স্বপ্নে সেই বৃত্তান্তের আভাস পান, উক্ত হইয়াছে। উহাতে সেই ঘটনা কোথায় হইয়াছিল উহার সন্ধান পাওয়া যায়। ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণের নামের সহিত সূর্যের নামের সম্বন্ধ আছে, যথা— প্রভাকর ও আদিত্যবর্ধন। হর্ষবর্ধন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, সূর্যের দিকে কবন্ধ রাহু অগ্রসর হইতেছে, সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধূম উদগীর্ণ হইতেছে ও সমগ্র গ্রহমণ্ডল ধূম ধূসরিত ও চতুর্দিকে যেন দারুণ অগ্নিশিখা আবির্ভূত হইয়াছে। ইংরাজিতে হর্ষচরিত লেখক শ্রদ্ধেয় ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু তাহার মন্ত্রীর কুপরামর্শেই হইয়াছিল। হর্ষ সেই ভণ্ডীকেই ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন ও স্বয়ং ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য

গিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে রাজ্যশ্রীর উদ্ধার ও হর্ষবর্ধনের রাজ্য লাভাদির কথা আছে, কিন্তু গৌড়াধিপের নির্যাতন ও প্রতিহিংসার কোন কথা নাই। আরও আছে যে, উক্ত রাজ্যবর্ধন হুনদিগকে পরাস্ত করিয়া যখন পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজ্যলাভ অপেক্ষা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিতে উদ্যত হন; কিন্তু তিনি উহা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই ভগ্নীপতির হত্যাদি সংবাদে অবিলম্বে পুষ্পভূতির বংশ মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করার জন্য রাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। কনৌজই তাঁহাদের রাজধানী হইল। তৎপরে বঙ্গের সহিত কনৌজের সম্বন্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল। গৌড়ের ইতিহাসকার রাজ্যবর্ধনের হত্যা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন— "রাজ্যবর্ধন কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া মালবরাজকে পরাজিত করেন। রাজ্যবর্ধন মালবেশ্বরকে পরাজিত করিলে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র রাজ্যবর্ধনকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বশিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক মালবরাজ দেবগুপ্তের দ্বারা নিহত করান ও শেষে কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া রাজ্যশ্রীকে গৌড়ে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। গুপ্ত নামক কোন ব্যক্তির সাহায্যে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে পলায়ন করনে। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন কনৌজ অধিকার করিয়া ভ্রাতৃহত্যার পরিশোধের জন্য কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করেন। হর্ষবর্ধন গৌড়ে কিয়ৎকাল বাস করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ জয়ার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন।" স্থানীশ্বর হইতে রাজ্যবর্ধন তখন কান্যকুব্জে রাজধানী করিয়াছিলেন। সেই সময় কান্যকুব্জের রাজবংশ ও রাজ্যবর্ধনের স্ত্রী যথারীতি কৌলিক নিয়মানুসারে নিহত স্বামী রাজ্যবর্ধনের সহমৃতা হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে সরস্বতী নদী তীরে প্রভাকরবর্ধনের পত্নী পতির মৃত্যু হইবার পূর্বেই সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কন্যাও সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময়েই হর্ষবর্ধন তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইহা হর্ষচরিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কবি বাজ্যবর্ধনের হত্যার পরে তাহাব স্ত্রী সহমরণ বৃত্তান্ত পূর্বোক্ত স্বপ্নে সূচিত অতি সুন্দর রূপে করিয়াছেন। আরও কবি বাণভট্ট প্রভাকরবর্ধন যে সূর্যের উপাসক ছিলেন ও তাঁহাদের পূর্বপুরুষের শৈব ও দেবী উপাসক ও তাঁহাদের মূর্তি ছিল বলিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন উহাতে সেখানে সূর্যোপসনার যথেষ্ট প্রমাণ প্রস্তর ফলকাদি দেখিয়াছেন। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহন করিবার পূর্বে ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া যে রাজধানী করেন উহার নামই ইন্দ্রপ্রস্থ। সম্ভবতঃ স্থানুর উপাসক পুষ্পভূতি তাহার রাজধানী স্থানীশ্বর রাখিয়াছিলেন, আর রাজ্যবর্ধনের বংশধর সূর্যের উপাসক বলিয়া পিতার অন্তেষ্টী ক্রিয়া স্থলের নাম সপ্তসপ্তি হইতে সপ্তগ্রাম দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্র ও সূর্যের উপাসনা। আরও সেকালের যে সকল ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী ভিন্ন অন্য কোন বৈদিক কর্ম জানিত না, তাহাদিগকে সাতসতি বা সপ্তসপ্তি ব্রাহ্মণ বলিত। বৈদিক ক্রিয়ার সময় কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণানয়ন করা হইত এইরূপ প্রবাদ সকলেই বিশ্বাস করে। হিন্দু অভ্যুদয়ের সময় হইতেই রাজার উপাস্য দেবতার নাম হইতে রাজধানীর নাম হইত, যথা কলিকাতার নামোৎপত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা রিয়াজুস সলাতিন গ্রন্থে দেখিতে পাই — "The City of Calcutta in past times was a village in a talugah endowed in favour of Kali, which is the name of an idol which is there" Riyazus Salatin P 30

অর্থাৎ শ্রীশ্রী ৺কালীমাতার নাম হইতেই কলিকাতার নামোৎপত্তি হইয়াছিল। আর আইনি আকবরিতে কলিকাতা সরকার সাতগাঁর অধীনে ছিল উল্লেখ আছে। যথা— "In 1596 A C it is mentioned in the Aini Akbari as a rent paying village named Kalikata under Sarkar Satgon" (Vol. II p. 141)

আদ্যাশক্তির অস্থিপঞ্জরের সহিত যেমন কলিকাতার সম্বন্ধোল্লেখ ও নামোৎপত্তি উক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সপ্তগ্রামের প্রাচীন আবিষ্কৃত প্রস্তরফলক মন্দিরাদিতে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রদ্ধেয় ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন সূর্যোপাসনা ও বিষ্ণু লক্ষী সরস্বতীর মূর্তি আদির পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্বত্রই অতীতের অন্ধকারের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সত্যাবিষ্কার হইতেছে। সেইরূপ সপ্তগ্রামের সহিত প্রাচীন আর্য বৈশ্য জাতির পতন ও অভ্যুত্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধ ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। আর্য বণিকজাতিই ভারতবর্ষের সর্বতভাবে উন্নতির মূল কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা অতি প্রাচীন স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের নির্মিত অর্ণবপোতে বাণিজ্য করিতে যাইতেন ও সেই বাণিজ্যের সাহায্যেই তাঁহাদেব রাজ্যশ্রী ও সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছিল। উহাতেই ইতিহাসে রাজা হর্ষবর্ধনের নাম সমুজ্জ্বল হইয়া আছে ও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যাবর্তে বৈশ্য সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই জৈন ও বৌদ্ধগণের মধ্যে শত্রুতা ছিল। বাংলায় জৈন প্রভাব ক্ষুণ্ন করিবার জন্য বিখ্যাত রাজা অশোকের আজ্ঞায় তাঁহার ভ্রাতা বীতশোককে জৈনভ্রমে কোন গোপাল হত্যা করে। বহুকাল হইতে সেইরূপ হত্যায় বাংলার নাম কলঙ্কিত। আদিত্যবর্ধনের পুত্র প্রভাকরই হুনগণের যম ছিলেন ও তিনি প্রতাপশিলা নামে খ্যাত হন। সেই হইতে তাঁহাব বংশধরেরা শৈলবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীহর্ষের পিতা উক্ত প্রভাকর পাঞ্জাব হইতে গুজরাট পর্যন্ত আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধন হুনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ও পিতার মৃত্যুর সময় সেই নিমিত্ত উপস্থিতে ছিলেন না। বাণের শ্রীহর্ষচরিত নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধহয় যে, তিনি হর্ষবর্ধনের প্রশংসাই করিয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই এবং রাজ্যবর্ধনের বিষয় যেন গোপনই করিয়াছেন। যুদ্ধ জয় করিয়া ক্ষতবিক্ষত বীর রাজ্যবর্ধন রাজ্যে আগমন করিয়া পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন আর কনিষ্ঠ হর্ষ তাঁহাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন বটে কিন্তু কেন যে, তিনি উহা ত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধানের সংকল্প ব্যক্ত করিলেন উহা উল্লেখ করেন নাই। পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বীর জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যদানাদির কথা ও তাঁহার সংবাদের জন্য উৎসুক না হইয়া কেন কনিষ্ঠকে সিংহাসনারোহণাদি আশীর্বাদ দান করা হইল সে কথাও কিছু বলিলেন না। অথচ হর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধনের সেই বৈরাগ্য সংকল্প ত্যাগ কিসের নিমিত্ত হইয়াছিল সে কথা আছে। বীর রাজ্যবর্ধন পিতার মৃত্যুতে যখন বিহুল, তখন ভগ্নীপতির মৃত্যু ও ভগ্নীর দুরবস্থায় তাঁহার সেই শ্মশান বৈরাগ্য দূর হইল, তদনন্তর তিনি তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া মালবরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি হর্ষকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না, যদিও হর্ষবর্ধন জ্যেষ্ঠকে সেজন্য নানানুরোধ করিয়াছিলেন। মাতুল পুত্র ভণ্ডিই অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালক হইয়াছিলেন। মহারাজ প্রভাকর যে মালবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার দুইপুত্র কুমার ও মাধব গুপ্তকে আপনার পুত্রদ্বয়ের সহচর স্বরূপ নিয়োগ করিয়াছিলেন ও কান্যকুব্জের রাজার সহিত কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দ্বারা কুলগৌরব বর্ধিত করিয়াছিলেন ইহা হর্ষচারিতকার বলিয়াছিলেন। বীর রাজ্যবর্ধন শত্রুদমন ও রাজ্যোদ্ধার করিলেন কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা তাঁহার সন্তানের কথা কিছুই নাই। গৌড়াধিপ প্রলোভন দেখাইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় গৃহে বধ করেন ও ভ্রাতৃহন্তার শাস্তি দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাদি আছে, কিন্তু পরিণাম যে

কি হইল সে কথা নাই। যাঁহার পরামর্শে গৌড়াধিপের নিকট নিরস্ত্র একাকী গমন করিয়া রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইয়াছিল, সেই ভণ্ডিকেই গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া হর্ষবর্ধন নিশ্চিন্ত রহিলেন। এইখানেই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ করিবার কারণ হইয়াছে। রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন পিতার মৃত্যুর সময় উভয়েই বিবাহিত ছিলেন। +

প্রসিদ্ধ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বৈশ্যজাতির ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন — "রাজ্যবর্ধনের যে পুত্র ছিল সে নিতান্তই শিশু। রাজমন্ত্রীগণ রাজপুত্র কি রাজ সহোদরকে সিংহাসন প্রদান করা উচিত এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য হর্ষবর্ধনের সহাধ্যায়ী ভণ্ডির পরামর্শ প্রার্থনা করেন। তিনি অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেও হর্ষবর্ধন রাজোপাধি গ্রহণ করিতেন না। "কুমার শিলাদিত্য" নাম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য করিতে লাগিলেন। পিতা প্রভাকরবর্ধনের প্রতাপশিলা নাম ছিল। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে তিনি ঐ রাজ্যভার গ্রহণ করেন ও তাহার নামে সম্বৎ আরম্ভ হয়। ইহাতেই শৈলবংশ ও হর্ষসম্বৎ উৎপত্তি হইল"।

* * * "হর্ষবর্ধনের পূর্ব পুরুষেরা শৈব ও সৌর ছিলেন কিন্তু হর্ষবর্ধনই বৌদ্ধ হইলেন। তাঁহারই সময় হইতে কান্যকুব্জ আর্যাবর্তের রাজধানী হইয়াছিল। মালবরাজের কনৌজাক্রমণাদিকার ও উহার উদ্ধার রাজ্যবর্ধনের গৌরব কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই যুদ্ধে যদি রাজ্যবর্ধন পরাস্ত হইতেন, তাহা হইলে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা বড়ই কঠিন হইত। যখন মালবরাজ অতীত গৌরব ও রাজ্য উদ্ধার করিবার নিমিত্তই প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজাধিকার ও শ্রীকণ্ঠ রাজ্য আক্রমণ করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন, তখন হুনকেশরী রাজ্যবর্ধন পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য হন।" যাহাই হউক, কুটনীতির বশবর্তী হইয়া কোন রাজা রাজ্যবর্ধনের প্রাণনাশ করে। বাণভট্টের স্বপ্ন বৃত্তান্তের সহিত কৌলিক সহমরণ প্রথার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। রাজ্যবর্ধনের পুত্র ও আত্মীয়গণ হর্ষবর্ধনের নিকট অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়াই সপ্তগ্রামেই অবস্থান করিলেন। উহা বিবেচনা করিবার কারণ প্রবাদ অপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। বর্ধমান জেলার মধ্যে অট্টহাস নামে এক অতি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। পুষ্পভূতি তাঁহার গুরু ভৈরবাচার্যের নিকট হইতে যে শিবাস্ত্র পাইয়াছিলেন উহার নামানুসারে শিবমূর্তির পূজা হইয়া থাকে। *রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণীর গাজীর কুড়ুল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন উহাও উল্লেখযোগ্য। সেই মসজিদের পূর্বে যে ঐখানে বৈশ্য মন্দির ছিল, উহার প্রমাণ রামায়ণ মহাভারতাদির নানাঙ্কের ঘটনাবলীর চিত্রাবলি ও সূর্য লক্ষী সরস্বতী আদি দেব দেবী মূর্তির দ্বারা তিনি প্রমাণিত করেন। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী ভিন্ন স্থান নয়, তিনি একথাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। 'গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না' প্রবাদবাক্য সেই অট্টহাসাস্ত্র যাহা পূর্বে সেইখানে ছিল ও মুসলমানেরা উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই লোকে মনে করেন, কিন্তু সেই অট্টহাসাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে ও লোকে সেইখানে শিব স্থাপনা করিয়া পূজা করে। সেইজন্যই উক্ত শিবের নাম ঐরূপ হইয়াছে। শিবের সহস্রনামের মধ্যেও অট্টহাস নাম নাই। সপ্তগ্রাম চৈনিক পরিব্রাজকগণের আগমনের বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত, গ্রীকাদি লেখকগণের বৃত্তান্তে প্রমাণিত হইয়াছে। হুয়েন সাঙ্ সেখানে যাওয়া বিপদজনক ভাবিয়াই যান নাই। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন সুতরাং তিনি যেখানে রাজ্যবর্ধনের হত্যা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হিন্দুমতানুসারে হইয়াছিল ও যে রাজবংশ হিন্দুধর্ম রক্ষা করিবার জন্য সেইখানে তাহাদের গৃহ দেবদেবী

+ শ্রীহর্ষচরিত সষ্ঠ উচ্ছ্বাস ২৪২ শ্লোক।

* হুগলী জেলার ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল দে লিখিয়াছেন।

লইয়া গিয়া বাস করিতেছেন সেখানে তিনি কিসের জন্য যাইবেন? শ্রীহর্ষচরিত যে রাজা হর্ষবর্ধনের গুণকীর্তন, ইতিহাস নহে একথা তাঁহার সভাকবি বাণ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রাজার আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া স্বগ্রামে উক্ত পুস্তক লিখিয়াছিলেন। বাণভট্ট সরস্বতী বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ও রাজ্যবর্ধনের মহিষী যে স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন ইহা হর্ষবর্ধনের দৃষ্ট স্বপ্নে প্রমাণিত হয়। মহাবীর রাজ্যবর্ধনের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে যে গৌড়াধিপ ক্রুর নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ বিশ্বাসঘাতকতায় করিয়াছিল। রাজ্যবর্ধনের শেষ ক্রিয়া কান্যকুব্জাধিপতির সন্তানাদি করিয়াছিল ও তাহারা সেইখানে বাস করেন। সপ্তগ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে * কান্যকুব্জের সাত রাজপুত্র বসবাস করায় ঐ নাম হইয়াছে। সতীর শাঁপে বা বিশ্বাসঘাতকতার পাপে রাজা শশাঙ্কের অঙ্গ কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য সূর্য ও প্রতিমাদির পূজা করিয়াছিলেন। গৌড়ের ইতিহাসকার সেকথা বলিয়াছেন। ত্রিবেণীর প্রাচীন মন্দিরে বৈষ্ণবাতারাদির সম্বন্ধ আছে ˚রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ সপ্তগ্রামের বণিকগণের সুখ্যাতি করিয়াছেন ও তাঁহারা বর্হির্বাণিজ্যহীন অন্তর্বাণিজ্যেই রত বলিয়াছেন। হর্ষচরিতে রাজা হর্ষবর্ধনের উপাধি 'দেব' ছিল ও তাহারা বৈশ্য ছিলেন ইহা পূর্ব পুরুষ পুষ্পভূতির বর্ণ উপাধি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যথা দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ১৩৩ পৃষ্ঠা 'মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীহর্ষদেবস্য ভ্রাতা'' পুনঃ (১৮৭ পৃষ্ঠা) ''পশ্যতাবৎ দেবং ইত্যভিধীয়মানশ্চ'' চতুর্থ উচ্ছ্বাস (৩৩১ পৃষ্ঠা) ''যশোবত্যাং দেবো রাজবর্ধনঃ প্রথমেব সম্বভূব গর্ভে''। তাঁহাদের গৃহে লক্ষ্মী ও চণ্ডীর উক্ত শ্রীশ্রী ˚সিংহবাহিনী মূর্তির পূজা নিত্য হইত। উক্ত দেবীব মুকুট ও মূর্তির প্রাচীনত্ব ও রাজাব কুলদেবী প্রমাণ করিয়া থাকে। উহার সহিত ঐ নামের অন্য কোন মূর্তির তুলনা বা সৌসাদৃশ্য নাই। ভারতবর্ষে দুই ত্রিবেণী বর্তমান, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সম্মিলন এলাহাবাদে আর বাংলায় আছে। রাজা হর্ষবর্ধন এলাহবাদে তাঁহার দান ধ্যানাদি করিতেছিলেন, আর বাংলায় ত্রিবেণীতে রাজ্যবর্ধনের বংশধর জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত হিন্দু ধর্মানুযায়ী কার্য করিতেছিলেন। উহা কোন ইতিহাসে স্থান পায় নাই। তাঁহারা প্রভাবশালী হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে গমন করেন নাই। তাঁহারা উড়িষ্যা ও বাংলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন ও সেখানে শৈলবংশীয় রাজাদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক তারানাথ বাংলায বৈশ্যরাজ্যের কথা বলিয়াছেন। সপ্তগ্রাম বা ত্রিবেণী বাংলাদেশের অতি প্রাচীন বন্দর, উহার উন্নতি রাজ্যবর্ধনের বংশধরগণ ও আত্মীয় কুটুম্ব দ্বারা হইয়াছিল। বৈশ্যজাতির উপর ব্রাহ্মণ সমাজ কেন খড়্গহস্ত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসুর জাতীয় ইতিহাসে আছে যে, * ''যতদিন সম্রাট হর্ষবর্ধন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে কোন পার্থক্য রাখেন নাই, ততদিন তাঁহার উপর ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোন বিদ্বেষের কারণ উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু যখন প্রয়াগের ন্যায় একটি প্রধান ব্রাহ্মণ তীর্থে সকল ধর্মাবলম্বীর সমক্ষে সম্রাট সর্বপ্রথম বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বৌদ্ধশ্রমণে ও ভিক্ষুকগণকে একপ্রকার সর্বস্ব দান করিয়া বৌদ্ধ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন, তখন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজের ধৈর্যচ্যুতি হইল। বিশেষতঃ যখন হর্ষবর্ধন স্বয়ং বৈদিক বিপ্রগণের সর্বপ্রধান উপাস্য দেবতা ইন্দ্রের বেশ ধারণ পূর্বক বুদ্ধ প্রতিমার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, তখন আর তাঁহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না''। + তাঁহার প্রধান মন্ত্রী অরুণাশ্ব ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রের উত্তরসাধক হইয়া হর্ষবর্ধনকে হত্যা

---

* পৃষ্ঠা-১৭৬ + পৃষ্ঠা-১৭৭

করিয়া কান্যকুব্জের সিংহাসনাধিকার করেন ও সেই সময় হইতেই উহা বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্র হইয়া পড়ে। তখনই বৈশ্য সমাজের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ সমাজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সে সম্বন্ধে উক্ত বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে,—"নিবন্ধকারগণ সেই সময় হইতে বৈশ্য সমাজের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, তাঁহাদের ধর্মনৈতিক সনাতন অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্যই অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।" ++

গুপ্তবংশের অধিকার কাল হইতেই তান্ত্রিক মহাশক্তির প্রভাবে শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ মন্ত্রযান উহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, তখনই বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ বিপন্ন, উহার সমুজ্জ্বল চিত্র ভবভূতির গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজ যশোবর্মা গৌড়াক্রমণ করিয়াছিলেন। উহাতে গৌড়রাজ ধৃত ও নিহত হন। সেই গৌড়রাজের নাম ও বংশ এখন পর্যন্ত সবিশেষ প্রকাশ হয় নাই। ঐ ঘটনা বাক্‌পতির গৌড়বহো কাব্যে বর্ণনা করা আছে। সেই রাজাই চীন সম্রাটের নিকট ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গুণ কীর্তন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই অনেক সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ণ হইয়াছিল; যাহাতে আদি হিন্দুশাস্ত্রের সর্বনাশ করা হয়। জাতিকে তখন জন্মগত করিবার চেষ্টা শাস্ত্রের বচন দ্বারা করিবার উপায় উদ্ভাবন করা হয়, কারণ তখন জাতিবিচার অতি সামান্য ছিল। তৎসম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য আর্যদেব যাহা বলিয়াছেন উহা উল্লেখযোগ্য— "অক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয় হইতেছে। শক প্রভাবে ব্রাহ্মণের রাজশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে ম্রিয়মাণ, তখন অগত্যা ব্রাহ্মণ সমাজ বৈশ্য গুপ্তবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৈশ্য সমাজের যে কেহ রাজত্ব করিত, প্রায় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাকে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নত করিবার প্রয়াসী হইয়া সমৃদ্ধিশালী সকল সমাজের সহানুভূতি হারাইয়াছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, শৈলবংশীয় রাজাগণের মধ্যে বর্ধন শব্দ নামান্ত না হইয়া মধ্যে ব্যবহৃত হইত। ইহা অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, তাহাদের বংশধরের মধ্যে কেহ যে সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস ও রাজত্ব লাভ করিয়াছিল। হোয়ান সিং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও সেইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হুনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবনতি করে। মহারাজ প্রভাকরবর্ধন বা প্রতাপশিলা সেই হুনদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতে বৈশ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়েই ভারতবর্ষের বাণিজ্য হইতে রাজ্যলাভ হয় ও উহার অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান ও শেষে ইউরোপের বণিকগণ এদেশে বহির্বাণিজ্য স্থাপন করিবার সুবিধা লাভ করে। তখনই ব্রাহ্মণ সমাজ সুমদ্র যাত্রা নিষেধ করিয়াছিলেন। ভীত বৈশ্য সমাজ ক্রমে ক্রমে বহির্বাণিজ্য ত্যাগ করে। যাঁহারা সুবর্ণদ্বীপ (বর্মা) সিংহলাদিতে সমুদ্রযাত্রায় বাণিজ্য করিত, তাঁহারা সুবর্ণবণিক বলিয়া খ্যাত ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে গুজরাটে বণিকগণের গমন বৃত্তান্ত আছে (৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় ও ২১৭ পৃষ্ঠায়) শ্রীমন্তের সহিত জনার্দন গুরুমশায়ের ঝগড়ায় শ্রীমন্তকে সুবর্ণবণিক বলিয়া স্থির করিতে হয়। * চীনদেশের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে ভারতবর্ষে আসিত ও সেই সঙ্গে স্বদেশের দ্রব্যের বিনিময়ে এদেশ হইতে তেজপত্রাদি লইয়া যাইত।

++ পৃষ্ঠা-১৭৮

"ব্রাহ্মণের মত নাহি বল্লালসেন্যা"

*   *   *   *

"তোমার ঘরে জল খায় সে কোন ব্রাহ্মণ।"

বেনারসের চিনিয়াপোত শাড়ীর নাম উহাতেই হইয়াছে। মনু ভিন্ন ঊনবিংশ সংহিতার মধ্যেও সেই সব ব্যবসায়ী পতিত ইত্যাদি স্থান লাভ করিল।

গৌড়ের ইতিহাসকার বলেন যে, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য পাণ্ডুশক্য হইতেই পাণ্ডুয়া নামোৎপত্তি হইয়াছে। মালদহের ভুতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের ভিত্তিভূমি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহার কিয়দংশ হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের ভিত্তির উপর বৌদ্ধ স্তূপের মালমসলায় নির্মিত। ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্যের অন্তর্গত ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। অনেক ধনশালী বণিক সেই রাজ্যে বাস কবিত বলিয়া উহার নাম ঐরূপ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে গৌড়ের ইতিহাসকার বলেন যে, "বর্তমান হুগলী জেলার আমতা গ্রামের নিকট পেঁড়ো বসন্তপুর হইতে হুগলী জেলায় পেঁড়ো পর্যন্ত ভুরিশ্রেষ্ঠী রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্য বৌদ্ধ রাজত্বকালে স্থাপিত হয়।" পশ্চিমের ব্যবসায়ীরা এখন শ্রেষ্ঠীর স্থলে শেঠজী বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে।

উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে, "সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যপোত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও জলিঙ্গী দিয়া পূর্ব বাংলায় যাওয়ার সময় নবদ্বীপের নিকট দিয়া গমন করিত; তজ্জন্য নবদ্বীপ একটি প্রধান বাণিজ্য নগর হইয়া ওঠে। লক্ষণ সেন ঐ নগরকে বড় ভালবাসিতেন। লক্ষণ সেন গৌড় নগরকে সুশোভিত করেন। গঙ্গা নদী মালদহ জেলায় বারম্বার আপনাব স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ও ব্যবসার স্থানেব পরিবর্তন হইয়াছে। ভুরিশ্রেষ্ঠীর অপভ্রংশ ভুরসুট এখনও বর্তমান আছে।"

মধুবনের তাম্রশাসনে সম্রাট হর্ষের পিতামহ আদিত্য মহাসেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন উল্লেখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সেই মহাসেনগুপ্তাকে দামোদর গুপ্তের কন্যা বলিয়াছেন। তদনুসারে মগধরাজ আদিত্য সেন মহারাজ হর্ষের সম্পর্কে ভ্রাতা হইতেছেন। সেই আদিত্য সেনই হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর অঙ্গ বঙ্গ গৌড়াদি লাভ করেন ও তিব্বতীয়গণ বঙ্গ, মগধ আক্রমণ করিয়াছিল; এই কথা গৌড়ের ইতিহাসে আছে। রাজতরঙ্গিণীতে ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ জয়পীড় ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে আসিয়াছিলেন উল্লেখ আছে। উক্ত জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্ধনের দেবমন্দিরে কমলা নাম্নী নর্তকীর নৃত্যকলা ও রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া যান। সেই কমলার মুখে নগরবাসির দুঃখ এক সিংহের অত্যাচার কেহ নিবারণ করিতে পারিতেছে না জানিতে পারেন ও তিনি উহাকে সংহার করিয়া শেষে দেশের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। নিহত সিংহের মুখে জয়ন্তের অজ্ঞাতে তাঁহার নামাঙ্কিত বহুমূল্য অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়া রাজা তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া ফেলেন। রাজার কন্যা কল্যাণী ও নর্তকী কমলাকে লইয়া জয়পীড় স্বরাজ্যে গমন করেন। দৌহিত্র ভুশূর বাংলার সিংহাসন লাভ করে ও রাজা আদিত্য সেন পাণ্ডুয়ার হোমদীঘি ও ধূমদিঘির তীরে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন উহাতেই ঐ সকল দিঘির নামে স্মৃতি বর্তমান রহিয়াছে। সেই রাজ ভুশূর রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগাদি ও তৎপুত্র রাঢ়ী ও সপ্তসতী ব্রাহ্মণগণকে যথাক্রমে যে ছাপান্ন ও আটাইশ গ্রাম দান করেন উহাতেই ব্রাহ্মণগণের গাঁই সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণেরা যাজনবৃত্তি ব্যবসা স্বরূপ বাংলাদেশে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অন্যত্র এইরূপ নাই, কারণ দেবলেরা শাস্ত্রানুযায়ী পতিত। উহাতেই প্রাচীন মন্বাদি সংহিতাতে বিসদৃশ নতুন ব্যবসা সংযোজিত হইল। ঐ সকল তখন হস্তলিখিত সুতরাং উহা করিবার সুবিধাও বিলক্ষণ ছিল। এতদ্ভিন্ন অনেক নূতন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ সেকালে প্রণয়ণ হইয়াছিল। যথা, ৯৭। ১২শ অধ্যায় মনু —

"চাতুর্ব্বর্ন্যং এয়োলোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্ ভৃত্যং ভবত্তভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বংবেদাং প্রসিদ্ধ্যতি"।

অর্থাৎ যে কিছু অতীত বর্তমান বা ভবিষ্যত সকলই বেদ সিদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র, চারি বর্ণ ও স্বর্গাদি লোকত্রয় ব্রহ্মচর্যাদি চতুষ্টয় ইহারা সমস্তই প্রসিদ্ধ পিতৃমাতৃ জাতত্ব ও উহার উপযোগী জানিবে। আবার ৪১৭।৮ম অধ্যায় মনু —

"বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ নহিতস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনোহি সঃ'।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দাস শুদ্র হইতে বলপ্রয়োগেও ধনগ্রহণ করিতে পারে, কারণ তাহার যাবতীয় ধন সমস্তই ভতৃগ্রাহ্য হইতেছে। আবার ৪১৩।৮ম অধ্যায় মনুঃ—

'শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীমত্তমেব বা দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বরম্ভুবা'।

অর্থাৎ বিধাতা দাস্য কর্মের জন্যই শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সেই শূদ্র ভক্তাচ্ছাদনাদি দ্বারা প্রতিপালিত হউক বা না হউক, উহাকে ব্রাহ্মণ দাস্য কার্য করাইতে পারিবেন। আবার ৩৯০।৮ম অধ্যায় মনু—

"আশ্রমেষু দ্বিজাতিনাং কার্য্যে বিবদতাং মিথঃ ন বিব্রূয়ান্নৃপোধর্ম্মং চিকীষন্ হিতামাত্মনঃ'।

অর্থাৎ ধর্মেচ্ছু রাজা দ্বিজাতিগণের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত কোন বিবাদ মীমাংসা করিবেন না। আবার সেই অধ্যায়েই ইহার বিরুদ্ধ শ্লোক সন্নিবেশিত রহিয়াছে। যথা ঃ ৩৪৬।৮ম অধ্যায় মনু—

"রক্ষন্ ধর্ম্মেণ ভূতানি রাজা বধ্যাংশ্চ ঘাতয়ন্ যজতেহহর হর্যজ্ঞৈঃ সহস্রশত দক্ষিণৈঃ"।

অর্থাৎ রাজা প্রজাগণের ধর্মানুযায়ী রক্ষা ও বধ করিলে প্রত্যহ লক্ষ গো দক্ষিণাও যাগযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। আরও মনু যে সময়ের ধর্মশাস্ত্রকর্তা তখন অন্য দেশের বলবান যোদ্ধৃগণকে অগ্রে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ও কারুক শিল্পিক শূদ্রাদিকে প্রতি মাসে একদিন রাজা কর্ম করাইয়া লওয়া ধর্ম হইতে পারে না। ৭ম অধ্যায় মনু ১৯৩ শ্লোক।

"কুরুক্ষেত্রাংশ্চ মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ শূরসেনজান্ দীর্ঘান্ লঘুংশ্চৈবনরানগ্রানীকেষু যোধয়েৎ"

"কারুকান্ শিল্পনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ একৈকং কাবয়েৎ কর্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ"। ১৩৮।৭ম অধ্যায় মনু।

চাণক্যের শ্লোকেই আছে যে, কোন কর্মেয় অগ্রে গমন করা উচিত নয়, কারণ বিপদকালে অগ্রগামী প্রথমে নষ্ট হয়। এই রূপ কূটনীতির কথা যখন মনুর স্মৃতির শ্লোকে দেখিতে পাই, তখনই উহা যে প্রক্ষিপ্ত একথা বলিতে কেহ কুণ্ঠিত হইতে পারে না। মনুর ৭ম অধ্যায়ের ২১৩ শ্লোক চাণক্যের শ্লোকের মধ্যবর্তী। যথা ঃ "আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি'। অর্থাৎ আত্মরক্ষা করাই ধর্ম, স্ত্রী অর্থ সমস্তই তজ্জন্য ত্যাগ করা যাইতে পারে। যদি ইহা সত্যযুগের ধর্ম হইত, তবে শিবি রাজার বা হরিশ্চন্দ্রের উদাহরণ মিথ্যা হয়। স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনই আর্য হিন্দুর সত্যযুগের ধর্ম দধিচী মুনি উহার উদাহরণ। গুপ্ত ও মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাবে যখন লোকে অর্থশাস্ত্রোক্ত কুটনীতির পক্ষপাতী হইয়াছিল, তখন তাহাদের রুচি পরিতৃপ্তি শাস্ত্রের উদরে নানা পূর্বোক্ত আবর্জনায় স্থানলাভ করিয়াছে। সেকালের রাজারা, বা তাঁহাদেব পরামর্শদাতা ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীগণ নীতি ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন না। তাঁহারা উহার প্রতিকারের চেষ্টা না করায় দেশের চারিদিকে বিশৃঙ্খল ও হিন্দু প্রভাব ধর্মাভাবে নষ্ট হয়।

বৈশ্য রাজত্বের শেষে ব্যবসার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাদিতে হিন্দু বণিকগণের সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে ও তৎসম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই ভারতবাসিরা ব্যবসা উপলক্ষে যাইত। মহাভারত রামায়ণে ভারতবর্ষের নানা স্থানের বিখ্যাত দ্রব্যের উপহার আদির কথা উল্লেখ আছে। বাণিজ্যের অভাবে দেশের কৃষিকার্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। বহুদিন পূর্বে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত জয় করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাংলার বলবীর্য ঐশ্বর্য দেখিয়া সেদিকে অগ্রসর হন নাই। সপ্তম শতাব্দিতে পারসিক ও আরবিক বণিকগণ বর্হিবাণিজ্যের একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে ও সেই ব্যবসায় উন্নত হইয়া ইসলাম রাজ্য এককালে ইউরোপ বিধ্বস্ত করিতে গিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দিতে আরবগণ করাচি দখল করে। যতদিন ইউরোপের বণিকগণ এদেশে বাণিজ্য ও ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই, ততদিন তাহারা দেশের উপর কোন কর্তৃত্ব করিতে পারে নাই। ব্যবসাই লক্ষ্মীর বাহণ বলিলে চলে। ক্লাইবের সৌভাগ্যোদয় আরকটের দুর্গ জয়ে ও কলিকাতা উদ্ধারে হইয়াছিল। উহাও তাঁহারা ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য করেন নাই। বাংলায় কাহার পর কে রাজা হইয়াছিল, উহার ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। "যাহা হইয়াছে উহা অনুমান সিদ্ধ, কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রতিপন্ন করিয়া হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ভিন্সেন্ট স্মিথ ও সার অরেল্ ষ্টাইন জয়াপীড়ের পৌণ্ড্র বর্ধনাদিপতির কন্যা কল্যাণীর সহিত বিবাহ ও নর্তকী কমলার সহিত কাশ্মীর যাত্রা বিবরণ বিশ্বাস করেন না। কোন সমসাময়িক লিপিতে বা গ্রন্থে কহ্লনমিশ্র বর্ণিত জয়াপীড় কাহিনী ˚রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও গৌড়রাজমালা লেখক গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু প্রসিদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কতিপয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আদিশূর ও জয়ন্তকে এক ব্যক্তি প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাংলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহারা কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথাই প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেক ও নীতিবিরুদ্ধ বলিতে হয়, কারণ যে পর্যন্ত না রাজতরঙ্গিণী ও কহ্লনের উক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা ভিন্সেন্ট স্মিথ ও সার অরেল স্টাইন তাঁহাদের মতের পোষকতা করিতে পারেন সে পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিবরণ যাহা তাঁহাদের বহুপূর্বে লিখিত হইয়াছে উহা অযথা অগ্রাহ্য করা যায় না। উক্ত বাংলার ইতিহাসকার বলেন যে, "মধ্যপ্রদেশে রঘোল গ্রামে আবিষ্কৃত শৈল বংশোদ্ভব দ্বিতীয় জয়বৰ্দ্ধন নামক নরপতির তাম্র শাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ২য় জয়বৰ্দ্ধনের পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৌণ্ড্রদেশের নরপতিকে নিহত করিয়া সমস্ত পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দির শেষ পাদে উৎকীর্ণ হইয়াছিল"। * * * "নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণের পার্শ্বে সংলগ্ন জয়দেবের খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে ৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই খোদিত লিপি জয়দেবের বংশ পরিচয় ও তাঁহার শ্বশুর বংশের বিবরণ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের খোদিত লিপিতে হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলপতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিল; অতএব ৭৫৯ * খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গৌড়দেশ হর্ষদেব কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। হর্ষদেব কামরূপরাজ বলিয়া খোদিত লিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই, তবে তাঁহার কন্যা রাজ্যমতীর 'ভগদত্ত রাজকুলজা' উপাধি দেখিয়া বোধহয় যে, হর্ষদেব কামরূপাধিপতি ছিলেন। গৌড়দেশ হর্ষদেব কর্তৃক জিত হইয়াছিল, অথবা তাঁহার পূর্বেই জিত হইয়াছিল তাহার নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই।" ইহাও সমর্থন করা যায়

* Indian Antiquary Vol. p. 17.

না, কারণ বাণের শ্রীহর্ষচরিতে কামরূপের রাজার সহিত হর্ষের সম্বন্ধ স্পষ্টই আছে। শ্রদ্ধেয় + ডাক্তার রাধাকুমুদের হর্ষচরিত গ্রন্থে আসামের রাজা কুমার হর্ষের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ও উভয়ে পরস্পর ইন্দ্র ও ব্রহ্মারূপে বুদ্ধের উপাসনা করিয়াছিলেন। আর যদিই গৌড় জয় আসামাধিপতি করিতেন, তাহা হইলে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মার সভাকবি বাকপতিরাজ বিরচিত 'গউডবহো' নামক গ্রন্থে সে কথা কেন উল্লেখ করেন নাই। সেই কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "যশোবর্মা যে মগধেশ্বর ও বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন "গউডবহো" কাব্যে তাঁহাদিগের নাম পাওয়া যায় না। যশোবর্মাদেব কর্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্তবংশীয় রাজা ২য় জীবিতগুপ্ত একই ব্যক্তি।" এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, কারণ গৌড় রাজমালা পৃ ১৫ নজীর দেখাইয়া তাঁহার নিজের কথা বলিয়াছেন "এই সময়ে বঙ্গদেশে কোন রাজার অধিকারভুক্ত ছিল + তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।" নেপালের পূর্বোক্ত খোদিত লিপিতে যে হর্ষদেবকে গৌড়, ওড্র ও কোশলপতি উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে, ইহাতে তিনি যে রাজ্যবর্দ্ধনের বংশধর ২য় হর্ষদেব সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ সেকালের ও একালের প্রাচীন রাজবংশের মধ্যে একই রাজার নাম উক্ত হইতে থাকে। সেই প্রথা সেই সময় হইতে চলিয়া অসিতেছে। গুপ্তবংশে আছে ও জয়পুরের রাজাদের মধ্যে মানসিংহ রামসিংহ এখনও হইয়া থাকে। শৈলবংশ ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলে আছে। বাংলায় সপ্তগ্রামে যাহারা শৌর্য বীর্যাপেক্ষা ধর্মযাজন করা মঙ্গলকর মনে করিয়াছিল তাহারা সেইখানে কুল দেবদেবীর পরিচর্যা ও ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। চণ্ডীর উপাস্যদেবী শ্রীশ্রী ̊ সিংহাবাহিনী যিনি সকল দেবতার শক্তি সমূহে সমুত্থিত তাঁহারই কৃপায় সেকালের বাংলার সীমার যে নদী প্রবাহিত হইয়াছিল উহাতে সুবর্ণ রেণু প্রবাহিত হইত ও সেই সুবর্ণ লইয়া বাণিজ্য করিয়া সেই নদীর ও বাণিকগণের নাম যথাক্রমে সুবর্ণরেখা ও সুবর্ণবণিক হইয়াছিল। সেই সুবর্ণ বণিকগণের মধ্যেই 'আঢ্য' ++ বৈশ্যোপাধি বর্তমান ও শ্রীহর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসে প্রশস্তি বন্দনায় আঢ্যরাজ বলিয়া আছে। এই 'আঢ্য' উপাধি বৈশ্যবর্ণের সুবর্ণ বণিকগণের আছে, একথা মনুর অনুবাদক ̊ ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও ̊ মথুরানাথ তর্করত্ন স্বীকার করিয়াছেন। সনক আঢ্যের পুত্র বল্লভানন্দের সহিত বল্লাল সেনের বিরোধের কথা বল্লাল চরিতে আছে। শর্মা, বর্মা, ভূতি দাসাদি মঙ্গল বল সম্পত্তি ও সেবক সূচক উপ-পদযুক্ত ব্রাহ্মণাদির উপাধি হইয়া থাকে, মনু বলিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের কথায় যাহা কিছু বলিবার বাকি আছে উহা সংক্ষেপ শেষ করা উচিত। ̊ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাংলার ইতিহাসে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলেন। আরও বলেন যে সেই সময়ে "মাধব গুপ্ত অথবা আদিত্য সেন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। অফসড় গ্রামে আদিত্য সেনের একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আদিত্য সেন একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী কোণদেবী একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এই খোদিত লিপি গৌড়বাসী সূক্ষ্মশিব কর্তৃক রচিত বা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। হর্ষবর্ধন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অব্দে ৬৬ সম্বৎসরে ৬৭১।২ খ্রীষ্টাব্দে সালপক্ষ নামক জনৈক সেনাপতি কর্তৃক একটি সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" সেই সময়ের সূর্যোপসনা ও সেই সকল মূর্তি সপ্তগ্রামে আবিষ্কৃত হওয়ায় উহা যে সেই সময়ের কথা বলিয়া বোধহয়। কাশ্মীরের সহিত বাংলার সম্বন্ধও সেই সময়েই দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরের রাজারাও তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গৌড়লেখমালা লেখক

+ ১৪৩ ও ১৫১ পৃষ্ঠা ++ এই উপাধির বিশিষ্টতার কথা আইনি আকবরীতে উল্লেখ আছে।

বলেন যে, "পৌণ্ড্রদেশ" যখন "শৈলবংশীয়" আক্রমণকারীর পদানত তখন যশোবর্মা নামক একজন উচ্চাভিলাষী নরপাল কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করিয়া হর্ষবর্ধনের রাজধানীর পূর্বে গৌরব পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।" "গৌড় বঙ্গ বিজয়ের অনতিকাল পরেই (৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে) কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় আসিয়া তাঁহাকে কান্যকুব্জের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন।"

"বিন্ধ্য প্রদেশের অধীশ্বর ২য় জয়বর্ধনের (রাঘোলিতে) প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, 'শৈলবংশতিলক' শ্রীবর্ধন নামক নরপতির সৌবর্ধন নামক পুত্র ছিল। এই সৌবর্ধনের আবার তিন পুত্র ছিল। ইঁহাদের মধ্যে শৌর্যান্বিত একজন পরাক্রান্ত শত্রু বিদারণ পটু পৌণ্ড্রাধিপতিকে নিহত করিয়া সমস্ত পৌণ্ড্রদেশ আধিকার করিয়াছিলেন। এই পৌণ্ড্র বিজেতার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রপৌত্র ২য় জয়বর্ধন রঘোলিতে প্রাপ্ত শাসনের সম্পাদন কর্তা।" অন্যান্য তাম্রশাসন হইতে জানা যায়— ৭ম শতাব্দে উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ 'শৈলোদ্ভব' বংশীয় রাজগণের করতলগত ছিল। অজ্ঞাতনামা 'শৈলবংশীয়' পৌণ্ড্রজিৎ 'শৈলোদ্ভব' বংশের শাখান্তর হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া অনুমান হয়। * (১৪।১৫ পৃষ্ঠা) উক্ত গ্রন্থকারও বলেন যে, '৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ৭ম শতাব্দীর শেষাঙ্কের বাংলার ইতিহাস ঘোব অন্ধকারাচ্ছন্ন। মগধের আদিত্য সেন ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া, অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বাংলায় তাঁহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিনা, বলা সুকঠিন।" আদালতের সাক্ষ্য গ্রহণের রীত্যানুসারে গৌড়ের ইতিহাসকারের মতেরই পক্ষপাতী হইতে হয়। কারণ তাহার কথা পাণ্ডুয়ার হোম ও ধুমদিঘি দ্বয়ের পোষকতা করিতেছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ভিন্সেন্টস্মিথ যাহা অনুমান করিয়াছেন উহাই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিরোধার্য করিয়া গোপালদেবকে গৌড়াধিপতি স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসকার তারানাথের আরব্যোপন্যাসের কথা স্বরূপ গোপালদেবের রাজ্য লাভ ও কাহিনী উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বাস করেন নাই, অথচ তিনি তাঁহাকে ৭৯০ হইতে ৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন, বলেন। ভিন্সেন্টস্মিথ তারানাথের মতের পোষকতা করিয়া গোপালদেবের রাজত্বকালে ৭৩০ বা ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রভা মিত্র বাঙালী ছিলেন। যাঁহারা বাঙালীকে ভীরু বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহারা জানেন না যে, বাঙালীরা কাশ্মীরে গমন করিয়া তাহাদের রাজার নিধনের প্রতিশোধ দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া বীরত্ব দেখাইয়াছিল। যাহাই হউক, এই সকল পণ্ডিতগণের মতামতের মধ্যে একটি মূল সত্য কথা বর্তমান আছে যে, বাংলার সহিত ভারতবর্ষের নানা স্থানের রাজাগণের সম্বন্ধ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাংলায় অরাজকতায় ব্যবসা ও বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছিল ও উহাতেই বাংলার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। সোনার বাংলার পার্শ্বপর্তী ও দূরবর্তী রাজন্যগণের দৌরাত্ম্যে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়াছিল। উহার জন্য সেকালের বণিকগণ সম্পূর্ণ দোষী নয়। তখন অর্ন্তবাণিজ্য বহুমূল্য সোনারৌপ্যাদি কাঁসা শঙ্খ গন্ধ দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা দ্বারা যাহারা আপনাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিয়াছিল তাহারাই সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, আদির নাম ব্যবসানুযায়ী লাভ করে। সাধারণতঃ লোকে ইহাই বিশ্বাস করে; কিন্তু উহারা সকলেই যে বৈশ্য ছিলেন সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। + গৌড়ের ইতিহাসকার বলেন যে, "মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের পূর্বাংশের সমস্ত বাণিজ্য

* ১ ভাগ ১০৩।৪।৪।৫ পৃষ্ঠা। ৭৮৩ পৃষ্ঠা (১০ অ ১২০ শ্লোক) ও ৫৭ পৃষ্ঠা (২০ অ ৩১।২)

\+ গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৫১ পৃষ্ঠা।

বাঙালীর হস্তে ছিল। বাঙালী আপনাদের নির্মিত অর্ণবপোতে সুবর্ণদ্বীপে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। তাহারাই সুবর্ণ বণিক বলিয়া বিখ্যাত, আর যাহারা গন্ধাদি সুমাত্রা যাভা দ্বীপ হইতে লইয়া আসিতে তাহারা গন্ধবণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গন্ধাদি দ্রব্য ব্যবসা করা সংহিতকারগণ পাতিত্যের কারণ, সেইজন্য বোধহয় গৌরবান্বিত বৈশ্যগণ উহা করিত না। সুদূর তির্বত ও মাঙ্গোলিয়া বাঙালীদের নামের পূর্বে যেমন 'শ্রীযুক্ত' ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহারাও ঐরূপ করে। উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতিদিগের আদি পুরুষগণ কেহই বাংলার আদিম অধিবাসী নহেন। তাঁহারা মিথিলা, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, বারাণসী, মগধ, মহারাষ্ট্র, দাবিড়, মধ্যভারত প্রভৃতি হইতে বঙ্গদেশে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সদ্‌গোপ, তিলি, তাম্বুলী, তন্তুবায়, গন্ধবাণিক প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমে শূন্য মূর্তি, সধর্ম নিরঞ্জনের স্তব থাকায় বোধহয়, উহারা বৌদ্ধ হইয়াছিল।'' চীন পরিব্রাজক যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল সেইখানেই গিয়াছিলেন, সপ্তগ্রামে ইহা ছিল না বলিয়া সেইখানে যান নাই ও উহার বিবরণ তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে নাই। সেইরূপ তাম্রলিপ্তে ছিল বলিয়া সেখানে গিয়াছিলেন। সেকালের বাণিজ্য দ্রব্যের তালিকা উক্ত গ্রন্থকার এইরূপ দিয়াছেন,— ''ঘোড়া, পট্টবস্ত্র, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, হীরা, মুক্তা, চন্দন, কর্পূর, নানাবিধ মাল মসলা, তেজপত্র, ভোটকম্বল, মেঘডম্বর শাড়ী রাম লক্ষ্মণ শাঁকা ইহাদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল।''

* ''সেনরাজগণের সময় তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যখাতি লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরিবর্তে সপ্তগ্রাম বণিজ্য প্রধান স্থান হইয়া উঠে। সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় প্রয়োজনের সময়ে দেশের হিতকল্পে অর্থ দিয়া সাহায্য না করায় বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেন উভয়েই তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। বাণিজ্যের জন্য সাতগাঁ অতি প্রধান স্থান হইয়াছিল। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে উহাকে মহাস্থান বলা হইয়াছে।''

* ''সেকালে কোন সদাগর বা বড়লোক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে পাটের দোলায় চড়িয়া যাইতেন। সঙ্গে বাদ্যকরগণ বাজাইতে বাজাইতে ও পাইকেরা চীৎকার করিতে করিতে যাইত। রাজাগণ সদাগরগণকে বাণিজ্যার্থ অর্থ সাহায্য করিতেন। বণিকেরা অবশ্য রাজার অর্থ সন্তোষজনকরূপে পরিশোধ করিতেন। তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল; তবে সাধারণ ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হইত।''

* ''খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে এদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে নানাজাতির উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পরশুরাম সংহিতা, পরাশর পদ্ধতি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রায় এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিবিধ জাতির উৎপত্তি এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা কল্পনামূলক মাত্র।'' ''চণ্ডী পূজার মধ্যে শুভাচণ্ডীর পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা অগ্রে স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এই শুভচণ্ডী এখন বঙ্গদেশে সুবচনী নামে পূজা পাইতেছেন। * * ''পুণ্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয় দেবের মন্দির ছিল। তাঁহার শক্তি ষষ্ঠী এদেশে পূজিত হইতেন।'' বল্লাল সেনের সময়ে এদেশের একটা সামাজিক যুগান্তর উপস্থিত হয়। তখন শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মত লইয়া দেশ তোলপাড় হইতেছিল। শক্তি সাধন তন্ত্র পাঠে বোধহয় যে এই সকল মতের সামঞ্জস্য সম্পাদনের জন্য তন্ত্রমতের সৃষ্টি হয়। বাংলার যে সকল জাতি, জাতি মর্যাদাহানী হইয়াছে তাহারা বলে, বল্লাল সেনের দৌরাত্মে তাহাদের

* ১ম ভাগ ২১০-২১১ পৃষ্ঠা। ঐ ২২৪ পৃষ্ঠা। ঐ ১৭৯ পৃষ্ঠা

জাতি ছোট হইয়া গিয়াছে।" গোবর্ধন মিশ্রের কুলজী গ্রন্থে আছে; ধনপতি গৌড় হইতে সুবর্ণ বণিকদের পাঁচজনকে উজানী নগরে সঙ্গে করিয়া আনয়ন করেন। এই পাঁচজন অযোধ্যা হইতে ব্যবসায়ের জন্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন। ইহা সনকাদি আঢ্যের কথাই উল্লিখিত হইতেছে। পূর্বেই কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ধনপতি যে সুবর্ণ বণিক ছিলেন, উহা গুরু মহাশয়ের গালি ও শিষ্যের প্রত্যুত্তরে পরিস্কার আছে। সুবর্ণ বণিকেরা বল্লালের কৌলিন্যাদি স্বীকার করে নাই। তজ্জন্য বল্লাল চরিতে উহাদিগকে দাম্ভিক বলা হইয়াছে।

সামাজিক দণ্ড — যাহাই হউক রাজা বল্লাল রাজনীতি অবলম্বন করিয়া দণ্ডাদির দ্বারা রাজ্য রক্ষা করা অপেক্ষা সামাজিক দণ্ড বলবান প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ সমূহের মধ্যে জাতি গৌরব জাগ্রত করিয়া তিনি কৌলিন্যাদির সৃষ্টি করিলেন; যাহাতে তাহারা উহারই জন্য বিব্রত হইয়া ও রাজার বাধ্য থাকিবে। রাজত্বের মধ্যে শিক্ষিত সমাজে উহা লইয়া দ্বন্দ্ব হইলে তাহারা রাজার বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্রাদি করিবার সুযোগাদি পাইবে না। তিনি হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানের জন্য যে কৌলিন্যাদি করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান হয় না। বাংলায় অসচ্চরিত্র বল্লালের সময় হইতেই রাজা জমিদারেরা সমাজ কর্তা সাজিয়া দেশের ব্যবসাদির ও রাজত্বের সর্বনাশ করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পর জাতি লইয়া হিন্দুর গোড়ামি ও দণ্ডবিধি শাস্ত্রের অঙ্কে সেই সকল সমাজপতিগণের ইঙ্গিতে স্থান পাইয়াছিল। মন্বাদি অষ্টাদশ পুরাণাদি নানা প্রক্ষিপ্ত রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বল্লালের সময় কৈবর্তাদি জলাচরণীর হয় ও শুদ্ধ বৈশ্যাদির সামাজিক দণ্ড হয়। বল্লভানন্দের ঋণদান ও যুদ্ধের বিনা রাজত্ব বদ্ধকে উহা দান করিতে না চাওয়ায় ঐ সামাজিক দণ্ডের মূল কারণ। শেষে উহাতেই নীচ ব্রাহ্মণ ঘটকেরা জাতির সর্বময় কর্তা হইয়া পড়ে। মুসলমানগণও ঐ নীতির পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। জাতিমালা কাছারি দেবীবর ঘটকের আবির্ভাবের পূর্বে ছিল। দত্তখান নামক এক ব্যক্তি মুসলমান রাজ্যের মন্ত্রী সেই কাছারীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৭তম সমীকরণ করিয়াছিলেন। নুলো পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠীকথায় প্রসিদ্ধ ঘটক দেবীবরের মেলবন্ধনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যের ধর্ম, রঘুনন্দনের স্মৃতি বা রঘুনাথের তর্কমহিমা কাহারও প্রশংসা করেন নাই, বরং উহাতে যে প্রাচীন আর্য ধর্ম ও শাস্ত্রের অবমাননা হইয়াছে উহা বলিয়াছেন। উহাতেই বাংলার অনেক প্রাচীন জাতি বংশের মর্যাদা শেষ হইয়াছিল।

''একালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম, বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধুম।''

উহাতেই রাজসাহী উদায়নাচার্য করণ প্রথা, পুরন্দর খাঁ সমান পর্যায়ে বিবাহ ও পরমানন্দ রায় অন্য কতকগুলি নিয়ম সৃষ্টি করেন। ক্রমে ক্রমে এক জাতির মধ্যে নানা বিভাগ ও গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ইহাতে লোকের ব্যবসা ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, লোকে মর্যাদা লইয়া বিব্রত হইল; কিন্তু যাঁহারা আভিজাত্য গৌরবে রাজা অপেক্ষা কোন প্রকারে হীন নন, বরং তাঁহার দুর্ব্যবহারে ক্ষুণ্ন ও লজ্জিত, যাঁহারা প্রসিদ্ধ বৈশ্য রাজার কুটুম্ব তাঁহারা কি সুযোগ পাইলে পুনরায় রাজ্য ও রাজত্ব করিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? সেইজন্যই বল্লাল সেনকে ঋণ দান দ্বারা রাজত্ব লাভাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল। বল্লভানন্দ আঢ্য প্রভৃতি সপ্তগ্রামের রাজ্যবর্ধনের বংশধরগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ঐ কার্যের অগ্রণী হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! বিধি বিড়ম্বনায় ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পীর জাফর খাঁ গাজী ত্রিবেণীতে মুসলমান ধর্মপ্রচারের জন্য একটি মসজিদ করেন ও উহাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে

মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। জাফর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাহ সফি জাফর খাঁই সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গার স্তব লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণেই বল্লালের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের বংশধরেরা কোন কার্য করিতে পারেন নাই। বল্লাল যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছিলেন বল্লাল চরিতে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। সেই বাংলায় বৈশ্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শেষ হইল। ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিখ্যাত কাটোয়ার উত্তর গঙ্গাতীরের উদ্ধারণপুর প্রসিদ্ধ। হোসেন সাহের রাজত্বকালে তাঁহারই মন্ত্রীগণ সম্মানিত হইয়াছিলেন ও গৌড় লুণ্ঠনের সময় অনেক গুপ্তধন ও ত্রয়োদশ সহস্র স্বর্ণপাত্র হোসেন সাহ লাভ করিয়াছিলেন। রূপ সনাতনের সাকর মল্লিক, দবির খাস ও গোপীনাথ বসুর পুরন্দর খাঁ উপাধি হইয়াছিল। এইরূপে রূপ, সনাতন দুই ভ্রাতাই বিখ্যাত বৈষ্ণব ও মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের দুই হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বঙ্গের সেনবংশীয় রাজারা কর্ণাটের পলাতক রাজপুত্রের বংশ। হর্ষচরিতে উহার উল্লেখ আছে ও গৌড়ের ইতিহাসকার উহা স্বীকার করিয়াছেন। * কথা সরিৎসাগর গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনের দেবসেন নামক রাজার কন্যা দুঃখ লব্ধিকার স্বয়ম্বর কথা আছে ও ঐ দেশের নানা স্থানে ২য় চন্দ্রগুপ্ত ও রুদ্রসেনের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেনেরা সামান্য সামন্তরাজা হইতে উন্নত হইয়াছিলেন। আরও তাঁহাদের সহিত যাঁহাদের রাজবংশানুযায়ী প্রাচীন আচার পদ্ধতির উপরে আসক্তির অভাব হয় নাই তাঁহাদের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা কেমন করিয়া রাজশক্তির প্রভাবে মস্তক নত করিবেন। তাঁহারা দেশত্যাগ করা শত সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর অনুভব করিয়াছিলেন। এইরূপে তাহারা হিন্দুরাজার পক্ষপাতী না হইয়া সপ্তগ্রাম, রাঢ়ে ও উড়িষ্যাদি নানা ব্যবসাকেন্দ্রে চলিয়া গিয়াছিল। উহাতেই স্থানানুসারে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য সঙ্ঘটিত হয়। +

যাবনিক সম্মান— যবনাধিকারের সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জাইগীরসহ মল্লিক, রায়, মণ্ডলাদি উপাধি লাভ করিত ও সুবর্ণ বণিকগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। রাজা রাজ্যবর্ধনের কুলদেব দেবী শিব, সিংহবাহিনী চণ্ডী লক্ষ্মী আদি দেব মল্লিকেরা বংশানুক্রমে পূজা করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান রাজত্বকালে যাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠ উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু পদবী বংশাবলীক্রমে ত্যাগ করিয়াছিলেন। জাতি পদবী অপেক্ষা উহা তখন অধিক মূল্যবান ছিল। কোন মুসলমান উচ্চ কর্মচারীরা তাঁহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিত না। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে হাড়িপা যোগমার্গে প্রবিষ্ট স্বীয় শিষ্য গোবিন্দচন্দ্রকে চারি কড়া সোনার কড়িতে হীরাদারী নাম্নী বেশ্যার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, তখন সোনার কড়ি আদি ব্যবহৃত হইত। ক্রমে জাতি মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যবসায়ী ভিন্ন সকল লোকেরা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বাংলার অধিপতিগণেরও জাতি লইয়া সমস্যা রহিয়াছে। আদিশূরের অস্তিত্ব অনেক ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন না কিন্তু আইনি আকবরিতে তাঁহার নাম ও বংশ পর্যায় বর্তমান রহিয়াছে। উহার উপর ঘটক মহাপ্রভুদের কারিকায় কনৌজ ব্রাহ্মণগণের বাংলায় আগমন হইতে মর্যাদা আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহাকে আইনি আকবরীতে কায়স্থ ও অন্যত্রে বৈদ্য আবার ++ গৌড়ের ইতিহাসকার ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিতে গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বল্লালচরিতে তাহার বংশধর বল্লালকে ব্রহ্মনদ পুত্র বলা হইয়াছে। কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় যে, হেমন্ত সেন সুবর্ণরেখা

---

* ১ম ভাগ পৃষ্ঠা ১২৫   + ১৫৬।৭   ++ ১ম/১৫৭

তীরে, কাশী ও পুরীতে রাজত্ব করিতেন। পরে দক্ষিণ বঙ্গ দিয়া পূর্ববঙ্গাধিকার করেন। ইহার পুত্র বিজয় সেনই গৌড়াধিকার করেন। বল্লাল চরিতে বীর সেনকে সূতপুত্র কর্ণের বংশজাত ও অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে। যাহা হউক, ইহাতে সেকালের রাজাদের জাতি ও বংশ পরিচয় লইয়া এইরূপ গণ্ডগোল, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর অনুমান করা যায় উহাতে বোধহয় যে, তিনি উচ্চ জাতি ছিলেন না। বৃক্ষ ফলের দ্বারা পরিচিত হয়, মানব কার্যের দ্বারা জাতির উচ্চ ও নিম্নতা লাভ করিত, উহার উদাহরণ বিশ্বামিত্রাদি। শুদ্ধ বৈশ্য বল্লভানন্দের কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে না পারায় বল্লাল সুবর্ণবণিক জাতিকে সমাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কলিকাতার খ্যাতনামা মল্লিকদের পূর্বপুরুষ রাজা রাজ্যবর্ধনের বংশাবলি ও অন্যান্য নিদর্শন যাহা কিছু ছিল, কলিকাতার ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অধিকারের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। উক্ত মল্লিকেরা কখন এই উপাধি লাভ করে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ইতিহাসে বড় স্মরণীয় হইয়াছে, সম্রাট ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অবরোধ করিলে সেনাগণের স্ত্রীসমূহের ক্রন্দনে ও ইলিয়াস শাহ ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সেখ রাজা বিয়াবানু নামক সাধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেন ও সম্রাট শিবিরে তাঁহার সহিত আলাপ করেন। শেষে সন্ধি হইয়া যায় উহাতে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। + গৌড়ের ইতিহাসকার বলেন যে, 'মুসলমান রাজত্বের পূর্বেই গঙ্গা, পাণ্ডুয়ার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিল। কালিন্দী নদী যে স্থানে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, তথায় একটি বাণিজ্য বন্দর স্থাপিত হয়, সেখান হইতে পাণ্ডুয়ায় পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হইত। ক্রমে এই স্থান বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠে। ঐ স্থানের নাম ধনবত্তার জন্য মালদহ হয়। মালদহ, পাণ্ডুয়ার সীমা হইতে অধিক দূরবর্তী নয়, ফিরোজ শাহ এই স্থান হইতে ইলিয়াসের সেনাদিগকে তাড়াইয়া দেন।" ++ "পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদারেরা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরদিয়ার মহাধনী উদয়ন কবিকঙ্কণ, বিকর্তন চট্টকে রাজা ও শ্রীরামকে খান উপাধি দান করেন। ইলিয়াস শাহ স্বপক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধি দান করিয়াছিলেন।" সেই সময় উক্ত রাজ্যবর্ধনের বংশধরেরা 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। পাঠান রাজত্বকালে উহা অতি সম্মানের ছিল।

সত্যনিষ্ঠা— সেই সময় মার্কোপোলো বাংলায় আসেন ও তিনি সেখানে নানাপ্রকার খাদ্য ফল শস্যাদি ও পন্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ব্যবসায়ীগণের সত্যনিষ্ঠা ও সততার প্রশংসা করিয়াছেন। * "মুগা ও রেশম মিশাইয়া প্রায় ত্রিশ প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইত। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে এই প্রকার মিশ্রিত উপাদানে বস্ত্রবয়ন প্রণালী মালদহ হইতে ঢাকায়

+ ২য়। ৫৪। ৫৩

++ কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়জীর মন্দির ও মল্লিকের খাল মল্লিকদের জাইগীরের পরিধির মধ্যে ছিল। উহার দলিল কলিকাতায় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর রাজত্বে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মল্লিকদের স্থাপিত দেব মন্দির ও সেবাব ব্যবস্থা বর্তমান ও তাহাদের কৃত খাল স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

§ গৌড়ের ইতিহাস ২য়। ৫৫ পৃষ্ঠা। ঐ ৫৪।

* Tavernier's Travels, Vol. I. page 77.

প্রবর্ত্তিত হয়, এইজন্য উহার সাধারণ নাম মালদহ।" ট্রভারনিয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ বৃত্তান্তে সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা উল্লেখ আছে। কৃষ্ণদাস পিতৃদত্ত নামাপেক্ষা সত্যবাদি নামেই সর্ববিদিত ছিলেন। ভ্রমণবৃত্তান্তে পিতৃদত্ত নামোল্লেখ নাই। যেমন যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু নামেই পরিচিত ছিলেন।

Shaista Khan having completed the years of his government, according to the custom of the empire of the Great Mogul, and Aurangzeb, son of Shah Jahan, having succeeded him, he withrew to Agra, where the court then was. One day, when he conversed with the King, he said that he had seen many uncommon things in all the Governments with which his Majesty had honoured him, but one thing alone surprised him, which was to have discovered a rich merchant who had never told a lie, and who was upwards of seventy years old. The King surprised on his own part with so extraordinary a fact, told Shaista Khan that he desired to see the man of whom he had told him, and ordered him to send him forthwith to Agra, which was done. This much distressed the old man, both on account of the length of the road, which is from twenty five to thirty days and because it was necessary for him to make a present to the king. In fact, he made him on valued at 40,000 rupees, and it was a gold box for keeping betel, ornamented with diamond, rubies, and emeralds. After he had saluted the King, and had made his present to him, the King merely asked his name, to which he replied **that he called himself the man who had never lied**. The King asking him further what his fathers name was : "Sir", replied he, "**I know not**." His Majesty, satisfied with this reply, stopped there, and, not desiring to know more, ordered them to give him an elephant, which is a great honour, and 10,000 rupees for his jurney."

অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের নিয়মানুসারে সায়েস্তা খাঁর তিন বৎসর দাক্ষিণাত্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার কার্যকাল সমাপ্ত হইলে, আরঙ্গজেব তাঁহার স্থানে সম্রাটের পুত্রকে নিযুক্ত করেন। একদিনে সায়েস্তা খাঁ আগ্রায় সম্রাটের সহিত কথোপকথনে বলেন যে, তাঁহাকে সম্রাট যেখানে কর্মোপলক্ষে রাখিয়াছিলেন সেখানে অনেক অসাধারণ বস্তু দেখিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেবলমাত্র একটি ঘটনায় সর্বাপেক্ষা তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ীকে দেখিয়াছেন, যে জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই, তাঁহার বয়স সত্তরেরও অধিক হইবে। সম্রাট অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া সায়েস্তা খাঁকে বলেন যে, তিনি সেই ব্যবসায়ীকে দেখিতে ইচ্ছা করেন ও তাঁহাকে অবিলম্বে আগ্রায় পাঠাইবার, আদেশ দান করেন। উহাতে সেই বৃদ্ধ ধনী ব্যবসায়ীটি অত্যন্ত বিপদগ্রস্থ হন, কারণ তাঁহাকে ২৫ হইতে ৩০ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া সম্রাটকে উপঢৌকনাদি প্রদান করিতে হইবে। তিনি যথাসময়ে সম্রাট সন্নিধানে উপনীত হইলেন ও সম্রাটকে একটি ৪০ হাজার টাকা মূল্যের হীরা, মণি ও পান্না খচিত তাম্বুল পাত্র উপহার প্রদান করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তরে বলিলেন যে, "সে ব্যক্তি কখনও মিথ্যা বলে নাই," এই নামেই তিনি বিদিত। সম্রাট তখন তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, উহা তিনি জানেন না। সম্রাট

তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর অন্য কোন প্রশ্ন করেন নাই। সম্রাট তাঁহাকে প্রভূত সম্মান নিদর্শন স্বরূপ একটি হস্তী উপহার এবং তাঁহার পাথেয় ১০০০০ দশ হাজাব টাকা দিতে আজ্ঞা করেন। এই সত্যবাদী ব্যক্তির অনুসন্ধানের মূল কারণ ভ্রমণকর্তা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন নাই। প্রবাদ যে, উহাকে সম্রাট তাঁহার বহু মূল্য আমদানি দ্রব্যাদির মূল্যের উপর করাদায় করিবার ভারার্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং উহা না করিয়া নেহাল চাঁদ দত্তের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন ও তিনি ঐ কার্য করিতেন। টেভানিয়ার সেই কথা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এইরূপ দিয়াছেন। সম্রাট কোন হীরা পান্নাদি দর্শন করিলে পর কোন আমীর ওমরাও জ্ঞাতসারে ঐ প্রস্তরাদি ক্রয় করিতেন না। তদ্ভিন্ন সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত তিন জন বিশেষজ্ঞ যখন ঐ প্রস্তরাদির বিষয় পরীক্ষা করিতেন তখন যে কোনও ব্যবসায়ীকে প্রস্তর সকল তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইতে হইত এবং ঐ স্থানে ঐ ব্যবসায়ীর অনেক ঐরূপ বেনীয়ানের সাক্ষাৎ ঘটিত, যাহাদের মধ্যে কেহ হীরার বিশেষজ্ঞ, কেহ বা পান্নার বিশেষজ্ঞ এবং কেহ বা মণির বিশেষজ্ঞ অথবা মুক্তার বিশেষজ্ঞ, যাহারা প্রত্যেক দ্রব্যটির ওজন ও অপরাপর বিশেষত্ব লিখিয়া লইত। পরে যখন ঐ ব্যবসায়ী কোন আমীর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট উহার কোনটি বিক্রয় করিতে যাইত, সেই পূর্বোক্ত বিশেষজ্ঞেরা তাঁহার নিকট উহার প্রত্যেক দ্রব্যটির বিশেষত্ব ও মূল্য সম্বলিত একটি তালিকা পাঠাইয়া দিত।

"It is that after the King has seen any stones, a prince or other noble who knows of it will never buy them, and besides, while these three men appointed to view the jewels are considering and examining them in their dwellings, where he is obliged to carry them, he meets several Banians (two persians and a banian Nehal Chand) who are experts, some for diamonds, others for rubies, for emeralds, and for pearls, who write down the weight, quality, perfection, and colour of each piece. And if the merchant afterwards goes to the Princes and Governars of provinces, these people send them a memorandum of all that carries the price."*

হর্ষচরিতে পুষ্পভূতিই সম্রাট হর্ষবর্ধনের আদি পুরুষ উক্ত আছে তদনন্তর মধুবন তাম্র ফলকানুসারে এইরূপ —

* Tavernier's Travels. Vol I page 136
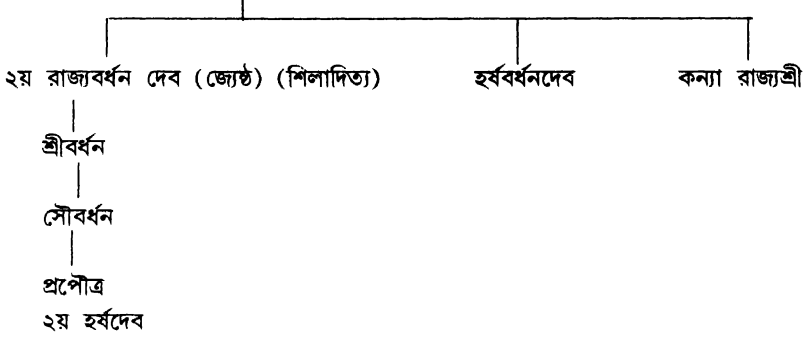
"গৌড় রাজমালা ১৩ পৃষ্ঠায় "হর্ষ স্বীয় তাম্রশাসনে আপনাকে পরম মাহেশ্বর বা শৈব বলিয়াছেন।" তাঁহার ও রাজ্যবর্ধনের অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আজও মল্লিক বংশে কুলদেবীর সহিত পূজিত হয়। তারানাথ বলেন, "উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের বিভিন্নাংশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য পার্শ্ববর্তী ভূ-ভাগ আপন আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না।"

হর্ষচরিতে আফসড় প্রস্তর ফলকে ও নৈসরি দানপত্রে দেব উপাধি বর্তমান আছে। হর্ষের মুদ্রাতেও দেবীমূর্তি আছে। রাজ্যবর্ধনের বংশধর দেব উপাধি দেবী আদি কুলদেবীর পূজা ও তুলা দান করে এবং আজও বিবাহের সময়ে মল্লিকাবংশে সেই প্রাচীন বৈশ্যের উষ্ণীয় আয়বৃদ্ধ্যন্নের সময় ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহারা পাঠান রাজত্বকালে 'মল্লিক' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহাদের বংশতালিকা এই গ্রন্থের পূর্বোক্ত ব্যক্তি বিশেষের পরিচয়ের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

কলিকাতার ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অগ্নিতে দগ্ধান্ত বিখ্যাত শ্রীশ্রী ˚সিংহবাহিনী সেবাধিকারী দেব মল্লিক বংশাবলি ঃ—

˚বনমালির পুত্র বৈদ্যনাথ তাঁহার পুত্রই উল্লিখিত সত্যবাদী কৃষ্ণদাস মল্লিক তাঁহার পুত্র রাজারামই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপদেষ্টা ও তিনিই কলিকাতাব প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির সূত্রপাত করেন।
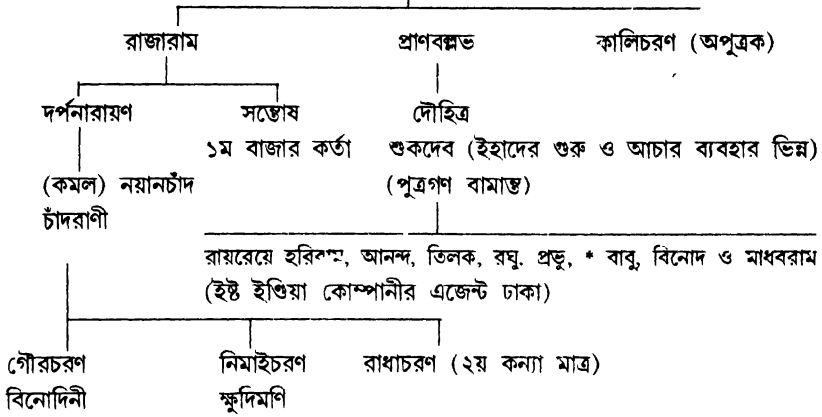
উক্ত কৃষ্ণদাসের ত্রিবেণী অন্নছত্রে দরিদ্রেরা আহার ও অবস্থান করিতে পারিত, তিনি বল্লভপুরে মন্দির করিয়াছিলেন উহা এখন নদীতীরে ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান, বংশধরেরা নূতন মন্দির করিয়াছে। উহা গঙ্গাগর্ভে পড়িবে এই ভয়েই উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিখ্যাত কবি সাদি বলিয়াছেন যে, ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন উচ্চ বংশের পরিচয় বংশধরগণের কার্যকলাপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদনুসারে মল্লিকবংশ যে রাজা রাজ্যবর্ধনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতে পারে উহা মল্লিকবংশের দান-ধ্যান ও ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বংশানুক্রমে বিখ্যাত হইয়া আছে। ইহাদের বংশ পরিচয় সেইজন্য ব্যক্তি বিশেষের নামের দ্বারা করা হয় না। কৃষ্ণদাস তাহার দান ধ্যান, সত্যকথা ও সততার জন্য যেমন বিখ্যাত, তেমনি তাঁহার বংশধরগণও বিদিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহই কাহারও দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, কেবল শুকদেব ও তাঁহার বংশধরেরা উহা করিয়াছে, সেইজন্য তাঁহারা দৌহিত্র সন্তান বলিয়া বোধ হয়। আরও শুকদেব নয়ান চাঁদের সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং দৌহিত্র ভিন্ন দর্পনারায়ণের ভ্রাতা হইয়া তাঁহার পুত্রের সমসাময়িক হইতে পারেন না; নয়নচাঁদের নাম কমলনয়ান ও তাঁহার নামে ঘাট ছিল।

রাজারামই জব চার্ণককে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন ও তদনুসারে তিনি কার্য করিয়াছিলেন ,রাজারাম সপরিবারে কলিকাতায় আসেন ও তাঁহার পুত্রেরাই কলিকাতায় বাজারাদি করিয়া সর্বতভাবে উহার উন্নতি করেন। নয়ানচাঁদ কমলনয়ান বলিয়া ছিয়াত্তরের মন্বান্তরের সময় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ও শুকদেব পলাশী যুদ্ধের পর কলিকাতা ধ্বংসের ক্ষতি টাকা বিলির সভার তের জন সভ্যের মধ্যে দুই জন পূর্বে ছিলেন। এই সকল ক্ষতিপূরণের কথা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। সপ্তগ্রামে শ্রেষ্টিচত্বর ও বেনেপাড়ার কথা এখন সেখানকার কৃষকগণ বলে ও স্থান দেখাইয়া দেয়। গ্রন্থকর্তা সেই সকল স্থান খনন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু গভর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষগণ এখনও পর্যন্ত কোন মনযোগ

* প্রভুরাম ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেন্টের বোরলেষ্ট সাহেবের এজেন্ট ছিলেন।

করেন নাই। বিখ্যাত দাতা ব্যবসায়ী ও মহাজন নিমাইচরণের কথা পরে যথাস্থানে বলা হইবে। গ্রন্থকর্তা স্বর্গত *নিমাইচরণের প্রপৌত্র, তাহার পিতা *যদুলাল কলিকাতার বিখ্যাত দেশহিতৈষী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও পিতামহ মতিলাল দান ধ্যান সত্যবাদিতার জন্য বিখ্যাত এবং প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সভার সভ্য ছিলেন। উক্ত মল্লিক বংশের অনেকেই অর্থদানাদি ক্রিয়া-কর্মে ও গৃহাট্টালিকায় এবং দেশের ও দশের হিতকর কার্য দ্বারা কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।
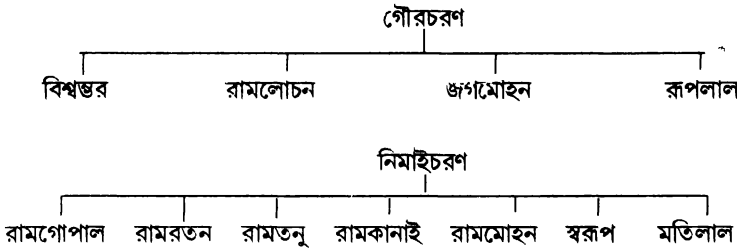
উড়িষ্যার সহিত বাংলার সম্বন্ধ ষ্টারলিং প্রভৃতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় ও পুরীর জগন্নাথের নিত্যভোগের জন্য নিমাইচরণ প্রত্যহ অর্থ দান ও মাহেশ বল্লভপুরের উক্ত দেবতার মন্দিরাদি নির্মাণ ও ভোগের সহায়তার জন্য কায়েমি বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাতৃ বা রাজার সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। আরও ইহাদের কুটুম্ব মহারাজা সুখময় নিজ ব্যয়ে পুরীর রাস্তা করিয়াছিলেন।

---

* ইহাদের নামে বৈষ্ণবতার পক্ষপাতী দৃষ্ট হয় ও সেই সময় হইতেই বোধ হয় খড়দহের গোস্বামীগণের শিষ্য হন।

বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ব্যবসা

পূর্বোক্ত মালদহের ইংরাজী বাজারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মল্লিক বংশের পূর্ব পুরুষের সাহায্যে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশে কিরূপে ব্যবসা, বাণিজ্য করিতে হয়, উহা শিক্ষা লাভ ও উহা আরম্ভ করে। রাজা মুকুন্দদেব যে, শৈলবংশ উদ্ভূত উহার প্রধান প্রমাণ যে, তিনি বঙ্গাধিকার করিয়া ত্রিবেণীতে পাকাঘাট ও রাস্তাদি করিয়াছিলেন। মালদহের নিকট দিয়া এক সময়ে গঙ্গা প্রবাহিত হইত, সেকালে নদী-প্রধান স্থানেই বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ছিল, কারণ তখন নৌকাদিতে ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যাদি যাইত। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মোগল ও বর্গীর আক্রমণে হতভাগ্য বাংলাদেশ বিপর্যস্ত হইতেছিল। কর্ণেল মালিসন লর্ড ক্লাইবের জীবন চরিতে Oudh-র নবাব উজীরের মুখ হইতে সেকালের অবস্থা ও কলিকাতার উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, উহা উল্লেখযোগ্য ঃ—

"He had observed, he stated, that whenever the English established a footing in a country, even thougth it were only by means of a commercial factory, they never budged from it, their countrymen followed them; and in the end they became masters of the place. He then pointed out how, in nine years the small factory of Calcutta had absorbed the three provences and was now engaged in swallowing up places beyond their border. He would not, he finally declared, submit his dominions to the same chance. Clive wisely gave way on that one point."

অর্থাৎ যেখানেই ইংরাজ কোম্পানী কুঠি কারবার খুলিয়াছে সেই স্থানই তাহারা করায়ত্ত করিয়াছে। উহার উদাহরণ, কলিকাতায় তিনি নয় বৎসর কাল থাকিয়াই তিনটি দেশ উদরস্থ করিয়াছেন, উহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই উহার আশ-পাশের জমি জায়গাও দখল করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধিকৃত স্থানে উক্ত কোম্পানীর কুঠি বা কারবার করিবার সুযোগ দিবেন না। ক্লাইব বুদ্ধিমানের মত উহাতে সম্মত হন।

ইহাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখনকার নবাবেরা ইংরাজ ব্যবসাদারদের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তখন দেশে সকলেই স্ব স্ব রাজ্য রক্ষা করিতে বিব্রত ছিল। সকলেই ইংরাজের সহায়তায় উহা করিতে উৎসুক। সুতরাং উহাই ইংরাজ কোম্পানীর সৌভাগ্যোদয়ের মূল কারণ। ভগবান যখন সহায় হন, তখন সুযোগ যেন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সম্বন্ধে পূর্বোক্ত গ্রন্থকর্তা যাহা বলিয়াছেন উহাতে ক্লাইবের দেওয়ানি প্রাপ্তির কারণোল্লেখ আছে।

"At Chapra in Bihar, Clive met the Nawab Wazir, the representative of Shah Alam, agents from the Jat chiefs of Agra and others from the Rohilla chiefs of Rohilkhand. The avowed purpose of the meeting was to form a league against Maratha aggression, it having been recently

discovered that the people had entered into communications with Shah Alam for the purpose of restoring him to his Throne. Then it was , that the question of the English frontier was discussed. It was eventually agreed that one entire brigade should occupy Allahabad to protect that place and the adjoining district of Karra; that a strong detachment of the second brigade should occupy Chunar; two battalions Benares, and one Lucknow. On his side the Emperor granted firmans bestowing the three provinces upon the East India company 'as a free gift' without the association of any other person subjuct to an annual payment to himself and successors of Twenty six lakhs of rupees and to the condition that the Company should maintain an army for their defence. On the 19th May following the Subahdar of the three provinces died. The arrangements made by Clive had deprived the position of all political importance. The individuality of the person holding that once important office was, therefore, of little importance. * * * In the eyes of the world of India, the three provinces were to continue a subah, administered by a Subahdar. The control of the English was to remain a matter for arrangement with the actual ruler, their real power only to be prominently used when occasion might require, and then, likewise in the name of the Subahdar."

অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের সুবেদারকে ধোঁকারটাটি স্বরূপ বর্তমান রাখিয়া দেশবাসির চক্ষে দেশের কর্মকর্তার কোন পরিবর্তন করা যুক্তিযুক্ত নয় ঠিক করিয়াছিলেন, তবে যখন আবশ্যক হইবে, তখনই কোম্পানী আসল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। ইহার সার মর্ম এই ছিল।

ক্লাইব শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন ও দেওয়ানি লব্ধ দেশগুলির রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য রক্ষা ও সেই সকল দেশের নবাব বাদশার খরচায় উহা করিতে লাগিলেন। তিনি কেন তখন দিল্লির শূন্য সিংহাসন অধিকার করেন নাই, সেকথা ক্লাইব এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই বিলাতের কর্তপক্ষগণকে যাহা জানাইয়াছিলেন; উহা উদ্ধৃত করা হইল।

" Our possessions should be bounded by the provinces. We should studiously maintain peace; it is the groundwork of our prosperity. Never consult to act offensively against any power exception defence of our own, the Kings or the Nawab Wazir's dominions, as stipulated by treaty, and, above all, be assured that a march to Delhi would be not only a vain and fruitless project but attended with destruction to your own army, and perhaps put a period to the very being of the Company in Bengal."

অর্থাৎ তখন দিল্লি অধিকাব করিতে গেলে ইংরাজ কোম্পানীর সৈন্য সামন্ত ত ধ্বংস হইবেই, অধিকন্তু যাহা কিছু লাভ হইয়াছিল উহা সমস্তই হারাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব বলেন যে; ইংরাজেরা বাংলা, বিহাব ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিয়া উহার সীমান্তদেশ সৈন্যসামন্ত দ্বাবা বেড়া বাঁধিয়া ওত পাতিয়াছিল।

" The English were to lie sighly ensconced in the three provinces of Bengal, Bihar and Orisa The frontier of Oudh was to form a permanent

barrier against all further progress."

এইখানে আর এক কৌতুকাবহ ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। নবাব মীরজাফর লর্ড ক্লাইবকে তাহার উইলে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ তিনিই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর কোন কর্মচারী এতদ্দেশীয় কাহারও নিকট হইতে কোন উপহারাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অগত্যা ঐ টাকায় তিনি যে, আপনার নামে দাতব্য ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন, উহা কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অধিপতি লর্ড ক্লাইবের বংশধরকে প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার জলবায়ুতে বা লড়াই-এ যে সকল কোম্পানীর কর্মচারীরা অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে, তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য ঐ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। অতএব ক্লাইবকে কলিকাতার পৃষ্ঠপোষক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১লা জানুয়ারির ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব ডবল ভাতা দেওয়া রহিত করায় তদ্বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য কোম্পানীব কর্মচারীরা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছিল। যাঁহারা ক্লাইবের যশ-কীর্তি মুখরিত করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার শত্রু হইয়া কি বিলাতে, কি এদেশে, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। আর সেই সময় সীমান্ত এলাহাবাদ কোরায় মারাঠারা ষাট হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণপূর্বক উহা গ্রহণ করিবে গুজব উঠিয়াছিল। সেই সময় ক্লাইব কিরূপে সেই বিদ্রোহ শান্তি করিয়াছিলেন উহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অতি সংক্ষেপে করা উচিত।

মুঙ্গেরে হিন্দুস্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহী ইংরাজ সেনাধিনায়কগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিল। এ সময় কাপ্তেন স্মিথ ক্লাইবের বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল। বিদ্রোহী সেনাধিনায়কগণকে কলিকাতায় বন্দি স্বরূপ পাঠান হইয়াছিল। ক্লাইবের জীবনচরিতকার এ বিদ্রোহ শান্তির কথায় ক্লাইবকে নেপোলিয়ানের তুলনা করিয়াছেন।

* " No sooner did Clive heai of the combination than instead of waiting to be attacked, he seized the initiative, the mutineers allowed him to strike the first blow, standing on the defensive in their insolated position, they gave the opportunity to Clive to destroy them in detail. It was the action which Napoleon employed against the Austrians in 1796, 1805 and 1809."

২৯এ জানুয়ারি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটানিয়া নামক জাহাজে ক্লাইভ কর্মত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৭ই মে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেন্ট লর্ড ক্লাইবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ও তিনি উহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তাহার ইহলীলা সমাপ্ত করিয়াছিল।

বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা লর্ড ক্লাইবের অক্ষয় কীর্তি। রাজত্বের সহিত জাতীয় ব্যবসার উন্নতি সাধন করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল একথা বলা অত্যাবশ্যক। ক্লাইব বিলাতে চলিয়া গেলে কোম্পানীর কর্মচারীরা যথেচ্ছাচারী ও পূর্ববৎ নিজমূর্তি ধারণ করিয়াছিল। কি ভেরিলষ্ট, কি কার্টিয়ার, কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে রীতিমত শাসনে রাখিতে পারেন নাই। সেকালের অবস্থার কথা যাহা কাপ্তেন ট্রটার ওয়ারেন হেস্টিংসেব জীবন চরিতে উল্লেখ করিয়াছেন উহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

+ " Even since Clive's return to England, the Company's affairs in Bengal had been falling back into their old disorder under the weak rule of Verelst and Cartier The rich provinces won by Clive's sword and further secured by his deplomacy had been left in the hands of

* Ibid p 189. + Captain Tortter's Warren Hastings p. 52

Native Administrators whose agents pleased their own countrymen in the name of a pensioned Sovereign living in idle state at Murshidabad. An army of Faujdars, Amins, Sardars and such like gentry, preyed like parasities on the people and fattened on the revenues designed for the Company's use.

The English 'supervisors' appointed in 1769 to check these abuses and to look after the Company's interest, were in Hasting's own words 'the boys of the service' who made themselves rulers, very heavy rulers of the people. Against the mischief caused by their ignorance or their greed, the Board of Revenue at Murshidabad was too weak or too dishonest, to make much headway. Within the Calcutta Council things were no better. Clive's Reforms had fallen on barren soil. Every Councillor did that which seemed right in his own eyes ---from the money-grabbing point of view. The Company's servants traded, bargained and took bribes as freely as they had done in the days of Vansitart. The golden age which Clive had promised after his return home was realised only by the gentle-men who were making their fortunes at the Company's expense, and by a number of native agents, officers, and landholders who throve upon the robbery and speculation that played havoc both with the trade and the revenue of Bengal. In 1770 the year the Cartier succeeded Verelst, broke out the terrible famine which slew more than a third of the people in Bengal and turned large tracts of fertile country into tigerhunted jungle. Meanwhile, the Company itself was borrowing money for immediate needs, and was paying in other ways the full penalty of its transformation into a political power. Amidst seeming riches, so great was its actual poverty that the Directors asked for a loan from the British Exchequer. The loan which saved them from impending bankruptcy, was granted in 1772, only on condition that the Company should pay the Nation 400000 Pounds a year for the privilege of holding a few years longer the Dominions, won by treaty from the Emperor of Delhi."

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই দাঁড়ায় যে, কোম্পানীর কর্তব্যপরায়ণ কর্তপক্ষ ও কর্মচারীগণের কৃপায় কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে ঋণ প্রাপ্ত না হইলে উক্ত কোম্পানীকে তখনই দেওলিয়া গ্রহণ করিতে হইত। তজ্জন্য কোম্পনীকে বাধ্য হইয়া বার্ষিক চার লক্ষ পাউণ্ড বিলাতের রাজকোষকে কর দান করিতে হইয়াছিল। বিলাতের সকলই কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, কারণ তাহারা এদেশ হইতে যে অর্থ লইয়া যাইত তাহাতে তাহারা বিলাতে গিয়া নবাবী করিত ও সেই নামে সকলেই অভিহিত হইত।

* " The tide of popular feeling ran very strong against the whole class of Nabobs, who laden with the spoil of India Service, were buying their wav at all costs into the house of commons and eclipsing the ancient splendour of the highest and wealthiest country lords."

---

* Ibid p 53-54

লর্ড ক্লাইব যে কেবল বাংলায় নির্বিবাদে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, উহা নয় বিলাতের পার্লামেন্টেও কোম্পানীর সভায় তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। বিলাতের মন্ত্রী লর্ড পিটকে বাংলা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অনেক পরামর্শ দান ও উহা কার্য্যে পরিণত করাইয়াছিলেন এবং ১০ই ফেব্রয়ারী ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির বিরুদ্ধে তিনি ভোট দিয়াছিলেন। ক্লাইবই যুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর সভার সভাপতি মি. লরেন্স সলিভানকে ঐ পদ হইতে পদচ্যুত করিয়াছিলেন।

+ ' He proceeded to declare that it would be impossible for him to proceed to India leaving behind him a hostile Court and a hostile Chairman, that at least the existing Chairman must be changed. He carried the proprietors with him and measures were taken for a fresh election. This election took place on the 25th April 1764. At it all the candidates proposed by Mr. Sulivan were defeated, he himself being returned by majority of one only. The Chairman and Deputy Chairman elected were both supporters of Clive."

ক্লাইব শেষ বার কলিকাতায় আসিবার সময় তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। তিনি তাঁহার সন্তান সন্ততির পাঠের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত তাঁহাকে বিলাতে রাখিয়াছিলেন। ক্লাইব তাহার মনোনীত ভান্সিটার্টকে বিলাতের রাজাকে উপহার দিবার জন্য হস্তী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভান্সিটার্ট কিন্তু উহা ক্লাইবের নামে না পাঠাইয়া আপনার নামে পাঠাইয়াছিলেন। ক্লাইব বাংলার কাহাকেও আপনার পদে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ভান্সিটার্টকে মাদ্রাজ হইতে আনাইয়াছিলেন। তিনি উহার প্রত্যুপকার কি সুন্দররূপে দান করিয়াছিলেন উহা পূর্বোক্ত ভিন্ন অনেক ঘটনায় প্রকাশ হইয়াছিল। ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইতিহাস সেই কলঙ্ক ভান্সিটার্টের নামে কীর্তন করিয়াছে। মীরকাসিমই লবণের একচেটিয়া ব্যবসা দেশের সর্বনাশ করিয়াছে সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন ও ক্লাইবই উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। উহাতেই মীরকাসিমের সহিত ইংরাজ কোম্পানীর বিবাদের সূত্রপাত হয়।

" But when he (Mirkasim) proceeded to alleviate the misery of his people he found that the fatal gift of the Salt Monopoly enabled the English thwart all his effort."

সম্রাট হইতে সামান্য জমিদার সকলেই যখন লোভে হিংসায় অন্তর্বিবাদে জর্জরিত ও দুর্বল, সাধারণে বহুকাল হইতে অরাজকতায় ও ঘোর দুর্ভিক্ষে ক্ষুণ্ণ তখনই ওয়ারেন হেস্টিংস কতকগুলি অর্থলোভী অকর্মণ্য লোকের দ্বারা যে সকল কার্য করিয়াছিলেন উহা তাঁহার বিচারে সবিশেষ আছে। কে কেমন লোক ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদের সহিত কার্য করিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন, তবে যুক্তি বিচার ও তথ্যানুসন্ধান দ্বারা যতদূর নিরপেক্ষভাবে করা যায় উহাই করা হইল। তাঁহার প্রথম গভর্নর জেনারেলীর কথা কিছু বলা হয় নাই। যথাস্থানে তাহা বলা হইবে।

জর্জ ফরেষ্ট সাহেব তাঁহার Selection from the letters. Despatches. and on the State papers নামক গভর্নমেন্ট অনুগৃহীত সংগৃহীত গ্রন্থে ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশের ব্যবসা সম্বন্ধে যাহা কিছু করিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

" The Exggerated charges of Burke against Hastings have left a stain. not only on the character of the man who founded our Empire. but on the Nation whose minster he was. To the eloquence of Burke

---

+ Col. Malleson's Clive p 56.

was first due the impression that our Indian dominion was founded by enormous crimes."

" Hastings recognised the Economic principle which Adam Smith put forward a few years later that the first interest of the sovereign of a people is that their wealth should increase as much as possible and he was practically impressed with the necessity for its application in a country like Bengal, where revenue is derived from the land rent. When he became Governor, the foreign and domestic trade of the province had almost perished on account of the revival of the old trade abuses which Clive had destroyed. A chief part of the revenues consisted of duties imposed on the transit of goods but the servant of the Company attempted themselves from paying them. Hastings formed a new plan for collecting customs. Hastings determined, therfore, to establish the system of ready money purchases, and to declare the weavers free to work for whom they will and to support them in that freeom. He wrote to a friend :--- " The company and their collectors and chiefs of factories are the only merchants of the company; they force advances of money on the weavers and compel them to give cloths in return, at an arbitrary valuation. which is often no more than the cost of the materials, so that the poor weaver only lives by running in debt to his employers, and thus becomes their slaves for life. The collectors trade with the money which they get in the districts, which affects the circulation as well as commerce of the country."

অর্থাৎ হেস্টিংসের সময় এদেশের যাবতীয় ব্যবসা সমস্তই কোম্পানীর কর্মচারীরা জবরদস্তি করিয়া আপনাদের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিল। এদেশের কৃষক, শিল্পী খরিদ দামে জিনিস বিক্রি করিতে বাধ্য হইত ও তাহারা আজীবন মজুরী পাইত না ঋণ গ্রহণ করায় ক্রীতদাসের মত কার্য করিয়া যাইত। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ আডাম স্মিথের মতে রাজার প্রথম কর্তব্য কর্ম হইতেছে যে, যাহাতে প্রজার ধন সম্পত্তি আদি যতদূর বর্দ্ধিত হয় ও ওয়ারেন হেস্টিংস সেইজন্য নগদ টাকায় দ্রব্যাদি খরিদের ব্যবস্থা করেন ও শতকরা আড়াই টাকা হারে মাশুল আদায় করিবার হুকুম দান করেন। কালেক্টরেরা কোম্পানীর খাজনার টাকা আদায় করিয়া ব্যবসায় খাটাইত। ক্লাইভ যে কিছু সংস্কার এতদ্ সম্বন্ধে করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর পূর্বের মত যাহা যেমন ছিল তেমনই হইয়াছিল। হেস্টিংস তাঁতিকুলকে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার হুকুম জারি করিয়াছিলেন। পরিণাম যে কি হইয়াছিল উহার কোন উল্লেখ নাই। তখন এদেশে মুদ্রানীতি একেবারে ভাল ছিল না। তজ্জন্য ব্যবসার বিলক্ষণ ক্ষতি হইত। কোম্পানী সেইজন্য তাহাদের টাঁকশালে টাকা মুদ্রিত করিত ও উহা বাংলাদেশে চলিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে বহু আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল। সেইজনাই হেস্টিংসের শেষ গভর্নরীর কার্যের সঙ্গে প্রথম গভর্নর জেনারেলীর কার্যের সামঞ্জস্য নাই। উহাতেই উহা স্বতন্ত্র করিতে হইয়াছে। মহামতি বার্ক ওয়ারেণ হেস্টিংসকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন ও জ্বলন্ত বক্তৃতায় প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসিকে তখন লজ্জায় ঘৃণায় কম্পিত করিয়াছিলেন। পরে মিল যুক্তি ও অধ্যবসায়ে ও মেকলে ভাষার ছটায় উহার প্রতিবাদ করিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসকেই ভারতবর্ষে ইংরাজ (ব্রিটিশ) রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন কর্তা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের উপর বিলাতী রাজা ও পার্লামেন্ট সভার কর্তৃত্ব ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলিটিং আইন দ্বারা গভর্নর জেনারেল ও তাঁহার সভার সভ্যবৃন্দের হস্তে, প্রতিনিধি স্বরূপ না হইলেও, অর্পিত হইযাছিল। সে হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংসার মঞ্চের আদিকাণ্ডের যবনিকা পতন হইল।

‘ক’ ক্রোড়পত্র

J. Long's Selection from unpublished records of Government.

No. 217. Court letter March, 25. 1757.

" It has been said that the number of people at Calcutta have of late been greatly diminished. We shall beg to be informed whether this is the case or not. You are, therefore, to make an enquiry into the same, and if you find it so, you are to give us the reasons, according to the best of your judgement for such decrease.

No. 231 Proceedings January 20 A. D. 1757.

" The Board are of opinion that all native and black inhabitants who have not engaged in the service of our enemy during our troubles should be restored to their houses and property found in the place; but as they neglected to secure the outskirts of the town, when they were required to do it or to lend any assistance in the defence of the place, we are of opinion they have forfeited all right and tittle to any restitution of the damages they have suffered."

No. 343 ½ Consultations. April 3.

"Commissioners for examing the estimater of European sufferers, send in a letter to the Board desiring that half the money stipulated by treaty for the Armenians may be taken from them and added or the European forced which will enable them to receive all the Portuguese sufferers as shares in that Fined. Ordered their letter be entered and that the secretary do inform them of the conation made by the Armenian to the Portuguese sufferers of 2 lacs of Rupees, more than which we care not demand, and that if they are willing to examine the Portuguese account. we recommend it to them to do it as soon as possible."

No. 346 Consultation April 17. 1758.

No. 348. Armenians and Greeks object to their accounts being revised by English Commissioners. April 24 1758. No 349. " The Armenian commissioners in contempt of all authority, have not only absolutely refused to bring in their own accounts. but have intimidated as many as they could influence to do the same."

The names of restitution Commissioners :--

Soovaram Bysack, Gobindram Meter, Ratoo Sojar Nelmoney, Nayan Mulick, Durgakishun Salmer, Dayaram Boss, Ramasantos, Durgaram Dutt, Mahamud Sadik, All Boye Ayenoode, Sookdeb Mulick.

No. 359 The Government rejected the petition of Omichand's claim in the restitution money as his house was protected by Nawab's guards & flag and his Jamadar Jagernath conducted the Nawab into Calcutta. His men took part in the plundering of Calcutta.

No. 360 Do. September 18. do.

Abstract of the Thirteen Native Commissioners' Restitution money account :-

		Demands			Deductions.		
		Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.
1	* Gobindram and Rogoo Retre	412680	5	0	37680	5	0
2.	Sooberam Bysack	441278	9	7	66278	9	7
3.	Ally Boye (a native merchant)	34457	0	0	17457	0	0
4.	Rutto Sircar	180322	3	0	40322	3	0
5.	Sookdeb Mullick	50942	8	0	10942	8	0
6.	Nian Mullick	43922	0	0	5922	0	0
7.	Diaram Bose	5153	0	0	1153	14	6
8.	Nilmoney	28113	0	0	10113	0	0
9	+ Hurrikissen Tagoor	13788	2	0	3788	2	0
10	Durgaram Dutt	647	0	0	100	0	0
11.	Ramsantose	6410	0	0	910	1	0
12.	Mohmud Suddock	2716	0	0	1	0	0
13	Ayer Noody						

Total amount of claims of all the twelve commissioners

Sc Rs 1220429 11 7

194669 9 1 after deduction about 16%

Sc Rs. 1025760 2 6 were distributed.

---

* shortly after the capture of Calcutta by Sirajudowla guards were placed upon the house of Gobindaram Mittre, likewise upon his goods and effects lodged in the factory to prevent their being plundered; and the commissioners regarded his demands for restitution as most exorbitant.

+ (In the consultation of the 17th April, Hurrikissen Tagore does not appear and spelling little different.)

লাটপ্রাসাদ
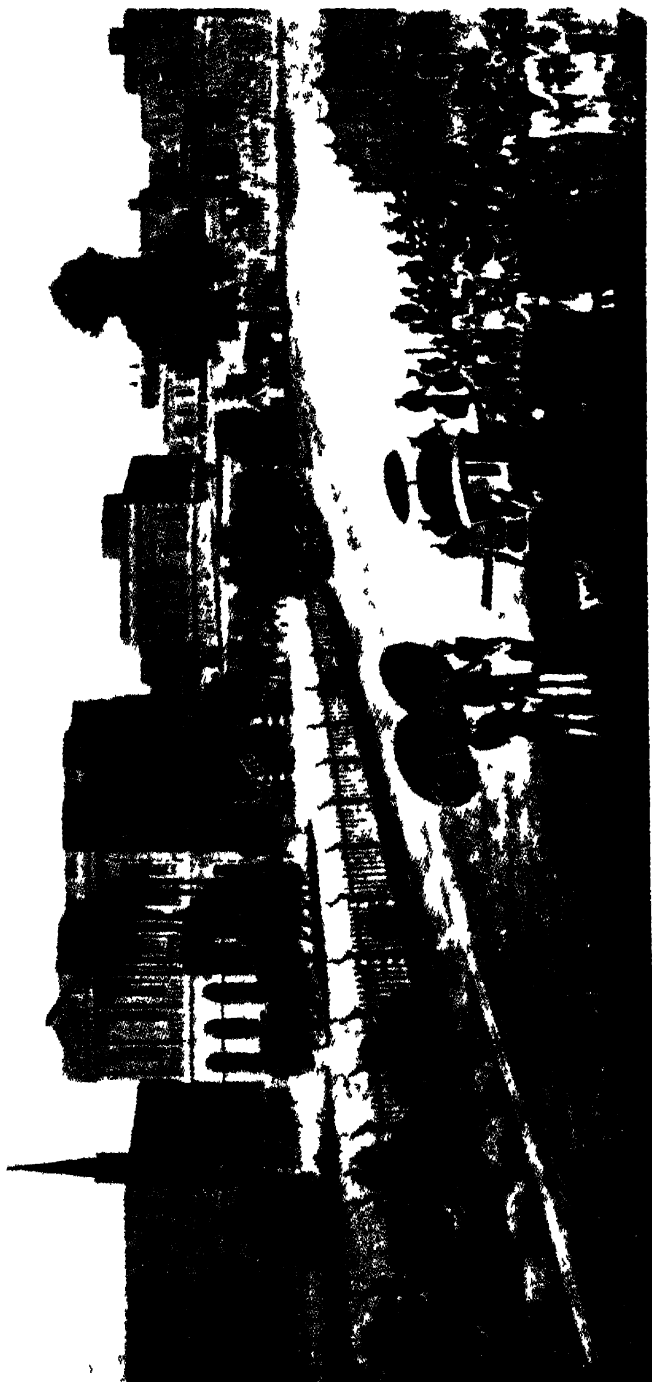
No. 359 Names of those said to be favoured on account of their connections with the native Commissioners.

Names	Demands	Deductions	Allied to or dependant on
Chaithon Doss Sc. Rs.	1702 o o	302 0 0	To Rutto Sircar
Niandos Dobah	1667 5 0	467 5 0	" " "
Birdabund & Tullichand	12395 4 0	2895 4 0	" " "
Dulob Lucky, Cannant Nurry, Churn Bysack	8233 11 0	1233 11 0	To Sobharam Bysack
Rajaram Palit	4215 12 0	1015 12 0	" Do Do
Gungaram Dutt Patee	2513 2 0	513 2 0	" " "
Gope Churn Bysack	4056 6 6	1056 6 6	" " "
Ranasaran Sircar	1114 4 0	240 4 0	" " "
Radacond Roy	876 12 0	176 12 0	" " "
Brojokissore Imona	2198 4 0	698 4 0	" " "
Gonas Bose	1517 1 0	317 1 0	" " "
Boncharam Sircar	646 0 0	96 0 0	" " "
Curoy Biswas	5983 4 0	1983 4 0	Gobindra Mittra's Cooly
Ramkisore Chakraberty	1421 0 0	421 0 0	His Dependant
Durgaram Bedsonga	3091 0 0	519 0 0	" "
Do Surmat	532 15 0	132 15 0	" "
Lillmoney Chandree	710 4 0	160 4 0	" "
Hurryram Ghose	390 8 0	90 8 0	To '
Lakhicond Ghose	319 10 0	-------	" "
Ramdeb Mittre	7313 8 0	1313 8 0	To Mittra, (But died in 1747)
Sookdeb Mittre	2380 4 0	380 4 0	" " " 4 Years
Ruttorn	3152 4 0	652 4 0	Mistress to above Mittra
Lollta	2419 10 0	419 10 0	Do Do
Hutty Roon	3577 12 0	577 12 0	Do Do.
	Rs. 73453 120	Rs 15733 10 0	

No. 354 Complaints from the Black inhabitants of the Gentoo Commissioners Consultations July 3 1758 :-- ordered Messrs Rider, Johnstone and senior to enquire into the truth of these allegations and report to board if they find any ground for such complaints .

They found the complaints against the Black Commissioners on the part of the poor almost universal and found themselves brought in contact with the principal black inhabitants equally eminent in unjust proceedings. Those black commissioners did not require vouchers, scarcely one agreed to the method of examining accounts.

" Ramindu Banerjee, a writer to the Committee declares to us that Gonas Bose, who is likewise a writer, did in the presence of himself and others, desire of Nilmoney, one of the commissioners and secretary, to pass his account without deduction, informing him that it amounted to about Rs. 1200 to which Nilmoney replied it was not customary and he could not pass it more than Rs. 800 but recommended it him to alter his account to about Rs. 1500 which was accordingly done and the accounts passed afterwards Rs. 1200 agreeable to the first request of Gonas Bose."

" Sobharam Bysack got a large sum of money without sending in any acoount at all. False names were forged, many were required to sign the English copy ! If they expressed dissatisfaction in signing the Bengali, they were told they had already acknowledged in the English copy recording the money ! Sobharam Bysack, one of the commissioners, said if they passed the accounts of the poor for full sums, what would remain to them, the rich Gobindram Mittre sent in a demand for Rs. 3600000 for what was valued in the Government books at Rs. 600000/ "

No. 421. (3rd Sept 1759) that some part of your Petitioners being now labouring under the greatest hardship and trouble imaginable by reason most of your Petitioners having large families and without one single rupee to help or support themselves unless they sell some of their things or goods for half value; that others being indebted to sundry persons on account of sums we have taken up and borrowed from time to time and which persons are daily vexing and harrassing your Petitioners for their demands and which if not complied with they threaten to throw your petitioners into a jail; your petitioners, therefore, most humbly pray your honour U. Counceil will be pleased to order further dividend of your Petitioners' restitution.

No 424. Armenian petition to Lord Clive regarding an armenian woman brought as a slave from the Persian Gulf (October 22, 1759). The Government was investigating a charge made against a Lt. Perry of unlawfully buying and Armenian girl and taking her to Patna.

তখন নবাবের দান গ্রহণের জন্য কলিকাতার কি ইংরাজ, কি গ্রীক, কি আরমানি, কি মুসলমান, কি বাঙালী সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, হায়! অর্থই তখন সকলের উপাস্য দেবতা হইয়াছিল!!!

'খ' ক্রোড়পত্র

* On the 2nd July, 1757 Colonel Clive thus addressed the Hon'ble George Pigot Esq President & the members of the select Committee of the Fort St. George.

Gentlemen,— Sometime since I acquiainted the president by a letter despacted under a Dutch Cover, of the necessity there was to overset Surajoh Dowlah. I have now the happiness to inform you the great event is completely brought to an end. He still delays under different pretences to fulfil the grand points of the treaty such as delivering us the villages making good the Calcutta balance and admitting the currency of our siccas, at the same time we found him designing our ruin in conjunction with the French, pressing invitations were sent to Monsicur Buccy to come into the and Monsieur Low's party (then in his pay at Rs. 10000/- per month) was ordered to return from Patna of all which we had certain knowledge by authentic copies of his own letters. At the junction some principal officers of his army made overtures to us, at the head of whom Jaffer Ally Cawn, who had long been busy and was a man who was generally exteemed by everyone as the other was deserted. We soon entered into a private treaty to make him Nabab and having prepared everything with the utmost secrecy the army consisting of 1000 Europeans & 2000 sepoys with 8 eight pieces of cannon marched from Chandernagore on the 13th in the morning & arrived on the 18th at Patna Front which was taken without opposition on the 22nd. In the evening we crossed the river, and landing on the island, marched straith for Plassy where we arrived by one O'clock in the morning. At day break we discovered the Nabab's army consisting of about 1500 horses and 350000 foot with upwards of 40 pieces of cannon moving towards us. They approached a place. and by six began

* Mr. Charles A Lawson is publishing in the "Madras Daily News" a selection from the records of the Government of Madras. It is well known that the Madras record room contains many papers relating to Bengal and despatches by men like Clive and the Duke of Wellington not to be found in Bengal.

the attack with a number of heavy connon, supported by the whole army and continued to play upon us very briskly for several hours, during which our very advantageous situation saved greatly being possessed of a large tope surrounded with a good mund bank. To succeed in an attempt on their cannon was next to imposible, as they were planted in a manner round us, and at a considerable distance from each other; we therefore, remained quiet in our post, in expectation of a successful attack upon their camp at night. The enemy retiring to their camp about noon with their Artillery, we sent a detachment and two field pieces to take possession of a tank with high bank, from whence they have considerably annoyed us with some cannon which were managed by Frenchman, this brought them out of second time, but as we found they made no great effort to dislodge us we proceeded to take possession of one or two more eminences lying very near one angle of their camp round which place run a ditch and breast·work, and an adjacent eminence was still in their prossession. They kept a smart fire of musquetry upon us, they made several attempts to bring their cannon, but our field pieces were played so warmly & well upon them, that they were always driven back. The horse exposing themselves a good deal on this occasion many of them were killed & among the rest four or five officers of the first distinction, which dispointing the enemy & throwing them into some confusion we were encouraged to storm the eminence and angle of their camp; both were attempted at the same time and carried with little or no loss though the latter was defended (exclusive of Blacks) by 40 French & 2 pieces of cannon and the former by a large body of foot and horse. On this a general rout ensued & we pursued the enemy six miles taking upwards of 40 pieces of cannon which they had abandoned. The roads were strewed with hackeries & filled with baggages of all kinds. Their loss is computed at about 500 men, on our side there were twenty two killed 50 wounded and these chiefly Blacks. Surajah Dowla saved himself on a camel and reaching the city early next morning, despatched away what jewels & treasure he convenintly could, and followed himself at midnight attended by four or five persons. During the warmest part of the action we observed a large body of troops, hovering on our right, who proved to be our friends, but as they made no signal by which we could discover them we frequently fired on them to make them keep their distance. After the action they sent their compliments and encamped that night in our neighbourhood. The next morning Jaffer Ally Khan paid me a visit and expressed much gratitude for the great services we had done him assuring us in the most solemn manner that he would faithfully fulfil the treaty he had made with us; he then proceeded to the city which he reached some

hours before Surajdaula left it. As on his flight Jaffer Ally Khan was in quiet possession of the palace & city I encamped without to prevent ravage & disorder, first at Mandipare & afterwards at the French Factory, at Sydabad. On the 29th I entered the city with only a party of 200 Europeans & 300 Sepoys & took up quaters in a spacious house & garden near the palace. The same day I waited on Jaffer Ally Khan who refused to sit himself on the "Musnud" till placed on it by me, which being done he received the homage & congratulations of all his courtiers as Nabab. The next morning he returned the visit & on my recommending him to counsult Jagget Seat on all occasions, who as the man of the greatest property in the kingdom, would give him the best advice for its tranquillity & security, we agreed into pay him a visit immediately together, at which a firm union was enterd into by us there, and Jugget Seat engaged to use his influence at Delhi (which is very great) both to get the Nawab confirmed, & procure for us such phiramondi as we should have occasion for.

The principal articles of our treaty with the present Nawab a confirmation of all grants, both in the Mogal's 'phiramondi' & the treaty with Surajdowlah. An alliance offensive & defensive against all enemies European or Country; the delivery of the French & their property into our hands, and perpetual exclusion of them from these provinces ; a tract of land extending between the lake & the river, form Calcutta, to Culpee, to be given to the Company, also one crore of rupees, fifty lakhs to the European sufferers, at the loss of Calcutta, 20 lakhs to the Black Sufferers, 7 to the Armenians & 50 to the Army and Navy. All the articles to be fulfilled within one month from his accession to the Subaship

As the sum in the treasury did not appear enough to satisfy our demand, which was only sufficient to pay the Nawab's troops, which was indispensibly necessary, it was left to Jugget Seat as a mutual friend to settle what we should receive, whose determination was that we should immediately be paid one half, two thirds in money & one third in jewels, plates & goods and that the other half should be discharged within 3 years at 3 equal & annual payments.

I have just had advice of Surajahdowlah being taken near Rajmaul in a distressed condition, with hardly clothes to his back; such is the misery he has been reduced to by his injuries to the English and by a general course of folly and wickedness, throughout the short time he had reigned. Our victory is very complete and present Nawab seems happily settled in his Government, and with universal approbation My presence, therefore, in this quarter, I imagine will not be required much longer when we have throughly considered the critical situation, the

company's affiars were in on this establishment after the taking of Chandernagore and the nice and the important game that was to be played with the late Nawab. I flatter myself that you will alter the sentiments you were pleased to express in your late letters, with regard to my having kept the troops here. I can not at this time reply to those letters, nor even acquaint you what you received, as all my papers are left at Chandernagore. I am now using my utmost indeavours to secuare Monsieur Law and his party. who are still at Patna. The French I spoke of in the action were some fugitives, who had assembled at Sydbad under Monsieur Sinfray the late secretary of Chandernagore and who advised, and I understand had the principal hand in burning and destroying Cossimbazar factory I must acquaint you that some days before I left Chandernagore letters arrived from the Nana, desiring our friendship for that he would engage to enter the province with 150,000 Mahrattas, and make good to us double of all the losses we had sustained, that as we were powerful in ships, we might keep out the French by sea, and he would take care to do it by land. In answer I have just written to him of our success, and that Jaffer Ally Khan is in peaceable possession of the kingdom, and will duly pay him the Chout. The late Nawab's spies have hitherto prevented any cassids passing through Cautack but now I hope they will meet with no further impediments. Jugget Seat has promised me to forward this safely to your hand. In a few days I expect to have one opportunity of addressing the court of Directors by a twenty gun ship despatched from hence.

Surajahdowlah arrived in the City on the 2nd at night and now immediately despatched having created some commotions in the army by the letters he wrote on the road to the several Jamadars. Monsieur Law & his party came as far as Rajhmaul to his assistance & were within 3 hours march of him, when he was taken. A party of the Nawab's horse & foot, followed by some of our military sepoys are after the French & I hope will give a good account of them. Gauzedeen Khan & the Mogal's son are come down Halabass & the Nawab of Oude with a numerous army is within 7 cross of them, it is expected every hour to hear of a battle or a compromise.

Robert Clive.

'খ' ক্রোড়পত্র

The speech of Rajah Radhakanta Deb Bahadur referred to in page 142 :—

As this is exclusively a native meeting it is meet that I should address it in our language. In the first place it is incumbent on me to say and on all others to know that we have not met here with any feelings of hostility towards the Hon'ble East India Company but with the view of obtaining a just recognition of our rights & privileges from our benign rulers. The Hindus in this part of India, I am happy to observe have always been the loyal subjects of the British Crown, evinced a deep interest in its prosperity and were greatly instrumental in procuring for it its earliest territorial acquisition in India. I shall briefly cite a few facts from private records in my possession to verify this assertion.

In 1756 all the Hindu sirdars and principal personages in Bengal and Behar were extremely disaffected to the Nawab Surajuddowllah on account of his tyrannical conduct. Rajah Rajbullav one of the Hindu nobles of the vidya caste fled from Murshidabad and took refuge in Calcutta whereupon the Nawab issued a Purwana to Mr. Drake the then governor of Calcutta, directing him to arrest & send up the Rajah to him. On his failing to do he received another Purwana to the effect that the plunder of Calcutta & the expulsion of the English residents there-from would be the inevitable consequence of his disobeying his orders. To dispel Mr. Drake's fears occassioned by his threats Rajah Rajbullav assured him that Nawab's sirdars were so dissatisfied with him that they would not fight against the English. To make his assurance doubly sure Rajah Rajbullav procured a persian letter to that effect addressed to Mr. Drake by the principal Hindu officers of the Nawab and dispatched it with great secrecy through a Hindu messanger who requested him to get it interpreted and its answer written by a Hindu & not by a Mussalman and Mr. Drake accordingly dispensed with the assistance of the Mussalman Munshi Tazuddin them in the service of the Company and availed himself of the aid a Hindu. This Hindu was Maharajah Nabakissen Bahadur. The satisfactory manner in which he executed this

task procured him a munshiship & hence he was at that time known by the name of Munshi Nabkissen. His subsquent success in the many diplomatic missions and other important services in which he was engaged gained him the love & esteem of the government. Soon after this Surajudowllah having attacked Calcutta with a large army caused Mr. Drake & the members of the council to retire to Madras, enacted the well knownd tragedy of Blackhole changed the name of Calcutta to that of Alinagar appointed Rajah Manick Chand its Governor & retired to Murshidabad. A few months after this Mr. Drake accompained by Colonel Clive and an army left Madras defeated the army of Surajudowllah weakend by desertion of the sirdars, captured the fortress of Budge Budge & took possession of Calcutta in January 1757. This momentous event was hailed with unutterable joy by the Hindus in general, whose descendants have assembled here & have been embolden to ask of the indulgent British Government, those blessings which have been hitherto withheld from them owing to misrepresentations as to their competancy to share them. Will not those persons who have before the Committee of Indian affairs blackened the character of the Hindus, so loyal, so faithful and so devoted to the interests of their rulers, be censured by all impartial men ? Do not the least observing of all observers amongst us, see clearly how grossly they have destorted facts ? [Englishman, Dated 6th August 1853, translated from original Bengali].

'গ' ক্রোড়পত্র

The Englishman 9th May 1840.
Notes on the Medical Statistics and Topography of Calcutta.

HISTORICAL NOTICES

In an old work printed in London 1555, entitled the 'Fardle of Facions' by William Waterman, are the following notices of 'Easterne Yude' and its inhabitants. The Ganges far passeth in greatness in all the floods. The land on each side by benefit of the battling breath of the gentle west wind reapeth corn twice in the year Other winter it hath none but the bitter blast of the easterly winds. They have two summers, a mild air, a rank soil and abundance of water, divers of them live an hundred years and more, they live a pure and simple life, being led with no lecherous lusts of other man's vanities Pestilence or other diseases they are not annoyed with, for they infect not the air with any filthy doings. Their physic is abstinence which is able not only to cure the malady already crept in, but also to hold out such as otherwise might enter.

In 1632 the capital of Bengal was Malcondi, a town somewhere on the west bank of the Hoogly, which according to the account given of it by Master William Bruton quarter master of the good ship Hopewell of London, burthen 240 tons, must have been a place of considerable size and magnificence of a splendid court.

The City of Bengalla is supposed by Rennel to have been situated upon an Island at the eastern mouth of the Ganges, but no trace of it now remains.

It is described by master Bruton as being in his time very great and populous. It hath many merchants in it and yieldeth very rich comodities. It is likewise famous for its multitude of rhinocers.

The town of 'Galgota' or 'Calecotte' is mentioned by several Dutch Navigators of early times, but without any distinct position assigned to it

The earliest English authentic account of the place is given by Captain Hamilton who visited in it in 1706, when it was the 'Emporium of British trade' and possessed a considerable number of English residents. and Fort for the protection of the trade. The settlement he narrates was founded by Mr. Job Charnock, the Company's Agent to India in 1690. This Gentleman having obtained permission to form an English settlement on the bank of the river, seems to have been greatly at a loss in fixing upon a proper situation, since besides residing at Barrackpore, which still bears his name he also settled at a village on the west bank called Ulabaria, but that place proving unhealthy he solicited and obtained permission to remove to Sootanutty on the opposite side and seems... .really to have been influenced in his choice by the existence of a particularly fine shady tree, not far from that place..... says his biographer, long and happy many years having married a Hindoo widow whom at the head of his guards he rescued from the funeral pile what she was about to act the trag.......catastrophe of ....with her deceased husband.

The.......Fort was built in 1696. Its side is now occupied by dwelling houses and the new Custom House. It was an irregular tetragonal building brick and mortar, facing the river for two hundred yards. A wall four feet thick surrounded it at a distance of twenty yards and enclosed a range of warehouses. Beyond these, and outside of the wall were scattred the houses of the English inhabitants upon the bank of the river, with enclosed gardens to each dwelling. The space thus occupied might be a half mile north and south of the Fort, and six hundred yards east. The Native Town lay to the northeast inward.

Calcutta possessed at that time a church built by the pious charity of merchants, and the Christian benevolence of seafaring men and a pretty good hospital; where many go in to undergo the penance of physic, but few come out to give an account of its operation.

Captain Hamilton seems to have been forcibly impressed with the badness of the locality on the score of healthiness. Mr. Charnock, he says "could not have chosen a more unhealthy situation on all the river for three miles to the eastward is a Saltwater Lake, which overflows in September and October, and prodigious number of fish resort there, but in November and December. when the floods are dissipated. those fishes are left die and with their putrefaction affect the air with thick stinking vapours which the northeast winds bring with them to Fort William; so that a great yearly mortality is caused by them." Of the west bank of the river. at Howrah. opposite Calcutta. he says "that for many reasons had been a better place to have built their Town and Fort. One is that where it now stands the afternoon's sun is full on the front of the

houses and shines hot on the streets. Whereas had the hot Town been on the other side of the river, the sun would have sent its rays on the backes of the houses and the fronts had been a good shade for the street."

In 1742 the Township of Calcutta was limited and defined by a ditch, begun as a protection against the Mahrattas Commencing about three miles to the north of the Fort, where a deep muddy gully debouched into the river. It was ment to surround the town and fall again with the river about the same distance below the Fort, but was never compared. The country itself to the southeast is said by Orme to have been so full of swamps, so intersected by water courses, and Nullahs as to be almost uninhabitable. In the rainy season in fact he says, it might be called an entire lake, "sinking as it does about ten feet below the level of the platin."

This seems to have been the general character of the country to the east and southeast from the Salt Lake as far Fulta and Budge Budge i.,e., for 20 or 30 miles, while to the north and northeast the land was higher and thickly covered with groves and jungles.

The earth excavated in forming the ditch, was so disposed on the inner or twonward side as to form a tolarably high road, along the margin of which was planted a row of trees and this constituted the most frequented and fashionable road about town, the streets of Calcutta followed their present direction. Onc the principal, lay due north and south along the bank of the river, and close to it, though now so distant and retains the name of 'Clive Street.' The other called the 'Avenue' ran east and west, the present Durrumtolla. They are described as being well raised cause ways, the materials for their elevation being found by deepening the ditch on each side.

The present fort which (will be more fully described afterwards) was begun in 1758 'upon a scale' says Orme of expence which its founder Lord Clive had no intention of. A fatality seems to have attended our selection and arrangements in every thing connected with the accommodation and healthy bestowal of our European troops in Bengal. The tate Dr. Bruke, Deputy Inspector of Hospitals, in his official reports describes Fort William as one of the wrost, if not the very worst of the Military stations in India.

The buildings are too crowded together, the estimate of space and of domestic convenience has been too confined for the climate, the apartments for the men are deficient in height and ventilation from the crowding of the buildings the height and proximity of the fortification. the radiation of heat is not only very great, but there is prevented the dissipation of those malarious vapours. of which there appears to be so

copious a supply from various sources in Fort William.

The gradual increase of the town is marked by a rapid succession of public edifices, the removal of nuisances, and numerous other topographical improvements towards the end of the century. In 1787 the present Cathedral Church of St. John was consecrated.It was built beyond the boundaries of the Fort in the environs of Calcutta. In 1790 was established the Free school for European children, and the same year 17 boys and 12 girls were admitted on the foundation. In 1799 the foundation of the new Government house was laid and the new Portuguese Church at Baitaconnah was consecrated. About this time was also opend 'the house at Howrah' for the education and maintenance of the orphans of military servants by the Bengal Military Orphan Society, instituted in 1787.Under the auspices of the Marquis Wellesley all the roads in and about Calcutta were greatly enlarged, widened. and made conducive to public convinence and health. Now says a flowery writer in one of the journals of the day on the new circular road of Calcutta, the young, the sprightly and the opulent during the fragrance of morning in the chariots of health enjoy the 'gales of recreation."

In the course of these improvements fell the famous Bytha Kanna tree (literally sitting down tree) probably the same whose shade captivated the venerable Job Charnock,–as it stood in the way of the new road which to this day bears the name of Boitacannah.

The tree in former times was the place of rendezvous for caravans which traded to and from the districts. Here the merchants met to depart in bodies from Calcutta, to protect each other from robbers in the neighbouring jungle, and here they dispersed when they arrived at Calcutta with merchandise for the Factory.

With regard to the population of Calcutta then as now very imperfect information is procurable Captain Hamilton mentions that when he was there one year (1700 ?) "there were reckoned about 1.200 English; some Military, some servants of the Company, some private merchants and some seamen."

At the capture of Calcutta in 1756, there were not more than 70 houses belonging to the English in the town, and the number of native houses was estimated by Mr Holwall at 9.451. The native inhavitants in the four villages close to Calcutta included under the Company's protection he estimated at about 400,000. The garrison at that unlucky hour consisted of 300 Europeans, of whom 146 were shut up in the blackhole. and only 23 came out alive the following morning. The more recent improvements in the town, under the auspices of the Lottery Committee will be particulary described afcrwards.

ক্রোড়পত্র 'ঘ'

CLIVE'S DEFENCE BEFORE PARLIAMENT

A. D. 1773

"After rendering my country the service which I think I may, without any degree of vanity, claim the merit of, and after having nearly exhausted a life full of employment, for the public welfare, and the particular benefit of the East India Company, I little thought that such transactions would have agitated the minds of my country-men in proceedings like the present, tending to deprive me not only of my property and the fortune which I have fairly acquired, but of that which is more dear to me my honour and reputation." "I have served my country and the Company faithfully, and had it been my fortune to be employed by the Crown, I should have been differently rewarded. Not a stone has been left unturned where the least probablity could arise of discovering something of a criminal nature against me. I am sure if I had any sore places about me they would have been found. The public records have been ransacked for proofs against me, and the late deputy-chairman of the Company, a member of this house, has been so assiduous in my affairs, that it appears, he has neglected his own". " To be called upon, after sixteen years have elapsed, to account for my conduct in this manner and, after an uninterrupted enjoyment of my property, to be questioned, and considered as obtaining it unwarrantably, is hard indeed, and a treatment I should not think the British senate capable of. But if such should be the case, I have a conscious innocence within me, that tells me my conduct is irreproachable. Frangas non flectes. My enemies may take from me what I have; they may, as they think, make me poor, but I will be happy. Before I sit down, I have one request to the house and it is, that when they come to decide upon my honour, they will not forget their own".

On the 21st of May several witnesses were examined and Clive, after a short speech, concluding with the words. "Take my fortune, but save my honour". left the house. The statement of facts, freed from some innuendoes with which it was unnecessarily incumbered, was reduced to the form of a distinct motion. in the following terms :- "That it appears to this house, that the Right Hon. Robert Lord Clive, Baron of Plassy. in the kingdom of Ireland. about the time of the deposition of Sirajudowllah. and the establishment of Meer Jaffier on the musnad. did

obtain and possess himself of two lacs of rupees as commander-in-chief, a further sum of two lacs and 80,000 rupees as member of the select committee, and a further sum of 16 lacs or more under the denomination of a private donation; which sums, amounting together with twenty lacs and 80.000 rupees were of the value, in English money, of £234,000." This motion was put as an amendment on the original motion containing both the statement of facts and the stigma and finally carried by a majority of 155 to 95. The stigma, thus virtually excluded, was then put as a separate motion, and negatived without a division. Ultimately at five in the morning of the 22nd May, 1773, a motion "that Robert Lord Clive did, at the same time, render great and meritorious services to his country. passed unanimously.

On this conclusion to the violent attacks on Clive, Lord Stanhope, well versed in parliamentary procedure thus wrote "such a note might be deemed almost a verdict of acquittal, certainly at least, it showd a wise reluctance to condemn. Inclosed the whole case and Clive had no further Parliamentary attack to fear." "But though the victory, was gained, the struggle affecting the personal honour and fortune of a proud and sensitive man have made deep inroads upon the contitution of one who had been long suffering from the acute agony caused by the malady contracted in India." *

> "Men at sometime are masters of their fates;
> The fault, dear Brutus, is not in our stars
> But in ourselves, that we are underlings."

Shakespeare

In 1767 Lord Clive's income was calculated to be at least. £.96,000 per annum, + which forms a great contrast to the pitiful letter from Bengal, quoted above.

In its dealings with the natives the two great obstacles which met the Company at every turn were the extreme poverty of the people and their very strict caste rules. The food, clothing and habits of the native population were prescribed by their religious beliefs. Hence it was extremely difficult, if not impossible, to push the sale of English goods.

'And that in so doing the said Robert Clive abused the power with which he was entrusted, to the evil example of the servants of the public and to the dishonour and detriment of the state.' (Malleson's Clive p 206.)

' Mr. Stanley proposed to omit the words inculpating the honour of Clive. Mr. Fuller seconded this amendment, going even turther and striking out the sentence of referring to the exercise of undue influence., This victory stripped Burgoynes, resolutions all their stings.' (Ibid p 208)

* Ibid p. 209

+ Debates in Asiatic Assemble. London 1767.

The creation of new desires new conventional necessities has been the great cause of the increase of industrial prosperity and efficiency throughout the world. For example, the East India Company succeeded, within half a century, in making tea an article of universal consumption in England, But in India the process was almost impossible. The Company was repeatedly pressed by manufacturers at home to export larger quantities of English cloth and other commodities, and was compelled in self defence to yield to this pressure, although the Directors knew that it was almost impossible to create a market for the English goods in India, if the use of the articles in question chanced to be contrary to the customs and religious tenets of the natives. The climate, moreover, rendered woollen clothes unsaleable.

Again, the extreme poverty of the natives rendered the collection of goods for shipment to England very difficult and complicated. There were no large local merchants or manufacturers. In its industrial development India had not yet abandoned the Domestic System,. The weavers were so poor, that the Company was obliged to advance money to buy materials, and to provide sustenance during the period of manufacture. It sent agents about the country to collect goods in such proportions as they were offered and to receive small quantities at specified places, until sufficient had been collected from various sources to form a cargo. The fabrics were collected into local warehouses, called 'Kottahs', and each piece was marked with the weaver's name. Hence they were transferred to large warehouses, which, with the offices and private quarters of the agents, formed a 'Factory'.

Owing to the necessity for partial payment in advance, an efficient system of supervision was necessary to prevent the native from selling the completed article to some person, other than he who had advanced money for the purchase of raw material,– a proceeding which was by no means uncommon when the rivalry between the English and French Companies was at its height. At the head of each factory there was always an Englishman. He employed a native secretary, who was called a 'Banyan'. The 'Banyan' hired overseers or agents, who were called 'Gomastahs' one for each village or station, which supplied the factory. "Gomastah" was provided with 'peons' who were armed servants, and 'Hircarars'. or messengers. The latter were employed to summon the 'Dallahs', "Pycars" and weavers, when goods were due, or were required to complete a cargo. The former of these were agents, who dealt with the "Gomastahs" and the "Pycars", brokers who were intermediate between the "Dallahs" and the weavers themselves. Thus the company's servant was five times removed from the actual weaver, The opportunities which this provided for corruption and oppression proved

irresistible for most of the officials concerned *

The following is the description of the condition of England before 1756 :-

"Never did the fortunes of England stand lower than at the end of 1756. In North America, Braddock had been defeated and his army annihilated. Oswego, with which the control of Lake Ontario had been taken; from India came the news of the Black Hole of Calcutta; on the continent our only ally. Frederick of Prussia, had been defeated by an equal force of French, and slunk home without daring to renew the action." Indeed such was the state of affairs in those days when the cynical Lord Chesterfield uttered the despairful cry :-

" We are no longer a nation."

"In 1702-1704, when there was no rain for two years, over two millions" says Manuci, "died in the Decean. Fathers, compelled by hunger offered to sell their children for a quarter or half-a rupee but were forced to go without food finding none to buy them."

The British rule was welcomed in the Deccan says a popular Maratha journal in its issue of the 18th December 1906.

In 1733 a famine in Chinglaput District took place.

"To the north of the Narbada anarchy and war were chronic; there was a nominal empire of which the centre was at Delhi as of yore. In 1759, however, the Emperor had been murdered, his son and heir driven to fly from the Capital and wander in the eastern provinces a suppliant for aid. In the following year the Afghans invaded Hindustan, and the marathas who had occupied Delhi, were driven back to the Deccan after a defeat attended with terrible slaughter. In 1764 the officers of the Company defeated and deposed the Nawab of the Eastern provinces and the fugitive heir of the Empire concluded a treaty with the British by which he was recognised as Emperor, and in 1771 he returned to Delhi where he exercised local authority through the agency of able functionaries. In the Eastern provinces the power of the British was finally established and their first Governor General Warren Hastings lent the support of British arms to his ally the Nawab of Oude, in a campaign which he conducted with success against the Rohillas or Indian Afghans."

In 1739 Delhi was captured by the atrocious Persians who killed thirty thousand unarmed inhavitants and that the English in Calcutta were feverishly digging a ditch round Calcutta to protect it against the marathas so lately as 1751. There was no security for property or life,

* See Mill. Vol III. p 11

and justice was bought and sold openly in court. This was the state of the country when Clive came to Calcutta to recover it from the Nawab of Bengal.

Warren Hasting's letter to Sir George Colebrooke. April 3' 1773 :-

The village communities are little republics having nearly everything they want within themselves and almost independent of foreign relations.

"A school in every village of Bengal" (Minute No. 84. Dated 7th November. 1830)

(Sir Thomas Monroe 1813)

"It is ovious that when the British took possessions of the country. in the different provinces they found that. in most parts of the country except Western and Central India. there existed a widespread system of National Education." *

" With every species of monopoly. therefore. every kind of oppression to manufactures of all denomimations throughout the whole country has daily increased; in so much that weavers. for daring to sell and connived at such sales. have. by the Company's Agents. been. frequently siezed and imprisoned. confined in irons. fined considerable sums of money. flogged and deprived. in the most ignominious manner of what they esteemed most valuable. their castes."

(Bolts - Consideration of Indian Affairs.)

" On the contrary it delibratcly strangled Indian manufactured exports and thereby gave English Mercantile enterprise an opportunity to obtain a footing which once obtained. has laid to the whole country being covered with the product of looms."

(William Dighy in Prosperous British India Page 260)

"The English Army of Traders in their march. ravage worse than a Tatarian conqueror. The trade they carried on more resembled robbery than commerce. Thus this miserable country was torn to pieces by the horrible rapaciousness of the Foreign traders " +

" The city of Calcutta in past times was a village in a taluqah endowed in favour of Kali. which is the name of an idol which is there. In as much as in the language of Bengal 'Karta' and 'Kata'. means 'master' or 'lord.' therefore this village was named 'Kalikata'. meaning that its owner was Kali. Gradually. by a process of the mo[illegible]ion of the tongue. the *alif* and the *ea* being dropped it was called Kalikata."- Riyajus Salatin. p. 30.

"In 1596 A. C. it is mentioned in the Aini-Akbari as a rent-paying village named Kalikata under Sarkar Satgaon." Vol. II. p. 141.

"Chandannagore alias Farashdangah. is twelve Karoh distant from Calcutta. The factory of the Christian French is situated there."

* Mr. John Matthai in village administration in British India chapter II P 42

+ Impeachment speech. 15th February. 1787 Burke

"Similarly at Chucharah the dutch hold authority".

"Dacca is on the banks of the Budhiganga and the Ganges named Padma, flows three karoh or kos distant from this city. During the sovereignty of Naruddin Muhammad Jahangir the Emperor, the city was called Jahangirnagar, from that time till about the end of the reign of Emperor Aurenzeb this city was Viceregal Capital of Bengal. Since the period of his Nizamat when Nawab Jafar Khan made Murshidabad the seat of Government the latter became the viceregal seat."

"After all allowance made for incidental faults and crimes, the substitution of rule of the East India Company for that of the decadent Mogul and the rapacious Maratha and the substitution of direct British rule for that of the East India Company, must surely be counted on the whole as triumphs of industrialism over militarism" (Vide Sir Roland Wilson's Province of the State)

RAPID RISE AND FALL IN THE IMPORT OF INDIAN COTTON MANUFACTURES INTO INGLAND

The Law of 1700 which obtained the Royal Assent on the 11th of April 1700 enacted that from and after the 29th of September 1701 all wrought silks and stuffs mixed with silk and cotton or the manufactures of China and India and all Calicoes painted or stained there, which are or shall be imported into this kingdom, shall not be worn or otherwise use in Great Britain and all goods imported after that day shall be ware-housed or exported again. *

Rice	Rs.	in lacs	Fall	Rs.	in lacs
1665	82	"	1750	165	"
1680	120	"	1800	131	"
1690	185	"	1825	58	"
1700	282	"	1850	13	"
			1870	50.000	only

Piece goods from Britain to India and of India sold at London.

1793	£ 276	£.1,797,345
1798	" 7,317	"3,245,745
1805	" 48,525	" 978,317
1810	"118,408	" 181,273

---

* Memoirs of Sir George Birdwood.

ক্রোড়পত্র ‘ঙ’

Long's Records Page 339 :–

"Petruse Aratoon or Coja Petruse was suspected by Major Adams to have been a spyo for the Nawab and was seized as such and ill treated, however, he vindicated his character to the Government His brother commanded the Artillery of the Nawab at Patna and was subsequently murdered there, the Nawab suspecting him of being too friendly to the English Had he been alive the massacre might have been prevented through his influence."

Page 314. Proceedings No 647 March 24, 1763.

Mr Batson lays before the board the following Minute –

" Coja Petruse, the Armenian, acts as the Nawab's spy in this place. Mr. Batson proposed that he and his family be turned out of Calcutta immediately and desires it may be put to vote."

"Mr. Watts stated 'Petruse is well known to be an intriguing person and to have raised himself, I believe, being a spy betwixt us and Seraj Dowla, and during Colonel Clive's Government was ordered to quit this settlement and not to have any connections at the Durbar, for having spread and told the Chutta Nawab Meeran that Colonel Clive intended to take away his life. I, therefore, think he ought to be ordered to quit this settlement, that his constituents cannot suffer any losses by our taking such a step as his business can be carried on equally the same as when he was absent in a late visit to the Nawabs."

" The President pointed out that ordering a merchant of long standing out of the settlement would be arbitrary and would shake all confidence but he was forbidden to act for the future as vakil to the Nawab."

খোজা পিদ্রুব কথায় মেজর আদামের রণনৈপুণ্য বিলক্ষণ অবগত হইতে পারা যায় ও ঘেরিয়ার যুদ্ধে গুর্গিন খাঁর হত্যা হইলেও মীরকাসিমের পরাজয় হইয়াছিল। উহাতে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে সেইরূপ দণ্ডিত করিলে যে পলাশীযুদ্ধের ফল অন্যরূপ হইত তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কারণ তখন নবাবী সৈন্যসামন্ত সকলেই লোভী ও অকর্মণ্য ছিল, মীরকাশিম যৎকিঞ্চিৎ তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়াছিল তাহাতেও যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিল না।

"Long's Records P 339 Proceedings No 687. November 21. 1763 Your petitioner begs leave to observe to this Hon'ble Board at Ouda Nulla, a place where the enemy had strong works and great forces, your

petitioner by direction from Major Adams wrote two letters to Marcan and Arratoon two Armenian officers. who amongst others commanded the enemy's forces, and intimated to them that as the English always favoured and protected the Armenian nation, so the Armenians in justice ought to direct their steps towards the good of the English "

" Your petitioner by carrying and bringing letters found means to introduce an correspondence between Rajah Monuk Chand and Major Kilpatrick which opened a passage for provisions to the English at Fulta Your petitioner was no less serviceable to the English when Siraju Dowllah came to attack Calcutta the second time as he was the person by whose means in carrying and bringing letters between Colonel Clive and Suraju Dowllah a general accommodation and peace was brought about."

"Even to this day whatever the Hon'ble the President and the Council have been pleased to order, your petitioner has always faithfully executed."

নবাব দরবারে আরমেনিয়ানগণের বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল ও গুর্গণ খাঁর ভগ্নী দলনীকে মীরকাশিম বিবাহ করেন উপন্যাসকার বর্ণনা করিয়াছেন। কোম্পানীর দপ্তরে আরমেনিয়ান ক্রীতদাসীকে পাটনায় ইংরাজ কর্মচারী লইয়া যাওয়ায বিচারের দরখাস্ত হইয়াছিল উহাতে ব্যবসার হানি হইয়াছিল বোধহয়।

380 –Frankland's expenses in surveying 22 Pergunnahs

(Letter to Court, December 31, para, III, 1758)

The getting possession of these lands has been attended with a charge of near Rs. 50.000 as it was necessary for Mr. Frankland to carry a great retinue and a large number of servants of all kinds. Add to this that the King's Connegoes were maintained at our expense, as well as the Gomastahs and other servants belonging the zemindars, whose accounts we sent for. In the above sum about 5 @ Rs. 6,000 is for dead stock. such as tents camels. &c, which are in the Company's stores. Since the month of July, the charges have decreased, and upon a medium do not exceed Rs. 3.700 per month for the whole 22 Pergunnahs